জীবনজয়ের পথে

নবপত্র প্রকাশন । কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম নবপত্র-প্রকাশ ঃ ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬

প্রকাশক ঃ প্রসূন বসু

নবপত্র প্রকাশন

৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট / কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক ঃ আশীষ কোঙার

শ্রীগুরু প্রিন্টার্স

৯এ রায় বাগান স্ট্রীট / কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচি

জীবনজয়ের পথে
তৃতীয় খণ্ড

জীবনজয়ের পথে

তৃতীয় খণ্ড

১

পেরেক

কথা ছিল দিন দুয়েকের মধ্যে আমি কুরিয়াজ কলোনির ভারগ্রহণের কাজ শুরু করব, কিন্তু মুশকিল হল এই যে তার আগে দলপতি-পরিষদের সভায় আমার কিছু করণীয় ছিল, তাদের কিছু বলার ছিল আমার — যাতে আমাদের যাবতীয় সম্পত্তি কুরিয়াজে চালান করার জন্যে গোছগাছ করে বেঁধেছেঁদে তৈরি করে দেয়ার কঠিন কাজটা আমার সাহায্য ছাড়াই কলোনি-বাসিন্দারা নিজে থেকে সংগঠিত করতে পারে।

কলোনির মধ্যে তখন আশঙ্কা, আশা-ভরসা, 'বদমেজাজ', জ্বলজ্বলে চোখ, ঘোড়া, গাড়ি এবং যতসব তুচ্ছ বস্তুর, প্রয়োজনীয় বলে লিস্টিভুক্ত করা হয়েছে অথচ দরকারের সময় তা সত্ত্বেও ভুলে যাওয়া গেছে এমন সব জিনিসপত্রের ও ভুল করে এদিক-সেদিক ফেলে-রাখা দড়াদড়ির রীতিমতো একটা কূলভাসানো প্রচণ্ড ঢেউ এমন অসম্ভবরকম জট পাকিয়ে উঠেছিল যে ছেলেরা নিজে থেকে সে জট-যে ছাড়াতে পারবে সফলভাবে তাদের সামর্থ্যে ততখানি বিশ্বাস আমার ছিল না।

অথচ কুরিয়াজ হস্তান্তরের চুক্তিনামাখানা হাতে পাবার পর মাত্র একটা রাত পেরোতে-না-পেরোতে দেখা গেল রীতিমতো একটা অভিযান শুরু করার মনোভাব তার মধ্যেই পেয়ে বসেছে কলোনিটাকে, কলোনি-বাসিন্দা প্রতিটি মানুষের মেজাজ, ইচ্ছাশক্তি আর কর্মের বেগকে প্রভাবিত করে তুলেছে

তা। কুরিয়াজের নামে কলোনি-বাসিন্দাদের মনে ভয়ের সঞ্চার না-হওয়ার কারণ ছিল সম্ভবত এই যে তারা কুরিয়াজকে তার স্বমহিমায় প্রত্যক্ষ করে নি। অপরপক্ষে কুরিয়াজ সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টির কবল থেকে রেহাই পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কেবলই মনে হচ্ছিল কুরিয়াজ যেন ভয়ঙ্কর আর আজগবি ধরনের একটা মড়া — অনেকদিন আগেই সরকারিভাবে তার মৃত্যুঘোষণা করা সত্ত্বেও যে নাকি আমায় গলা টিপে মারতে সমর্থ।

দলপতি-পরিষদ সিদ্ধান্ত করল যে আমার সঙ্গে কুরিয়াজে তারা মাত্র ন'জন কলোনি-বাসিন্দা আর একজন শিক্ষককে পাঠাবে। আমি কিন্তু আরও বেশি লোক চাইলুম। বললুম, এত ছোট্ট একটা দল নিয়ে আমি যা করতে পারব তা হবে গোর্কি কলোনির মর্যাদায় কলঙ্কলেপন ছাড়া কিছু নয়, কেননা কুরিয়াজের গোটা শিক্ষক-পরিচালক গোষ্ঠীকেই বরখাস্ত করা হয়েছে এবং সেখানকার বাসিন্দাদের মনোভাবও আমাদের অত্যন্ত বিরুদ্ধে।

শুনে ইয়ার্কির ছলে হেসে কুদ্‌লাতি বলল:

'সাথে করে আপনে দশজনা লোক নেন কি বিশজনা নেন তাতে তফাত ঘটবে কাঁচকলা। মোট কথা, কিছুতিই আপনে কিছু করে উঠতি পারবেন না। তবে যখন আমরা সবাই গিয়ি পেঁছাব ওখেনে তখনকার ব্যাপার আলাদা — কামারের এক ঘায়ে তখন কাত করে দেব সবকিছু। মনে রাখবেন, ওখেনে ওরা আছে তিন শো জনা। আমাদের সবকিছু পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে নিয়ি যেতি হবে এখেন থেকে। ভাবেন তো, তিন শো বিশটা শোররে মালগাড়িতি চাপানো কি সোজা কথা! তাছাড়া আপনে তো লক্ষ্য করেছেন, পেত্যেক দিন নতুন-নতুন বাচ্চারে ওরা আমাদের এখেনে পাঠাতেছে। তাই না? কে জানে, খার্‌কভের লোকগুলার মাথাটাথা সব খারাপ হয়ি গেছে কিনা, নাকি ইচ্ছা করে আমাদের জ্বালাবার জন্যিই এমন কাণ্ডমাণ্ড করতেছে তারা।'

সত্যি, ক্রমাগত নতুন-নতুন ছেলেমেয়ে আসতে দেখে আমি নিজেই তখন দমে যাচ্ছিলুম কেমন। এই নতুন আগন্তুকরা আমাদের জমাট-বাঁধা যৌথ জীবনকে কেমন যেন তরল করে তুলছিল, পূর্ণশক্তি, বিশুদ্ধতা ও নমনীয়তা সহ গোর্কি কলোনির স্বরূপ বজায় রাখাই কঠিন করে তুলছিল আমাদের পক্ষে। অথচ আমাদের ওই ছোট-ছোট সব বাহিনীর সাহায্যে তখন তিন শো জনের মস্ত একটা জটলা সামলানোর দায়িত্ব ঘাড়ে চেপেছে।

কুরিয়াজের সঙ্গে লড়াইয়ের ওই প্রস্তুতিপর্বে আচমকা কামারের এক-ঘা হানার পরিকল্পনাটা সব সময় মাথায় ঘ্রছিল আমার। ভাবছিল্ম, সত্যি, প্রচণ্ড এক ঘা মেরেই কুরিয়াজবাসীদের জয় করতে হবে। কেননা একটুমাত্র দেরি, ক্রমিক বিবর্তন আর 'ক্রমান্বয়ে অন্প্রবেশ'এর সকল বাসনা আমাদের লড়াইয়ের শ্ভ ফলাফলকে বানচাল করে দেবে। আমি ভালোই জানতুম যে কুরিয়াজের নৈরাজ্যের ঐতিহ্যও আমাদের নিজস্ব ধরনধারণ, ঐতিহ্য আর চারিত্র্যবৈশিষ্ট্যের মতোই পরস্পরের মধ্যে 'ক্রমান্বয়ে অন্প্রবেশ'এ সমর্থ, আর তা ঘটা মোটেই অসম্ভব নয়। 'ক্রমান্বয়ে অন্প্রবেশ'এর তত্ত্বটি জিদ ধরে অনবরত আউড়ে খার্‌কভের ঋষিপ্রতিম ব্যক্তিরা এই কাল-প্রসিদ্ধ ধারণাটি আমাদের মগজে প্রবেশ করাতে চাইছিলেন যে খারাপ ছেলেদের ওপর ভালো ছেলেদের শ্ভ প্রভাব একদিন-না-একদিন পড়বেই। আমি কিন্তু ভালোই জানতুম যে ঢিলেঢালা সাংগঠনিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে গড়ে-ওঠা যে-কোনো যৌথ সংস্থায় সবসেরা ছেলেপিলেরাও সংসর্গদোষে সহজেই একেবারে ব্নো জানোয়ারের মতো হয়ে উঠতে পারে। তবে উপরোক্ত ক্রমোন্নয়নের পদ্ধতি চাল্ হওয়ার মতো সময় পাওয়ার অনেক আগেই আমার পরিকল্পিত নির্ধারক আঘাতটি-যে হানতে হবে একেবারে অঙ্কের মতো নিখ্ঁতভাবে এটা হিসেব করে রেখেছিল্ম বলে 'ঋষিকল্পদের' সঙ্গে আমি আর দ্বন্দ্বয্দ্ধে প্রব্ত্ত হই নি। এখন, আমাদের কলোনিতে উপরোক্ত নতুন আগন্তুকদের আবির্ভাবে আমার এই পরিকল্পনা সফল করে তোলার পথে বাধার স্ষ্টি হচ্ছিল। প্রাজ্ঞ কুদ্‌লাতি ব্ঝেছিল যে আমাদের তত্ত্বাবধানের অধীন অন্যান্য সবকিছ্র মতো একই রকম উৎকণ্ঠা নিয়ে আর প্রয়াস করেই এই নতুনদেরও কুরিয়াজে স্থানান্তরণের জন্যে প্রস্তুত করতে হবে।

অতএব অগ্রপশ্চাৎ বহ্রকম চিন্তা করে, বহ্ দ্শ্চিন্তা মাথায় নিয়ে 'অগ্রবর্তী মিশ্র বাহিনী'র পরিচালক হিসেবে অবশেষে আমি কুরিয়াজ যাত্রা করল্ম। যতক্ষণ সে থাকছে ততক্ষণ, একেবারে শেষ ম্হ্র্ত পর্যন্ত, আমাদের কলোনির কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করবে বলে যদিও কথা দিয়েছিল কালিনা ইভানভিচ, তব্ এত মনমরা হয়ে আর আসন্ন বিচ্ছেদের চিন্তায় এতই ভেঙে পড়েছিল সে যে কলোনি-বাসিন্দাদের মধ্যে ইতিউতি ঘ্রে বেড়ানোটুকুই মাত্র করতে পারছিল আর কাজের নানান খ্ঁটিনাটি অনেক কষ্টে মনে করে পরম্হ্র্তেই তা ফের ভুলে যাচ্ছিল বেচারা। গভীর দ্ঃখ পেলে ব্ড়ো মান্ষের

মনের অবস্থা যেমন হয়ে থাকে ভাবখানা ওর তেমনই হয়েছিল আর-কি। কালিনা ইভানভিচের হুকুমগুলো শুনছিল ছেলেরা শ্রদ্ধা আর স্নেহভরে, খুশিভরা গলায় 'ঠিক হ্যয়' বলে আর সজোরে স্যালুট ঠুকে সাড়াও দিচ্ছিল তাতে, তবে বুড়ো মানুষকে করুণা করার অস্বস্তিকর ভাবটা শিগ্‌গিরই ঝেড়ে ফেলে যে-যার নিজের মতো কাজ করে যাচ্ছিল।

কলোনির পরিচালনায় আমি রেখে এলুম কভালকে। লুনাচার্স্কি কমিউন তাকে ফাঁক পেলেই ঠকাবে এই ভয়ে যতটা বিচলিত হয়ে ছিল কভাল এমন আর কিছুতে নয়। কথা ছিল, লুনাচার্স্কি কমিউনই আমাদের কাছ থেকে তালুকটার, ফসল-বোনা আবাদের আর ময়দা-কলের দখল নেবে। ফলে কমিউনের প্রতিনিধিদের সে-সময়ে গোর্কি কলোনির নানা বিভাগে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল, আর কমিউনের চেয়ারম্যান নেস্তেরেঙ্কোর লাল দাড়িগাছা অনবরতই অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে কভালের দিকে ফিরছিল। এই দু-জনের মধ্যে কূটনৈতিক দাঁও-কষাকষি অবশ্য খুবই অপছন্দ করছিল ওলিয়া ভোরনভা আর চেষ্টা করছিল নেস্তেরেঙ্কোকে এ থেকে সরিয়ে দিতে। যেমন, একবার ওলিয়া বলল:

'বাড়ি যান দেখি, নেস্তেরেঙ্কো! আপনের ভয়টা কিসির, শুনি? এখেনে জুয়াচোর নাই কেউ। বাড়ি যান, শোনতেছেন আমার কথা!'

শুধুমাত্র চোখদুটো দিয়ে চতুর হাসি ছড়িয়ে রাগে-অগ্নিশর্মা কভালের দিকে মাথাটা ঝাঁকিয়ে নেস্তেরেঙ্কো বলল:

'লোকডা কেমন, তা জানো ওলিয়া? ও হল্য গে কুলাক! একবারে জাত কুলাক লোকডা...'

এবারে পুরোপুরি খেপে গিয়ে একগুঁয়ের মতো বলতে লাগল কভাল:

'কী পেয়েছেন আপনারা? ভেবেছিলেন সবকিছু আমরা এমনিই মিনি-মাগনা আপনাদের দান করে দিতে যাচ্ছি? ছেলেরা যে এই সবকিছুর জন্যে এতটা মেহনত করে মরল সে-সব সত্ত্বেও? কেন? কেন দেব আমরা, শুনি? আপনারা আমাদের তালুকের দখল নিতে যাচ্ছেন, স্রেফ এই জন্যেই? নিজেদের থলথলে ভুঁড়ির দিকে তাকান-না একবার! আবার ভান করছেন যেন কত গরিব!.. আপনাদের মূল্য ধরে দিতে হবে এর জন্যে!..'

'কিন্তু ব্যাপারডা চিন্তা করেন একবার! আমি আপনেদের দাম দেব কী প্রকারে?'

'তা আমার ভাবার দরকার? আমি যখন আপনারে জিজ্ঞেসা করেছিলাম মাঠে আমরাই বীজ বুনব কিনা তখন আপনি কতটা চিন্তা করেছিলেন, বলেন তো? খুব তো তখন মাতব্বরি চালে বলেছিলেন — বীজ বুনে ফেল! এখন কী হবে? পয়সা ছাড়ুন তাহলে! গমের জন্যে, বাজরার জন্যে আর বীটের জন্যে...'

মাথাটা একপাশে হেলিয়ে তামাকের থলির মুখটা খুলে তার ভেতরে কিসের যেন সন্ধানে আঙুলগুলো আলতো করে পুরে দিল নেস্তেরেঙ্কো। তারপর অপরাধীর মতো হেসে বলল:

'কথাডা খুবই ঠিক, আপনে ঠিকই কয়েছেন... দানাফসল... হ্যাঁ, তা তো বটেই। কিন্তু কাজির জন্যি আপনে পয়সা চান ক্যানে? ছেল্যারা তো — যারে কয় — সমাজের মঙ্গলের জন্যি কাজ কর্যোল বলা চলে...'

তিড়িং করে লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে তীব্র আবেগক্ষুব্ধ গলায় কভাল বলে উঠল:

'কিসের জন্যে তা করতে যাবে ওরা, শুনি? যত্তো সব নিষ্কম্মা রক্তচোষার ধাড়ি! আপনাদের কি কুষ্ঠব্যাধি হয়েছে, না কী? আবার বলছেন নাকি কমিউন বানিয়েছেন, এদিকে বাচ্চাদের খাটুনি ভাঙিয়ে মুনাফা লোটার বেলা ঠিক আছেন!.. আপনারা যদি পয়সা না দেন, তাহলে সবকিছু আমি গন্‌চারোভ্‌কা গাঁয়ের লোকেদের বিলিয়ে দেব!'

এরপর ওলিয়া ভোরনভা নেস্তেরেঙ্কোকে ঘর থেকে ভাগিয়ে দিল, আর মিনিট পনেরো পরে দেখা গেল বাগানে কভালের সঙ্গে কী নিয়ে যেন ফিস্‌ফিস করে কথা বলছে সে। ওলিয়া তার বুকের মধ্যে পোষ মানিয়েছে তখন (যা একমাত্র স্ত্রীলোকেরই সাধ্য, আর কারও নয়!) কলোনি ও কমিউনের প্রতি তার সহানুভূতির পরস্পরবিরোধী দুটো ধারাকে। কলোনি ছিল ওলিয়ার কাছে জন্মদাত্রী মায়ের মতো, কিন্তু কমিউনে ছিল তার চরম একাধিপত্য। সেখানকার পুরুষদের সে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল শেরের সাহচর্যে থেকে শেখা কৃষি-সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার বিপুল বৈচিত্র্য দিয়ে, আর মেয়েদের মন ভুলিয়েছিল স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পর্কে তার প্রবল শক্তিশালী ও প্রায়শই পুরুষবিদ্বেষী প্রচার-অভিযান চালিয়ে। কমিউনের সংকট-সময়ে ও নানা ধরনের প্রয়োজনের মুহূর্তগুলিতে ওলিয়ার নিজস্ব 'হাতের পাঁচ' বলতে ছিল জনা-বিশেক ছেলেমেয়ের একটা বাহিনীর হাতিয়ার। এই ছেলেমেয়েরা ওকে এতটা

ভক্তিশ্রদ্ধা করত যেন ও ছিল তাদের যোয়ান-অব-আর্ক। সকলের হৃদয় জয় করেছিল মেয়েটা তার সহজাত রুচিবোধ, কর্মশক্তি আর অপরিসীম আশার যাদুস্পর্শ দিয়ে। ওকে দেখে কভাল প্রায়ই সগর্বে চাঁছাছোলা এই মন্তব্যটা করত:

'এই-ই হল গিয়ে আমাদের হাতের কাজ!'

লুনাচার্স্কি কমিউনকে দেয়া ছয়-ফসলী আবাদের ব্যবস্থাসহ সু-নিয়ন্ত্রিত তালুকটির আকারে গোর্কি কলোনির উদার দানটি ছিল ওলিয়ার জয়-গৌরবের প্রতীক, কিন্তু আমাদের পক্ষে এই দান ছিল মানসিক দিক থেকে বিপর্যয়ের সামিল। বিশেষ করে কৃষির ব্যাপারে বিগতদিনের পরিশ্রম ও প্রয়াসের গুরুত্ব যতখানি তীব্রভাবে আমরা অনুভব করছিলুম এমন আর কিছুতেই করি নি। আমরা জানতুম (হাড়ে-হাড়েই জানতুম!) — আগাছা নিড়তে, পর্যায়ক্রমিক ফসলের ফলন সংগঠিত করতে, যন্ত্রপাতি-সাজসরঞ্জাম ঠিক-ঠিক জোড়াতাড়া লাগিয়ে তা চালু করতে ও তার প্রতিটি খুঁটিনাটির দিকে নজর দিতে, মন্থরগতি অন্তহীন প্রায়-অনির্ণেয় এই সমগ্র প্রক্রিয়াটির তদারক করতে ও তার প্রতিটি পৃথক-পৃথক দিককে চালু রাখতে আমাদের কতখানি মূল্যই-না দিতে হয়েছিল। আমাদের সত্যিকার ঐশ্বর্য লুকনো ছিল মাটির গভীরে গাছপালার শিকড়ে-শিকড়ে জড়াজড়ি জালিকাজের মধ্যে কোনোখানে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে-তৈরি জীবজন্তুর প্রশস্ত খোঁয়াড়গুলোয়, গাড়ির চাকা, অক্ষদণ্ড, ময়দা-কলের চালনদণ্ড আর পাখার মতো সাধারণ সব জিনিসের মর্মে-মর্মে। তাই ওই সময়টায় — যখন অত কিছু ছেড়েছুড়ে চলে আসতে হচ্ছিল, অত কিছুকে তাদের বাসভূমির মাটি থেকে উপড়ে তুলে শ্বাসরোধী মাল-বওয়া গাড়ির জিনিসপত্রের স্তূপে ঠেসে ভরতে হচ্ছিল যখন, তখন শেরে-যে বিষণ্ণ মনে ঘুরে বেড়াবেন এবং তাঁর সমস্ত চলাফেরায়-যে বিপর্যস্ত মানুষের ভাবভঙ্গি ফুটে উঠবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না।

অবশ্য মনমরা ভাব সত্ত্বেও স্বভাবসিদ্ধ শান্ত সুশৃঙ্খলভাবে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি যাত্রার জন্যে বেঁধেছেঁদে গুছিয়ে ফেলতে বাধা হল না এদুয়ার্দ নিকলায়েভিচের। তাই অগ্রবর্তী মিশ্র বাহিনীটাকে নিয়ে আমি যখন খার্কভ যাত্রা করলুম তখন তাঁর নুয়ে-পড়া চেহারা নিয়ে দুশ্চিন্তাটা মন থেকে দূর করে দিতে আমাকেও বিশেষ বেগ পেতে হল না। তাছাড়া যাত্রার মুহূর্তে মনে দুশ্চিন্তা পোষার কোনো অবকাশও ছিল না, কারণ আমাকে ঘিরে তখন

বামন ভূতের দল — আমার কলোনি-বাসিন্দারা — আনন্দে আর উত্তেজনায় উদ্দাম উদ্বাহু নৃত্য জুড়ে দিয়েছিল।

আমার জীবনে সবচেয়ে সুখের দিনগুলির অবসান ঘটল এইভাবে। এখন মাঝে-মাঝে একথা চিন্তা করে আমার অনুশোচনা হয় যে সে-সময়ে কেন আমি আরও বেশি সপ্রেম আগ্রহ আর মনোযোগ নিয়ে দিনগুলিকে পর্যবেক্ষণ করি নি, কেন নিজেকে বাধ্য করি নি ওই সময়কার জীবনের দিকে একদৃষ্টে অবিচলভাবে তাকাতে, চিরকালের মতো কেন মনের পটে মুদ্রিত করে রাখি নি সে-সময়কার প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি নড়াচড়া, উচ্চারিত প্রতিটি শব্দে নিহিত-বিচ্ছুরিত রঙ রেখা আর আলো।

তবু তখনও এটা বুঝতে আমার কোনো অসুবিধে ছিল না যে একশো বিশজন কলোনি-বাসিন্দা নিছক মাথাগোঁজার আশ্রয় আর কাজ খুঁজে-পাওয়া একশো বিশজন অনাথ ছেলেমেয়েমাত্র নয়। না। ওরা ছিল নৈতিক উন্নয়নপ্রয়াসের কয়েক শো ধারার, সুসমঞ্জসভাবে সমন্বিত কর্মশক্তির কয়েক শো কেন্দ্রের, সু-বৃষ্টির অজচ্ছল মুক্তধারার প্রতীক। এমন কি স্বেচ্ছাচারী একগুঁয়ে স্বভাবের ছুঁড়ি প্রকৃতি পর্যন্ত ওদের জন্যে অপেক্ষা করে থাকত আনন্দোৎফুল্ল অধৈর্য নিয়ে।

ত্রেপ্‌কে তালুক ছেড়ে আসার ওই দিনগুলোয় কোনো একটি কলোনি-বাসিন্দাকেও সাধারণভাবে আস্তে-ধীরে হাঁটতে দেখা যেত কিনা সন্দেহ। ওদের তখন স্বভাবেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় দৌড়ে যাওয়া, কাজের কথা নিয়ে কিচিরমিচির করতে-করতে, স্পষ্ট আনন্দপূর্ণ শৃঙ্খলার সঙ্গে, সুঠাম চলনে, লঘুপায়ে সোয়ালোপাখির মতো চলাফেরা করা। এমন এক-একটা মুহূর্ত আসত তখন, যখন প্রচলিত মতবিরুদ্ধ এই চিন্তা মাথায় খেলত আমার যে সুখী লোকেদের পরিচালনার জন্যে তাদের মাথার ওপর কোনো কর্তৃপক্ষকে চাপিয়ে দেয়ার দরকার করে না, কারণ শাসন-কর্তৃপক্ষের স্থান অনায়াসেই নিতে পারে সেই আনন্দময়, অভিনব মানব-প্রবৃত্তি — যা প্রত্যেককেই শেখায় তাকে কী করতে হবে, কেমনভাবে করতে হবে আর কেনই-বা তা করতে হবে।

মাঝেমাঝেই এমন কথা ভাবতুম আমি। আবার নানা ধরনের দৃশ্য আর শব্দের অভিঘাতে নৈরাজ্যবাদী চিন্তার এই স্বর্গ থেকে ক্ষণে-ক্ষণে পতনও ঘটত। যেমন, একটা উদাহরণ দিই। একদিন দেখি আলিওশা ভোল্‌কভ

জড়ুলের-দাগে-ভরতি তার ক্রুদ্ধ মুখখানা নিচু করে এনে ঠিকে-ভুল-করা একটি ছেলেকে আচ্ছা করে বকাবকি করছে। বলছে:

'তুই করতেছিস কী, গাড়ল কোথাকার! প্যাকিং বাক্স আটকানোর জন্যি কেমনধারা পেরেক ব্যাভার করতেছিস তা চেয়ে দেখেছিস? কী ভেবেছিস তুই, তিন-ইঞ্চি পেরেক যেখেনে-সেখেনে রাস্তাঘাটে মিলবে মনে করেছিস নাকি?'

পরিশ্রমে মুখে-রক্ত-জমা, উৎসাহী ছেলেটি হঠাৎ ধমক খেয়ে অসহায়ভাবে হাতের হাতুড়িখানা নামিয়ে ফেলে। তারপর অপ্রস্তুত হয়ে হাতুড়িটা খালি-পায়ের গোড়ালিতে ঘষতে-ঘষতে শুধোয়:

'তাইলে কোন সাইজের পেরেক লাগবে?'

'এর জন্যি পুরানো পেরেক ব্যাভার করা লাগবে, বুঝলি? আগে একবার যা ব্যাভার করা হয়েছে এমন পেরেক। কিন্তু র' দেখি! তুই এগুলা — এই তিন-ইঞ্চি পেরেকগুলা পেলি কনে?'

এর পরই শুরু হয়ে যায় সত্যিকার অগ্ন্যুদ্‌গিরণ! বাচ্চাটার সামনে দাঁড়িয়ে, নতুন তিন-ইঞ্চি পেরেক সম্বন্ধে যার বোধ এমন মারাত্মকরকম যৎসামান্য সেই চরিত্রটিকে ক্রুদ্ধ ভোল্‌কভ কথার গাঁইতির ঘায়ে টুকরো-টুকরো করতে থাকে।

সত্যি, দুনিয়ায় আজও বিয়োগান্ত পালা অভিনয়ের শেষ নেই!

ব্যবহার-করা পেরেক-যে কী বস্তু খুব কম লোকই তা জানে!

পুরনো তক্তা আর ভাঙা অব্যবহার্য নানা জিনিসপত্র থেকে বহুরকম চতুর পদ্ধতি অবলম্বন করে তবে এ-রকম পেরেক টেনে-হিঁচড়ে বের করতে হয়। আর তখন তা বেরিয়ে আসে বাঁকাচোরা, বেতো রুগীর মতো গাঁটফোলা অবস্থায়, মরচে-ধরা চেহারা নিয়ে। দেখা যায়, কোনোটার মাথা গেছে বেঁকে আর ছুঁচলো দিকটা আছে ভোঁতা হয়ে, কোনোটা (আর এ-রকমটা প্রায়ই দেখা যায়) আছে দ্বি-বা ত্রিভঙ্গমুরারি হয়ে, আবার অনেক সময়ই এমন ঢেউ খেলিয়ে আর জট পাকিয়ে আছে যে-রকমটি নতুন করে বানানো দুনিয়ার সবসেরা কামারেরও সাধ্যের বাইরে। অতঃপর এই পেরেককে এক-টুকরো লোহার পাতের ওপর রেখে দমাদ্দম হাতুড়ি পিটিয়ে সোজা করতে হয় আর এজন্যে হাতুড়িধারীকে গোড়ালিতে ভর দিয়ে উবু হয়ে বসতে হয় আর বাড়ি মারতে হয় যতবার পেরেকটার গায়ে ততবার নিজের আঙুলেও।

তারপর, অবশেষে পুরনো পেরেককে হাতুড়ি-পেটা করে যদি-বা কোনোরকমে ঢিট করা গেল তো দেখা গেল নতুন করে সেটাকে লাগাতে গেলেই হয় সেটা ফের বেঁকে যাচ্ছে, নয় ভেঙে যাচ্ছে, আর নয়তো ঠিক জায়গায় কিছুতেই বসছে না। কোনো সন্দেহ নেই যে ঠিক এই সমস্ত কারণেই অপেক্ষাকৃত বাচ্চা গোর্কিপন্থীরা পুরনো পেরেক অত অপছন্দ করত আর নতুন পেরেক সংগ্রহের জন্যে নানারকম সন্দেহজনক কারসাজির আশ্রয় নিতে প্রলুব্ধ হোত। আবার এইসব কারসাজির ফলেই দলপতি-পরিষদের তরফ থেকে সরকারি তদন্ত যেত শুরু হয়ে আর এর জন্যে কুরিয়াজে আমাদের স্থানান্তরণের দারুণ আনন্দময় অভিযানের ওপরও ম্লান ছায়াপাত ঘটত।

আর শুধু পেরেকই-যে এর জন্যে দায়ী ছিল তা-ও নয়! রঙ-না-করা টেবিল, বেঞ্চিজাতীয় আসবাব, নানা ধরনের অসংখ্য টুল, গাড়ির পুরনো চাকা, মুচির জুতো-মেরামতি লাস, জরাজীর্ণ ফাইলপত্র আর ছেঁড়াখোঁড়া বই — স্থিতু হয়ে এক জায়গায় বসবাস করা আর সঞ্চয়ী হওয়ার ফলে যা কিছু টুকরোটাকরা জঞ্জাল জমা হয়ে থাকে সে-সবই — আমাদের বীরোচিত অভিযানের মহিমাকে ম্লান করে দিচ্ছিল... অথচ এসব দূর করে ফেলে দিতেও মন উঠছিল না।

এছাড়া ছিল কলোনির নতুন আগন্তুকরাও! ওদের ঢিলেঢালা, বিজাতীয় মূর্তিগুলো চোখে পড়লে সেদিকে আমি যেন দ্বিতীয়বার তাকাতে পারতুম না। ভাবতুম — আচ্ছা, এদের এখানে রেখে গেলে কেমন হয়? যদি কোনো অভাবী শিশু-সদনের হাতে তুলে দিই এদের, আর সেইসঙ্গে ঘুষ হিসেবে দিয়ে যাই একজোড়া শুয়োরছানা কিংবা একবস্তা আলু? আমি করতুম কী, সর্বদাই এই নতুন আগন্তুক ছেলেমেয়েদের ফিরেফিরতি পরীক্ষা করে তাদের ছোট-ছোট দলে ভাগ করে দিতুম, মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধের মান অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস ঘটাতুম তাদের। ওই সময়ের মধ্যে আমার চোখ যথেষ্ট শিক্ষিত হয়ে উঠেছিল এবং বাইরের কতগুলো লক্ষণের যোগফল দেখে — যেমন, অভিব্যক্তির প্রায়-অনির্ণেয় কিছু-কিছু তারতম্য, গলার স্বর, হাঁটার ভঙ্গি এবং ব্যক্তিত্বের এইরকম বহুতরো তুচ্ছ মোচড়, এমন কি হয়তো একটুখানি গন্ধের আভাস থেকেও — এক-নজর তাকিয়েই আমি মোটামুটি সঠিকভাবে বলে দিতে পারতুম আলোচ্য কাঁচামালটি থেকে কী ধরনের তৈরি পণ্য আশা করা যেতে পারে।

যেমন, ধরা যাক, অলেগ ওগ্নিয়েভের কথা। ভেবেছিলুম, একে কি কুরিয়াজে নিয়ে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে, না এখানে রেখে যাওয়াই উচিত? আর কেন যেন আমার মনে হয়েছিল, ওকে ফেলে যাওয়া উচিত হবে না। ছেলেটি ছিল অসাধারণ ধরনের আর আগ্রহোদ্দীপক একটি নমুনা। অ্যাড্‌ভেঞ্চারপ্রিয়, পর্যটক আর ফুলবাবু ছিল আমাদের অলেগ। সম্ভবত প্রাচীন নর্‌মানদের বংশোদ্ভূত ছিল সে, কারণ তাদের মতো ও-ও ছিল লম্বা, ঢিলেঢালা আর সোনালি চুলওয়ালা ফর্সা চেহারার। সম্ভবত অলেগ আর তার উত্তর-ইউরোপীয় পূর্বপুরুষদের মধ্যে কয়েক পুরুষে সুসংস্কৃত রুশ বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব ঘটেছিল, কারণ ওর ছিল সু-উন্নত কপাল, প্রশস্ত আর বুদ্ধিমত্তার ছাপ-মাখানো হাঁ-মুখ আর এদের মাঝখানে ভারসাম্য রক্ষা করার মতো একজোড়া সুন্দর, হাসিখুশি, ধূসর চোখ। পোস্টাল অর্ডার-সংক্রান্ত কী একটা ঝামেলায় যেন অলেগ নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল, আর তাই জনা-দুই মিলিশিয়াম্যানের পাহারায় ওকে কলোনিতে নিয়ে আসা হয়েছিল। দুই মিলিশিয়াম্যানের মাঝখানে থেকে ও সেদিন বেশ দুলকি চালে আর খোশমেজাজে হেঁটে এসেছিল আর নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশ্রয়ের দিকে কৌতূহল নিয়ে তাকাচ্ছিল। পাহারার হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আমার প্রাথমিক উপদেশাবলী ছেলেটা ভদ্রভাবে আর গম্ভীর হয়ে মনোযোগের সঙ্গে শুনল, অপেক্ষাকৃত বয়স্ক কলোনি-বাসিন্দাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করল, অপেক্ষাকৃত বাচ্চাদের খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগল অবাকবিস্ময়ে আর খুশিমনে, আর তারপর উঠোনের মাঝখানটাতে রোগা-রোগা ঠ্যাংদুটো অনেকখানি ফাঁক করে দাঁড়িয়ে বলে উঠল:

'অ! তাইলে এই হল্য গে কলোনি! মাক্সিম গোর্কি কলোনি, তাই না? দ্যাখো একবার কাণ্ডখান! তাইলে তো আমারে কলোনিটারে একবার পরীক্ষে করি দেখতি হচ্ছে!.'

অলেগকে অষ্টম বাহিনীতে ভরতি করে নেয়া হল। অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে একটা চোখ একটু ঘোঁজ করে তাকিয়ে ফেদরেঙ্কো ওকে বললে:

'মনে নিচ্ছে না যে তুই বিশেষ কাজের ছেলে! কী বলিস, কাজ জানিস নাকি? তাছাড়া তোর জ্যাকেটটাও তেমন সুবিধার নয়... বুঝলি...'

শুনে হাসিমুখে অলেগ তার ফ্যাশনদুরস্ত জ্যাকেটটার দিকে তাকাল।

তারপর পরীক্ষার জন্যে যেন জ্যাকেটের একটা কোনা তুলে ধরল। শেষে খুশিখুশি মুখে দলপতির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল:

'ও কিছু না, কমরেড দলপতি! আমার জ্যাকেটে কাজির অসুবিধা হবে না। তুমি কি চাও যে কোটখান তোমারে দিয়ি দেই?'

শুনে হাসিতে ফেটে পড়ল ফেদরেঙ্কো। অষ্টম বাহিনীর অন্যান্য পালোয়ান সদস্যও ওর সঙ্গে হাসিতে যোগ দিল।

'ঠিক আছে, তাইলে দাও দেখি, তোমার কোটখান গায়ি হয় কিনা দেখি!'

অলেগের খাটো কোট গায়ে দিয়ে সন্ধে পর্যন্ত ঘুরে বেড়াল ফেদরেঙ্কো। তার আগে আমাদের মধ্যে এ-রকম ফ্যাশনদুরস্ত জামার আবির্ভাব না-ঘটায় কলোনি-বাসিন্দারা এতে মজাও পেল খুব। কিন্তু সন্ধের পর কোটটা তার মালিককে ফেরত দিয়ে ফেদরেঙ্কো কড়া গলায় বলল:

'এটা তুলে রাখ। এখন থেকে একটা স্পোর্টস শার্ট গায়ে চড়াবে, বোঝলে। কাল তোমারে বীজবোনা যন্তর ঠেলতি হবে কিন্তু।'

অবাক হয়ে স্থিরদৃষ্টিতে দলপতির দিকে এক-নজর তাকাল অলেগ, তারপর চটুল দৃষ্টিতে তাকাল নিজের জ্যাকেটের দিকে।

'তুমি বলতি চাও এই পোশাকি এখেনে কাম চলব্যে না?'

পরদিন সকালে স্পোর্টস শার্ট গায়ে চড়িয়ে দেখা দিল সে। তারপর নিজের মনেই বিদ্রুপের ছলে গুন্‌গুনিয়ে বলল:

'ব্বাস, এখন প্রোলেতারিয়ান বন্যে গেছিস আর-কি! এখন তোরে বীজবোনা যন্তর ঠেলতি লাগব্যে... হ্যাঁ, এডা এট্টা নূতন ব্যাপার বটে!'

নতুন কাজে প্রতি পদে ভুল ঘটতে লাগল অলেগের। যে-কোনো কারণে হোক বীজবোনা যন্ত্র ও ঠিক সামলাতে পারছিল না। যন্ত্রটার পিছুপিছু শোচনীয়ভাবে হাঁপাতে-হাঁপাতে হাঁটছিল, মাটির ঢেলায় বারে-বারে হোঁচট খাচ্ছিল আর আঙুলের ফাঁক থেকে কাঠ বা শেকড়বাকড়ের গুঁজি বের করার জন্যে থেকে-থেকেই এক-পায়ে জবুথবুভাবে নাচছিল। আর বীজবোনা যন্ত্রটা চলার সময় তার ঘুরন্ত ফলাগুলোকে কিছুতেই সামলাতে না-পেরে প্রতি তিন মিনিট অন্তর ও চিৎকার করে সঙ্গীকে বলছিল:

'অ মশায়, তোমার ঘোড়া-দুটারে থামাও দেখি, কী এট্টা যেন বেধে গেছে এখেনে!..'

অবশেষে অলেগের কাজ বদল করে ওকে ঘোড়ায়-জোতা মইখানা চালিয়ে আনতে পাঠাল ফেদরেঙ্কো। কিন্তু আধঘণ্টাটাক পরে অলেগ ফের এসে ধরল ফেদরেঙ্কোকে, তারপর বিনীতভাবে নিবেদন করল:

'কমরেড দলপতি, এট্টা কাণ্ড ঘট্যেছে, বোঝলে? আমারডা বসি পড়্যেছে!'

'তোমার কীটা?'

'আমার ঘোড়াডা! একবার এসি দেখ্যে যাও — ঘোড়াডা বসি পড়্যেছে আর এখনও বসি আছে। একবার গিয়ি অর সাথে কথা কও দেখি!'

ফেদরেঙ্কো দৌড়ে 'মেরি'র কাছে গেল। মাটিতে বসে-পড়া 'মেরি'কে দেখে ও খেপে গিয়ে বলল:

'কী সব্বোনাশ!.. এরে মাটিতি শোওয়ায়ে দিলি তুই কী করে?! সবকিছু দেখতেছি জট পাকায়ে ফেলেছিস! এই ডাণ্ডাখান এখেনে এল কী করে?'

অলেগ এবার ভাবেভঙ্গিতে প্রাণপণে চাষী-চাষী ধাঁচ ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেল। বলল:

'কয়েট্টা মাছি না কী যেন মুখের কাছি ভনভন করতিছিল, বোঝলে!.. আর তাই ও বস্যে পড়ল। কিন্তু অর তো কাজ করা উচিত, নয় কি?'

গলায় পরানো কলারের নিচে থেকে রাগী চোখে অলেগের দিকে তাকিয়ে ছিল 'মেরি'। পরানোর দোষে কলারটা ওর কান ছুঁইছুঁই করছিল। ফেদরেঙ্কোও চটে গিয়েছিল অলেগের ওপর।

'বসে আছে, তাই বটে! মাদী ঘোড়া আবার বসে নাকি কখনও? ওরে তোল্!..'

লাগামগাছটা ধরে অলেগ এবার 'মেরি'র ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়ে:

'হেট্-হেট্, ওঠ্!'

হেসে ওঠে ফেদরেঙ্কো:

''হেট্-হেট্, ওঠ্' বলে চেঁচায়ে লাভ নাই। তুই কি গাড়ির কোচোয়ান নাকি?'

'দ্যাখো, কমরেড দলপতি...'

'আমারে খালি-খালি 'কমরেড দলপতি' বলে ডাকতেছিস ক্যানে?'

'তাইলি কী বলি ডাকব্য?'

'আমার তো একটা নাম আছে, নাকি?'

'ওহ্-হো, তাই তো!.. তা দ্যাখো কমরেড ফেদরেঙ্কো, আমি নিজের

গাড়ির কোচোয়ান না, আর বিশ্বেস কর এয়ার আগি 'মেরি'র সাথে আমার এতডা গা-মাখামাখি ছেল না। তয় 'মেরি' নামে আমার কিছু বন্ধু ছেল বটে, আর ওয়াদের সাথে ভাবসাব সে তো বিলকুল ভেন্ন ব্যাপার, বোঝলে... তার সাথে ঘোড়া জোতার এই সব সাজ-সরঞ্জাম আর কলারের কোনো সম্পক্ক ছেল না...'

একই সঙ্গে ক্রুদ্ধ আবার সংযত শক্তির দ্যোতক দুই চোখ মেলে ফেদরেঙ্কো একবার উত্তর-ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত এই মূর্তিটার অমার্জিত সৌষ্ঠবের দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর মাটিতে একদলা থুথু ফেলে বলল:

'বকবকানি বন্ধ করে এবার ঘোড়ার সাজ পরানোর দিকি নজর দে দেখি!'

সেদিন সন্ধেবেলা দুই হাত ছড়িয়ে দিয়ে ধীরেসুস্থে রায় দিল ফেদরেঙ্কো:

'ও শালার কোন কামে লাগব্যে? ও খালি মিষ্ট পিঠা খাতি জানে আর শালার মেয়্যাদের সাথে পিরিত করতি পারে... কিন্তু আমাদের কোনো কামে লাগব্যে বলি মনে হয় না। যদি আমার মত নেন তো বলি, অরে কুরিয়াজে লওয়া উচিত হব্যে না।'

অষ্টম বাহিনীর এই দলপতিটি গম্ভীর আর দুশ্চিন্তিত মুখ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। যে-দণ্ডাজ্ঞা ও দিয়েছে আমার কাছ থেকে সে-ব্যাপারে সমর্থন পাবার অপেক্ষায় ছিল ও। বুঝলুম, এটা গোটা অষ্টম বাহিনীরই রায়। বাহিনীটি তার ধ্যানধারণার দৃঢ়তা আর অন্যের কাছ থেকে কাজ আদায়ে তার কড়াকড়ির জন্যে সকলের কাছে পরিচিত ছিল। কিন্তু সব সত্ত্বেও আমি ফেদরেঙ্কোকে বললুম:

'ওগ্নিয়েভকে কুরিয়াজে আমরা নিয়ে যাবই। দলকে তুমি বুঝিয়ে বল যে অলেগকে কাজের লোক বানাতেই হবে। তোমরা যদি এটা করতে না পার, তাহলে বুঝতে হবে কেউই তা পারবে না, আর তাহলে অলেগ সোভিয়েত-রাজের শত্রু আর ভবঘুরে বনে যাবে। আমি কী বলতে চাইছি বুঝতে পারছ তো?'

'বুঝ্যেছি!' ফেদরেঙ্কো বলল।

'তাহলে দলকে কথাটা বুঝিয়ে বল, কেমন?'

'ঠিক আছে, এ নিয়ি কথা বলব-নে,' আমার কথায় চটপট রাজি হয়ে গেল ফেদরেঙ্কো। তবে ওই একই রকম তৎপরতার সঙ্গে ধাঁধায় পড়লে আমাদের স্লাভজাতের যা চিরাচরিত ধরন সেই ভঙ্গিতে হাতখানা ওর মাথার পেছনে চুলকনোর জন্যে উঠেও এল।

অতএব স্থির হল, অলেগ আমাদের সঙ্গে যাবে। কিন্তু উজিকভ? রেগেমেগে চরম রায় দিয়ে বসলুম আমি — না, আর্কাদি উজিকভকে সঙ্গে নেয়া উচিত হবে না। কেননা, যতই যাই হোক, আমার কাছে উজিকভের মূল্য ছিল কতটুকু? অন্য যে-কোনো শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে এমন একটা নিরেস কাঁচামাল যদি কারও ঘাড়ে গছিয়ে দেয়া হোত, তাহলে সেই ভারগ্রস্ত ব্যক্তি নিশ্চয়ই এর হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে আধ-ডজনখানেক কমিটি গঠন করে বসত, আধ-ডজনখানেক প্রস্তাব পাশ করাত, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারের ভারপ্রাপ্ত জন-কমিশারিয়েত কিংবা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন-নিবেদন করত, কিংবা চরমপন্থা হিসেবে 'প্রাভ্দা' পত্রিকাতেই চিঠি লিখে বসত, আর যে-ভাবেই হোক শেষপর্যন্ত এ-ব্যাপারে আসল দোষীর মুখোশ খুলে দিত। পুরনো বালতির টিন দিয়ে এঞ্জিন বানানো কিংবা আলুর খোসা দিয়ে টিনজাত খাবার তৈরি করা কারও কাছ থেকে আশা করা চলে না। অথচ আমার কাছ থেকে কিনা আশা করা হচ্ছিল যে এঞ্জিন কিংবা টিনজাত খাবার নয়, উজিকভকে গড়ে-পিটে একেবারে সত্যিকার সোভিয়েত নাগরিক বানাতে হবে আমাকে!

একেবারে বাচ্চা বয়স থেকেই আর্কাদি উজিকভ তার জীবনটা কাটিয়েছিল বড়রাস্তার আশপাশে ঘুরঘুর করে, আর ইতিহাস-ভূগোলের ভারি রথচক্র ওকে মাড়িয়ে দলে গিয়েছিল চলে। ও যখন খুব ছোট্টটি ওর বাবা তখন পরিবার ফেলে পালায় আর বাড়িতে তার জায়গা দখল করে আরেক নতুন বাপ। এ লোকটা ছিল 'দৈনিকিন সরকার' নামে মজাদার এক পুতুলনাচের আসরের কোনো একটা পুতুল। 'দৈনিকিন সরকারের' সঙ্গে উজিকভের এই সৎবাপও পরিবার সঙ্গে নিয়ে বিদেশে চলে যেতে মনস্থ করে। কিন্তু ভাগ্যের খামখেয়ালিতে পরিবারটি এত সব জায়গা থাকতে গিয়ে পৌঁছয় জেরুসালেমে। ওই শহরে থাকতে আর্কাদি উজিকভ এরপর বাপ-মা বলতে যা কিছু ছিল ওর তা সবই হারিয়ে বসে, অর্থাৎ তারা দু'জনেই যত-না অসুখে তার চেয়ে বেশি করে মানুষের অকৃতজ্ঞতার শিকার হয়ে মারা পড়ে, আর আর্কাদিকে ফেলে রেখে যায় আরবদের ও অন্যান্য 'জাতিগত সংখ্যালঘু'দের অপরিচিত পরিবেশে। ইতিমধ্যে, উজিকভের সত্যিকার জন্মদাতা বাপ 'নতুন অর্থনৈতিক কর্মনীতি'র মারপ্যাঁচ কালক্রমে সফলভাবে আরম্ভ করে ফেলে আর তার ফলস্বরূপ কী একটা যৌথ ব্যাবসা-প্রতিষ্ঠানের সদস্য বনে গিয়ে

হঠাৎই নিজের বংশধর সম্পর্কে তার পুরনো দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে। দুর্ভাগা সন্তানের পাত্তা খুঁজে বের করে লোকটা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ-সুবিধে এত সুকৌশলে নিতে সমর্থ হয় যে আর্কাদিকে সত্যিসত্যিই এক সাবালক সঙ্গীর তত্ত্বাবধানে এক স্টিমারে উঠিয়ে ওদেসা বন্দরে আনিয়ে নিতে সক্ষম হয় সে। এইভাবে বাপের স্নেহবন্ধনে বাঁধা পড়ে আর্কাদি। কিন্তু মাস দুয়েক যেতে-না-যেতেই বাপটি ছেলের বিদেশী শিক্ষার কিছু-কিছু চোখ-ধাঁধানো ফলাফল প্রত্যক্ষ করে দুঃখে হতবাক হয়ে যায়। আর্কাদির চরিত্র ছিল রুশী কার্যকলাপের দরাজ বিস্তারের সঙ্গে আরবী কল্পনাপ্রবণতার এক চমৎকার মিশ্রণস্বরূপ — আর তাই অচিরে বাপ উজিকভের রেস্ত গেল বিলকুল ফাঁক হয়ে। রাস্তার বাজারে আর্কাদি শুধু যে হাতঘড়ি, রুপোর চামচের সেট আর গেলাসদানি, শুধুই যে যাবতীয় পোশাক-আশাক আর অন্তর্বাস ইত্যাকার পারিবারিক অস্থাবর সম্পত্তি ঝেড়েপুঁছে বেচে দিল তাই নয়, আসবাবপত্রগুলো পর্যন্ত দিল বিক্রি করে। বাপের জাঁকালো নামসইয়ের সঙ্গে ওর কাঁচা হস্তাক্ষরের আশ্চর্য পারিবারিক সাদৃশ্যের দরুন ও এমন কি বাপের অফিসের চেকবই পর্যন্ত ব্যবহার করা শুরু করল।

ফলত যে-করিতকর্মা হাত দুখানা মাত্র অল্প কিছুদিন আগে আর্কাদিকে 'পবিত্র ভূমি' থেকে উঠিয়ে এনেছিল সেই দুখানা হাতই আবার একবার নড়াচড়া শুরু করল। আমরা যখন কুরিয়াজে উঠে যাওয়ার সক্রিয় প্রস্তুতির কাজে ভয়ানক ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ে একদিন বড় উজিকভ এসে দর্শন দিল কলোনিতে। ইউরোপীয় চাকচিক্যওয়ালা ও এক ধরনের সম্ভ্রান্ত পেশার মানুষের দর্শনধারী এই লোকটির চেহারায় জীবনযাপনের আঁচড়ের বিশেষ কোনো চিহ্ন ছিল না। আমার সামনে টেবিলের উলটোদিকে গ্যাঁট হয়ে বসে লোকটি আমায় আর্কাদির জীবন-বৃত্তান্ত সবিস্তারে শোনাল। কাহিনী শেষ করল গলাটা সামান্য একটু কাঁপিয়ে এই কথা কটা বলে:

'একমাত্র আপনিই আমার ছেলেকে আগের মতো করে আমায় ফিরিয়ে দিতে পারেন!'

সোফায়-বসা ছেলেটির দিকে এক-নজর তাকিয়েই ওর প্রতি আমার এমন বিতৃষ্ণা জন্মাল যে ইচ্ছে করছিল তক্ষুনি ছেলেটাকে তার ফাঁপরে-পড়া বাপের সঙ্গে ফেরত পাঠিয়ে দিই। কিন্তু ইচ্ছে হলে কী হবে, বাপ তার ছেলে ছাড়াও সঙ্গে করে একটুকরো সুপারিসের কাগজ আমাকে দেবার জন্যে

এনেছিল। আর সেই কাগজখানার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয়া আমার সাধ্যে ছিল না। ফলে আর্কাদি রয়ে গিয়েছিল কলোনিতে।

ছেলেটা ছিল লম্বা, রোগা আর কেমন জবুথুবু। আগুনে-রঙের চুলেভরা মাথাটার দুই পাশে উঁচিয়ে থাকত তার খাড়া, মস্ত-মস্ত, স্বচ্ছ, গোলাপি-রঙের দুটো কান, আর বিরল ভুরুসহ বড়-বড় ফোঁটা-দাগওয়ালা মুখখানাকে দেখলে মনে হোত যেন ভারি, ঝুলে-পড়া নাকটার টানে তা-ও নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে। নাকটার সঙ্গে ওর অন্য অবয়বের কোনো সামঞ্জস্য ছিল না। আর্কাদি সব-সময়ে ভুরুর তলা থেকে চোখ ঘোঁজ করে তাকিয়ে থাকত। কিন্তু ও যদি একেবারেই না তাকাত তাহলে বোধহয় ভালো ছিল, কেননা হলদেটে-শাদা ওর ম্যাড়মেড়ে চোখদুটো সাংঘাতিক বিতৃষ্ণা জাগাত মনে। এই সবকিছুর সঙ্গে লালা-গড়ানো আধখোলা একটা হাঁ-মুখ আর সর্বদা মুখে-সাঁটা বিমর্ষ আর অপরিবর্তনীয় একটা ভঙ্গি যোগ করলে তবেই বোধহয় উজিকভের চেহারার ছবিটা সম্পূর্ণ হয়।

আমি নিশ্চিত ছিলুম যে কলোনি-বাসিন্দারা নির্ঘাত কোনোদিন ওকে অন্ধকারে আড়ালে-আবডালে পেয়ে পিটিয়ে দেবে, নয়তো দেখা হলে ধাক্কা দেবে গায়ে গা বাধিয়ে। তাছাড়া কেউই ওর সঙ্গে এক ঘরে থাকতে কিংবা এক টেবিলে খেতে রাজি হবে না এবং যে-সুস্থ মানবিক বিতৃষ্ণা আমি নিজে কেবলমাত্র শিক্ষকসুলভ প্রয়াস খাটিয়ে চেপে রাখতে সক্ষম হচ্ছিলুম সেই একই বিতৃষ্ণার বশে ওরা ওর সঙ্গ পরিহার করে চলবে।

কলোনিতে আসার প্রথম দিনটি থেকেই উজিকভ সঙ্গীদের জিনিসপত্র চুরি করতে আর বিছানায় প্রস্রাব করতে শুরু করল। আমার কাছে এসে মিত্কা জেভেলি একদিন কালো ভুরুদুটো কুঁচকে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলে:

'আচ্ছা, আন্তন সেমিওনভিচ, বলেন তো, এমন একটা ছোঁড়ারে আমরা সাথে লব কেন? দ্যাখেন দেখি — জেরুসালেম থেকে ওদেসা, ওদেসা থেকে খার্কভ, খার্কভ থেকে আমাদের কাছে, তারপর এখেন থেকে কুরিয়াজ — ওরে গাড়িতি চাপায়ে নিয়ি যেতি হবে কেন? নিয়ি যাবার মতন এমনিতেই কি আমাদের যথেষ্ট লোকজন জিনিসপত্তর নাই? ব্যাপারডা কী, বলেন তো?..'

কী আর বলব, চুপ করে রইলুম। ধৈর্য ধরে আমার উত্তরের অপেক্ষায় কিছুক্ষণ চুপ করে রইল মিত্কা আর লাপতের হাসিমুখের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাতে লাগল। তারপর ফের বলল:

'এমন একটা জন্তু আমি জন্মে দেখি নাই! ওরে... একডোজ স্ট্রিক্‌নিন খাওয়ায়ে দেয়া উচিত, আর নয়তো রুটি দিয়ি একটা গোল্লা বানায়ে... তার মধ্যি আলপিন পুরি ওরে খাতি দেয়া দরকার।'

'অমনধারা রুটি ও খাবেই না,' হাসতে-হাসতে লাপত বলল।

'কে খাবে না? উজিকভ? আচ্ছা, মজা করার জন্যি একবার চেষ্টা করি দেখাই যাক-না — দ্যাখবে, ও নিশ্চয় গিলি ফ্যালবে... কেমনধারা লোভী ও, তা তো জানই! আর কী হ্যাংলার মতন খায় ছোঁড়াটা! ওহ্, ওর খাওয়ার কথা চিন্তা করতি পর্যন্ত ঘেন্না লাগে!..'

বলতে-বলতে রুচিবাগীশ মিত্‌কা শিউরে উঠল। আর চোখে শহীদ-শহীদ ভাব ফুটিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল লাপত। মনে-মনে আমিও কিন্তু ওদের পক্ষেই ছিলুম আর নিজেকে শুধোচ্ছিলুম:

'কী করা যায়?.. উজিকভ সঙ্গে করে এমন সব সুপারিসপত্র এনেছে...'

কাঠের সোফাটায় বসে ছেলেদুটো ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ ভাস্‌কা আলেক্সেয়েভের পরিচ্ছন্ন হাসি-হাসি মুখখানা উঁকি দিল ঘরের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে খুশিতে ঝলমল করে উঠল মিত্‌কা।

বলল, 'এয়ার মতন যত ছেলে পাই সাথে নিতি পারি!.. ভাস্‌কা, ইদিক আয় তো!'

লজ্জায় সাংঘাতিক লাল হয়ে উঠে মিত্‌কার দিকে লাজুক হাসি আর মোহাচ্ছন্ন চাউনি মেলে ভাস্‌কা এসে মিত্‌কার কোল ঘেঁষে বসে পড়ল। তারপর কিছুটা দীর্ঘশ্বাস, গোঙানি আর হাসিতে মেশানো অবর্ণনীয় একটা আওয়াজ করে নিজের মধ্যে চাপা অদম্য আবেগকে মুক্তি দিল।

ভাস্‌কা আলেক্সেয়েভ কলোনিতে এসেছিল তার নিজের ইচ্ছেয়, এসেছিল জীবনের জান্তব নিষ্ঠুরতায় চূর্ণ হয়ে, চোখভরা জল নিয়ে। এক ঝোড়ো, বাদলার সন্ধেয় সোজা হেঁটে এসে সে হাজির হয়ে গিয়েছিল দলপতি-পরিষদের এক সভার আসরে। ওইরকম আপাতদৃষ্টিতে প্রতিকূল আবহাওয়ার একটা অবস্থা ভাস্‌কার ভাগ্যের পক্ষে অনুকূল হয়ে দেখা দিয়েছিল, কেননা আবহাওয়া ভালো থাকলে সে কখনও কলোনিতে ভরতি হতে পারত কিনা সন্দেহ। কিন্তু সে যাই হোক, পাহারাদার মিশ্র বাহিনীর দলপতি ওকে সেদিন অফিস-ঘরে নিয়ে এসে বলেছিল: 'এটারে নিয়ি কী করি বলেন দেখি? দরজার কাছে দেখি দাঁড়ায়ে-দাঁড়ায়ে কাঁদতেছে, ইদিকে বিষ্টিও পড়তেছে খুব।'

চলতি ঘটনাবলী নিয়ে তাদের তর্ক থামিয়ে দলপতিরা ততক্ষণে এই নতুন আগন্তুকের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছে। ছেলেটাও দ্রুত তার আয়ত্তে যা-কিছু উপায় ছিল — যেমন, জামার হাতা, আঙুল, হাতের মুঠো, জ্যাকেটের নিচের ধারটা, টুপি, ইত্যাদি — সবকিছুর সাহায্যে তার শোকোচ্ছ্বাসের সমস্ত লক্ষণটুকু মুছে ফেলে ভিজে ভিজে চোখদুটো পিটপিট করতে-করতে ভানিয়া লাপতের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। কীভাবে সঙ্গে সঙ্গেই যেন সে বুঝে ফেলেছিল যে লাপতই হল সভাপতি। ছেলেটার ছিল মিষ্টি গোলাপি মুখ আর পায়ে টেকসই একজোড়া গ্রাম্য বুটজুতো। একমাত্র পরনের খাটো পুরনো জ্যাকেটটাই ছিল তার ছিমছাম বেশভূষার সঙ্গে অসামঞ্জস্যে ভরা। ছেলেটার বয়স হয়েছিল প্রায় তেরো...

'কী চাস তুই?' কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করেছিল লাপত।

ছেলেটি গম্ভীরভাবে বলেছিল, 'আমি কলোনিতি থাকতি চাই।'

'কিসের জন্যি?'

'আমার বাপ বাড়ি ছাড়্যে চলি গ্যাছে, আর মা কয়েছে — যেখেনে খুশি তর চল্যে যা...'

'সে কী? মা কখনও অমন কথা কতি পারে?'

'সে আমার নিজির মা নয়...'

এই নতুন খবরে এক মুহূর্তের জন্যে লাপতকে কেমন হতবুদ্ধি দেখাল।

'দাঁড়া, দাঁড়া! কী বললি?.. তা, ঠিক আছে, সে না হয় তোর নিজির মা নয়। কিন্তু তোর বাপের তো উচিত তোর দেখাশোনার ভার নেয়া। ভার নিতি সে বাধ্য, তা জানিস!..'

ফের একবার বাচ্চাটার চোখে দু'ফোঁটা জল টলমল করতে লাগল, আর লাপতের কথার উত্তর দেয়ার আগে আরও একবার সে তৎপর হয়ে উঠল সবটুকু জল মুছে ফেলতে। ভর্তির আবেদনকারীর এই অদ্ভুত ধরনধারণে দলপতিদের কড়া চোখগুলো কেমন কোমল হয়ে উঠছিল। অবশেষে অনিচ্ছাকৃতভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাচ্চাটা বলেই ফেলল:

'আমার বাপ — আমার বাপও নিজির বাপ নয়।'

এক মুহূর্তের জন্যে পরিষদের সবাই চুপ মেরে গেল, আর তারপরই একটা সজোর, তীক্ষ্ন হাসির দমক ছুটল। হাসতে-হাসতে লাপতের চোখে জল এসে গেল প্রায়। সে বলল:

'ভ্যালা ঝামেলায় পড়েছিস দেখতেছি, ইয়ার!.. তা, খুলে বল্ দেখি ব্যাপারখান কী!'

বিন্দুমাত্র দেখানেপনা বা ভানের আশ্রয় না-নিয়ে সহজভাবে এবং লাপতের হাসি-হাসি মুখের ওপর থেকে চোখের দৃষ্টি না-সরিয়ে আবেদনকারী আমাদের জানাল যে ওর নাম ভাস্কা আর পদবি আলেক্সেয়েভ। ওর বাপ ছিল ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ান। পরিবার-পরিজন ফেলে সে কোথায় উধাও হয়ে যাওয়ায় ওর মা ফের বিয়ে করে এক দর্জিকে। তারপর ওর মায়ের কাশির রোগ হয়। আগের বছর সে মারা গেলে দর্জি 'ফের আরেকজনারে বে করে'। আর যখনকার কথা বলছি সে-বছর ইস্টার-পরবের সময়ে দর্জি নতুন বৌ ফেলে চলে যায় কন্‌গ্রাদে, আর ছেলেটাকে খবর পাঠায় যে সে আর ফিরছে না। সে আরও লেখে: 'তরা তদের নিজিদের ব্যবস্তা নিজিরাই কর্যে নিতি পারিস।'

'ওরে আমাদের ভরতি করে নিতি হবে দেখতেছি,' কুদ্‌লাতি বলল। 'কিংবা কে জানে, তুই হয়তো মিছা কথাই বলতেছিস। অ্যাঁ? তা, কে তোরে শিখায়ে-পড়ায়ে পাঠায়েছে ক' দেখি?'

'শিখায়্যে-পড়ায়্যে? এট্টা লোক — হুই ওইখেনে থাকে — সে আমারে শিখায়্যেছে — সে কয়্যেল, ছেল্যারা ওইখেনে থাকে আর জমিনে চাষ দেয়।'

অতএব ভাস্কা আলেক্সেয়েভকে কলোনিতে ভরতি করে নিলুম আমরা। শিগ্‌গিরই সে সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল এবং ভাস্কাকে কুরিয়াজে না-নিয়ে বিদায় দেয়া হবে কিনা এ-প্রশ্ন আমাদের গোপন আলোচনায় উঠলই না বলা চলে। প্রশ্নটা তোলা হল না হয়তো একমাত্র এই কারণেই যে খোদ দলপতি-পরিষদ ভাস্কাকে ভরতি করে নিয়েছিল এবং এর ফলে 'রক্তসম্পর্কে রাজবংশীয়' বলে গণ্য হবার পুরো অধিকার ছিল তার।

কলোনিতে নতুন আগন্তুকদের মধ্যে এছাড়াও ছিল মার্ক শেইনহাউস আর ভেরা বেরেজোভ্‌স্কায়া।

ওদেসার কিশোর-অপরাধী সংক্রান্ত কমিশন মার্ক শেইনহাউসকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছিল চুরির দায়ে অভিযুক্ত হিসেবে। ওর সঙ্গে যে-কাগজপত্র এসেছিল তাতেই উল্লেখ ছিল কথাটার। একজন মিলিশিয়াম্যানের পাহারায় এসেছিল ও। কিন্তু ওকে এক-নজর দেখেই আমার কেমন মনে হল যে কমিশন নিশ্চয়ই ভুল করেছে, কেননা অমন অপরূপ একজোড়া চোখের

অধিকারী কখনও চোর হতে পারে না। মার্কের চোখের বর্ণনা দেয়ার বৃথা চেষ্টা করব না আমি। বাস্তব জীবনে অমন চোখের দেখা কদাচিৎ মেলে, অমন চোখ কেবল দেখা যায় নেস্তেরভ, কল্‌বাখ আর রাফায়েলের মতো শিল্পীদের আঁকা ছবিতে, তাঁদের চিত্রিত সন্তদের প্রতিকৃতিতে — বিশেষ করে ম্যাডোনাদের মুখে। অমন একজোড়া চোখ-যে কী করে ওদেসার এক গরিব ইহুদি-ছেলের মুখ জুড়ে বসল তা বোঝা শক্ত হচ্ছিল। মার্ক শেইনহাউসের দেহে দারিদ্র্যের প্রতিটি লক্ষণ প্রকট হয়ে ছিল। তার রোগাসোগা ষোল বছর বয়সী দেহে আবরণ বলতে ছিল যৎসামান্য, আর তার পা-দুটো শতচ্ছিদ্র একজোড়া বুটের ভগ্নাবশেষের মধ্যে কোনোরকমে গোঁজা ছিল মাত্র। তবে মুখখানা ছিল তার মসৃণ আর পরিচ্ছন্ন, আর কোঁকড়া চুলগুলো সুন্দর করে আঁচড়ানো। ছেলেটার চোখের পাতাগুলো এত বড়-বড় আর ঘন ছিল যে মনে হোত প্রতিবার পাতা পড়ার ঝাপ্‌টায় বুঝি দমকা বাতাস বইবে।

বললুম, 'এখানে লেখা আছে যে তুমি নাকি চুরি করেছিলে। কথাটা সত্যি?'

প্রায় যেন ছোঁয়া যায় এমন একঝলক আলো মার্কের বড়-বড়, কালো, সন্তশোভন বিষণ্ণ চোখ থেকে ঠিকরে বেরুল। যেন চেষ্টা করেই চোখের পাতাদুটো তুলল ও, তারপর বিষণ্ণ, রোগা, ফ্যাকাশে মুখখানা আমার দিকে একটু ঝুঁকিয়ে বলল:

'হ্যাঁ, সত্য কথা তো বটেই। আমি... হ্যাঁ... আমি চুরি করেছি...'

'কী, খিদের জ্বালায়?'

'না, ক্ষুধার জ্বালায় যে তা কতি পারি না। ক্ষুধার জ্বালায় চুরি করি নাই।'

তখনও গম্ভীর, করুণ, স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল মার্ক। কেমন লজ্জা হল। সত্যি, কেন আমি এই অবসন্ন, বিষণ্ণ ছেলেটাকে যন্ত্রণা দিচ্ছি। হাসিটাকে যতদূর সম্ভব সদয় করে তোলার চেষ্টা পেলুম। বললুম:

'আমি অবশ্য কথাটা তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই না। চুরি যদি করে থাক তো করেছ, ব্যস চুকে গেল। লোকের জীবনে তো কতরকম ঘটনাই ঘটে, সে-সব কী আর মনে করে রাখার মতো?.. আচ্ছা, কখনও কি তুমি কোনো ইশকুলে পড়েছ?'

'হ্যাঁ, আমি ইশকুলে পড়্যেছি। পাঁচ কেলাস পড়্যেছি। আরও লেখাপড়া শিখতি চাই।'

'খুব ভালো কথা! তোমাকে তারানেত্সের চতুর্থ বাহিনীতে ভরতি করে নেয়া হবে। এই চিরকুটখানা ধর — এটা নিয়ে যাও, চতুর্থ বাহিনীর দলপতি তারানেত্সকে খুঁজে বের কর গিয়ে। যা-কিছু দরকার সেই-ই করবে'খন।'

টুকরো কাগজখানা হাতে নিল মার্ক, কিন্তু দরজার দিকে চলতে শুরু না করে টেবলের কাছে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল।

'কমরেড ডিরেক্টার, এট্টা কথা বলার ছেল, কথাটা বলতিই হবে আমারে। এখেনে আসার পথে সারাডা সময় খালি ভাব্যেছি কেমনে কথাডা পাড়ব্য আপনের কাছে। কথাডা না-বলি কিছুতি আর থাকত্যে পারত্যেছি না!..'

কথা ক'টা বলে করুণভাবে হাসল মার্ক। তারপর অনুনয়ের ভঙ্গিতে আমার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে রইল।

'কী কথা? আমাকে নিশ্চয় বলতে পার তুমি! বল, বলে ফেল!..'

'এয়ার আগি আমি আর-এট্টা কলোনিতি ছেলাম। সেডা যে খুব খারাপ কলোনি তা-ও কতি পারি না। কিন্তু কেমন মনে হল্য, আমার স্বভাব নষ্ট হয়ি যাতিছে। দেনিকিনওয়ালারা আমার বাপেরে খুন করেয়েছে আর কম্‌সমোল সদস্য হয়্যেও কিনা আমার মন নরম হয়ি যাতিছে। এয়া ঠিক না, এয়া আমি নিজিও বুঝি। বলশেভিকের মতন চরিত্তির হওয়া উচিত আমার। এয়ার ফলে আমার মাথায় চিন্তা ঢুক্যেছে। আচ্ছা, আমি যদি আপনেরে সবকিছু খুল্যে বলি তাইলি আপনে আমারে ফের ওদেসায় ফিরত পাঠাব্যেন না কথা দিতি পারেন?'

সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে দু'চোখের আগুনে-ঝলক মার্ক আমার মুখের ওপর সরাসরি ফেলল।

'তুমি আমায় যা-ই বল না কেন, আমি তোমায় ফেরত পাঠাব না।'

'ধন্যবাদ, কমরেড ডিরেক্টার! আপনে-যে একথা কবেন তা আমি জানতাম, তাই আমি এখেনে চল্যে আসব বলি মনস্থির কর্যে ফেল্যেছিলাম। মনস্থির কর্যেছিলাম কারণ 'সংবাদ' পত্রিকায় আমি এট্টা রচনা পড়্যেছিলাম, রচনার নাম 'নূতন মানুষ গড়া হচ্ছে যেখানে'। রচনাডা ছেল আপনের কলোনি নিয়ি। আমারে-যে কনে যাতি হবে তা সাথে-সাথে আমি বুঝ্যে নেলাম আর আমারে এখেনে পাঠানোর জন্যি দরবার করতি শুরু কর্যে দেলাম। কিন্তু

যতই কাকুতিমিনতি করলাম কিছুতিই কিছু হল্য না। অরা আমারে কয়েল — ‘ওয়া তো অপরাধীদের কলোনি, তুই ওখেনে যাতি চাস ক্যানে?’ তাই একদিন কলোনি ছাড়্যে আমি পলায়্যে আলাম, আসি সিধা টেরামগাড়িতি উঠ্যে বসলাম। এত তাড়ঘাড়ি সবকিছু ঘট্যে গেল, আপনে ভাবতি পারব্যেন না পের্যন্ত! তারপর একজনার পকেটের ভিতরি হাত ঢুকায়্যেছি-কি-ঢুকাই নাই অমনে আরেক জনা আমারে ধরি ফ্যালল, তারপর আমারে এই মারে-কি-সেই মারে। পরে অরা আমারে কমিশনের কাছি ধর্যে নিয়ি গেল।’

‘কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি কমিশন বিশ্বাস করেছিল?’

‘ক্যানে করব্যে না? অরা ভদ্দরলোক, ন্যায়পরায়ণ লোক, তা বাদে ব্যাপারডা ঠিকই ঘট্যেছেল আর সাক্ষীও ছেল জনা-কয়, সবকিছুই যেমন-যেমন থাকা দরকার তেমনডা ছেল। বললাম, আমি আগিও পকেট মার্যেছি।’

মন খুলে হাসলুম। কমিশনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমার অবিশ্বাস যে ভিত্তিহীন নয় তা আবিষ্কার করে আত্মতৃপ্তি লাভ করলুম। মার্কও আশ্বস্ত হয়ে চতুর্থ বাহিনীর সঙ্গে ব্যবস্থাদি পাকা করে নেয়ার জন্যে চলে গেল।

তবে ভেরা বেরেজোভ্স্কায়ার ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

সময়টা ছিল শীতকাল। সেদিন মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্না বোকভাকে ট্রেনে তুলে দিতে আর খার্কভে পেঁাছে দেয়ার জন্যে একটা খুব জরুরি চিঠি তাঁর হাতে দেয়ার উদ্দেশ্যে আমি স্টেশনে গিয়েছিলুম। গিয়ে দেখি স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্না রেলওয়ের ডিউটিতে নিযুক্ত এক শান্ত্রীর সঙ্গে তুমুল তর্ক জুড়ে দিয়েছেন। শান্ত্রীটি বছর ষোল বয়সের একটি মেয়েকে চেপে ধরে রেখেছে। মেয়েটির খালি পাদুটো একজোড়া গ্যালশ বা জুতোর রবারের আবরণের মধ্যে গোঁজা, আর তার পরনে খাটো, সাবেকি কায়দার ঢোলা জামা। জামাটা সম্ভবত ছিল কোনো দয়ার্দ্রচিত্ত বৃদ্ধার দান। মেয়েটির আঢাকা মাথার অবস্থাটা ছিল ভয়াবহ — জটা-পড়া তার কটা চুলের সাবেক কটারঙ আর ছিল না এবং একগোছা চুল একটা কানের পেছন থেকে জমাট-বাঁধা জটার আকারে বেরিয়ে এসে মেয়েটার গালে আর কপালে আঠালো কালো গুছির মতো সেঁটে ছিল। হাতখানা শান্ত্রীর হাত থেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছিল মেয়েটা আর সারাক্ষণই ছেনালের মতো একগাল হেসে ঢলে-ঢলে পড়ছিল। মেয়েটা সত্যিই ভারি সুন্দরী ছিল। কিন্তু ওর হাস্যোজ্জ্বল চোখদুটোয় এমন এক ধরনের ধিকিধিকি

আগন্ন জবলতে দেখেছিলন্ম যা একমাত্র ফাঁদে-পড়া, কোণঠাসা জন্তুর অসহায় হতাশ চোখে মাঝে-মাঝে জবলতে দেখা যায়। হাসিটাই ছিল ওর জানা আত্মরক্ষার একমাত্র হাতিয়ার, ওর একমাত্র কর্ণ কূটনীতি।

শন্নলন্ম শান্ত্রীটি বলছে, 'কমরেড, আপনের পক্ষি যন্ক্তি দেখানো তো খন্বই সোজা। আপনে তো খোঁজ রাখেন না এয়াদের নিয়ি আমাদের কত হাঙ্গাম পোয়াতি হয়!'

এবার মেয়েটাকে শন্ধোল সে:

'ক' দেখি, গত হপ্তায় তুই টেরেনে উঠ্যেছিলি? না, না? মাতাল হইছিলি? না, না?'

'আমি? মাতাল? বানায়্যে-বানায়্যে কথা কওয়ার জায়গা পায় না!' শান্ত্রীর দিকে খোলাখন্লি এবার একঝলক ছেনালি হাসি ছন্ড়ে বলল মেয়েটা। তবে সেইসঙ্গে নিজের হাতখানা শান্ত্রীর মন্ঠো থেকে হিঁচড়ে ছাড়িয়ে নিয়ে আঙন্লগন্লোয় যেন লেগেছে এমন ভাব করে সেগন্লো মন্খের কাছে এনে ফন্ঁ দিতে লাগল।

'যাক বাব্বাঃ, ছাড়ান পেয়্যেছি শেষমেষ!' লজ্জা-লজ্জা ছেনালি ভাব করে নিচু গলায় বলল মেয়েটা।

শন্নে শান্ত্রীটি ফের ধরার জন্যে ওর দিকে এগিয়ে গেল আর ও তিন পা পিছিয়ে গিয়ে হেসে উঠল হো-হো করে। আমাদের চারদিকে ইতিমধ্যে ভিড় জমে উঠতে শন্রন্ করেছিল, কিন্তু সেদিকে মেয়েটার ভ্রন্ক্ষেপমাত্র ছিল না।

মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্না অপ্রস্তুতভাবে মাথাটা ঘোরাতেই আমার দিকে তাঁর চোখ পড়ে গেল।

'আন্তন সেমিওনভিচ! ওহ্ আন্তন সেমিওনভিচ!..'

আমাকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে উত্তেজিতভাবে ফিস্‌ফিস করে তিনি বললেন:

'শন্নন্ন — ব্যাপারটা সত্যিই ভয়ঙ্কর! ভাবন্ন একবার! মেয়েটা যন্বতী হয়ে উঠেছে, রীতিমতো সন্ন্দরী যন্বতী!.. অবশ্য সন্ন্দরী বলেই যে কথাটা বলছি আমি তা নয়, মোটেই তা নয়... যাই হোক, এর একটা বিহিত করতেই হবে!..'

'কী করতে চান আপনি, মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্না?'

'কী করতে চাই? কিছু বোঝেন না, তাই না? ন্যাকা কোথাকার!'

'বটে! বটে!..'

'তাই তো, ন্যাকাই তো! কেবল নিজের সুবিধে, কেবল হিসেব, এছাড়া আর কিছুই বোঝেন না, কেমন? এতে আপনার বিশেষ সুবিধে হবে না, তাই না? শাস্ত্রীটাই মেয়েটাকে শায়েস্তা করুক, কেমন?'

'কিন্তু দেখুন — মেয়েটা হল গিয়ে বেশ্যা!.. কী করে আপনি আশা করেন যে প্রধানত ছেলেদের একটা যৌথ সংস্থায় আমি একে ভরতি করে নেব?'

'আপনার যুক্তি-বিস্তার থামান দেখি। হায়, হায়, বেচারা... শিক্ষাবিজ্ঞানী!'

অপমান বোধ করে কেমন ফ্যাকাশে মেরে গেলুম। ক্ষিপ্তভাবে বললুম:

'ঠিক আছে! এই মুহূর্তে ওকে আমি কলোনিতে নিয়ে যাচ্ছি!'

দুই হাত ছড়িয়ে মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না আমায় বেষ্টন করলেন। বললেন:

'প্রিয় মাকারেঙ্কো, আপনি সত্যিই বড় ভালো! ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ!..'

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটার কাছে ছুটে গিয়ে দুই হাতে ওর দুটো কাঁধ ধরে কানে-কানে ওকে কী যেন বললেন। শাস্ত্রীটিও সজোরে উপস্থিত দর্শকদের ধমকে উঠল:

'হাঁ কর্যে দ্যাখতিছেনডা কী? মনে ভাবতিছেন বায়োস্কোপ দেখতি এয়্যেছেন বুঝি? যান, যান, কাট্যে পড়েন, নিজির চরকায় তেল দ্যান গিয়ি!..'

তারপর থুথু ফেলে আর কাঁধ-ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেই ও চলে গেল।

মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না তরুণীটিকে আমার কাছে নিয়ে এলেন। মেয়েটি তখনও হাসছিল।

'আসুন, আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই। এ হল ভেরা বেরেজোভ্‌স্কায়া। এ কলোনিতে যেতে রাজি... ভেরা, ইনি হলেন তোমাদের ডিরেক্টর। ভারি দয়ালু লোক, বুঝলে। ওঁর কাছে তুমি খুব ভালো থাকবে।'

ভেরাও আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল:

'তা যাব-নে... আমার কোনো আপত্তি নাই।'

মারিয়া কন্‌দ্রাতিয়েভ্‌না আর আমি পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলুম। তারপর আমার নতুন রক্ষণাধীন মেয়েটিকে নিয়ে শ্লেজের দিকে চললুম।

শ্লেজের সিটের তলা থেকে ঘোড়ার গায়ে চাপা দেবার কম্বলখানা বের করে মেয়েটিকে বললুম, 'গায়ে দাও, নইলে ঠাণ্ডা লাগবে।'

ঘোড়ার কম্বল মুড়ি দিয়ে ভেরা খুশি-খুশি ভাবে আমায় শুধোল:

'আমি ওখেনে — কলোনিতি গিয়ি কী করব্য?'

'পড়াশুনো করবে, কাজ করবে।'

অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ রইল ভেরা। তারপর হঠাৎ একসময়ে খামখেয়ালির মতো 'মেয়েলি' গলায় বলে উঠল:

'হায়, হায়, ভগমান!.. আমি মোট্টেও লেখাপড়া করব্য না, ভুলেও সেকথা মনে স্থান দিয়েন না!..'

রাত ঘনিয়ে আসছে তখন — মেঘলা, অন্ধকার, অলক্ষুণে। আমরা এসে পড়েছি মাঠের পথে। বরফঢাকা মাঠের ওপর দিয়ে পিছলে যাচ্ছে স্লেজগাড়ি। কোচোয়ানের বাক্সে-বসা সরোকা যাতে শুনতে না-পায় এইভাবে নিচু গলায় ভেরাকে আমি বললুম:

'আমাদের সব ছেলেমেয়েই লেখাপড়া করে। তুমিও করবে বৈকি। ভালো ছাত্রী হবে তুমি। সুন্দর জীবন শুরু হবে তোমার।'

আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে চিৎকার করে ভেরা বললে:

'সোন্দর জেবন!.. তা-ই বটে! উঃ, কী ভীষণ আঁধার হয়ি আসত্যেছে!.. ভয় লাগতিছে আমার!.. আমারে কনে নিয়ি যাতিছেন আপনে?'

বললুম, 'চুপ কর!'

চুপ করে গেল ও। কুঞ্জবনে ঢুকলুম এবার। নিচু গলায় কাকে যেন গালাগাল দিতে-দিতে যাচ্ছিল সরোকা। এমন যদি কেউ থেকে থাকে যে অন্ধকার রাত আর জঙ্গলের সরু-সরু পথ বানিয়েছে তবে তাকেই সম্ভবত ও গালাগাল দিচ্ছিল।

'আপনেরে এট্টা কথা কব?' ফিস্‌ফিস করে বলল ভেরা।

'বলে ফ্যাল!'

'ব্যাপারডা কী জানেন?.. আমার না, বাচ্চা হবে...'

শুনে কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে আমি বললুম:

'তুমি বানিয়ে বলছ না তো?'

'না। বানায়্যে বলব্য ক্যানে?.. এয়া খাঁটি কথা, একদম খাঁটি কথা!'

দূরে কলোনির আলো মিটমিট করছে দেখা গেল। আবার ফিস্‌ফিস করে কথা শুরু করলুম।

বললুম, 'পেটের বাচ্চাটা নষ্ট করে ফেলব আমরা। ক'মাস হল?'

'দুই মাস।'

'তাহলে নষ্ট করা যাবে।'

'কিন্তু অরা যে হাসব্যে?'

'কারা হাসবে?'

'আপনের... ছেল্যাপিল্যারা...'

'ওরা কেউ জানবেই না।'

'অরা ঠিক জানতি পারব্যে...'

'না। শুধু আমি জানব আর তুমি জানবে। আর কেউ না।'

সবজান্তার হাসি হাসল ভেরা। বলল:

'ওহ্, আপনে পারেনও বটে!'

চুপ করে রইলুম। কলোনিতে পেঁছিনোর আগে ঢিবিমতো জায়গাটায় দুলকি চালে উঠল আমাদের ঘোড়া। সরোকা তখন স্লেজ থেকে নেমে ঘোড়ার পাশে-পাশে হেঁটে যাচ্ছিল আর শিস দিচ্ছিল। হঠাৎ ভেরা আমার হাঁটুর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে প্রচণ্ড কান্না শুরু করে দিল।

সরোকা শুধোল, 'ব্যাপার কী মেয়েটার?'

'ঝামেলায় পড়েছে আর-কি।'

'আত্মীয়স্বজন নিয়ি বোধকরি,' আন্দাজ করল সরোকা। 'আত্মীয়স্বজনের থেকে খারাপ আর কিছু নাই সংসারে!'

বলে ফের স্লেজের ওপর কোচবাক্সে উঠে বসে চাবুকখানা চমকালো।

'হেট-হেট, কমরেড 'মেরি', চল্-চল্! পথ তো পেয়ে গেছিস!'

অবশেষে কলোনির উঠোনে এসে পেঁছিলুম আমরা।

দিন-তিনেকের মধ্যে মারিয়া কন্দ্রাতিয়েভ্না ফিরে এলেন খার্কভ থেকে। কিন্তু তাঁকে আমি ভেরার দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার কথা কিছুই জানালুম না। এর এক সপ্তাহ পরে কলোনিতে প্রচার করে দিলুম যে কিড্নির অসুখের জন্যে ভেরাকে হাসপাতালে পাঠাতে হচ্ছে। হাসপাতাল থেকে ফিরে এল ভেরা বিনম্র ও শোকাচ্ছন্ন অবস্থায়। এসে নিচু গলায় আমায় শুধোল:

'আমি এখন কী করি?'

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে সাবধানে আমি জবাব দিলুম:

'এখন থেকে তুমি বাঁচতে শুরু করবে।'

ওর লজ্জিত, শূন্যদৃষ্টির দিকে তাকিয়ে কিন্তু আমার মনে হল ওর

কাছে বাঁচার মতো এমন কঠিন, এমন ধাঁধা-লাগানো ব্যাপার আর কিছু নেই।

যাই হোক, ঠিক হল ভেরা বেরেজোভ্স্কায়া অবশ্যই আমাদের সঙ্গে কুরিয়াজে যাবে। শেষপর্যন্ত অবশ্য দেখা গেল যে সকলেই যাচ্ছে, এমন কি আমার রণনৈতিক পরিকল্পনার দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না-করে শিক্ষা-সংক্রান্ত জন-কমিশারিয়েত এর মাত্র দিন-কয়েক আগে যে-বিশজন নতুন ছেলেমেয়েকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল তারা পর্যন্ত যাচ্ছে। আহা, যদি শুধুমাত্র সেই আদি, অকৃত্রিম, সুপরীক্ষিত এগারোটি গোর্কি বাহিনী আমার সঙ্গে কুরিয়াজ যেত, তাহলে কী ভালোই-না হোত! ওই বাহিনীগুলো আমাদের কলোনির ইতিহাসে কঠিন শ্রমসাধ্য ছ-ছ'টি বছর ধরে লড়াইয়ের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এসেছিল। চিন্তা-ভাবনা, ঐতিহ্য, অভিজ্ঞতা, আদর্শ ও রীতি-পদ্ধতিতে কত যে ঐক্য ছিল তাদের মধ্যে কী বলি! ওরা সঙ্গে থাকলে দুনিয়ায় কোনো কিছুতেই আমি ডরাতুম না। অন্তত পক্ষে এই নতুন আগন্তুক ছেলেপিলেরা না-থাকলেও কত ভালো হোত! আপাতদৃষ্টিতে এই নতুনরা যদিও নানা বাহিনীতে মিলেমিশে গিয়েছিল, তবু মনে হতে লাগল এদের যেন সর্বত্রই বড় বেশি সংখ্যায় দেখতে পাচ্ছি। এদের মুখোমুখি হলেই বড্ড অস্বস্তি হোত আমার: কেমন যেন বেঠিকভাবে হাঁটছে আর কথা বলছে এরা, সঙ্গে করে নিয়ে-আসা স্থূল আর নিকৃষ্ট রুচির ছাপ তখনও পর্যন্ত এদের মুখে কেমন সেঁটে আছে।

কিন্তু সে যাই হোক, ভাবলুম এ-নিয়ে আর বৃথা মাথা ঘামাব না। আমার তৎকালীন এগারোটা বাহিনীকেও মনে হচ্ছিল যেন ইস্পাতে গড়া। আবার ভয়ও হচ্ছিল, এই এগারোটা পুঁচকে বাহিনী যদি কুরিয়াজে গিয়ে এঁটে উঠতে না-পারে, তাহলে না জানি কী বিপর্যয়ই ঘটবে! অগ্রবর্তী মিশ্র বাহিনী যাত্রা করার আগের দিন সন্ধেয় আমার মনটা ঠিক এইরকম দুঃখে আর বিভ্রান্তিতে বিমূঢ় হয়ে ছিল। আর এমনই ভবিতব্য, সেদিন ওই সন্ধের ট্রেনেই দ্জুরিন্স্কায়া এসে হাজির। আমার ঘরে একা আমাকে ডেকে নিয়ে দরজা বন্ধ করে তিনি বললেন:

'আন্তন সেমিওনভিচ, আমার ভয় করছে! এখনও সময় পার হয়ে যায় নি। এখনও ইচ্ছে করলে আপনি যাওয়া বাতিল করতে পারেন!'

'নতুন কিছু ঘটেছে কি, লিউবোভ সাভেলিয়েভ্না?'

'গতকাল আমি কুরিয়াজ গিয়েছিলাম। ওখানকার অবস্থা আতঙ্কজনক!

এমন দৃশ্য চোখে সওয়া যায় না! আপনি তো জানেন আমি জেলে কাটিয়েছি, যুদ্ধেও গেছি, কিন্তু এখন আমার যত খারাপ বোধ হচ্ছে এর আগে এমন আর কখনও হয় নি।'

'ব্যাপার কী বলুন তো?..'

'তা জানি না। কেমন করে যে বলব তা-ও বুঝতে পারছি না। আপনি শুধু কল্পনা করার চেষ্টা করুন — পুরোপুরি দুর্নীতিগ্রস্ত, বিষিয়ে-থাকা শ-তিনেক ছেলে অকর্মণ্য হয়ে আলস্যে ডুবে আছে — এটা এক ধরনের পাশব জীবন, জৈব ধ্বংসের এক ধরনের নমুনা, বুঝতে পেরেছেন! এমন কি এটাকে নৈরাজ্য পর্যন্ত বলা চলে না!.. তাছাড়া কী সাংঘাতিক দারিদ্র্য, দুর্গন্ধ আর ছারপোকা!.. দোহাই আপনার, যাবেন না ওখানে! ওখানে যাওয়া পাগলের পরিকল্পনা ছাড়া কিছু নয়!'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান! কুরিয়াজ যদি আপনার মনে এমন একটা মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে থাকে, তবে তো বলতে হয় ও-জায়গাটা নিয়ে কিছু-একটা করার যথেষ্ট জোরালো যুক্তি রয়েছে।'

লিউবোভ সাভেলিয়েভ্না গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

'ওহ্, এক কথায় এর মীমাংসা হতে পারে না! অবশ্যই এ-নিয়ে কিছু-একটা করতেই হবে, এটা আমাদের কর্তব্যও, কিন্তু এজন্যে আপনার যৌথ-সংস্থাটাকে বলি দেয়া উচিত হবে না। আপনার সংস্থার মূল্য আপনি জানেন না আন্তন সেমিওনভিচ — একে চোখের মনির মতো রক্ষে করতে হবে, বাড়িয়ে তুলতে হবে, উন্নতি ঘটাতে হবে এর, মুহূর্তের খামখেয়ালিতে একে ছুড়ে ফেলে দেয়া চলে না!'

'কার খামখেয়াল?'

'জানি না কার,' ক্লান্তভাবে বললেন লিউবোভ সাভেলিয়েভ্না। 'আমি আপনার কথা বলছি না, আপনার দৃষ্টিভঙ্গি এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ এক বিশেষ ধরনের। কিন্তু — হ্যাঁ, ভালো কথা, এটাই আমি আপনাকে বলতে চাইছিলুম — আপনি যত জনকে জানেন তার চেয়ে অনেক বেশি শত্রু আছে আপনার।'

'তা, তাতে হলটা কী?'

'এমন অনেক লোক আছে কুরিয়াজে গিয়ে আপনি অপদস্থ হলে যারা দারুণ খুশি হবে।'

'তা আমি জানি।'

'জানেন তো? তবে? তাহলে আসুন, ব্যাপারটা নিয়ে গভীরভাবে ভাবা যাক। পরিকল্পনাটা বাতিল করুন তাহলে! এখনও সময় আছে!'

দ্জুরিন্স্কায়ার এই প্রস্তাব শুনে হাসি পেল আমার। বললুম:

'আপনি আমাদের বন্ধু। আপনার যত্ন আর মমতাকে আমরা যে কত মূল্যবান মনে করি তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না। কিন্তু... ক্ষমা করবেন, আপনি কি সেই সাবেকি শিক্ষাবিজ্ঞানীর মনোভাব দেখাচ্ছেন না?'

'আপনার কথাটা বুঝলুম না।'

'কুরিয়াজে আমাদের লড়াইটা নিছক কুরিয়াজ আর আমাদের শত্রুদের জন্যেই যে দরকার তা-ই নয়, আমাদের নিজেদের জন্যেও, আমাদের প্রতিটি কলোনি-বাসিন্দার জন্যেও এটা সমান দরকার। এই লড়াইয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। কলোনি-বাসিন্দাদের মধ্যে গিয়ে একটুখানি ঘুরে দেখে আসুন, বুঝবেন পিছু-হটা এখন অসম্ভব।'

এর পরদিন সকালে অগ্রবর্তী মিশ্র বাহিনী খার্কভ যাত্রা করল। একই গাড়িতে লিউবোভ সাভেলিয়েভ্নাও আমাদের সঙ্গে গেলেন।

২

অগ্রবর্তী মিশ্র বাহিনী

ভোলখভ ছিল অগ্রবর্তী মিশ্র বাহিনীর নেতৃত্বে। ছেলেটা কথা বলত খুবই কম, কথা বলার সময়ে হাত-মুখ নাড়ত না কখনই এবং মুখভাবের পরিবর্তনও তার ঘটত কদাচিৎ কিন্তু বিভিন্ন ঘটনা আর মানুষ সম্পর্কে নিজের মনোভাব কীভাবে প্রকাশ করতে হয় তা সে জানত ভালোরকমই। আর এই মনোভাব প্রকাশের সঙ্গে সর্বদাই মিশে থাকত একধরনের নির্দোষ ব্যঙ্গ আর অবিচল আত্মবিশ্বাসের ভাব। এই সমস্ত গুণের দেখা অবশ্য যে-কোনো আত্মসম্মান-জ্ঞানসম্পন্ন রকবাজ ছেলের মধ্যে স্থূল আদিম ধরনে মেলে, কিন্তু যখন একটা যৌথ-সংস্থায় থাকার ফলে গুণগুলো বিশিষ্ট আকার পায় ও পরিশীলিত হয়ে ওঠে তখন এদের অধিকারী একধরনের সমুন্নত ও সংযত মহিমা এবং শান্ত, অজেয় শক্তির বিকিরণে ঝলমল করতে থাকে।

সংগ্রামের ক্ষেত্রে এই ধরনের দলপতিদেরই দরকার পড়ে, কারণ এদের সাহস ও আত্মসংযমের শক্তির ওপর ভরসা রাখা চলে। আমার সবচেয়ে বড় স্বস্তির ব্যাপার ছিল এই যে কুরিয়াজ কিংবা কুরিয়াজের বাসিন্দাদের নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে ভোলখভ কখনও সময় নষ্ট করত না। বিষয়টা নিয়ে ছেলেদের অনবরত বকবকানির চোটে বাধ্য হয়ে মাঝে-মাঝে সে-সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে হলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তা করত ভোলখভ। তবে তা হোত একেবারে মুখের মতো জবাব:

'কুরিয়াজের ছোঁড়াদের নিয়ি মাথা ঘামানো বন্ধ কর্ দেখি! দেখবি-নে আর পাঁচজনার মতন ওরাও রক্ত-মাংসের মানুষ।'

তবু, এ-সত্ত্বেও, অগ্রবর্তী মিশ্র বাহিনীর জন্যে ছেলে-বাছাইয়ের সময় সে কিন্তু দারুণ গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপারটা দেখল। বাহিনীর জন্যে প্রতিটি প্রার্থীকে নিঃশব্দে, বেশ মনোযোগ দিয়ে বিচার করে দেখতে লাগল সে, তারপর মুরুব্বিয়ানা চালে এইভাবে সংক্ষেপে মত জাহির করতে লাগল — যেমন, একটা উদাহরণ দিই:

'নাঃ, এরে দিয়ি কাজ চলবে না! লড়ার মতন মুরোদ নাই এডার!'

অনেক মাথা ঘামিয়ে তবে অগ্রবর্তী মিশ্র বাহিনীটি তৈরি করা হল। এই দলের প্রত্যেকেই ছিল কম্সমোলের সদস্য, আবার ওই একই সঙ্গে কলোনিতে সে-সময়ে প্রধান-প্রধান যে-যে ধ্যানধারণা ও বিশেষ দক্ষতার দেখা মিলত তাদের যোগ্য অধিকারীরাও ছিল এর সদস্যভুক্ত। নিচে এই বাহিনীর সদস্যদের একটু করে পরিচয় দেয়া যাক:

১। ভিত্‌কা বগয়াভ্‌লেন্‌স্কি। দলপতি-পরিষদ এর একটা নতুন নামকরণ করেছিল (আর সে কি যে-সে নাম!)। দলপতি-পরিষদ এর নাম দিয়েছিল — গোর্‌কভ্‌স্কি! গোর্‌কভ্‌স্কি ছিল রোগাসোগা, শাদাসিধে চেহারার ছেলে, কিন্তু একেবারে শেয়ালশিকারী কুকুরের মতো চালাক। ও ছিল চমৎকার শৃঙ্খলাপরায়ণ, কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে সর্বদাই প্রস্তুত, সবকিছু সম্পর্কে নিজস্ব মতামত ছিল ওর এবং অন্যেরা কে কেমন সে-সম্পর্কে চটপট চরম রায় দিতে ছেলেটা ছিল পটু। যে-কোনো ছেলের একেবারে ভেতরটা পর্যন্ত দেখার এবং এক-নজর দেখেই তার সম্পর্কে মোদ্দা কথাটুকু নির্ভুলভাবে বলে দেয়ার ক্ষমতার মধ্যে নিহিত ছিল গোর্‌কভ্‌স্কির আসল প্রতিভা। সেই সঙ্গে আসল ব্যাপারগুলো কখনও চোখ এড়াত না ওর। ও

জানত, ব্যক্তিবিশেষ সম্পর্কে নিজের ধারণাকে কী করে মিলিয়ে-জুলিয়ে মেপে নিতে হয় যৌথ জীবনের প্রয়োজনের নিক্তিতে আর এইভাবে বিশেষ-বিশেষ প্রবণতা, বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ লক্ষণযুক্ত ব্যাপারগুলো আবিষ্কার করে সমষ্টি সম্পর্কে নিজের জ্ঞান বাড়িয়ে নিতে হয়।

২। মিত্‌কা জেভেলি — আমাদের পুরনো বন্ধু ও সত্যিকার গোর্কি মর্মবাণীর সবচেয়ে সফল ও মনোহর ধারক-বাহক। মিত্‌কার চরিত্রের বিকাশ ঘটেছিল খুবই শোভনভাবে। ও বেড়ে উঠেছিল সুপুরুষ তরুণ হিসেবে, ঘাড়ের ওপর দৃঢ়সংবদ্ধ মাথা ও অল্প-একটু ঝোলা দুই চোখের উজ্জ্বল, কালো, হীরের ধারওয়ালা দ্যুতি নিয়ে। কলোনিতে তখন সব সময়েই এমন বেশ কিছু খুদে বাচ্চাকে দেখা যেত যারা মিত্‌কার সামান্য, অপ্রত্যাশিত জায়গায় হাতনাড়াসহ জোরালো কথাবার্তা, তার পোশাকের পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা, তার হাঁটাচলার ভঙ্গি আর কলোনির প্রতি তার দৃঢ়মূল অথচ স্ফূর্তি আর খোশমেজাজে-ভরা আনুগত্যের অনুকরণ করার চেষ্টা করত। কুরিয়াজে আমাদের কলোনির বাস উঠিয়ে যাওয়াকে সাংঘাতিক রাজনৈতিক তাৎপর্যের দ্যোতক একটা গুরুতর ঘটনা বলে গণ্য করত মিত্‌কা। এ-বিষয়ে সে নিশ্চিত ছিল যে 'বাচ্চাদের সংগঠিত করার' সঠিক ধরনটি আমরা আবিষ্কার করে ফেলেছি। সে মনে করত প্রলেতারীয় প্রজাতন্ত্রের মঙ্গলের জন্যে আমাদের এই আবিষ্কারের প্রচার হওয়া দরকার।

৩। মিখাইল অভ্‌চারেঙ্কো। খুব যে চালাকচতুর চটপটে তা নয়, তবু চমৎকার কাজের ছেলে ছিল অভ্‌চারেঙ্কো, আর ছিল কলোনি ও তার স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে প্রবল উৎসাহী। মিশার অতীত জীবনটা ছিল ভারি গোলমেলে, তার খুঁটিনাটি মনে করে বলতে ওর নিজেকেও খুব বেগ পেতে হোত। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রায় সব ক'টি শহরেই সে একবার-না-একবার ঢুঁ মেরে এসেছিল, অথচ তার জ্ঞান কিংবা মনের বিকাশ ঘটাতে কোনো একটা শহরও-যে কিছুমাত্র সাহায্য করেছিল তা মনে হয় না। কলোনিতে আসার প্রথম দিনটি থেকেই মিশা কলোনির প্রেমে পড়ে গিয়েছিল আর তারপর তার নামের পাশে আপত্তিকর ঢেরা চিহ্ন কোনোদিনও পড়েছিল কিনা সন্দেহ। নানারকম পাঁচমিশেলি কাজ জানত ছেলেটা, তবে ওর পক্ষে সম্ভাব্য সত্যিকার পেশা বলতে কিছু ছিল না, কারণ কোনো একটা বিশেষ মেশিনের কাজে লেগে থাকা কিংবা কোনো একটা জায়গায় বেশিদিন কাজ

করা তার স্বভাবে ছিল না। এই ত্রুটি অবশ্য সে পূরণ করে নিত ব্যবস্থাপনার কাজে সত্যিকার যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে। জিনিসপত্র প্যাক করা ও এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় তা আনা-নেয়ার কাজে লিপ্ত কোনো বাহিনীর কাজ সংগঠিত করার ক্ষমতা রাখত সে। বিনা ব্যতিক্রমে সর্বদাই তৎপরতা ও সাফল্যের সঙ্গে ছেলেটা কাজ সমাধা করত আর কাজের ফাঁকে-ফাঁকে ছড়িয়ে থাকত তার একে-ওকে কয়েক দফা দাঁতখিঁচুনি দেয়া আর হুকুম জারি করা। কেজো লোকের রকম-সকম যেমনধারা হয় আর-কি। তবে এ-সব অন্যের পক্ষে বিরক্তিকর ঠেকত না, কারণ এ-সবের সঙ্গে সর্বদাই মিশে থাকত মিশার সদিচ্ছাপ্রণোদিত বোকামি আর অফুরন্ত প্রসন্নতা। সর্বোপরি মিশা অভ্‌চারেঙ্কো ছিল কলোনিতে সবচেয়ে বলশালী ছেলে, এমন কি সিলান্তি অত্‌চেনাশের চেয়েও গায়ে বেশি শক্তি রাখত সে। মিশাকে অগ্রবর্তী মিশ্র বাহিনীর জন্যে বেছে নেয়ার সময় প্রধানত তার এই গুণটির কথাই ভোলখভের নিশ্চয় মাথায় ঘুরছিল।

৪। দেনিস কুদ্‌লাতি। কুরিয়াজ অভিযানের পর্যায়ে দেনিস ছিল কলোনির মধ্যে সবচেয়ে প্রবল ব্যক্তিত্ব। কলোনির সাধারণ সভায় কুদ্‌লাতি যখন বলতে উঠে বিশেষ করে কারও নাম উল্লেখ করত তখন ভয়ে তার রক্ত হিম হয়ে যেত না এমন বুকের পাটাওয়ালা ছেলে কলোনিতে খুব কমই ছিল। অন্যায় করলে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করে মুখের কথায় তাকে একেবারে কাদায় ফেলে প্রাণভরে নিখুঁতভাবে পায়ে ঠুসতে আর কলোনি থেকে তার বহিষ্কারের দাবি ভয়ঙ্কররকম বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপিত করতে জুড়ি ছিল না কুদ্‌লাতির। সে ছিল সত্যিই ভারি বুদ্ধিমান ছেলে আর তার পেশ-করা যুক্তিতর্কও প্রায়ই প্রতিপক্ষকে কাবু করে ফেলার মতো যথেষ্ট চোখা হোত। বিশেষ করে এ-কারণে সে ছিল সকলের ভয়ের পাত্র। তার গভীর এবং অবিচল ধারণা ছিল যে কলোনি হল একটা দরকারি জিনিস আর জিনিসটা বেশ ভালোরকম ঢালাই-করা আর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিতও বটে। সন্দেহ নেই যে কলোনিটাকে সে চাকায় তেল-দেয়া আর ভালো মেরামত-করা খামারবাড়ির এমন একখানা ঘোড়ার গাড়ি বলে ধরে নিয়েছিল — যে-গাড়িতে চেপে চুপচাপ ঝাঁকুনি খেতে-খেতে লোকে হাজারখানেক কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে পারে, তারপর একসময় গাড়ি থেকে নেমে তেলের ডিবেটা ফের একবার ব্যবহার করে আর এদিক-সেদিক এক-আধটুকু হাতুড়ি ঠুকে নিয়ে আবার

গাড়িতে চেপে বসে আরও হাজারখানেক কিলোমিটার অক্লেশে পার হয়ে যেতে পারে। যদিও চেহারার দিক থেকে কুদ্‌লাতি ছিল একেবারে কুলাকের মতো দেখতে আর আমাদের থিয়েটরেও সে সবসময়ে কুলাকের ভূমিকাতেই অভিনয় করত, তবু আমাদের কম্‌সমোল সংগঠনের সে-ই ছিল প্রথম সংগঠক আর তার সবচেয়ে সক্রিয় কর্মী। সত্যিকার গোর্কিপন্থী ছিল সে, অযথা কথার অপব্যয় করা তার ধাতে ছিল না। বক্তৃতাবাগীশদের সে নিঃশব্দে উপেক্ষা করে চলত, আর লম্বা-চওড়া বক্তৃতা শুনে সত্যিসত্যিই অসুস্থ বোধ করত।

৫। এভ্‌গেনিয়েভকে বাহিনীর দলপতি বেছে নিয়েছিল মস্তানদের শায়েস্তা করার টোপ হিসেবে। ছেলেটা এমনিতে ছিল কম্‌সমোলের একজন ভালো সদস্য এবং এক বিশ্বস্ত, হাসিখুশি কমরেড, কিন্তু তার কথাবার্তায় আর ধরনধারণে তখনও পর্যন্ত রাস্তা আর সংশোধনাগারে কাটানো তার অতীতের উত্তাল দিনগুলোর কিছু-কিছু জের রয়ে গিয়েছিল। আর বেশ পাকা অভিনেতা হওয়ায় দরকার পড়লে যে-কোনো রাস্তার লোকের সঙ্গে তার নিজস্ব রকের ভাষায় কথা বলতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হোত না এভ্‌গেনিয়েভকে।

৬। জোর্‌কা ভোল্‌কভ ছিল কম্‌সমোল সংগঠনে কভালের ডান হাত। আমাদের মিশ্র বাহিনীতে ও রাজনৈতিক কমিশার হিসেবে কাজ করেছিল আর তৈরি করেছিল বাহিনীর নতুন সংবিধান। জোর্‌কা ছিল জন্মসূত্রে রাজনীতিবিৎ — রাজনীতিবিদের মতোই আগুনখেকো, আত্মপ্রত্যয়ী আর দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ। ওর সম্পর্কে কভাল বলেছিল:

'জোর্‌কা কুরিয়াজের ছেলেগুলার রাজনৈতিক স্নায়ুতে শান দিয়ে দেবে। ওরা — হতচ্ছাড়াগুলা — মনে ভেবেছে বুঝি ওরা সাম্রাজ্যবাদী যুগেই বাস করছে! আর যদি হাতাহাতি করার দরকার পড়ে তাহলেও জোর্‌কা পিছিয়ে থাকবে না।'

৭ ও ৮। তোস্‌কা সলভিয়েভ ও ভান্‌কা শেলাপুতিন — অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সীদের মধ্যে থেকে দুই প্রতিনিধি। দু'জনেরই ছিল ফিটফাট বুরুশ-করা ঢেউখেলানো চুলের রাশ। তোস্‌কার চুল ছিল হালকা শাদা আর ভান্‌কার সোনালি-কটা। তোস্‌কা ছিল তর্‌তাজা তারুণ্যে ভরপুর সুশ্রী চেহারার, আর ভান্‌কার ছিল বোঁচা নাক আর দুষ্টুমিভরা সতেজ মুখ।

অগ্রবর্তী মিশ্র বাহিনীর ন-নম্বর ও সর্বশেষ সদস্য ছিল কোস্তিয়া ভেত্‌কোভ্‌স্কি। সেই-যে সে কলোনি ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তারপর তার ফেরত চলে আসার ব্যাপারটা ঘটে একেবারে আচম্বিতে, গদ্যময় আর অনাড়ম্বরভাবে। আমাদের কুরিয়াজ যাত্রার ঠিক তিন দিন আগে ও ফিরে এল কলোনিতে — আগের চেয়ে রোগা আর ফ্যাকাশে হয়ে, লজ্জিতভাবে। উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি না-করে ওকে গ্রহণ করল সবাই, আর লাপতই একমাত্র যে ওকে কিছুটা খোঁচা না-দিয়ে পারল না। বলল:

'তারপর, ককেশাসের সেই সাংঘাতিক জায়গাটায় গেছিলি নাকি — সেই-যে 'ঈশ্বর আমারে পার করি দ্যাও'-তে?'

ফিকে হাসি হাসল কোস্তিয়া। বলল:

'নাঃ! ওদিকি কোথাওই যাই নাই!'

'হায়, হায়!' লাপত বলল। 'তাইলে ওই নচ্ছার জিনিসটা শুধাশুধাই ওখেনে দাঁড়ায়ে রইল?'

কোস্তিয়ার দিকে চেয়ে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে চোখ টিপল ভোলখভ। বলল:

'তারপর, খুব ভালো-ভালো জিনিস খেয়ে পেট ভরাতেছিলি তো ওখেনে?'

কিছুমাত্র লজ্জা না-পেয়ে কোস্তিয়া জবাব দিল:

'তা ভরাত্যেছিলাম!'

'তা, এখন মিষ্টান্নের কোন পদ খেতি চাস?'

এবার জোরে হেসে উঠল কোস্তিয়া। বলল:

'আমি এখন দলপতি-পরিষদের সভার জন্যি অপেক্ষা করব্য। জানিস তো, মিষ্টি তৈয়ের করতি ওরা যেমন পোক্ত, তিতো খাবার তৈয়ের করতিও তেমনি!..'

এবার কড়া সুরে জবাব দিল ভোলখভ, 'তোর খাবার নিয়ি মাথা ঘামানোর সময় নাই আমাদের। তবে আমি তোরে একটা কথা কতি পারি — আলিওশা ভোল্‌কভের গোড়ালিতি একটা ফোস্কা পড়েছে। তুই ইচ্ছা করলি অগ্র-বাহিনীতি তার জায়গাটা নিতি পারিস। তা তুই কী বলিস এ-বিষয়ে, লাপত?'

'আমার তো মনে হয় তোর মতলবখান জবর।'

'কিন্তু পরিষদের মত লওয়ার দরকার পড়বে না?' শুধোল কোস্তিয়া।

'এখনকার মতন সামরিক আইন জারি করেছি আমরা — পরিষদের সভা বাদ দিয়েও এ-সব ব্যাপার ফয়সলা করতে পারি এখন।'

এইভাবে, তার নিজের এবং আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে, কোনোরকম সভার অনুষ্ঠান কিংবা 'মনস্তত্ত্ব' বিচার ছাড়াই অগ্রবর্তী মিশ্র বাহিনীতে ঢুকে গেল কোস্তিয়া। পরদিন থেকেই কলোনির পোশাকে ঘুরে বেড়াতে লাগল ও।

ইভান দেনিসভিচ কির্‌গিজভ নামে নতুন একজন শিক্ষককে আমরা সঙ্গে নিলুম। ইভান ইভানভিচ বিদায় নেয়ার পর তাঁর জায়গায় এ'কেই আমি কাজে নিয়েছিলুম। বলা যেতে পারে, পিরগোভ্‌কায় শিক্ষকতার কাজে আত্মবলি দেয়া থেকে ফুসলে নিয়ে এসেছিলুম তাঁকে। অনভ্যস্ত দর্শকের চোখ দিয়ে দেখলে ইভান দেনিসভিচকে অবশ্য সাধারণ একজন গ্রাম্য স্কুলমাস্টার বলে মনে হতে পারত, কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন সেই বীরচরিত্র আমাদের রুশ সাহিত্য যাঁকে এত দীর্ঘ দিন ধরে এত আয়াস করে খুঁজে বেড়িয়েছে। তাঁর বয়স হয়ে ছিল তিরিশ বছর, তিনি ছিলেন দয়ালু, প্রাজ্ঞ, ধীরস্থির এবং সর্বোপরি কঠিন পরিশ্রমী। রুশ উপন্যাসে অবশ্য এমন কোনো নায়ক কিংবা খলনায়ক চরিত্র নেই যে কিনা এই শেষোক্ত গুণটি নিয়ে গর্ব করতে পারে। এমন কোনো কাজই ছিল না ইভান দেনিসভিচ যা করতে পারতেন না। সব-সময়ে দেখা যেত কিছু-না-কিছু তিনি করছেনই, অথচ এমন অনায়াসে তা করতেন যে একটু দূর থেকে তা দেখলে মনে হোত তাঁর ওপর আরও একটা কাজের ভার চাপানো চলতে পারে। অবশ্য কাছে এসে ভালো করে দেখলে বোঝা যেত যে আর কোনো কাজের ভার চাপানো চলে না তাঁর ওপর, তবু সময়ে জিভের লাগাম কষতে না-পারার দরুন কখনও হয়তো অল্প-একটু লজ্জা পেয়ে তুত্‌লে-তুত্‌লে বলে ফেলতুম:

'ইভান দেনিসভিচ, এই — কী বলে — ফিজিক্স লেবরেটরির যন্ত্রপাতিও কিন্তু প্যাক করা লাগবে...'

এক্সারসাইজ খাতায়-বোঝাই একটা প্যাকিং-বাক্সের ওপর ঝুঁকে পড়ে তখন হয়তো কাজ করছিলেন ইভান দেনিসভিচ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে হেসে বলতেন:

'কী বললেন? ফিজিক্স লেবরেটরির যন্ত্রপাতি? ওহো, তাই তো — তা, ঠিক আছে! আরও ক'জন ছেলেকে কাজে লাগিয়ে ও-কাজটা সেরে ফেলব'খন...'

কথাটা শুনে একটু অপ্রস্তুত হয়ে আমি হয়তো সরে যেতুম। আর শুনতুম ইতিমধ্যেই আমার হৃদয়হীনতার কথা ভুলে ইভান দেনিসভিচ কাউকে ডেকে মিষ্টি করে বলছেন:

'খোকা, যাও তো, কয়েকটি ছেলেকে ডেকে আনো দেখি। এই তো, লক্ষ্মী ছেলে!'

এক সকালবেলায় খার্‌কভে গিয়ে পেঁছিলুম আমরা। স্টেশনে আমাদের নিতে এসেছিলেন জনশিক্ষা দপ্তরের ইন্‌স্পেক্টর ইউরিয়েভ। মে মাসের ঝলমলে সকালবেলা আর আমাদের অভিযাত্রীসুলভ মনোভাবের সঙ্গে তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখখানার চমৎকার সঙ্গতি ঘটেছিল। ইউরিয়েভ ছেলেদের সকলের কাঁধ চাপড়াতে-চাপড়াতে বলতে লাগলেন:

'ও, তাহলে এই হল গিয়ে সব গোর্কিপন্থী!.. বাঃ, চমৎকার!.. আরে, লিউবোভ সাভেলিয়েভ্‌নাও-যে এখানে হাজির দেখছি! বেশ, বেশ! তা, দেখুন, আমার একখানা গাড়ি আছে, খালাবুদাকে তুলে নিয়ে আমরা সোজা কুরিয়াজ চলে যেতে পারি। লিউবোভ সাভেলিয়েভ্‌না, আপনিও কি যেতে চান? বেশ তো, চলুন-না! ছেলেরা অবশ্য লোকাল ট্রেন ধরে রিজোভে যেতে পারে। আর রিজোভ থেকে জায়গাটা মোটেই দূর নয় — মাত্র দু' কিলোমিটার... মাঠ পেরিয়ে সোজাসুজি চলে যাওয়া যায়। তবে, মনে হয়... তোমাদের কিছু খাওয়া দরকার, তাই না? নাকি, কুরিয়াজ পেঁছে ওখানেই খাওয়াদাওয়া করা চলতে পারে?'

আমি কী বলি তাই শোনার জন্যে ছেলেরা একবার আমার দিকে, আরেকবার কৌতুকভরা চোখে তাকাতে লাগল ইউরিয়েভের দিকে। আসন্ন অ্যাড্‌ভেঞ্চারের প্রতীক্ষায় তারা সাংঘাতিক চন্‌মনে হয়ে ছিল, আর তাই খার্‌কভে দেখা-পাওয়া প্রথম কৌতূহলের বস্তু ইউরিয়েভের দিকে সাগ্রহে তাদের উত্তেজিত 'শুঁড়গুলো' বাড়িয়ে ছিল তারা।

আমি বললুম:

'আমাদের অগ্রবর্তী মিশ্র বাহিনী হচ্ছে গোর্কি কলোনির এক ধরনের ঝটিকা-বাহিনী। কথাটা বুঝেছেন? আমরা যদি গাড়িতে করে যাই, তাহলে ছেলেরাও গাড়িতে করে চলুক। দু'খানা গাড়ি যোগাড় করা সম্ভব নিশ্চয়ই?'

কথাটা শুনে আনন্দে ইউরিয়েভ প্রায় লাফিয়ে উঠলেন:

'চমৎকার! সত্যিই তো! সবকিছুই এরা... নিজেদের ধরনে করে থাকে!

দারুণ ব্যাপার, তাই-না! তা, দেখুন, আরেকখানা গাড়ি আমি না হয় জনশিক্ষা দপ্তরের খরচে ভাড়া করছি, তবে আমি নিজে কিন্তু এদের সঙ্গে — এই ছেলেদের সঙ্গে যাব তা বলে দিলাম!..'

'ঠিক আছে, তাই চলেন তাইলে,' হেসে দাঁত বের করে এবার ভোলখভ বললে।

'বেশ, বেশ!.. তাহলে চলা যাক!.. এস দেখি, দু'খানা মোটর ভাড়া করি!' ভোলখভ হুকুম দিল:

'তোস্‌কা, ওনার সাথে যা দেখি!'

'ঠিক হ্যয়!' স্যালুট ঠুকে চেঁচিয়ে উঠল তোস্‌কা। আর ওর দিকে আনন্দে ডগমগ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে ইউরিয়েভ হাতে হাত ঘষতে আর আনন্দে নাচতে লাগলেন।

'সত্যি, এমনটা দেখি নি কখনও!..' সবিস্ময়ে বার-দুয়েক কথাটা বললেন তিনি।

প্রায় দৌড়ে তিনি স্টেশনের বাইরের চত্বরের দিকে চললেন আর ফিরে-ফিরে তোস্‌কার দিকে তাকাতে লাগলেন। তোস্‌কা কিন্তু স্বভাবতই অগ্রবর্তী মিশ্র বাহিনীর সদস্য হিসেবে তার পদমর্যাদার কথা ভুলে স্টেশনে দৌড়োদৌড়ি করতে রাজি হল না।

ইউরিয়েভের ব্যাপারস্যাপার দেখে আমাদের ছেলেরা পরস্পর তাকাতাকি করতে লাগল। গোর্‌কভ্‌স্কি চুপিচুপি একবার জিজ্ঞাসাও করলে:

'কে উনি?.. ভারি মজার লোক তো!..'

এর একঘণ্টার মধ্যে আমাদের তিনখানা মোটর কুরিয়াজের টিলার চুড়োয় গিয়ে পেঁছে গেল আর একটা পুরনো গির্জের বিধ্বস্ত দেয়ালের পাশে এসে দাঁড়াল। ছেঁড়াখোঁড়া ঢোলা পাতলুনের ছেঁড়া অংশ মাটিতে লোটাতে-লোটাতে কয়েকটা কর্কশ, অপরিচ্ছন্ন মূর্তি ঢিলেঢালাভাবে আমাদের গাড়িগুলোর দিকে এগিয়ে এল। ছোকরা সেপাইদের মতো পাতলা ছিপছিপে, বিচারকদের মতো কঠোরমূর্তি গোর্কিপন্থীদের আবির্ভাবে তাদের মধ্যে-যে বিশেষ কোনো কৌতূহলের সঞ্চার হল তা কিন্তু মনে হল না।

জনা-দুই শিক্ষকও এগিয়ে এলেন। কিন্তু তাঁরা এমনভাবে পরস্পর চোখোচোখি করতে লাগলেন যে আমাদের প্রতি তাঁদের বিরূপ ভাবটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল।

'এদের এখন থাকতে দেয়া যায় কোথায়?' পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন তাঁরা। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আপনার জন্যে টিচার্স-রুমে একখান খাটের ব্যবস্থা করতে পারি, আর ছেলেরা কয়েকটা এজমালি শোবার ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে নিতে পারবে।'

'তাতে কিছু এসে-যাবে না! যে-কোনো জায়গায় আমরা মাথাগোঁজার একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারব। যাই হোক, আপনাদের ডিরেক্টর-সায়েব কোথায়?'

দেখা গেল, ডিরেক্টর কলোনিতে নেই, তিনি শহরে গেছেন। গ্রিজের ফোঁটাদাগে-ভরতি হালকা পাঁশুটেরঙের ট্রাউজার্স পরনে এক মান্যবর ব্যক্তি অবশ্য অসময়ে কাজ করতে হওয়ার এই অন্যায় ব্যবস্থাকে কিছুটা গাঁইগুঁই করে মেনে নিলেন ও আমাদের কলোনি ঘুরিয়ে দেখাতে রাজি হলেন। তবে আমার পক্ষে দেখার মতো নতুন কিছু ছিল না কলোনিতে, ইউরিয়েভও দর্শনীয় বস্তু দেখার জন্যে বিশেষ উদ্‌গ্রীব ছিলেন না। এছাড়া দ্‌জুরিন্‌স্কায়া মনমরাভাবে চুপচাপ হয়ে রইলেন সারাক্ষণ আর ছেলেরা সরকারি গাইডের তোয়াক্কা না-রেখে নিজেদের চোখে কলোনিটা একবার দেখে নেয়ার জন্যে ছুটে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়ল। ওদের পিছুপিছু ইভান দেনিসভিচও চললেন পায়ে-পায়ে।

এদিকে হাতের লাঠিগাছটা তুলে ধরে আকাশের নানা দিকে খোঁচা দেয়ার ভঙ্গিতে তাঁর নিজস্ব কিছু-কিছু সাংগঠনিক কীর্তিকলাপের ব্যাখ্যান দিতে লাগলেন খালাবুদা। তারপর কুরিয়াজের ঐশ্বর্যের নানা উপাদানের হিসেব দিতে শুরু করলেন। তবে তাদের সব ক'টিকে পরিণত করে নিলেন একটি সাধারণ গুণনীয়কে, আর সে গুণনীয়কটি হল জোয়ারে ফসল। অবশেষে ছেলেরা দৌড়ে ফিরে এল। দেখলুম তাদের মুখে হতভম্ব হওয়ার ভাব। কুদ্‌লাতির চোখের দৃষ্টি যেন বলতে চাইছিল: 'কী করে এই ঝঞ্ঝাটে নিজিরে জড়াইলেন আন্তন সেমিওনভিচ!'

হাতদুটো পকেটে পুরে রাগে জ্বলজ্বলে চোখ নিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে কেবলই পেছন দিকে তাকাচ্ছিল মিত্‌কা জেভেলি। তার বিতৃষ্ণাভরা এই ধরনধারণ দ্‌জুরিন্‌স্কায়ার চোখ এড়াল না। তিনি শুধোলেন:

'ব্যাপারটা তোমাদের পছন্দ হচ্ছে না, তাই-না ছেলেরা?'

মিত্‌কা জবাব দিল না। কিন্তু ভোলখভ হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠল। বলল:

'আজ হোক কাল হোক এখেনে একটা হাতাহাতি কাণ্ড ঘটবেই!'

'মানে? কী বলতে চাও তুমি?' ফ্যাকাশে মেরে গিয়ে লিউবোভ সাভেলিয়েভ্‌না প্রশ্ন করলেন।

'এই ছোঁড়াদেরে কব্জা করা লাগবে আমাদের,' ভোলখভ তার আগের কথাটার ব্যাখ্যা দিল। তারপর ঢোলা জ্যাকেট গায়ে অথচ খালি পা আর টুপিছাড়া খালি মাথা, ময়লারঙ পুঁচকে একটা বাচ্চা ছেলের জামার কলারটা দু'আঙুলে চেপে ধরে হঠাৎ তাকে টেনে এনে দাঁড় করাল দ্‌জুরিন্‌স্কায়ার সামনে। বলল:

'ওর কানদুটোর দিকি দ্যাখেন একবার!'

বাচ্চা ছেলেটা বশংবদের মতো ঘুরে দাঁড়াল। দেখলুম, কানদুটোর অবস্থা সত্যিই দেখবার মতো। সে-দুটো শুধুই-যে কালো হয়ে ছিল আর জীবনের ব্যবহারজীর্ণতার ফলে তাদের ওপর পুরু-হয়ে-জমা ময়লার স্তরটা চকচক করছিল তা-ই নয়, রক্তঝরা দগদগে ঘা, মামড়ি-পড়া পাঁচড়া আর চুলকনায় কানদুটোর বাহার আরও খোলতাই হয়েছিল।

'কানদুটোয় এসব কী হয়েছে তোমার?' শুধোলেন দ্‌জুরিন্‌স্কায়া।

শুনে অসহায়ভাবে হাসল বাচ্চাটা। তারপর একটা পা দিয়ে অপর পাটা ঘষতে শুরু করল। দেখা গেল, পাদুটোর অবস্থা ওর কানদুটোরই মতো।

ধরা গলায় অবশেষে জবাব দিল ছেলেটা, 'ওগুলান প্যাঁচড়া।'

'তোর ভয় হয় না যে প্যাঁচড়ায় তুই মরে যেতি পারিস?' তোস্‌কা জিজ্ঞাসা করল।

'ক্যানে? মরব্য ক্যানে? গুষ্টিসুদ্ধা ছেল্যার তো এমনধারা হয়্যেছে, কই কেউ তো মরে নাই!'

যে-কোনো কারণেই হোক কলোনি-বাসিন্দা ছেলেদের বড় একটা দেখা পাওয়া যাচ্ছিল না। কেবল অপরিচ্ছন্ন ক্লাবঘরটায়, থুথু-ছিটনো সিঁড়িতে আর নোংরা আবর্জনায়-ভরা পায়ে-চলা পথগুলোতে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিল এক-আধটা বিষণ্ন মূর্তি। অযত্নে ফেলে-রাখা, দুর্গন্ধওয়ালা এজমালি শোবার

ঘরগুলো — যেখানে মাছি-ভনভনে জানলাগুলোর কাচ ভেদ করে রোদ্দুর পর্যন্ত ঢোকার উপায় ছিল না — সেগুলোও খালি পড়ে ছিল।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'কলোনি-বাসিন্দারা সব গেল কোথায়?'

ডিউটিতে-রত শিক্ষকটি প্রশ্ন শুনে আমার দিক থেকে উদ্ধতভাবে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তারপর দাঁত চেপে বিড়বিড় করে বললেন:

'একেবারে অনাবশ্যক প্রশ্ন।'

চাঁদপানা গোল মুখওয়ালা বছর পনেরো বয়সের একটি ছেলে আমাদের পিছুপিছু আসছিল। তাকে শুধোলুম:

'আচ্ছা, খোকা, এখানে কেমন জীবন কাটছে তোমার?'

কুরিয়াজের সব ক'টি কচি মুখের মতো আ-ধোয়া কিন্তু বুদ্ধিমত্তায়-ভরা কচি মুখখানি আমার দিকে তুলল ছেলেটি। বলল:

'জেবন? এয়ারে কি জেবন কয়? কিন্তু সক্কলে বলত্যেছে যে অবস্তা নাকি শিগ্‌গিরই ভালো হবে — কথাটা সত্য?'

'কে বলছে একথা?'

'ছোঁড়ারা বলতিছে। ওয়ারা বলতিছে যে শিগ্‌গিরই সবকিছু ভেন্নরকম হবে, তবে অল্প এট্টু দোষ করলিই নাকি পিঠে বার্চের ডাল ভাঙা হবে।'

'বার্চের ডাল ভাঙা হবে? কিসের জন্যে?'

'ওয়ারা চোরেদের ধরি-ধরি পিটায়। তা, এখেনে তো হাজার গণ্ডা চোর আছে।'

'আচ্ছা, বল দেখি, তোমরা কেউ কখনও হাতমুখ ধোও না কেন?'

'ক্যামনে ধোব কন? কোত্থাও জল নাই-যে! বিজলি তৈরির যন্তরডা অকেজো হয়্যে পড়ি আছে আর তাই পাম্প করি জল তোলা যাতিছে না। তা বাদে আমাদের না আছে তোয়ালে, না আছে সাবান...'

'ওরা তোমাদের সাবান-তোয়ালে দেয় না?'

'আগি দিত... কিন্তু সব চুরি হয়ি যেত। সবকিছু এখেনে চুরি হয়ি যায়। এখন ভাঁড়ারেও আর কোনো সামগ্রী অবশিষ্ট নাই।'

'কেন? ব্যাপারটা কী?'

'এক রাত্তিরি ভাঁড়ারে চুরি হয়্যে গেল। তালা ভাঙ্যে সবকিছু নিয়ি গেল চোরে। ডিরেক্টার কয়্যেলেন সবারে গুলি চালায়্যে মারব্যেন...'

'তারপর?'

'তারপর আবার কী ... কিছুই করল্যেন না। যেই তিনি কয়্যেলেন 'গুলি চালাব্য!' অমনে ছোঁড়ারা কয়্যেল 'বেশ তো, চালান!' ব্বাস, আর তিনি কিছুই করল্যেন না, খালি মিলিশিয়ারে ডাকায়্যে পাঠাল্যেন...'

'তারপর? মিলিশিয়া এসে কী করল?'

'তা জানি না।'

'তা, তুমি ভাঁড়ার-ঘর থেকে কিছু নিলে না?'

'না, নিই নাই। একজোড়া পাতলুন অবিশ্যি নিতি চায়্যেলাম, কিন্তু আমার আগিই বড় ছোঁড়ারা সেখেনে হাজির হয়্যে গিয়্যেল। আমি যখন ভাঁড়ারি গেলাম, দেখলাম মেঝের উপর খালি গোড়া-দুই চাবি পড়্যে আছে।'

'এ ব্যাপারটা কবে ঘটল?'

'গত শীতে।'

'তাই বুঝি... তা, খোকা, তোমার নাম?'

'পিয়ত্‌র মালিকভ।'

কলোনির ইশ্‌কুল-বাড়িমুখো যাচ্ছিলুম আমরা। যেতে-যেতে ইউরিয়েভ চুপচাপ আমাদের কথাবার্তা শুনছিলেন। খালাবুদা আসছিলেন খানিকটা পেছনে। আমাদের গোর্কিপন্থী ছেলেরা তাঁকে ঘিরে ধরে আসছিল। মজাদার চরিত্রের লোক পেলে তাকে ছেঁকে ধরার আশ্চর্য প্রবণতা ছিল আমাদের এই ছেলেদের। লাল দাড়ির গোছা হাওয়ায় উড়িয়ে আর গাঁটওয়ালা মোটা লাঠিগাছা পেছনে মাটির ওপর দিয়ে টানতে-টানতে খালাবুদা তখন ছেলেদের কাছে ফসলের গপ্পো করছিলেন।

ইশ্‌কুল-বাড়িতে ঢুকলুম আমরা। বাড়িটা আগে ছিল মঠের সন্ন্যাসীদের আবাস, শিশু-সহায়তা কমিটি বাড়িটাকে ফের নতুন করে বানিয়ে নিয়েছিল। কলোনিতে এটাই ছিল একমাত্র দালান যেখানে কোনো এজমালি শোবার ঘর ছিল না। লম্বা একটা টানা বারান্দার দু'পাশে লম্বা, সরু-সরু ক্লাস-রুম — এই নিয়ে ছিল দালানটা। এই বাড়িটাকে কেন ইশকুল করা হয়েছিল তা জানি না। ঘরগুলো একমাত্র এজমালি শোবার ঘর হওয়া ছাড়া আর কোনো কাজে লাগার উপযুক্ত ছিল না।

পোস্টার আর দুর্বল-হাতে-আঁকা বাচ্চাদের ড্রইং-সাঁটা দেয়ালওয়ালা একটা ক্লাস-রুমকে 'পাইওনিয়র কর্নার' নাম দেয়া হয়েছিল। আমাদের দেখানো হল ঘরখানা। বোঝা গেল কলোনি-পরিদর্শকদের কমিশনগুলোকে দেখানো আর

রাজনৈতিক ঠাট বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই বিশেষ করে ঘরখানাকে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। কেননা, চাবি খংজে পাওয়া আর 'পাইওনিয়র কর্নার' খোলার জন্যে আমাদের বাইরে অপেক্ষাই করতে হল অন্তুতপক্ষে আধঘণ্টা।

ঘরে ঢুকে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে একখানা বেঞ্চিতে বসা গেল। ইতিমধ্যে আমার ছেলেদের উত্তেজনা কমে এসেছিল। আমার পেছন থেকে অন্যের কান বাঁচিয়ে সাবধানে ফিস্‌ফিস করে বলল ভিত্‌কা:

'আন্তন সেমিওনভিচ, আমরা কিন্তু এই ঘরে শবব। সকলে একসাথে। কেবল ওদের বিছানাপত্তর নেন না যেন! ওতে ছারপোকা কিলবিল করতেছে!.. ওঃ, যদি দেখতেন, কী সাংঘাতিক ছারপোকা!'

ভিত্‌কারও পেছন থেকে আমার দিকে মখ বাড়িয়ে জেভেলি বলল: 'এখেনকার কিছ-কিছ ছোঁড়ারে তো ভালোই বোধ হল। কিন্তু ওরা ম্যাস্টারদের উপর যা হাড়ে চটা-না, কী বলব! আপনে ওদের দিয়ি কিছতি কাজ করাতি পারবেন না যদি-না...'

'যদি-না কী?'

'যদি-না আপনে ধমকাধমকি করেন।'

কলোনি-হস্তান্তরের হকুমনামাটা নিয়ে অপরপক্ষের সঙ্গে আমাদের আলোচনা করার ছিল। শহর থেকে গাড়ি হাঁকিয়ে ইতিমধ্যে ডিরেক্টর-সায়েব এসে গিয়েছিলেন। তাঁর নিষ্প্রভ বিবর্ণ মখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল: এ-রকম একটি তুচ্ছ প্রাণীর ন্যায়-অন্যায় বিচার করে কোনো লাভ নেই। ডিরেক্টরের মহা-দায়িত্বপর্ণ পদে এমন এক হতভাগাকে বসিয়েছিলই-বা কে?

গোড়া থেকেই ডিরেক্টর-সায়েব আগবাড়া হয়ে হম্বিতম্বি শরর করে দিলেন। তিনি বলার চেষ্টা করলেন যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কলোনির হস্তান্তর সমাধা হয়ে যাওয়া দরকার, কেননা ইতিমধ্যে অঘটন যদি কিছ ঘটে তিনি তার দায়িত্ব নিতে পারবেন না।

ইউরিয়েভ শধোলেন:

'আপনি দায়িত্ব নিতে পারবেন না — একথার মানে কী?'

'এর সরল মানে এই যে ছেলেরা সাংঘাতিক খেপে আছে। যে-কোনোরকম মারাত্মক কাণ্ডকারখানা ঘটে যেতে পারে। ছেলেদের হাতে বন্দক-পিস্তল আছে, বঝেছেন?'

'কিন্তু ওরা সাংঘাতিক খেপেই-বা আছে কেন? আপনিই ওদের খেপিয়ে দেন নি তো?'

'আমি খেপিয়ে দিইচি? বলচেন কী? হাওয়া কোনদিকে বইচে তা ওরা নিজেরাই টের পাচ্চে না ভাবেন? মনে করচেন, ওরা কিছুই বোঝে না, না? ওরা স — ব টের পায়!'

'যেমন? একটা উদাহরণ দিন।'

'ওদের কপালে যে কী নাচচে তা ওরা জানে,' খুবই ইঙ্গিতপূর্ণভাবে কথাগুলো বললেন ডিরেক্টর। তারপর আরও ইঙ্গিতপূর্ণভাবে জানলার দিকে তাকালেন, যেন দেখাতে চাইলেন আমাদের উপস্থিতিই কলোনি-বাসিন্দাদের পক্ষে অমঙ্গলের কারণ।

ওঁর ভাবভঙ্গি দেখে আমার কানে-কানে ফিস্‌ফিস করে বলল ভিত্‌কা:

'কী জঘন্য! একবারে জানোয়ার লোকটা!..'

বললুম, 'ভিত্‌কা, চুপ!' তারপর ডিরেক্টরকে বললুম: 'দেখুন, মারাত্মক কাণ্ডকারখানা যা-ই ঘটবে তার জন্যে কিন্তু আপনিই দায়ী থাকবেন, তা সে কলোনি হস্তান্তরের আগে কিংবা পরে যখনই ঘটুক-না কেন। আমার মনে হয় এক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক ব্যাপারস্যাপার যত তাড়াতাড়ি চুকে যায় ততই ভালো।'

ঠিক হল, পরদিন বেলা দুটোর সময় আনুষ্ঠানিকভাবে কলোনি হস্তান্তর করা হবে। কলোনির গোটা পরিচালন-কর্তৃপক্ষকে বরখাস্ত করা হল বলে ঘোষণা করা হল। এ'দের মধ্যে শিক্ষকই ছিলেন চল্লিশ জন। তাঁদের সকলকে বলা হল সামনের তিন দিনের মধ্যে যার-যার ঘর ছেড়ে দিতে। ব্যক্তিগত আসবাব ও অন্যান্য জিনিসপত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আরও পাঁচ দিন বেশি সময় দেয়া গেল।

ডিরেক্টর শুধোলেন, 'আপনাদের সরবরাহ-ম্যানেজার আসচেন কখন?'

'আমাদের কোনো সরবরাহ-ম্যানেজার নেই। ভাঁড়ারের জিনিসপত্র বুঝে নেয়ার জন্যে আমার একজন ছাত্রের ওপর ভার দেব।'

মেজাজ দেখিয়ে ডিরেক্টর জবাব দিলেন, 'কোনো ছাত্রের হাতে আমি কিছু ছেড়ে দিতে রাজি নই।'

ওঁর এই অর্থহীন একগুঁয়েমি দেখে আমার মেজাজ কেমন বিগড়ে গেল। আশ্চর্য লোক তো, ওঁর আছেই-বা কী যা উনি ছেড়ে দেবেন।

বললন্ম, 'আন্‌ষ্ঠানিকভাবে জিনিসপত্রের ফর্দ তৈরি করা হোক চাই নাই হোক তাতে আমার কিছ্ম যায়-আসে না। আমি যা চাই তা হল এই যে এখন থেকে ঠিক তিন দিন পরে আপনাদের একজনেরও যেন এখানে মন্থ দেখতে না হয়। এই হল গিয়ে আমার সাফ কথা!'

'বটে! আপনি ভয় পাচ্চেন যে আমরা আপনার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে পারি?'

'ঠিক! ঠিক বলেছেন!'

কথাটায় অপমানিত বোধ করে লাফিয়ে উঠে ডিরেক্টর দ্রন্ত পা চালিয়ে দরজার দিকে চললেন। ডিউটিরত শিক্ষকটিও পিছ্ম নিলেন ওঁর। হঠাৎ দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়িয়ে শেষ বাক্যবাণটি নিক্ষেপ করে গেলেন ডিরেক্টর:

'বাধা দেয়ার কাজটা আমাদের করতে হবে না — অন্যেরাই তা করবে, বন্ঝলেন!'

ছেলেরা হেসে উঠল, দ্‌জ্‌রিন্‌স্কায়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, আর অপ্রস্তুত ভাবটা চাপা দিতে জানলার তাকে কী একটা বস্তু যেন মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলেন ইউরিয়েভ। একমাত্র খালাবন্দার মধ্যেই কোনো বিকার লক্ষ্য করা গেল না, দেয়ালে-ঝোলানো পোস্টারগন্লো একমনে পড়তে থাকলেন তিনি।

ইউরিয়েভ বললেন, 'আমাদের এবার যেতে হয়। কাল ফের আবার আসব, তাই না লিউবোভ সাভেলিয়েভ্‌না?'

শন্নে করন্ণভাবে আমার দিকে তাকালেন দ্‌জ্‌রিন্‌স্কায়া।

ওঁকে মিনতি করে বললন্ম, 'দয়া করে আসবেন না!'

'কেন আসব না?'

'এসে লাভ কী বলন্ন? আমাকে তো কোনো সাহায্য দিতে পারবেন না, ফলে কথা বলে অযথা সময় নষ্ট করে লাভ কী?'

একটু যেন ক্ষন্ব্ধ হয়ে ইউরিয়েভ বিদায় নিলেন। আন্তরিকভাবে করমর্দন করে ছেলেদের আর আমার কাছ থেকে বিদায় নিলেন লিউবোভ সাভেলিয়েভ্‌না। বললেন:

'আপনারা ভয় পান নি? সত্যি?'

শহরমন্খো চলে গেলেন ওঁরা।

আমরা সবাই উঠোনে বেরিয়ে এলন্ম। মনে হল কলোনিতে দন্পন্রের খাওয়া শন্রন্ হয়েছে, কেননা দেখা গেল রান্নাঘর থেকে এজমালি শোবার

ঘরগুলোয় পাত্রে করে বর্শ্চ স্যুপ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কোস্তিয়া ভেত্‌কোভ্‌স্কি আমার জামার হাতায় টান দিয়ে হেসে ইঙ্গিতে দেখাল: দেখলুম স্যসপ্যান বয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে দুটো ছেলেকে আমাদের মিত্‌কা আর ভিত্‌কা ধরেছে।

শুনি মিত্‌কা তখন ধমক দিয়ে বলছে, 'অমনভাবে কাজ করতি হয় নাকি? আচ্ছা মজার ছোঁড়া তো তোরা! এর থেকে ভালোভাবে কাজ করতি শিখিস নাই? বুনো লোক নাকি তোরা, অ্যাঁ?..'

ব্যাপারটা যে কী ঘটছে প্রথমটায় ধরতে পারি নি। শুধু দেখি কী, কোস্তিয়া কুরিয়াজের রুটি-বওয়া ছেলেদের একজনের জামার হাতা চেপে ধরে হাতখানা টেনে তুলে ফেলেছে। ছেলেটার অন্য হাতের নিচে চাপা রয়েছে আস্ত একখানা পাউরুটি আর সেই রুটির বেশির ভাগটাই ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে ঝরে-ঝরে পড়ছে। ছেলেটা দারুণ লজ্জা পেয়ে গেছে আর কোস্তিয়া জামার হাতা ধরে তাকে ঝাঁকুনি দিয়েই চলেছে। দেখা গেল তার জামার গোটা হাতাটাই বর্শ্চের ঝোলে ভিজে টুপটুপ করছে আর জামার কনুই পর্যন্ত বাঁধাকপি আর বীটের টুকরোয় মাখামাখি হয়ে আছে।

'আরে, দ্যাখো দ্যাখো!' বলতে-বলতে হাসির চোটে কোস্তিয়ার দম-আটকানোর যোগাড়। ছেলেটাকে হাতের মুঠোয় এক-টুকরো মাংস চেপে ধরে থাকতে দেখে আমরা বাকি সকলেও হাসি সামলাতে পারলুম না।

'আর ওই ছেলেটা?'

'ওটারও একই অবস্থা!' হাসতে-হাসতে কোনোরকমে বলল মিত্‌কা। 'বর্শ্চ নিয়ি এজমালি ঘরে যাবার পথে ওরা ঝোল থেকে মাংসের টুকরা তুলি নেয়... আরে গন্দভ, তোর লজ্জা হওয়া উচিত! অন্তত জামার হাতাটা গুটায়ে নে! তা না!'

কোস্তিয়া বলল, 'ওঃ! ভাবতেছি কেমনে না জানি আমাদের দিন কাটবে এখেনে, আন্তন সেমিওনভিচ!'

দেখতে-দেখতে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ল আমার ছেলেরা। মে-মাসের মিষ্টি দিনটা হেলে দাঁড়াল মঠের পাহাড়ের চুড়োয়, পাহাড়টা কিন্তু তবু পালটা হাসল না। আমার মনে হল যেন একটা স্বচ্ছ অনুভূমিক পর্দা দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাকে দুটো গোলার্ধে ভাগ করে ফেলা হয়েছে। তার ওপরের গোলার্ধটা হল আশ্‌মানি রঙের ঔজ্জ্বল্য, সুরভিত বাতাস, সূর্যালোক,

পাখির উড়াল আর উ'চু-উ'চু ছোট-ছোট শান্ত মেঘে-ভরা আকাশ। আর দূরে যেখানে আকাশটা নেমে এসেছে মাটিতে সেখানে একেবারে আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গুচ্ছ-গুচ্ছ কুঁড়েঘর, চিত্তাকর্ষক বনভূমি আর আঁকাবাঁকা একটা নদীর ফুরফুরে ফিতেটি। কালো, সবুজ আর মরচে-লাল মাঠগুলো সূর্যের আলোয় এমন পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো যে মনে হচ্ছে তারা যেন উৎসব উদ্‌যাপনের জন্যে তৈরি হয়ে আছে। এটা ভালো না মন্দের লক্ষণ তা ঈশ্বরই জানেন, তবু এই সহজ সুন্দর নিসর্গদৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভারি ভালো লাগছিল আমার, ইচ্ছে হচ্ছিল এই নির্মল মে-দিনের একটা অংশ হয়ে যাই আমিও। অথচ আমারই পায়ের নিচে ছিল ঘাম, ধূপ আর ছারপোকার মিশ্র দুর্গন্ধে-ভরা বেওয়ারিশ অনাথ জীবনের নোংরা আবর্জনা-উথলানো কুরিয়াজের কলুষিত মাটি আর প্রাচীন প্রাকার। না-না, এটাকে পৃথিবী বলা চলে না, এটা ছিল অন্য কিছু, কারও মনে-মনে গড়া দুঃস্বপ্নের জগৎ!

কলোনিতে ইতিউতি ঘুরে বেড়ানোর সময়ে কেউ আমার কাছে ঘে'ষল না, তবে মনে হল এতক্ষণে যেন কলোনি-বাসিন্দার সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে। আর তারা আমাকে দূর থেকে লক্ষ্য করছে। এজমালি শোবার ঘরগুলোয় ঢুকলুম আমি। কত-যে শোবার ঘর তার যেন সীমা-সংখ্যা গুনে পারছিলুম না। এমন একটাও জায়গা খুঁজে পেলুম না, অসংখ্য কুঁড়ের মধ্যে এমন একটাও কুঁড়েঘর, দালান কিংবা দালানের সংযোজিত অংশ, যেখানে একটা-না-একটা এজমালি শোবার ঘর নেই। ইতিমধ্যে অগুন্তি কলোনি-বাসিন্দা এসে জুটে গিয়েছিল এজমালি শোবার ঘরগুলোয়। ঘরের মধ্যে যত্রতত্র বসে ছিল তারা — জড়-করা কম্বলের স্তূপের ওপর, কিংবা খালি তক্তা আর খাটের লোহার কাঠামোগুলোর ওপর। ছে'ড়াখোঁড়া পাতলুনের দুই হাঁটুর ফাঁকে হাতদুটো গুঁজে বসে-বসে দুপুরের খানা হজম করছিল ছেলেরা। এছাড়া কেউ-কেউ জামাকাপড় থেকে ছারপোকা মারছিল, তাস-খেলুড়েরা ঘরের কোণে-কোণে জটলা পাকিয়ে বসে ছিল, আর আরেক দল ছেলে ঝুলকালি-মাখা স্যাসপ্যানগুলো থেকে তখনও ঠাণ্ডা বর্‌শ্চ স্যুপ খেয়ে চলেছিল। ঘরে ঢুকতে আমার দিকে ফিরেও তাকাল না কেউ, ওদের জগতে আমার কোনো অস্তিত্বই ছিল না।

একখানা এজমালি ঘরে ঢুকতে এমন একদল ছেলের দেখা পেলুম যারা 'নিভা'* পত্রিকার একখানা পুরনো সংখ্যা থেকে ছবি দেখছিল। ব্যাপারটা দেখে অবাক লাগল।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'আচ্ছা ছেলেরা, বল তো, মাথার বালিশগুলো গেল কোথায় তোমাদের?'

প্রশ্ন শুনে সব ক'টা মুখ আমার দিকে ফিরল। চোখা নাকওয়ালা একটি ছেলে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের ছোঁয়াচ-লাগা তার মুখখানা পুরোপুরি আমার দিকে মেলে ধরল:

'বালিশ? আপনে নিচ্চয় কমরেড মাকারেঙ্কো আন্তন সেমিওনভিচ! তাই না?'

'হ্যাঁ, আমিই সেই।'

'আপনে ঘুরি বেড়াত্যেছেন, সবকিছু দেখতিছেন? কেমন?'

'হ্যাঁ, তাই-ই করছি বটে।'

'আসচে কাল বেলা দুডার সময়...'

বাধা দিয়ে বললুম, 'হ্যাঁ, আসচে কাল বেলা দুটোর সময়। ...কিন্তু তুমি এখনও আমার প্রশ্নের উত্তর দাও নি — তোমাদের বালিশগুলো গেল কোথায়?'

'আপনেরে বলতি লাগবে, তাই না? বলব্য?'

মিষ্টি করে আমার দিকে ইঙ্গিত করে ঘাড় নাড়ল ছেলেটি, তারপর তাপ্পিমারা নোংরা গদির ওপর আমার বসার মতো একটা জায়গা করে দিল। বসলুম।

তারপর শুধোলুম, 'নাম কী তোমার?'

'ভানিয়া জাইচেঙ্কো।'

'লিখতে পড়তে পার?'

'গত বছর আমি চার কেলাসে পড়ত্যেছেলাম। কিন্তু এবার শীতকালে — আপনে হয়তো জানেন — কোনো কেলাসই বসে নাই।'

'ভালো কথা... তা, তোমাদের বালিশ আর বিছানার চাদরগুলো গেল কোথায়?'

* 'নিভা' — প্রাক-বিপ্লব যুগের একখানা সচিত্র পত্রিকা। — অনুঃ

রসিকতার ঝোঁকে কটা চোখদুটোকে ঝলমলিয়ে তুলে ভানিয়া দ্রুত এক-নজর সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে নিল, তারপর টেবলের ওপর জুত করে উঠে বসল। ওর ছেঁড়াখোঁড়া রঙচটা একপাটি বুটজুতো আমার হাঁটুটা ঠেসে ধরল। অন্য ছেলেরাও বিছানার পাশে এসে ভিড় জমাল এবার। তাদের মধ্যে হঠাৎ চাঁদপানা গোল মুখওয়ালা মালিকভকে চোখে পড়ে গেল। বললুম:

'আরে, তুমিও যে এখানে দেখছি!'

'হুঁ-হুঁ... এয়াই তো আমাদের দল! এডা হল্য গে তিম্‌কা অদারিউক, আর ওডা ইলিয়া... ইলিয়া ফোনারেঙ্কো!'

লালচুলো, ছিটে দাগে-ভরা মুখওয়ালা তিম্‌কার চোখে পাতার বংশ ছিল না আর হাসিতে ছিল না মালিন্যের চিহ্ন। অপরদিকে ইলিয়ার মুখখানা ছিল চওড়া গোলগাল, ফ্যাকাশে আর ব্রণয়-ভরা, তবে তার মুখের মধ্যে আসল বস্তু ছিল চোখদুটো — হালকা বাদামিরঙের, দৃঢ় সুগঠিত পাতাওয়ালা একজোড়া চোখ। সঙ্গীদের মাথার ওপর দিয়ে তাকিয়ে প্রায়-খালি এজমালি ঘরখানা এক-নজর দেখে নিয়ে চাপা গলায় ষড়্‌যন্ত্রীর ভঙ্গিতে এবার বলতে শুরু করল ভানিয়া জাইচেঙ্কো:

'বালিশগুলান কনে গেল জানতি চান, তাই না? তা, আমি আপনেরে সরাসরি বলতি পারি — বালিশ বিলকুল হাওয়া হয়ি গ্যাছে। ব্যস, ফুরায়্যে গেল!'

হাতদুটো দু'পাশে ছুড়ে আর আঙুলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে হঠাৎ রিন্‌রিনে গলায় খিল্‌খিল করে হেসে উঠল ভানিয়া। দেখাদেখি অন্যরাও উঠল হেসে।

জাইচেঙ্কো ফের বলল, 'আমরা সবাই এখেনে ভারি হাসিখুশি, কারণ এখেনে সর্বকিছুই ভারি মজাদার! এখন বালিশপত্তর কিছু নাই দেখতিছেন তো?.. কিন্তু আগি বালিশ ছেল, আর তারপর... দুই ফুঁয়ে উড়ি গেল সর্বকিছু — আর এখন বালিশের বংশ নাই!..'

বলতে-বলতে ফের হেসে উঠল ও।

'লালচুলো একদিন রাত্তিরে বালিশ মাথায় দে বিছানায় শুয়্যেল, আর পরদিন প্রাতঃকালে ঘুম থেক্যে উঠি দ্যাখে কী, বালিশ হাওয়া হয়ি গেছে... ফুস্‌মন্তর পড়্যেছে... আর বালিশ গেছে হাওয়া হয়ি!..'

কথাটা বলে খুশিতে ডগমগ সরু-সরু চেরা চোখের ফাঁক দিয়ে অদারিউকের দিকে তাকাল জাইচেঙ্কো। হাসতে-হাসতে পেছনে হেলে পড়ায় পা দিয়ে আমার হাঁটুটা আরও জোরে পিষে দিল ও।

'আপনে হয়তো বলবেন, আমরা বালিশ চাইলি তার হিসাব-পত্তর সবকিছু তো কাগজে-কলমে লেখ্যে রাখা হবে। তাই না, আন্তন সেমিওনভিচ? সবকিছু গোনাগাঁথা থাকব্যে আর লেখা থাকব্যে, তাই না? যখন বালিশ দেয়া হবে, তখন কারে দেয়া হতিছে তার নাড়ি-নক্ষত্তর সবকিছু। এখেনে কিন্তু বালিশ দূরস্থান, মানুষিরই হিসাব রাখে না কোনো শম্মা! কেউ না!.. কেউই ছেল্যাপিলাদের মাথা গুন্‌তি করে না... কেউ না!..'

'তা কী করে সম্ভব?'

'খুবই সম্ভব, খুবই সোজা ব্যাপারডা! এখেনকার কাণ্ডমাণ্ড ওই রকমই! ইলিয়া ফোনারেঙ্কো যে এখেনে থাকতিছে — আপনে কি মনে করেন কেউ তা লেখ্যে রাখিছে? মোট্টেও না! কেউ অর পাত্তাই রাখে না! আমার কথাও কেউ জানে নাকি মনে ভাব্যেছেন? আর এমনধারা বহুত্‌ ছেল্যাপিলা আছে এখেনে — খুশিমতন অরা এখেনে থাকে, তারপর আর কনে চলি যায় আর সেখেনে গিয়ি থাকে, ফের আবার ফিরি আসে এখেনে। আপনে কি ভাবতিছেন যে তিম্‌কারে এখেনে কেউ পাঠায়্যেছেল? মোট্টেও না! নিজি-নিজিই একদিন আস্যে এখেনে থাকতি শুরু কর্যে দিয়্যেল ও।'

'তাহলে এ-জায়গাটা ভালো লেগেছে ওর?'

'মোট্টেও না! ও এখেনে এস্যেছে দু-হপ্তা আগি। বগদুখভ কলোনি থেক্যে পলায়্যে চলি এস্যেছে। ও গোর্কি কলোনিতি যাতি চেয়্যেল।'

'গোর্কি কলোনির কথা বগদুখভে কেউ জানে?'

'জানে না আবার? সক্কলে জানে! নিচ্চয় জানে!'

'তাহলে ও একা এখানে পালিয়ে এল কেন?'

'বোঝলেন না, সকলের রুচি তো এক-রকম না। কিছু ছোঁড়া আছে যারা কড়া শাসন পছন্দ করে না। সকলে কয় আপনের কলোনিতি নাকি নিয়মকানুন সাংঘাতিক কড়া — শিঙ্গা বাজলিই ছোঁড়াদের দৌড়ায়্যে আসতি হয় — এয়ার পরই ছোঁড়াদের দফারফা! এক-দুই, এক-দুই — শুরু হয়ি যায়! বোঝলেন ব্যাপারখান? আর তারপর — কাজ যা করতি লাগে সে আর কহতব্য নয়! তা, কিছু ছোঁড়া আছে যারা এসব কিছুই করতি চায় না...'

'অরা পলায়্যে যাবে,' ফোড়ন কাটল মালিকভ।

'কারা? কুরিয়াজের ছেলেরা?'

'হুঁ-হুঁ। অরা নিঘ্‌ঘাত পলায়্যে যাবে। যত শিঘ্রি পারে পলাব্যে। অরা কাঁতিছিল: 'হুঁ-হুঁ বাবা, মাকারেঙ্কোরে তো চেনো না! কিন্তু হেয় শুধা পুরস্কার পাবে আর আমরা খাট্যে মরব ক্যানে?..' অরা সক্কলে পলায়্যে যাবে।'

'কোথায় পালাবে?'

'অনেক জায়গা আছে পলানোর। জায়গার অভাব আছে নাকি! যে-কোনো কলোনিতি খুশি হল্যে চল্যে যাওয়া যায়।'

'তা, তোমরা কী করবে?'

খুশিখুশি গলায় জাইচেঙ্কো তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'এইডা হল্য গে আমাদের ঝাঁক, বোঝলেন? আমাদের ঝাঁকে আছে চারট্যে ছোঁড়া। আর বোঝলেন তো, আমরা চুরি-চামারি করি না। চুরি-টুরি পছন্দ করি না আমরা। এই হল্য গে ব্যাপার! তবে তিম্‌কা — না, নিজির জন্যি ও-ও কিছু নেয় না, নিলি নেয় দলের জন্যি...'

বিছানায় বসে লাল হয়ে উঠল তিম্‌কা। তারপর আধবোজা চোখের ফাঁক দিয়ে বিনীতভাবে ভালোমানুষের মতো আমার দিকে তাকাতে চেষ্টা করল।

বললুম, 'আচ্ছা, ঝাঁক, তাহলে বিদায় নিচ্ছি! আমাদের মধ্যে বনিবনা ঠিকই হবে বলে মনে হচ্ছে!'

হাসিমুখে ওরা সবাই বলে উঠল, 'বিদায়!'

এজমালি শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ফের ঘুরতে লাগলুম। তাহলে দেখা যাচ্ছে ইতিমধ্যেই আমার দলে চারজন এসে গেছে! কিন্তু এখনও বাকি রয়ে গেছে দু'শো ছিয়াত্তর জন, কিংবা হয়তো তার চেয়েও বেশি। জাইচেঙ্কো যে ঠিক কথা বলেছে এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই — কলোনিতে এমন বহু লোক আছে, যাদের না-আছে কোনো হিসেব না-আছে খাতায় তাদের নাম লেখা। হিসেবের বাইরে এই ভয়ঙ্কর অনামা সংখ্যার কথা ভেবে আমি হঠাৎ কেমন আতঙ্কিত হয়ে উঠলুম। ভাবলুম, এই সাংঘাতিক বিপর্যয়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো এমন গোঁয়ার্তুমি আমাকে পেয়ে বসল কী করে? শুধু আমার নিজের সাফল্যেরই নয়, গোটা একটা যৌথ সংস্থার জীবন বিপন্ন করার মতো ঝুকিই-বা নিলুম কী করে? দু'শো আশি — এই সংখ্যাটা যতক্ষণ

কাগজের ওপর কালির অক্ষরে তিন সংখ্যার একটা অঙ্ক হয়ে চোখের সামনে ছিল মাত্র, ততক্ষণ নিজের কাছে নিজের শক্তিকে মনে হয়েছিল অজেয়, কিন্তু ওইদিন সেই দু'শো আশি জন যখন আমার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বাহিনীটাকে চারপাশ থেকে নোংরা একটা শিবিরের ফাঁদে ফেলে ছেঁকে ধরেছিল তখন আতঙ্কে আমার পেটটা কেমন যেন গুলিয়ে উঠতে লাগল আর এক বিসদৃশ ভয়াবহ দুর্বলতায় যেন ভেঙে পড়তে চাইল হাঁটুদুটো।

উঠোনের মাঝখান থেকে তিন জনকে আমার দিকে আসতে দেখলুম। মনে হল ওদের বয়স বছর সতেরোর মতো হবে। ওদের মাথার চুল এমন কি আঁচড়ানো পর্যন্ত ছিল, পায়ে ছিল ভালো বুটজুতো। একজনের পরনে ছিল মোটামুটি নতুন বাদামিরঙের জ্যাকেট, অবশ্য তার তলা থেকে কোঁচকানো, ঝোলের দাগওয়ালা শার্টটা দেখা যাচ্ছিল। অপর একজনের পরনে ছিল চামড়ার একটা কোট, আর তৃতীয় জন পরে ছিল পরিষ্কার শাদা শার্ট। বাদামি জ্যাকেট-গায়ে ছেলেটা হাতদুটো ট্রাউজার্সের দুই পকেটে ঢুকিয়ে, মাথাটা একপাশে হেলিয়ে হঠাৎ একেবারে আমার মুখের ওপর ওদেসার চটুল রাস্তার গানের একটা কলি শিস দিয়ে গেয়ে উঠল। একসার চমৎকার শাদা দাঁত ঝিকিয়ে উঠল দেখলুম। আরও লক্ষ্য করলুম, ছেলেটার চোখদুটো বড়-বড় আর নিষ্প্রভ, আর ভুরুদুটো লালচে রঙের আর ঝাঁপালো। অপর দুজন দাঁড়িয়ে ছিল প্রথম ছেলেটার পাশে। পরস্পর গলা-জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল তারা আর ঘনঘন জিভ নাড়িয়ে সিগারেটটাকে মুখের এপাশ থেকে ওপাশে চালাচালি করছিল। আরও কয়েক জন কুরিয়াজ-বাসিন্দাকে আমাদের দিকে আসতে দেখা গেল।

লালচুলো ছোকরাটি একচোখ কুঁচকে সজোরে বলে উঠল:

'অ! আপনেই মাকারেঙ্কো, কেমন?'

ওর সামনে দাঁড়ালুম। তারপর মুখে যাতে কোনোরকম মনোভাব প্রকাশ না পায় তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে-করতে শান্তভাবে জবাব দিলুম:

'হ্যাঁ, আমার ওই নাম। তোমার?'

জবাব না-দিয়ে লালচুলো আবার একবার শিস দিয়ে উঠল। তারপর একপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে চোখ ছোট-ছোট করে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে কাঁধদুটো উঁচু করে তুলে শিস দিতে-দিতে লম্বা-লম্বা পা ফেলে আর হাতদুটো যেন কী খুঁজছে এমন ভঙ্গিতে

পকেটে পুরে চলে গেল ছেলেটা। ওর সঙ্গী দুজনও গলা-জড়াজড়ি করে হাঁটতে-হাঁটতে চলে গেল পিছুপিছু। আর যেতে-যেতে গান ধরল বাজখাঁই গলায়:

অ ছেল্যা, অ ছেল্যা রে —
ফুর্তিতে জান ঢেল্যা দে...

যে-দলটা এসে আমাদের চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, তারা তখনও দেখছিল আমাকে। হঠাৎ একটা চাপাগলার মন্তব্য কানে এল:

'আমাদের নুতন ডিরেক্টার...'

একই রকম চাপাগলায় আরও একটা মন্তব্য শুনলুম:

'তাইতে শালার কী আস্যে-গেল?'

'কোথা থেকে আপনে শুরু করতি চান, কমরেড মাকারেঙ্কো?'

প্রশ্ন শুনে ফিরে তাকালুম। দেখলুম, কালোচোখো একটি তরুণী মেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। এমন একটা জায়গায় তুষার-শাদা ব্লাউজ আর কড়া কালো টাই দেখতে পাব আশা করি নি। দেখে অবাক হলুম।

মেয়েটি বলল, 'আমার নাম গুলিয়ায়েভা।'

নাম শুনে মনে পড়ল মেয়েটির কথা আগেই শুনেছিলুম। মেয়েটি ছিল দর্জিখানার শিক্ষিকা। কুরিয়াজে একমাত্র পার্টি-সদস্য। ওকে দেখেও আনন্দ হল। সবে মোটা হতে শুরু করলেও মেয়েটির কোমর তখনও বেশ সরু ছিল, আর মাথায় ছিল চকচকে কালো ঢেউ-খেলানো চুল। অনপচিত আত্মিক শক্তির সৌগন্ধ্য যেন ঘিরে ছিল মেয়েটিকে। খুশির সুরে বললুম:

'বেশ তো, দুজনে মিলেই শুরু করা যাক।'

'না-না, আমি বিশেষ কোনো কাজে লাগব না! কী করে কী করতি হয় তাই-ই জানি না!'

'আমি শিখিয়ে নেব তোমাকে।'

'তাহলে ঠিক আছে!.. মেয়েদের কাছে নিয়ি যাব বলি আপনেরে ডাকতি এসেছিলাম। এখনও আপনে আমাদের ঘরে আসেন নাই। মেয়েরা আপনের জন্যি অপেক্ষা করতিছে... আপনেরে দেখার জন্যি ওরা ব্যস্ত হয়ি উঠেছে। সত্যি! ওদের নিয়ি আমার এট্টু গর্ব আছে — এখেনকার মেয়েরা আমার তত্ত্বাবধানে থেকেছে বরাবর, ওদের মধ্যি এমন কি তিনজনা কম্‌সমোল-সদস্য পর্যন্ত আছে। আসেন, তাইলে!'

কলোনির কেন্দ্রবর্তী দোতলা দালানটার দিকে হে'টে চললুম আমরা।

যেতে-যেতে গ্নলিয়ায়েভা বলল, 'গোটা পরিচালক দলের বরখাস্ত দাবি করে আপনে খ্নব ভালো কাজ করেছেন। সবাইরে এখন প্নটলি-পোঁটলা সহ ফিরত পাঠায়ে দেন, পেত্যেকটি লোকরে, কাউরে ছাড়ান দিবেন না!.. আমারেও ফিরত পাঠায়ে দেন।'

'না-না, তোমার সম্বন্ধে আমরা ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা করে ফেলেছি! তোমার সাহায্যের ওপর আমার ভরসা আছে।'

'কিন্তু ভালো করি ভাব্যে দেখেন — পরে হয়তো পস্তাবেন!'

মেয়েদের এজমালি শোবার ঘরখানা দেখলুম মস্ত বড়। তাতে আছে ষাটখানা খাটবিছানা। আর দেখে আমার তাক লেগে গেল যে প্রতিটি বিছানায় একখানা করে কম্বল আছেই। যদিও এটা সত্যি যে কম্বলগ্নলো প্নরনো আর জীর্ণ, তব্ন কম্বল তো বটে! আর সেই কম্বলের নিচে আছে বিছানার চাদরও। বিছানাগ্নলোয় এমন কি বালিশ পর্যন্ত আছে!

মেয়েরা সত্যিই আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। ওদের পরনে ছিল প্নরনো ছাপা-কাপড়ের ফ্রক, আর প্রায় তার সবগ্নলোতেই তালিমারা। মেয়েদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে বড় যেটি তার বয়স ছিল পনেরো বছর বা তার কাছাকাছি।

বললুম, 'কী খবর মেয়েরা!'

গ্নলিয়ায়েভা বলল, 'দ্যাখো, আন্তন সেমিওনভিচরে তোমাদের কাছে এনে হাজির করেছি। ওনারে তোমরা দেখতি চেয়েছিলে তো।'

ফিস্‌ফিস করে অভ্যর্থনা জানাল মেয়েরা, তারপর নিঃশব্দ পায়ে আমাদের কাছে ঘে'ষে এল। বিছানাগ্নলোর পাশ দিয়ে আসার সময় হাত দিয়ে কম্বলগ্নলো টানটানও করে দিল তারা। কেন যেন এই বাচ্চা মেয়েগ্নলোর জন্যে ভারি কষ্ট বোধ হতে লাগল আমার, মনে হল ওদের জন্যে যত তুচ্ছই হোক অল্প ছোটখাট কিছ্ন উপহার হাতে করে আনতে পারলে বোধহয় ভালো হোত। আমাদের ঘিরে বিছানাগ্নলোর ওপর বসল ওরা, তারপর ভিতু-ভিতু চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। ব্নঝতে পারছিলুম না কেন ওদের জন্যে অত কষ্ট হচ্ছিল আমার। সে কি ওদের ফ্যাকাশে চেহারা, রক্তশ্নন্য ঠোঁট আর আড়চোখে তাকানোর ভঙ্গির জন্যে, নাকি তালিমারা পোশাক পরেছিল বলে, তা ঠিক ধরতে পারছিলুম না। মাথার মধ্যে হঠাৎ এই

চিন্তাটা খেলে গেল যে মেয়েদের কখনও এমন ন্যাতাকানি পরে থাকতে দেয়া উচিত নয়, কারণ সারা জীবন তাদের মনে এর প্রভাব থেকে যেতে পারে।

বললুম, 'আচ্ছা, মেয়েরা, বল তো তোমাদের দিন কাটছে কেমন?'

জবাবে একটি কথাও বলল না কেউ, খালি আমার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসতে লাগল। হঠাৎ কেমন যেন ধারণা জন্মাল আমার — ওরা খালি মুখ টিপেই হাসতে জানে, সত্যিকার প্রাণখোলা হাসি যে কী বস্তু এই মেয়েরা তা জানে না! একের-পর-এক ওদের মুখের দিকে তাকাতে-তাকাতে শেষপর্যন্ত আমার চোখদুটো এসে নিবদ্ধ হল গুলিয়ায়েভার মুখে। বললুম:

'বুঝলে, আমি হলুম গিয়ে অভিজ্ঞ মানুষ। কিন্তু এদের একটা ব্যাপার আমি ঠিক বুঝছি না।'

ভুরুদুটো তুলে শুধোল গুলিয়ায়েভা:

'কোন ব্যাপারটা বলেন তো?'

আমার একেবারে মুখোমুখি বসে ছিল একটি বাচ্চা মেয়ে। ময়লারঙ এই মেয়েটির পরনে ছিল এত খাটো একটা গোলাপি ফ্রক যে তার হাঁটুদুটো ফ্রকে ঢাকা পড়ছিল না। চোখের পলক ফেলা বন্ধ করে হঠাৎ সে বলল:

'আপনের গোর্কিপন্থীদেরে নিয়ি যত তাড়াতাড়ি পারেন চল্যে আসেন। আমাদের পক্ষি এখেনে বাস করা খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার।'

এক পলকে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে। গোলমালটা যে কোথায় তা ধরে ফেললুম। দেখলুম, ময়লারঙ সেই বাচ্চা মেয়েটির মুখে, তার আড়ষ্ট চোখের দৃষ্টিতে, তার ঠোঁটের অনিচ্ছাকৃত কাঁপুনিতে ফুটে উঠেছে ভয়, সত্যিকার নির্ভেজাল ভয়!

গুলিয়ায়েভাকে বললুম, 'এরা সন্ত্রস্ত হয়ে আছে দেখছি!'

'কষ্টে দিন কাটতেছে এয়াদের, আন্তন সেমিওনভিচ, বড় কষ্টে দিন কাটতেছে...'

বলতে-বলতে গুলিয়ায়েভার চোখের পাতাদুটো ভারি আর গোলাপি হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি জানলার দিকে কয়েক পা সরে গেল ও।

'তোমাদের ভয়টা কী নিয়ে?' বারবার আমি মেয়েদের জিজ্ঞাসা করতে লাগলুম। 'আমাকে বল দেখি!'

প্রথমে ভয়ে-ভয়ে, একে অপরকে ঠেলা দিয়ে আর কথায় বাধা দিয়ে

কথা বলতে শুরু করল মেয়েরা, তারপর আর-একটু সাহস সঞ্চয় করে ভয়াবহরকম সবিস্তারে কলোনিতে নিজেদের জীবনের কথা বলল।

জানা গেল, একমাত্র নিজেদের এজমালি শোবার ঘরখানায় ওরা কিছুটা নিরাপদ বোধ করত। উঠোনে বেরুতে পর্যন্ত ভয় পেত ওরা, কারণ বেরুলেই ছেলেরা নির্যাতন শুরু করে দিত, চিমটি কাটত, নোংরা কথা বলে জ্বালাতন করত, পায়খানায় উঁকিঝুঁকি দিত আর মেয়েদের কেউ পায়খানায় গেলে পায়খানার দরজা পর্যন্ত হাট করে খুলে দিত। এছাড়া প্রায়ই উপোস দিতে হোত মেয়েদের, কারণ খাবার ঘরে তাদের জন্যে প্রায় কোনো খাবারই অবশিষ্ট থাকত না। রান্না হলেই রাঁধা-খাবারের পাত্রগুলো নিয়ে ছেলেরা নিজেদের এজমালি শোবার ঘরে চলে যেত। এজমালি ঘরে রাঁধা-খাবার নিয়ে যাওয়া যদিও নিষিদ্ধ ছিল এবং রান্নাঘরের কর্মচারিরাও তা করার অনুমতি দিত না, তবু ছেলেরা কর্মচারিদের কথায় কর্ণপাত না-করে খাবারের স্যাসপ্যানগুলো আর পাঁউরুটি সবকিছুই ঘরে নিয়ে যেত। মেয়েরা এসব করতে পারত না, তারা খাবার ঘরে গিয়ে বসে থাকত। আর প্রায়ই তাদের বলা হোত যে ছেলেরা সব খাবার নিয়ে গেছে, খাবার মতো আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। কখনও-কখনও তাদের বরাতে জুটত অল্প কয়েক টুকরো পাঁউরুটি। তাছাড়া খাবার ঘরে মেয়েদের বেশিক্ষণ থাকাও বিপজ্জনক ছিল, কারণ ছেলেরা তাহলে ঘরে ঢুকে তাদের মারধর করত, 'বেশ্যা' আর আরও কী-কী সব খারাপ কথা বলে গালাগালি দিত, তাদের নানারকম নোংরা কথা শেখানোর চেষ্টা করত। তদুপরি বাজারে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে ছেলেরা জবরদস্তি মেয়েদের কাছে নানা জিনিস চাইত আর মেয়েরা তা দিতে রাজি না-হলে তারা একদৌড়ে মেয়েদের এজমালি শোবার ঘরে ঢুকে পড়ে হাতের কাছে যা পেত — একখানা কম্বল কিংবা একটা বালিশ — তা-ই হাতিয়ে নিয়ে শহরে বিক্রি করতে চলে যেত। একমাত্র রাতের বেলাই মেয়েরা জামাকাপড় কাচাকাচি করতে যেতে ভরসা পেত। কিন্তু যে-সময়ের কথা বলছি তখন এমন কি রাত্রেও কাপড় কাচতে যাওয়া বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল, কারণ ছেলেরা ধোপাখানাতেও নজর রাখত আর সেখানে ঢুকে যে-সব কাণ্ডকারখানা করত তা ভাষায় বলার নয়। একদিন নাকি ভালিয়া গরদ্‌কোভা আর মানিয়া ভাসিলেঙ্কো নামে দুটি মেয়ে রাত্রে কাপড় কাচতে যায়, তারপর ফিরে এসে সারা রাত কান্নাকাটি করে তারা আর পরদিন ভোরবেলা কলোনি ছেড়ে কোথায়-যে

চলে যায় তার আর খোঁজ পাওয়া যায় নি। একটি মেয়ে এ-নিয়ে আবার ডিরেক্টরের কাছে নালিশ করায় তাকেও নাকালের একশেষ করে ছাড়ে ছেলেরা। পরদিন সে যখন পায়খানায় যায় তখন তাকে চেপে ধরে ওরা তার সারা মুখে পায়খানার অকথ্য বস্তুটা মাখিয়ে দেয়। মেয়েরা আমাকে আরও জানাল যে সকলেই বলছে নাকি অবস্থা এরপর অন্যরকম হতে যাচ্ছে, কিন্তু কিছু-কিছু ছেলে এখনও বলছে যে পরিবর্তনের ফলে কিছুতেই কিছু হবে না, কারণ গোর্কিপন্থীরা সংখ্যায় একেবারেই নগণ্য আর যেভাবেই হোক তাদের খেদিয়ে দেয়া হবেই।

আমার মুখের ওপর থেকে একবারের জন্যেও চোখ না-সরিয়ে মেয়েদের কথা শুনছিল গুলিয়ায়েভা। ওর দিকে তাকিয়ে আমি হাসলুম — ওর দিকে তাকিয়ে ততটা না, যতটা ওর চোখের জল ফেলার জন্যে।

মেয়েদের করুণ কাহিনী বলা শেষ হল যখন, তখন ওদের মধ্যে স্মেনা নামে একটি মেয়ে গম্ভীরভাবে আমাকে শুধোল:

'আচ্ছা, বলেন তো, সোভিয়েত-রাজের আমলে কি এসব জিনিস চলতি দেয়া হতি পারে?'

বললুম, 'তোমরা আমায় যা-কিছু বললে এ এক সাংঘাতিক লজ্জার ব্যাপার। সোভিয়েত-রাজের আমলে এ-ধরনের কেলেঙ্কারি চলতে দেয়া উচিত নয়, এ-জিনিস চলতে পারেও না। দেখো, দিনকয়েকের মধ্যে এখানকার সবকিছু বদলে যাবে। তোমরা সুখে জীবন কাটাতে পারবে, কেউ তোমাদের কোনোরকম অনিষ্ট করবে না আর আমরা তোমাদের এই ন্যাতাকানি পোশাক দূর করে ফেলে দেব।'

'আর দিনকয়েকের মধ্যিই?' চিন্তিতভাবে আমার কথার প্রতিধ্বনি করল জানলার তাকে-বসা শণ-রঙের চুলওয়ালা একটি মেয়ে।

বললুম, 'হ্যাঁ, আর ঠিক দশদিনের মধ্যে।'

অন্ধকার ঘনিয়ে আসা পর্যন্ত বিষণ্ণ চিন্তায় ভরপুর হয়ে কলোনির এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ালুম সেদিন।

তিন শো বছরের পুরনো, কয়েক ফুট চওড়া দেয়াল-দিয়ে-ঘেরা আর মধ্যেকার জরদ্‌গব ছালবাকলা-ওঠা গির্জে সহ প্রাচীন, বৃত্তাকার সেই জায়গাটা, নোংরা আবর্জনায়-ভরা সেই জমিটার প্রতিটি বর্গমিটার এলাকা যেন আগাছার মতো সর্বব্যাপী শিক্ষাবিজ্ঞান-সংক্রান্ত সমস্যায় কণ্টকিত বলে

মনে হতে লাগল। ঘরের চাল পর্যন্ত ঘোড়ার নাদে-বোঝাই জরাজীর্ণ আস্তাবলে, গো-জাতির ডজনখানেক বৃদ্ধা চিরকুমারীর অনাথাশ্রমস্বরূপ গোয়াল-ঘরে, খামারখোলার গোটা জায়গাটা জুড়ে, বহুদিন উৎসন্ন হয়ে-যাওয়া ফলবাগানের ভাঙাচোরা রেলিঙগুলোর মধ্যে, বলা যেতে পারে আমার চারপাশের গোটা অঞ্চল জুড়েই মাথা উঁচিয়ে ছিল 'সামাজিক শিক্ষা'র শুকনো ডালপালা। আর কলোনি-বাসিন্দাদের এজমালি শোবার ঘরগুলোয়, শিক্ষক-কর্মচারিদের শূন্য আস্তানায়, তথাকথিত ক্লাবঘরগুলোতে, রান্নাঘরে আর খাবার ঘরে ওই সব শুকনো ডালপালা থেকে হাওয়ায় দুলছিল ভারি-ভারি, বিষাক্ত সব ফল। তার পরের কয়েকটা দিন ধরে ওই সব বিষফলই আমার গলাধঃকরণ করার কথা ছিল।

যতই ভাবতে লাগলুম ততই আমার চিন্তার সঙ্গে মিশে যেতে লাগল দুর্জয় ক্রোধ। বুঝতে পারলুম ১৯২০ সালের সেই দুর্জয় ক্রোধ আবার ফেনিয়ে উঠছে আমার মধ্যে। অপ্রশম্য ঘৃণার নাছোড়বান্দা দৈত্য আচম্বিতে আবার আমার পাশে এসে দাঁড়াল যেন। ইচ্ছে হল তখনই — ওই মুহূর্তে, নিজের জায়গা থেকে এক পাও না-নড়ে, কাউকে-না-কাউকে কোটের কলার চেপে ধরে চারপাশের দুর্গন্ধময় আবর্জনার স্তূপে আর কাদায় তার নাকটা আচ্ছা করে ঘষে দিই, তার কাছে দাবি জানাই অবিলম্বে এর একটা-কিছু বিহিত করার — দাবি জানাই শিক্ষা-বিজ্ঞান কিংবা সামাজিক শিক্ষার তত্ত্বজ্ঞান নয়, বৈপ্লবিক কর্তব্য কিংবা কমিউনিস্টশোভন কর্মোদ্দীপনা নয়, না, কিছুই না, শুধু সাধারণ অতি-সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের, সাধারণ বহুনিন্দিত একান্ত বিষয়ীসুলভ সততার! প্রলয়ঙ্কর ক্রোধের বন্যায় ধুয়েমুছে গেল আসন্ন দিনগুলি সম্বন্ধে আমার মনে সঞ্চিত ভয়, আমার সম্ভাব্য ব্যর্থতার আশঙ্কা। মেয়েদের আমি যে-কথা দিয়েছিলুম তার ফলে আমার মনের সাময়িক দোদুল্যমানতা, অনিশ্চয়তার ভাব সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হয়ে গিয়েছিল। মাত্র দশ দিনের মধ্যে যাদের মানুষের মতো বাঁচার অবস্থা সম্ভব করে তুলব বলে মরিয়ার মতো নিশ্চয়তা দিয়েছিলুম সেই জনা-বিশেক সন্ত্রস্ত, বোবা, বিবর্ণ মেয়েই তখন আমার কাছে আমার নিজ বিবেকের প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

রাতের অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হয়ে উঠল। কলোনিতে বাতির আলোর চিহ্নমাত্র ছিল না। করালদর্শন, একান্ত গদ্যময় গোধূলি ঘন হয়ে চেপে

বসল মঠের পাঁচিলগুলোর ওপর, তারপর এগিয়ে এসে গ্রাস করল গির্জেটাকেও। আর সর্বত্র, ঘরের কোণ আর ফাঁক-ফোকর থেকে গুড়ি মেরে বেরিয়ে এল বেওয়ারিশ মাণবকরা, আর যা-হোক-কিছু রাতের খাবার কাড়াকাড়ি করে খেয়ে রাত্রের মতো যে-যার জায়গায় থিতিয়ে যেতে শুরু করল। হাসি, গান, উচ্ছল গল্পগুজব — কোনো কিছুর চিহ্নমাত্র ছিল না কোনোখানে। কেবল থেকে-থেকে কানে আসছিল বিরক্তিপ্রকাশের চাপা গজগজানি কিংবা এ-কলোনির রীতিসিদ্ধ অর্থহীন ঝগড়াঝাঁটির শব্দ। হঠাৎ দেখা গেল দুই মাতাল একঘেয়ে গালিগালাজ করতে-করতে একটা এজমালি শোবার ঘরের সিঁড়িহীন বারান্দাটায় ওঠার চেষ্টা করছে। আর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে তাচ্ছিল্যভরে তাদের লক্ষ্য করছে কোস্তিয়া ভেত্‌কোভ্‌স্কি আর ভোলখভ।

৩

দৈনন্দিন ঘটনাচক্রে

পরদিন বেলা দুটোর সময় কুরিয়াজের ডিরেক্টর-সায়েব আমাদের ওপর সদয় হলেন এবং পরিচালন-কর্মীদের গোটা দলকে বরখাস্ত করা সহ কলোনি-হস্তান্তরের দলিলটিতে সই দিয়ে একখানা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়িতে উঠে বিদায় নিলেন। পেছন থেকে তাঁর অপসৃয়মাণ মাথাটির দিকে তাকিয়ে লোকটির চমৎকার সাফল্যে ঈর্ষাবোধ হল আমার — আহা, কী পাখির মতো স্বাধীন লোকটি, কেউ এমন কি তাঁর পেছনে একটা ঢিল পর্যন্ত ছুড়ল নাগো!

এদিকে আমি — যার আয়ত্তে পাখির ডানা নেই — তাকে কিনা সারাক্ষণ বুকের মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা বয়ে জবুথবু হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে কুরিয়াজের পার্থিব জনসমষ্টির মধ্যে।

মে-মাসের রোদ্দুর গায়ে মেখে ঝলমল করছিল ভান্‌কা শেলাপুতিন। লাজুক-লাজুক ভাব আর মুখভরা হাসি নিয়ে হীরের মতো আলো বিকিরণ করছিল সে। গির্জের দেয়াল থেকে ঝোলানো তামার ঘণ্টাটাও ওর পাশে ঝলমল করে উঠতে চাইছিল। কিন্তু সেটা পুরনো আর ঝুলকালি-মাখা ছিল বলে সূর্যের আলোয় নিষ্প্রভ মুখে ভেঙচি কাটাই সার হচ্ছিল তার।

তদ্‌পরি ঘণ্টাটা ছিল ফাটা, আর ভান্‌কার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও ঘণ্টা থেকে কাজ হওয়ার মতো তেমন-কিছ্‌ শব্দ বের্‌চ্ছিল না। ভান্‌কা অবশ্য কলোনির সাধারণ সভা ডাকার জন্যে ঘণ্টাটা বাজাতে চাইছিল।

দায়িত্বের অপ্রীতিকর, গ্‌র্‌ভার ও জ্বালাতুনে বোধের প্রকৃতিটা ম্‌লগতভাবেই হল য্‌ক্তিব্‌দ্ধিবিরহিত। প্রতিটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এই বোধটা ব্যতিব্যস্ত হয়, প্রতিটি ছোটখাট ফাঁক-ফোকরে জোর করে মাথা গলায়, আর তারপর সেই গর্তে বসে রাগে আর উদ্বেগে থরহরি কাঁপতে থাকে। শেলাপ্‌তিন যখন ঘণ্টাটা বাজাচ্ছিল এই বোধটা তখন ঘণ্টাকে আশ্রয় করল: মনে হতে লাগল এমন কর্ণপীড়ক আওয়াজ কলোনির বাতাসে ভেসে বেড়াতে দেয়া যায় কী করে?

আমার পাশে দাঁড়িয়ে ভিত্‌কা গোর্‌কভ্‌স্কি এতক্ষণ একমনে আমার ম্‌খের ভাব লক্ষ্য করছিল। এবার সে চোখ ফেরাল মঠের দেউড়িতে ঘণ্টাঘরের দিকে, আর তার চোখের মনিদ্‌টো সঙ্গে সঙ্গে আরও অন্ধকার আর বড়-বড় হয়ে উঠল। আর মনে হল প্‌রো এক ডজন খ্‌দে শয়তানের বাচ্চা যেন তা থেকে উঁকি দিচ্ছে। মাথাটা পেছনদিকে হেলিয়ে নিঃশব্দে হাসল ভিত্‌কা, লাল হয়ে উঠল অল্প-একটু, তারপর ধরাগলায় বলল:

'আমরা এটারেও সংগঠিত করে ফেলব-নে। সংগঠিত করবই আমরা!'

ঘণ্টাঘরের দিকে ছ্‌টে গেল ও, আর যেতে-যেতে পথের মধ্যে ভোলখভের সঙ্গে একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনাও সেরে নিল। ভান্‌কা ইতিমধ্যে প্‌রনো ঘণ্টাটা থেকে বার-দ্‌য়েক ধরাগলার কাশির মতো একটা আওয়াজ বের করেছিল। সে এবার হাসতে-হাসতে বললে:

'ওরা কি শ্‌নতি পাতিছে না? আমি ইদিকে ঘণ্টা বাজায়ে চলেছি, অথচ ওরা কেউ খেয়ালই করতিছে না!..'

প্‌রনো গির্জেটাতেই ছিল কলোনির ক্লাবঘর। ঘরটায় ছিল সামনে জাফরি-লাগানো উঁচু-উঁচু জানলা আর গোটা দ্‌ই ঘর-গরমের চুল্লী। অর্ধব্‌ত্তের আকারের প্‌জাবেদীর জায়গাটায় একটা ঘ্‌ণধরা মঞ্চের ওপর রাখা ছিল একখানা লগবগে ছোট্ট টেবিল। দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে বসা ভালো এই চীনে প্রবাদটিকে কুরিয়াজে উপেক্ষা করাই রেওয়াজ ছিল। কেননা ক্লাবঘরে বসার উপযোগী কোনো আসবাবপত্র ছিল না। অবশ্য কুরিয়াজ-বাসিন্দাদেরও ওখানে এসে বসার বিন্দ্‌মাত্র বাসনা ছিল না মনে। মাঝে-মাঝে একেকটা

জটপড়া মাথা দরজায় উ'কি দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হচ্ছে, দেখা যেতে লাগল। আর দেখা যেতে লাগল তিন-চার জনের একেকটা দল দুপুরের খাবারের আশায় উঠোনটায় ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে। তবে কলোনি হস্তান্তরের দিন ছিল বলে ওইদিন খাবার তৈরি হতে দেরি হচ্ছিল। কিন্তু যাদের কথা বললুম তারা ছিল নিছকই কুরিয়াজের অন্ত্যজ নাগরিক — কুরিয়াজ-সভ্যতার যারা ছিল গিয়ে প্রাণস্বরূপ তারা তখনও পর্যন্ত কোথাও যেন গা-ঢাকা দিয়ে ছিল।

কুরিয়াজের মাস্টারদের কাউকে দেখতে পাচ্ছিলুম না। এটা যে কেন, গোলমালটা যে ঠিক কোথায় হয়েছিল, ততক্ষণে আমি তা জেনে গিয়েছিলুম। পাইওনিয়রদের ঘরে শক্ত কাঠের টেব্‌লের ওপর শুতে হওয়ায় আগের রাত্রে আমাদের ভালো ঘুম হয় নি, আর সেই সময়ে কুরিয়াজের জীবনযাত্রা সম্পর্কে মজার-মজার কাহিনী শুনিয়ে ছেলেরা আমাকে ভুলিয়ে রেখেছিল।

চল্লিশজন মাস্টারের জন্যে কলোনিতে চল্লিশখানা আলাদা ঘর ছিল। আমরা আসার আঠারো মাস আগে তাঁরা ওই ঘরগুলোকে নানারকম রুচিকর বস্তু, কুরুশকাঠিতে বোনা টেব্‌ল-ঢাকা আর গদি-আঁটা সোফা দিয়ে মফস্বলের সবসেরা কায়দায় বিজয়োল্লাসে সাজিয়েছিলেন। তবে অস্থাবর প্রকৃতির এমন আরও অনেক দামি জিনিস দিয়ে ঘর ভরিয়েছিলেন তাঁরা মালিকানা হস্তান্তরের পক্ষে যেগুলো অপেক্ষাকৃত বেশি উপযোগী আর সুবহ ছিল। আর এইসব দামি জিনিস অল্পদিনের মধ্যেই কুরিয়াজের কলোনি-বাসিন্দাদের হস্তগত হয়ে গেল — মান্ধাতার আমল থেকে যে-উপায়টি সি'ধেল চুরি নামে প্রসিদ্ধ সেই একেবারে সহজতম উপায়ে। সম্পদ আহরণের এই ধ্রুপদী ধরনটি কুরিয়াজে এত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে শুরু করল যে মাস্টাররা সবাই একের-পর-এক তাঁদের অবশিষ্ট সাংস্কৃতিক সম্পদ দ্রুত শহরে সরিয়ে নিয়ে গেলেন, ঘরে রাখলেন কেবল খুবই সাদাসিধে সামান্য কিছু আসবাব — অবশ্য ডিউটির সময়ে শিক্ষাবিজ্ঞানীদের বিশ্রামের জন্যে মেঝেতে-বিছনো 'ইজ্‌ভেস্তিয়া' পত্রিকার কপিকে যদি আসবাব আখ্যা দেয়া চলে, তবেই।

অতঃপর যখন থেকে কুরিয়াজের মাস্টাররা শুধু সম্পত্তি খোওয়া যাওয়ার ভয়েই নয়, গোটা প্রাণটাই হারানো কিংবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খোওয়া যাওয়ার ভয়ে থরহরি কম্পমান হলেন, তখন থেকেই মাস্টারদের চল্লিশটি ঘর দ্রুত যুদ্ধের সময়কার বোমা-প্রতিরোধী সুরক্ষিত ঘরের আকার ধারণ করল। আর সেইসব

ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে শিক্ষক-সম্প্রদায় তাঁদের ডিউটির ঘণ্টাগ‌ুলো বিবেক বাঁচিয়ে কাটাতে লাগলেন। কুরিয়াজের মাস্টারদের ঘরে জানল্যা-দরজায় আর অন্যান্য ফাঁক-ফোকরে লাগানো আত্মরক্ষার এমন সব জোরালো যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করেছিল‌ুম যা তার আগে কিংবা পরে আর কোথাও আমার নজরে পড়ে নি। ঘরগ‌ুলোর জানলা-দরজার ফ্রেমে আর কপাটের পাল্লাগ‌ুলোয় আগাগোড়া মালার মতো করে পোঁতা ছিল প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড গজাল, মোটা লোহার হ‌ুড়কো, আড়াআড়িভাবে লাগানো লোহার ডাণ্ডা আর মস্ত-মস্ত ওজনের সব তালা।

আমাদের অগ্রবর্তী মিশ্র বাহিনী কুরিয়াজে পেঁছনোর পর থেকে আর কোনো মাস্টারের টিকিটিও দেখতে পাই নি। কাজেই তাঁদের বরখাস্ত করাটা কিছ‌ুটা প্রতীকী ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমন কি তাঁদের ঘরগ‌ুলোকেও আমার কাছে মনে হয়েছিল একটা বিম‌ূর্ত ব্যাপার বলে, কারণ ঘরগ‌ুলোয় এককালে-যে মান‌ুষ নামের জীব বাস করত তার প্রমাণ মিলেছিল একমাত্র ভোদ্‌কার খালি বোতল আর ছারপোকার উপস্থিতি থেকে।

অবশ্য এই ঘটনাটা কব‌ুল না-করলে মিথ্যে বলা হবে যে লোজ্‌কিন নামে অ-বোধগম্য আকৃতি আর বয়সের একজন লোক সেদিন আমার চোখে পড়েছিল বটে। লোকটি আমার কাছে তার শিক্ষাবিজ্ঞানগত শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছিল আর 'আপনের পরিচালনায় য‌ুবশক্তিরে প্রগতির পথে আরও খানিক আগায়্যে নিয়ি যাবার জন্যি' গোর্কি কলোনিতে থেকে যেতেও চেয়েছিল। শিক্ষাবিজ্ঞান-সংক্রান্ত নানারকম স‌ূক্ষ্ম ব‌ুকনির অবতারণা করে বেচারা সেদিন আমার পাশে-পাশে ঘ‌ুরঘ‌ুর করেছিল আধ-ঘণ্টাটাক। বলেছিল:

'বিশ‌ৃঙ্খলা! বোঝলেন, সেরেফ বিশ‌ৃঙ্খলা ছাড়া কিছ‌ু না! ও আপনে যতই ঘণ্টা বাজ্যাতি থাকেন, অরা কিছ‌ুতিই আসব্যে না। কিন্তু ক্যানে আসব্যে না কন দেখি? আসলে শিক্ষাবিজ্ঞানগত দ‌ৃষ্টিভঙ্গি দরকার, বোঝলেন! এই কথাডাই আমি সব্বদা বল্যে আসত্যেছি। সাধারণত যা কওয়া হয়ি থাকে সেডা অবিশ্যি খ‌ুবই ঠিক যে আপেক্ষিক আচরণ দরকার, কিন্তু আপেক্ষিক আচরণডা করা যায় কীভাবে যদি এট্টা ছোঁড়া (কথাডা বলত্যেছি বলে আমারে মাপ করব্যেন!) চুরি করে আর কেউ তার চুরি না-ঠেকায়? ওয়াদের প্রেতি সব্বদা আমি সঠিক আচরণ করে্য থাকি, অরাও সব্বদা আমার কাছে

আসে, আমারে খাতিরও করে যথেষ্ট, তবু দ্যাখেন... মাত্তর দিন-দুয়েকের জন্যি আমি শাশুড়ির বাসায় গিয়েলাম — ওনার অসুখ ছেল, তাই — তা, তার মধ্যি অরা কি করল্য জানেন? আমার ঘরের জানলার কাচখান খুল্যে ফেল্যে ঘর থেক্যে সবকিছু ঝাড়্যেপুছে চুরি কর্যে নিল। একবারে মায়ের কোলের বাচ্চার মতন ন্যাংটা কারি রাখ্যে গেল আমারে, কোটখান ছাড়া গায়ি চড়ানোর মতন জামা রইল্য না আমার। আপনে হয়তো জিজ্ঞাস করব্যেন, এমনডা করল্য ক্যানে? ঠিক আছে — যে তদেরে দয়ামায়া দেখায় না তার ঘর থেক্যে যত ইচ্ছা চুরি কর্, কিন্তু যে তদের সব্বদা স্নেহ করে তার ঘরে চুরি করিস ক্যানে? আসলে শিক্ষাবিজ্ঞানগত দৃষ্টিভঙ্গি দরকার, এই কথাডাই আমি সব্বদা বল্যে আসত্যেছি। ছেল্যাদের আমি পেরায় কাছে ডাকি, পেরায় অদের সাথে কথাবাত্তা বল্যে থাকি আমি, বোঝলেন না! আমি অদের উৎসাহ জাগায়্যে তুলি, আরে এয়াই তো দরকার, না কী! আমি অদেরে আঁক কষতি দেই। বলি, ধর্, এক পাকিটে ভেন্ন পাকিটের থেক্যে সাত কোপেক বেশি আছে, আর সবসুদ্ধা দুই পাকিট মিলায়্যে আছে তেইশ কোপেক, তাইলি প্রেতি পাকিটে কত কোপেক কর্যে রয়্যেল? কী বলেন, খুব মাথা খাটায়্যে বার কর্যেছি না?'

উদ্ধতভাবে চোখদুটো তুলে দুষ্টুমিভরা ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল লোজ্‌কিন।

সৌজন্য দেখানোর চেষ্টা করে বললুম, 'কী ব্যাপার?'

'না-না, সত্যি, কন দেখি — কত রয়্যেল?'

'কী কত রইল?'

'কন দেখি, প্রেতি পাকিটে কত কোপেক কর্যে রয়্যেল?'

'কী, আমাকেও তা বলতে হবে নাকি?'

'হ্যাঁ — কন-না, প্রেতি পাকিটে কত কোপেক কর্যে রয়্যেল?'

চটে উঠে বললুম, 'শুনুন, কমরেড লোজ্‌কিন, বলুন তো, আপনি কোনোদিন ইশ্‌কুলে পড়েছেন কী?'

'নিচ্চয়, পড়্যেছি বৈকি। কিন্তু আমি বেশির ভাগডাই শিখ্যেছি নিজির চেষ্টায়, নিজিরে শিক্ষিত কর্যে তুল্যেছি আমি। আমার জেবনডাই হল্য গিয়ি নিজির চেষ্টায় বহুদিন ধর্যে শিক্ষালাভের এট্টা নমুনা। অবিশ্যি এডা ঠিক যে আমি কোনোদিন ওই সব শিক্ষক-প্রশিক্ষণ টেক্‌নিক্যাল

ইশ্‌কুলে কিংবা ইনস্টিট্যুটে পড়ি নাই। তয় আমি আপনেরে জোর দিয়িই কতি পারি — এখেনে তো ইউনিভার্সিটির শিক্ষে-পাওয়া বেশ ক'জনা ছেল, একজন তো এমন কি শর্টহ্যান্‌ড কোর্সের গ্রাজুয়েট আর আরেক জন আইন পাশ-করা ম্যাস্টারও ছেল, কিন্তু অদের কাউরে এমনধারা এট্টা আঁক কষাতি দিয়ি দ্যাখেন দেখি!.. কিংবা, ধরেন, আরও এট্টা আঁক, যেমন: দুডা ভাই এট্টা সম্পত্তির মালিক হল্য...'

'শর্টহ্যান্‌ডের মাস্টারই বুঝি দেয়ালে ওই কথাগুলো লিখে রেখেছেন?'

'হ্যাঁ, সে-ই লেখ্যেছে বটে... প্রেথম-প্রেথম সে চাতিছিল শর্টহ্যান্‌ড শিক্ষের এট্টা দল গড়াতি, কিন্তু ছোঁড়ারা ওয়ার সব্বস্ব চুরি করো নেয়ার পর সে কয়্যেল: 'এমনধারা বর্বরদের মধ্যি আমি কাজ করব্য না।' এয়ার পর সে আর দল গড়ার চেষ্টা পায় নাই, খালি অ-আ-ক-খ শেখায়্যেই সময়ডা কাটায়্যে দেছে...'

ক্লাবঘরের চুল্লীটার পাশে একফালি কার্ডবোর্ড দেয়ালে ঝুলতে দেখেছিলুম। তাতে লেখা ছিল:

সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথই হল শর্টহ্যান্‌ড-শিক্ষা

এর পরও বেশ কিছুক্ষণ বকবক করল লোজ্‌কিন, তারপর একসময়ে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। ওর সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত যেটুকু আমার মনে আছে তা হল, লোকটি চলে যাওয়ার পর দাঁতে দাঁত চেপে ভোলখভের এই কথা তিনটে:

'জঘন্য বিরক্তিকর লোক!'

ক্লাবঘরে সেদিন বিসদৃশ আর মনোবল নষ্ট করে দেয়ার মতো এই ঘটনাটার সম্মুখীন হতে হল আমাদের যে কুরিয়াজের বাসিন্দারা সভায় আসতে রাজি নয়। ঘরটার উঁচু-উঁচু শূন্য দেয়ালগুলোর দিকে মনমরাভাবে তাকিয়ে রইল ভোলখভ। রাগে কালচে মেরে গিয়ে আর থুতনি চেপে মুখটাকে কঠিন করে তুলে কুদ্‌লাতি নিজের মনে কী যেন বিড়বিড় করতে লাগল। ঘৃণা আর অবজ্ঞার হাসি হাসতে লাগল মিত্‌কা। একমাত্র মিশ্‌কা অভ্‌চারেঙ্কোই মেজাজ ঠিক রাখতে আর শান্ত হয়ে থাকতে পারছিল। অনেক আগে যে-কথাটা শুরু করেছিল সেই যুক্তিরই জের টেনে তখন বলে চলেছিল সে:

'...আসল কথা হল জমিতি লাঙ্গল দেয়া... আর বীজ বোনা দরকার এখন। ভাবেন একবার, দেখতি-দেখতি মে-মাস আস্যে গেল, ইদিকে ঘোড়াগুলান ঘরে বসি খায়্যে-খায়্যে জাবনা শেষ করি ফেলতেছে, কিচ্ছুটি না-করি খাড়ায়্যে আছে খালি!..'

'এজমালি শোবার ঘরগুলায় জনপ্রাণী নাই,' হঠাৎ বলে উঠল ভোলখভ। 'সক্কলে শহরে রোঁদে বেরায়ে গ্যাছে।' কথাটা বলেই, আমার উপস্থিতির দিকে বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত না-করে, গলা ছেড়ে গালাগালি দিতে শুরু করল সে।

কুদ্‌লাতি প্রস্তাব করল, 'ওরা মিটিঙে না-আসা পর্যন্ত দুপারের খাবার দেয়া বন্ধ করা যাক।'

বললুম, 'না, তা হয় না।'

কুদ্‌লাতি চিৎকার করে উঠল, 'হয় না? তাইলে আমরা এখেনে বসে কী করতেছি? খেতগুলা এখনও পর্যন্ত আগাছায় ঢাকা, জমিতি লাঙ্গল দেয়া হয় নাই পর্যন্ত। এরে কী বলবেন আপনে? আর ওরা কিনা মনের সুখে পেট পুরে খায়্যে চলতেছে। এর অর্থ, কুঁড়ের বেহন্দগুলা নিজিদের খুশিমতন যা কিছু করতি পারবে, তাই তো?'

রাগে থরথর-করে-কাঁপা, শুকনো ঠোঁটদুটো জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিল ভোলখভ। তারপর সারা শরীরে যেন কাঁপুনি ধরেছে এমনভাবে দুটো কাঁধ জড়ো করে এনে বলল:

'আস্তন সেমিওনভিচ, চলেন আমাদের সাথে, কথা আছে।'

'কিন্তু দুপুরের খাবার দেয়ার ব্যাপারটা কী হবে?'

'আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুক ওরা, নচ্ছারের গুষ্টি! তাছাড়া পেরায় সকলেই তো ওদের শহরে চলি গেছে।'

পাইওনিয়রদের ঘরে গিয়ে সকলে বেঞ্চিতে বসার পর ভোলখভ বলতে শুরু করল:

'জমিতি লাঙ্গল দিতি হবে, না, না? আর বীজ বুনতি? কিন্তু কোন ছাইভস্মটা বুনব আমরা? এয়াদের তো কোনো বীজই নাই, আলু-বীজ পর্যন্ত নাই! ওরা না হয় চুলায় যাক, নিজিরাই আমরা বীজ বুনতি পারি, কিন্তু কিছুই তো নাই এয়াদের ভাঁড়ারে। আর দ্যাখেন, কী নোংরা আর দুর্গন্ধ চারদিকি। আমাদের ছোঁড়ারা এখেনে এলি কী কর্‌য়ো যে তাদের কাছে মুখ দেখাব তা জানি নে — ভদ্দরলোকের পা ফেলার মতন জো

একইঞ্চি জায়গা নাই কোথাও! তাছাড়া এয়াদের এজমালি শোবার ঘরগুলো, গদি-বিছানা আর বালিশেরই-বা কী গতি করা যাবে? আর জামা-কাপড়ের? সব্বাই ওরা খালি-পায়ে চলাফেরা করে থাকে। গেঞ্জি, আণ্ডার-উইয়ার, এ-সকলই-বা কোথায় এয়াদের? তাছাড়া না আছে ডিশ, না আছে চামচ, না কিছু! তাইলে, কোথা থেকে শুরু করব আমরা? কোনো এট্টা জায়গা থেকে তো শুরু করতি লাগবে!'

অধীর প্রত্যাশা নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ছেলেরা। ওদের ভাবখানা ছিল এমন যেন কোথা থেকে শুরু করতে হবে তা আমার জানার কথা!

কুরিয়াজের ছেলেরা আমাকে ততটা দুশ্চিন্তিত করে তোলে নি যতটা করছিল নিছক বৈষয়িক অসংখ্য খুঁটিনাটি ব্যাপার। এই বৈষয়িক ব্যাপারগুলো জমে-জমে উঁচু হতে-হতে এমন একটা জটিল তালগোল পাকানো স্তূপে পরিণত হয়েছিল যার নিচে তিন শো কুরিয়াজ-বাসিন্দার সমস্যাও চাপা পড়ে যাওয়ার অবস্থা ঘটেছিল।

শিশু-সহায়তা কমিটির সঙ্গে আমাদের চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কুরিয়াজকে মনুষ্যবাসোপযোগী করার জন্যে আমার বিশ হাজার রুব্‌ল পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই এটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল যে প্রয়োজনের তুলনায় এই টাকাটা ছিল সমুদ্রে নিতান্তই বারিবিন্দুবৎ। আমার ছেলেরা দরকারি জিনিসের ফর্দ বানানোর সময় মোটেই কোনো জিনিস বাড়িয়ে বলে নি। তবে কুরিয়াজের চরম দৈন্যদশা ধরা পড়েছিল একমাত্র তখনই যখন কুদ্‌লাতি সম্পত্তি হস্তান্তরের সময় জিনিসপত্র বুঝে নিতে শুরু করেছিল। সম্পত্তি হস্তান্তর-সম্পর্কিত দলিলে ম্যানেজারের অভাবে সইসাবুদ যে মূল্যহীন তা নিয়ে ডিরেক্টর-সায়েবের অত বিচলিত হওয়ার সত্যিই কোনো কারণ ছিল না। সত্যি বলতে কী, তাঁর নির্লজ্জতার সীমা-পরিসীমা ছিল না, কেননা দলিলে উল্লিখিত সম্পত্তির পরিমাণ ছিল একেবারে যৎসামান্য। সম্পত্তি বলতে ছিল ওয়ার্কশপে অল্প কয়েকটা লেদ-মেশিন আর আস্তাবলে কয়েকটা বাজে জাতের নিকৃষ্ট ঘোড়া। ব্যস, ওই পর্যন্তই! না ছিল অন্য কোনো যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল কিংবা কৃষির কোনো সাজ-সরঞ্জাম। কেবল শুয়োরের লক্ষ্মীছাড়া খোঁয়াড়টায় থকথকে পাতলা গু মাড়িয়ে ঘোঁতঘোঁত করে বেড়াচ্ছিল গোটা ছয়েকের মতো শুয়োর। শুয়োরগুলোকে দেখে প্রথমে ছেলেরা হাসি

সামলাতে পারে নি, কারণ হেঁড়ে মাথা, সরু-সরু লম্বা ঠ্যাঙ আর পুঁচকে লেজওয়ালা প্রাণীগুলো আমাদের ব্রিটিশ-বংশীয়দের থেকে আকার-প্রকারে এতই ভিন্ন ছিল যে তা বলার নয়। এছাড়া উঠোনের কোনো একটা অজ্ঞাত কোণ থেকে একখানা লাঙল উদ্ধার করতে পারায় কুদ্‌লাতির আনন্দ দেখে কে! হাবেভাবে মনে হচ্ছিল বহুদিন পরে হারানো ভাইকেই বুঝি সে খুঁজে পেয়েছে। আর আবিষ্কৃত হয়েছিল পুরনো একটা ইটের গাদা থেকে জমিতে দেবার একখানা মই। ইশ্‌কুল-বাড়িটায় তল্লাসি চালিয়ে মোটমাট যা পাওয়া গিয়েছিল তা হল টেবিল আর চেয়ারের খানকতক পায়া আর ব্ল্যাকবোর্ডের কিছু-কিছু ভগ্নাংশ — ব্যাপারটা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক ছিল, কেননা প্রতি বছরই একসময়-না-একসময় শীত শেষ হয় আর তখন, বসন্তকালে, যে-কোনো গেরস্তের হাতেই জ্বালানিকাঠের অল্প-কিছু সঞ্চয় থেকেই যায়। ওগুলোও ছিল এইরকম জ্বালানির অবশিষ্টাংশ।

সবকিছুই কেনার, তৈরি করার আর ফিরেফিরতি বানানোর দরকার ছিল। আর এ-সবের মধ্যে একেবারে গোড়ার কাজই ছিল কয়েকটা পায়খানা খাড়া করা। শিক্ষাবিজ্ঞান-সংক্রান্ত সারগ্রন্থে কখনও পায়খানার উল্লেখ থাকে না, কুরিয়াজে এই অতি-প্রয়োজনীয় ব্যাপারটাকে যে হালকাভাবে দেখা হয়েছিল আর উপেক্ষা করা হয়েছিল তার কারণও ছিল নিশ্চয়ই এ-ই।

কুরিয়াজ মঠটা তৈরি করা হয়েছিল একটা খাড়াই টিলার মাথায় আর মঠের চতুর্দিকেই টিলাটা সটান ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছিল। কেবল টিলার দক্ষিণদিকের ঢালু গা-টা পাঁচিল দিয়ে আড়াল করা ছিল না, আর তাই সেই খোলা জায়গাটা থেকে দেখা যেত মঠের বিলসদৃশ পুকুরটার ওপারের পদভোর্‌কি গাঁয়ের খড়ে-ছাওয়া ঘরের চালগুলো। সর্ববিচারেই দৃশ্যটা ছিল ইউক্রেনীয় নিসর্গচিত্রের একটা চমৎকার নিদর্শন, যথেষ্ট পরিমাণ ছন্দ-মিল আয়ত্তে থাকলে যে-কোনো কবি সেই দৃশ্যে অনুপ্রাণিত হতে পারত। অথচ সেই সুন্দর নিসর্গশোভায় তৃপ্ত হওয়ার বিনিময়ে কুরিয়াজবাসীরা হীন অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে পদভোর্‌কির বাসিন্দাদের চোখের সামনে মেলে ধরত খাড়াই পাড়ের ধার-ঘেঁষে-বসা একসার মূর্তির পশ্চাদ্দেশ। সামাজিক শিক্ষা-সংক্রান্ত দপ্তরের লক্ষ-লক্ষ রুব্‌ল ব্যয়ে কেনা খাদ্যসামগ্রীকে হজম করার পর তাদের চরম উপাদানে রূপান্তরিত করার কাজে তখন ব্যস্ত থাকত মূর্তিগুলো।

ওপরে যে-সমস্যাটার কথা বলা হল সেই সমস্যায় আমার ছেলেরাও দারুণ কষ্টভোগ করছিল। যথাসম্ভব গাম্ভীর্য ও আন্তরিকতার সঙ্গে বিষয়টা উত্থাপন করে মিশা অভ্‌চারেঙ্কো নালিশ জানাল:

'আচ্ছা, সত্যি, কী করা যায় বলেন তো? এর জন্যি খার্‌কভ যাতায়াত করতি হবে, না কী? তাছাড়া রোজ-রোজ সেখেনে যাওয়াই-বা যায় কী উপায়ে?'

আর তাই দেখা গেল আমাদের আলোচনা শেষ হব-হব করছে এমন সময় পদভোর্‌কি থেকে জনা-দুই ছুতোর-মিস্ত্রি 'পাইওনিয়র কর্নার'-এর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে বয়সে যে-জন বড় সেই খাকি টুপি-মাথায় সেপাই-সেপাই চেহারার লোকটি আমার ইচ্ছের কথা শুনে তা একান্তভাবে সমর্থন করল। বলল:

'সত্যই তো! এয়া তো ভারি লজ্জার কথা! লোকেরে যখন খাতিই হয় তখন, তাদের .. তো করা লাগবেই। রিজোভের গুদাম থেক্যে কাঠের তক্তা আমরা যোগাড় করতি পারি। কিচ্ছুটি ভাবব্যেন না! এ-তল্লাটে সক্কলে আমারে চেনে। যা চুক্তি হয়্যেছে সেই অনুযায়ী ট্যাকাটা আমারে দিয়ি দ্যান আর দ্যাখেন কেমন একখান পায়খানা বানায়্যে দিই আপনেদেরে — মঠের সাধুদেরও এমন পায়খানা ছেল না কোনোদিন! অবিশ্যি যদি আপনেরা শস্তায় কাম সারতি চান তাইলে তা-ও পারি, ভেনেস্তার পাতলা তক্তা দিয়ি হালকা ঝুপড়িও বানায়্যে দিতি পারি আপনেদেরে। তবে যদি শক্তপোক্ত ভালো কিছু চান তাইলি আমার পরামশ্য এই যে দেড় কিংবা দুই ইঞ্চি পুরু তক্তা দিয়ি পায়খানা বানায়্যে দিই। ওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষিও ভালো, বোঝলেন — ঝুপড়ির মধ্যি তেমন হাওয়াও ঢোকবে না, শীতকালে বেশ ঢাকাঢুকি থাকব্যে আর আরাম বোধ হবে-নে, আর গ্রীষ্মিতেও গরমে তক্তায় ফাটল ধরব্যে না।'

এই চমৎকার লোকটির কথায় সেদিন যতটা অভিভূত হয়েছিলুম, মনে হল এমনটা আর কখনও হই নি। কী আশ্চর্য লোক — যে নাকি শীত-গ্রীষ্ম, বাতাস-আশ্রয় সবকিছুর কথা চিন্তা করে ঘর বানাতে পারে! লোকটির নাম ছিল বরভোয়। ওর হাতে একতাড়া নোট গুঁজে দিলুম আমি, আর ওর সহকারী, গোলাপি গোলগাল ছেলেটিকে ও যে-রকম জোরগলায় নির্দেশ দিতে লাগল তাই শুনে দ্বিতীয়বার পুলকিত হলুম। শুনলুম ও বলছে:

'আমি কাঠ যোগাড় করতি চললাম, ভানিয়া। তুই কাজ শুরু করো

দে। এক দৌড় দিয়ি গিয়ি তর আর আমার কোদাল দ্বখান নিয়ি আয় দেখি। এখ্বনি কাম শ্বর্ব করা লাগব্যে, ব্বঝলি!.. অবিশ্যি ওনাদের একজনারে আমাদের সাথে আসতি লাগব্যে, কনে আর কোন দিকি ম্বখ করি পায়খানা বসব্যে তা আমাদেরে দেখায়্যে দিতি লাগব্যে তো!..'

ভানিয়াকে 'কনে আর কোন দিকি ম্বখ করি' তা দেখিয়ে দেয়ার জন্যে হাসতে-হাসতে চলে গেল কির্গিজভ আর কুদ্লাতি। এদিকে বরভোয় তার পাওয়া টাকাটা রহস্যময় একটা কাপড়ের পটিতে জড়িয়ে বেঁধে নিল, তারপর আরও একবার আমায় তার নৈতিক সমর্থন জানিয়ে গেল:

'কাজডা আমরা ঠিক কর্যে ফেলব্য, কমরেড ডিরেক্টার! বিশ্বেস করেন!'

আমি সত্যিই ওকে বিশ্বাস করেছিল্বম। ইতিমধ্যে সবকিছ্ব সম্পর্কেই আমার কেমন একটা ভরসা জেগেছিল। মনে হচ্ছিল অস্ববিধেজনক অস্থায়ী অন্তর্বর্তী পর্যায় যেন পার হয়ে এসেছি, এখন কুরিয়াজে শিক্ষা-সংক্রান্ত কাজকর্ম যেন শ্বর্ব করা চলে।

ওই একই সন্ধেয় দ্বিতীয় আরেকটা যে-সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করে ফেলেছিল্বম আমরা তা হল চামচ আর খাওয়ার প্লেট-সংক্রান্ত। এ-সমস্যাটাও ছিল আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে য্বক্ত। গোল গম্ব্বজওয়ালা মঠের ভোজনকক্ষ — যেখানে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে আঙ্বল-উঁচনো গম্ভীরম্বখ সন্ত আর ম্যাডোনারা কয়েক পোঁচ চুনকামের তলা থেকে উঁকি দিচ্ছিলেন — সেখানে কয়েক প্রস্থ টেবিল আর বেঞ্চি ছিল বটে কিন্তু না-ছিল কোনো চামচ, না-ছিল খাবার প্লেট। কুরিয়াজের বাসিন্দাদের ওসব বাব্বগিরির বালাই ছিল না কোনোদিন। আধঘণ্টা ব্যস্তসমস্ত হয়ে হৈ-হল্লা করার পর এবং আস্তাবলে কূটনৈতিক আবেদন-নিবেদনের পালা সঙ্গে করে তবেই ভোলখভ কোনোরকমে এভ্গেনিয়েভকে একখানা প্বরনো দ্বই চাকার ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে তাকে শহরে রওনা করিয়ে দিতে পারল — চার শো প্লেট আর চার শো কাঠের চামচ কিনে আনার উদ্দেশ্যে।

মঠের দেউড়ির কাছে এভ্গেনিয়েভের ঘোড়ার গাড়ি একদল ছেলের ভিড়ে গিয়ে পড়ল। ছেলের দলটা আনন্দে আটখানা হয়ে প্রচুর হৈ-হল্লা জ্বড়ে দিয়েছিল আর একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি করছিল। আমাদের ছেলেরা সহজপ্রব্বত্তির বশে যেন অন্বকূল বাতাস বইছে টের পেয়েই দেউড়ির দিকে ছ্বটে এসেছিল। আমিও ছ্বটে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল্বম, আর আসতেই

সঙ্গে সঙ্গে খপ্পরে পড়ে গেলুম কারাবানভের। ওই সময়টায় আবার আমার বুকখানার ওপর নিজের শক্তিপরীক্ষার বাতিক পেয়ে বসেছিল কারাবানভকে।

আসলে সেদিন গোটা দলবলসহ কুরিয়াজে এসে হাজির হয়েছিল জাদোরভের নেতৃত্বাধীন সপ্তম মিশ্র বাহিনী (আমাদের 'রাব্‌ফাক'-এর ছাত্রছাত্রীরা)। আর ওরা এসে পেঁছনোর মুহূর্তটি থেকেই কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের রহস্যময় ভয়াবহ জনতার সম্মুখীন হওয়ার সমস্যাটা এমন এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আকার ধারণ করল যা এমন কি লোজ্‌কিনের কাছেও তিন তুড়িতে উড়িয়ে দেবার মতো ব্যাপার ছিল।

অমন একটা কঠিন আর গোলমেলে মুহূর্তে আমাদের সব ক'টি 'রাব্‌ফাক' ছাত্রছাত্রীর কুরিয়াজে এসে হাজির হয়ে যাওয়াটা আমাদের কাছে একটা বিশেষ আনন্দের ব্যাপার ছিল। সবাই এসেছিল ওরা — ভারি, শক্তসমর্থ চেহারার বুরুন, যার প্রবল আবেগপ্রবণ প্রকৃতির ওপর জ্ঞানার্জনের ছাপ পরম সুখকরভাবে পড়তে শুরু করেছিল সেই সেমিওন কারাবানভ, পশুরোগ-চিকিৎসার সংকীর্ণ কাঠামোর মধ্যে যার পরিব্যাপ্ত প্রকৃতি নিজেকে আঁটিয়ে নিতে সমর্থ হয়েছিল সেই আন্তন ব্রাত্‌চেঙ্কো, প্রসন্ন আনন্দে-ভরা মাত্‌ভেই বেলুখিন, গম্ভীর ইস্পাত-কঠিন অসাদ্‌চি, বুদ্ধিজীবী ও সত্য-সন্ধানী ভের্‌শ্‌নেভ, কালোচোখো বুদ্ধিমতী মেয়ে মারুসিয়া লেভ্‌চেঙ্কো, নাস্তিয়া নচেভ্‌নায়া, 'ইর্‌কুত্‌স্কের গভর্নরের ছেলে' গেওর্গিয়েভ্‌স্কি, শনাইদের, ক্রাইনিক, গোলস, আর সবশেষে নাম করলেও যে মোটেই তুচ্ছ নয়, আমার সেই প্রিয়পাত্র ও 'ধর্মসন্তান' সপ্তম মিশ্র বাহিনীর দলপতি আলেক্‌সান্দর জাদোরভ। সপ্তম মিশ্র বাহিনীর অপেক্ষাকৃত বয়স্ক সদস্যদের ওই সময়ে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই 'রাব্‌ফাক' থেকে স্নাতক হয়ে বেরুনোর কথা। আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে 'ভ. উ. জ'*-এও ওরা ভালো ফল দেখাবে। অবশ্য আমরা ওদের উচ্চশিক্ষার্থী হিসেবে যত-না গণ্য করতুম তার চেয়ে বেশি করে গণ্য করতুম কলোনি-বাসিন্দা হিসেবে। শিক্ষাক্ষেত্রে ওদের কৃতিত্বের তালিকা নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো সময়ও ছিল না তখন। যাই হোক, প্রথম প্রীতি-সম্ভাষণ ইত্যাদির উচ্ছ্বাস কমলে পর আমরা সবাই ফের 'পাইওনিয়র কর্নার'-এ

* 'ভ. উ. জ' — উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। — অনুঃ

ফিরে এলুম। টেবলের কাছে গিয়ে একখানা চেয়ারে ভালোমতো জাঁকিয়ে বসে কারাবানভ অতঃপর শুরু করলে:

'আমরা ব্যাপারটা বুঝেছি, আন্তন সেমিওনভিচ — দিনের আলোর মতনই এটা স্পষ্ট। ব্যাপারটা হল, হয় করব নয় মরব! আর তাই আমরা এসেছি!'

কুরিয়াজে আমাদের ওই প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা 'রাবফাক' ছাত্রছাত্রীদের খুলে বললুম আমরা। শুনতে-শুনতে ওরা ভুরু কোঁচকাল, উদ্বিগ্নভাবে চারিদিকে তাকাতে লাগল আর মেঝেয় চেয়ারের পায়া ঘষে আওয়াজ করতে লাগল। চোখদুটো কুঁচকে চিন্তিতভাবে জানলার বাইরে তাকিয়ে জাদোরভ বললে:

'না-না, গায়ের জোর খাটিয়ে কাজ হবে না। ওরা সংখ্যায় অনেক!'

প্রকাণ্ড চওড়া কাঁধদুটো ঝাঁকিয়ে হাসল বুরুন। বলল:

'বুঝলি, সাশা, আসলে সংখ্যায় ওরা বেশি নয়। ওটা আসল ব্যাপারই নয়! ওরা-যে সংখ্যায় অনেক সেটা কোনো কথা না, আসল কথা হল — ধুত্তেরি ছাই — কোন জিনিসটাকে-যে পাকড়ে ধরা যাবে তা-ই বোঝা যাচ্ছে না। তুই বলছিস, ওরা সংখ্যায় অনেক, কিন্তু তারা কোথায়? কোথায় তারা? পাকড়ে ধরবি-যে এমন কাকে পাবি? এক-আধজনকে নয়, ঝাঁকবাঁধা অবস্থায় ওদের পাকড়ানো দরকার। কিন্তু ঝাঁকবাঁধা অবস্থায় ওদের পাচ্ছিস কোথায়?'

ঘরে ঢুকে গুলিয়ায়েভা আমাদের কথা শুনছিল। অল্প হেসে কারাবানভের সন্দেহভরা চোখের দৃষ্টিকে ঠেকিয়ে এবার সে বলল:

'অদেরে সকলরে একসাথে কখনোই পাবেন না! কোনোদিন না!..'

'কখনোই পাব না, তাই কি?' চটে উঠে সেমিওন বলল। ''কোনোদিন না' বলতে কী বোঝাতে চাইছেন আপনি? একসাথে ওদের ধরবই আমরা! দু'শো আশি জনকে যদি বাগে আনতে না পারি তো এক শো আশিজন বাগে আসবে নিশ্চয়ই। আর তারপর দেখাব — কত ধানে কত চাল। কিন্তু এখেনে বসে শুধু কথা বলে লাভ কী?'

সবাই মিলে একটা কর্মসূচি ঠিক করা গেল। ঠিক হল, ওদের দুপুরের খাবার দেব আমরা। কুরিয়াজবাসীরা এতক্ষণে সত্যিসত্যিই ক্ষুধার্ত হয়েছে, সবাই ওরা এজমালি শোবার ঘরগুলোয় জড় হয়ে দুপুরের খাবারের জন্যে অপেক্ষা করছে। হতভাগাগুলোকে খেতে দেয়া হোক। তারপর যখন তারা খেতে থাকবে তখন আমরা সবাই এজমালি ঘরগুলোয় ঘুরে-ঘুরে প্রচারকার্য

চালাব। ওদের — শোরের বাচ্চাদের — সরাসরি বলতে হবে, মিটিঙে আয় দেখি, তোরা কি মানুষ, না মানুষ নামের যোগ্য নোস? আয়! এ তোদের নিজেদের স্বার্থ, জন্তু কোথাকার! নতুন একটা জীবন শুরু হতে চলেছে তোদের, আর তোরা কিনা আরশোলার মতো আলো দেখলেই ছুটে পালাচ্ছিস! এসব কথায় কেউ যদি পাল্টা মেজাজ দেখানোর কিংবা গায়ের জোর ফলানোর চেষ্টা করে, তাতে উত্তেজিত হয়ে ওঠার দরকার নেই। শুধু এই কথাটাই বললে হবে যে একপাত্তর বর্শ্চ সামনে নিয়ে যে-কেউ বীরপুঙ্গবের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে, তার চেয়ে মিটিঙে আয় দেখি, এসে বল্ কী চাস তুই... এইটুকুই এখনকার মতো যথেষ্ট। ঠিক হল তাহলে দুপুরের খাওয়ার পর আমরা মিটিঙ শুরু হওয়ার ঘণ্টা বাজিয়ে দেব।

জনা-বিশেকের মতো কুরিয়াজ-বাসিন্দা রান্নাঘরের দরজার আশপাশে বসে-বসে খাবার কখন দেয়া হয় তারই অপেক্ষায় ছিল। দেখলুম, মিশা অভ্চারেঙ্কো দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে আর তার আগের দিন লালচুলো যে-ছোকরাটি আমার নাম জিজ্ঞাসা করেছিল তাকে ধরে নীতিশাস্ত্রের বচন আওড়াচ্ছে। শুনতে পেলুম ও বলছে:

'যে কাজ করে না তার খাবার পাবার কোনো অধিকার নাই, আর তুই কিনা আমারে বুঝাতে চাস যে অধিকার আছে। কোনো কিছুতেই অধিকার নাই তোর। বুঝলি, ইয়ার! যদি তোর ঘাড়ের উপরি মাথা বলি কোনো পদাথ্থ থাকে, তাইলে একথাটা তোর পরিষ্কার বোঝা উচিত। আমি তোরে কিছু খাতি দিতি পারি কিন্তু সেটা হবে আমার ভালোমানুষির নমুনা, বুঝলি ছোঁড়া! কেননা তুই খাবার পাবার অধিকার অজ্জন করিস নাই, বুঝলি তো ইয়ার! পেত্যেকেরেই খাট্যে খাতি লাগবে, আর তুই কিনা ছোঁড়া নেহাত পরের ঘাড়ে বসি খাওয়ার লোক। আমি তোরে বড় জোর ভিক্ষা দিতি পারি, এই পের্যন্ত।'

লালচুলো ছেলেটা কিন্তু ক্রুদ্ধ বুনো জানোয়ারের মতো একটা চোখ দিয়ে মিশাকে দেখছিল। ছেলেটার আরেকটা চোখ ছিল বন্ধ। বাস্তবিক, তার আগের দিন লালচুলো ছেলেটার মুখের যে-চেহারা দেখেছিলুম ইতিমধ্যে তার প্রভূত পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। মুখখানার কিছু-কিছু অংশবিশেষ রীতিমতো ফুলে গিয়েছিল আর নীলচে রঙ ধারণ করেছিল, আর ওপরের ঠোঁট আর ডান গালটা রক্তে মাখামাখি হয়ে ছিল। এসব দেখেশুনে আমার অধিকার

জন্মাল মিশা অভ্‌চারেঙ্কোকে এই অতি-গুরুতর প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করার:

'বলি, এ-সমস্তর মানে কী? কে ওর মুখে আলপনা এঁকেছে?'

শুনে মিশা গম্ভীরভাবে একটু হাসল। কিন্তু তারপর যা বলল তাতে ওকে প্রশ্নটা যে-ভাবে করা হয়েছে তার সঠিকতা নিয়েই যেন আপত্তি তুলল বলে মনে হল। মিশা বলল:

'আমারে শুধাতেছেন ক্যানে, আন্তন সেমিওনভিচ? ওয়া তো আমার থোত্‌না না, ওয়া খোভ্‌রাখের থোত্‌না। আমারে যে-কাজের ভার দেয়া হয়েছে আমি তা-ই করে যেতেছি। তবে হ্যাঁ, ডিরেক্টর হিসাবে আপনেরে আমি এ-ব্যাপারি এট্টা বিস্তারিত রিপোর্ট দিতি প্রস্তুত। শোনেন, ভোলখভ আমারে কয়েল: 'দরজায় দাঁড়ায়ে থাক, খবদ্দার কেউ যেন পাকশালে না ঢোকে!' তা, সেই থেকে আমি দরজায় দাঁড়ায়ে রয়েছি, এখনও তাই আছি। আমি কী ওরে তাড়া করেছি? পিছুপিছু ধাওয়া করি এজমালি শোবার ঘরে ঢুকেছি? না ওরে খোঁচাখুঁচি করেছি? কিচ্ছুটি না! নিজমুখে খোভ্‌রাখ বলুক যে ওরে আমি কিছু করেছি! ওরা সবাই সেই থেকে বিনা কাজে এখেনে ঘুরঘুর করতেছে — কে জানে, হতি পারে হয়তো ও কোনো কিছুতি গুঁতা খায়েছে!'

ইতিমধ্যে খোভ্‌রাখ হঠাৎ গোঙাতে শুরু করে দিয়েছিল। এখন মাথা ঝাঁকিয়ে মিশার দিকে ইঙ্গিত করে নিজের বক্তব্য বলতে শুরু করল:

'আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখ্যে নিব! ভাবতিছ আমাদেরে উপাস করানোর অধিকার আছে তোমাদের, ঘুসাঘুসি মারার অধিকার আছে, কেমন? আমারে তুমি চিনো নাই এখনও, কেমন? ঠিক আছে, সময়ে ঠিকই চিনতি পারব্যো!..'

তখনও পর্যন্ত মারামারিতে কে-যে পূর্বপক্ষ তা বোঝা যাচ্ছিল না, ফলে ব্যাপারটা নিয়ে আমাকে একটু মাথা ঘামাতে হল। এই ধরনের অস্পষ্ট ঘটনার নিদর্শন ইতিহাসে বিরল নয় এবং এদের মীমাংসা যে সর্বদাই অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার তা আমার জানা ছিল। ফলে সতর্কভাবে একটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করলুম। বললুম:

'ওকে মারলে তুমি কোন অধিকারে, শুনি?'

তখনও হাসতে-হাসতে আমার দিকে ফিন্‌দেশী একখানা ছুরি বাড়িয়ে ধরল মিশা। বলল:

'দেখেন — এইখান হল গিয়ে যারে কয় 'ফিন্‌কা'। কোথা থেকে ছুরিখান পেয়েছি বলি আপনের ধারণা? আপনে কি ভাবতিছেন খোভ্‌রাখের কাছ থেকে এডা চুরি করেছি আমি? শোনেন বলি, গোড়ায় অনেক বক্তিমে হল। ভোলখভ কয়েল কেউ যেন পাকঘরে না ঢোকে। তা, আমি এই জায়গা ছেড়ে কোথাও নড়ি নাই, ইদিকে ও ছোঁড়া ওর 'ফিন্‌কা' বাগায়ে ধরি আমার দিকি তেড়ে এয়েল, বলল, 'আমারে ঢুকতি দ্যাও!' তা, আমি অবশ্য ঢুকতি দেলাম না। কিন্তু ও ফের কয়েল, 'ঢুকতি দ্যাও আমারে,' তারপর আমারে ধাক্কা দিয়ি যাবার চেষ্টা করেল। পাল্‌টা আমিও ওয়ারে এট্টা ধাক্কা দিয়েলাম বটে। ছোট্ট করি এট্টা ধাক্কা, বোঝলেন আন্তন সেমিওনভিচ! তা, ওডা, আহাম্মকডা, করল কী, ওর 'ফিন্‌কা'খান নাচাতি লাগল। ও ছোঁড়া শৃঙ্খলা কারে কয় তার নামগন্ধও জানে না। ঠিক যেমন গাছের গঁুড়ি এমনি মোটাবুদ্ধি...'

'সে যাই হোক, তুমি ওকে মেরেছ-যে তাতে ভুল নেই! দেখেছ — রক্তে ভেসে গেছে ছেলেটা! এটা নিশ্চয়ই তোমার ঘুসির কারদানি?'

কেমন যেন থতমত খেয়ে নিজের হাতদুটোর দিকে তাকাল মিশা। বলল:

'তা আমার তো বটেই, আর কার হতি যাবে কন? আমি কিন্তু জায়গা ছেড়ে নড়ি নাই। ভোলখভ আমারে এখেনে দাঁড়াতি কয়েল, তো আমি দাঁড়ায়ে আছি তো আছিই। অবশ্য খোভ্‌রাখ আহাম্মকডা ওর হাত দুইখান নাড়াচাড়া করেল কয়েকবার...'

'আর তুমি হাত নাড়াও নি, বলতে চাও?'

'তা, হাত নাড়াতি কেউ তো আমারে মানা করে নাই, করেল কি? তবে আমি কিন্তু জায়গাটি ছেড়ে নড়ি নাই। এতক্ষণ এক জায়গায় খাড়া দাঁড়ায়ে আছি, তা একবারও পা বদলাতি কিংবা হাতখান ঘুরি থাকলে তা সোজা করতি পারব না নাকি? তা, ও যদি আমার উপর এসি পড়ে, সেও কি আমার দোষ? তুই কোথায় যেতেছিস তা চেয়ে দেখবি তো একবার, নাকি খোভ্‌রাখ? ধর্‌, একখান রেলগাড়ি আসতিছে... টেরেন আসতি দেখলি তুই একধারে সরে দাঁড়ায়ে অপেক্ষা করবি তো, নাকি? কিন্তু তুই যদি লাইনের উপর খাড়া হয়ি 'ফিন্‌কা' বাগায়ে রয়ে যাস, তাইলে উপায়ডা কী হবে? টেরেন তো তার বাঁধা লাইন ছেড়ে নড়তি পারবে না, আর তুইও হয়ি যাবি এট্টা রক্তমাংসের দলা। কিংবা ধর্‌, একখান মেশিন চলতিছে, তা তোরে তো মেশিনের কাছি

সাবধানে আটঘাট বান্ধে যেতি লাগবে, নাকি? তুই তো দুদু-খাওয়া খোকাটি নোস!'

দিব্যি খোশমেজাজে খোভ্‌রাখকে কথাগুলো বুঝিয়ে বলতে লাগল মিশা। মাঝে-মাঝে কথায় একেবারে, যাকে বলে, মধু ঢেলে। আর বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে ডান হাতখানা নেড়ে-নেড়ে দেখাতে লাগল কীভাবে ট্রেন আসছে আর ট্রেন আসার সময় খোভ্‌রাখের কোথায় দাঁড়ানো উচিত, এইসব। খোভ্‌রাখও ওর কথা শুনতে লাগল নিঃশব্দে মনোযোগ দিয়ে আর মে-মাসের রোদ্দুরের তাপে তার গালে-মুখে মাখানো রক্ত জমাট বাঁধতে শুরু করল। আমাদের 'রাব্‌ফাক' ছাত্রছাত্রীদের দলটাও গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মিশার বক্তৃতা শুনছিল। মিশার অসুবিধেজনক অবস্থা ও তার যুক্তিতে নিহিত সহজ কাণ্ডজ্ঞান ওরা বেশ উপলব্ধি করছিল বলেই মনে হচ্ছিল।

আমরা যখন কথা বলছি তখন জনকয়েক কুরিয়াজ-বাসিন্দা ছেলেও কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। ওদের চোখমুখ দেখে টের পাওয়া যাচ্ছিল যে মিশার যুক্তিতর্কে ওরা রীতিমতো মুগ্ধ হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে মারামারিতে জেতায় মিশার যুক্তি ওদের কাছে আরও বিশ্বাসযোগ্য ঠেকছিল। আমার এইসব নতুন ছাত্রের মুখেচোখে এমন কিছু লক্ষণ ফুটে উঠেছিল যা দেখে ওদের অভিব্যক্তি আমার কাছে বেশি বোধগম্য হয়েছিল। বিশেষ করে আমার কৌতূহল জেগেছিল ওদের মুখেচোখে বিদ্বেষভরা ইচ্ছাপূরণের খুশির অস্পষ্ট ঝিলিক লক্ষ্য করে, যা টেলিগ্রামের ঝাপসা অক্ষরের মতো সাতপুরু ময়লা আর বর্‌শ্চ স্যুপের দাগের তলা থেকে উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করেছিল। কেবল একটিমাত্র মুখে — ভানিয়া জাইচেঙ্কোর মুখে — যেন উৎসবের দিনের স্লোগানের মতোই জ্বলজ্বলে অক্ষরে ফুটে উঠেছিল উল্লাস আর প্রতিহিংসার চিহ্ন। হাতদুটো ট্রাউজার্সের কোমরবন্ধের মধ্যে পুরে দিয়ে আর জুতোছাড়া খালি পাদুটো বেশ খানিকটা ফাঁক করে নিজের 'ঝাঁক'-এর সামনে দাঁড়িয়ে ধারালো হাসি-হাসি চোখে খোভ্‌রাখের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল ভানিয়া। হঠাৎ মাটিতে পা ঠুকে আর বাচ্চা ছেলের মতো হালকা ছিপছিপে দেহটাকে সজোরে পেছনদিকে হেলিয়ে দিয়ে ও বলে উঠল — না, ঠিক কথা বলল না যেন সুর করে ছড়া কাটল:

'তাইলে দেখা যাতিছে তর থুত্‌নিতি কেউ ঘুসো ঝাড়লি তর মোট্টেও ভালো লাগে না, তাই না, খোভ্‌রাখ?'

'তুই চুপ যা, মশা কাঁহাকা!' গোমড়ামুখে বলে উঠল খোভ্‌রাখ। ওর গলার আওয়াজ একেবারে নিষ্প্রাণ শোনাল।

'হা-হা-হা! অর পছন্দ হয় নাই!' খোভ্‌রাখের দিকে আঙুল উঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ভানিয়া। 'ওয়ারা অর থুত্‌নিতি মোক্ষম একখান ঘুসো ঝাড়িছে, আর কিছু না!'

জাইচেঙ্কোকে তাড়া করার উদ্যোগ করল খোভ্‌রাখ। কিন্তু সেই মুহূর্তে কারাবানভ শুধু তার হাতের থাবাখানা খোভ্‌রাখের কাঁধে রাখল। আর সঙ্গে সঙ্গে কাঁধ সহ খোভ্‌রাখের শহুরে পোশাক-পরা গোটা দেহখানাই কুঁচকে গেল যেন। ভানিয়া কিন্তু খোভ্‌রাখের তাড়ায় এতটুকু ভয় পায় নি, কেবল সে মিশা অভ্‌চারেঙ্কোর আরেকটু কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল, এইমাত্র। খোভ্‌রাখ ইতিমধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে সেমিওনকে এক-নজর দেখল, তারপর সাংঘাতিক মুখবিকৃতি করে প্রাণপণে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। সেমিওন এতে সদয়ভাবে একটুখানি হাসল মাত্র। ওদিকে খোভ্‌রাখের বিতৃষ্ণা-জাগানো কটা চোখদুটো কোটরের মধ্যে একবার ঘুরপাক খেয়ে ভানিয়ার চোখের ওপর এসে থামল। অন্য সময়ের মতো তখনও ভানিয়ার চোখদুটো উৎসাহে আর খুশিতে ঝলমল করছিল। স্পষ্ট বোঝা গেল কেমন যেন থতমত খেয়ে গেছে খোভ্‌রাখ। নিজের খুশিমতো যা ইচ্ছে করার ব্যাপারে ব্যর্থতা আর কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের কাছ থেকেও বিচ্ছিন্নতা, গালে-মুখে মাখানো, তখনও পর্যন্ত পুরোপুরি জমাট বাঁধে নি এমন চাপ-চাপ রক্ত, মিশার বক্তৃতা আর কারাবানভের হাসি — এই সবকিছু হজম করা আর এ-নিয়ে চিন্তা করার জন্যে কিছুটা সময় পাওয়ার দরকার ছিল ওর। আবার জঘন্য (এমন কি ঘৃণ্যও বলা চলে এমন) ভানিয়াটাকে উপেক্ষা করা আর ওর স্বভাবসিদ্ধ উদ্ধত প্রাণঘাতী জ্বলন্ত দৃষ্টিটাকে নরম করে আনাও শক্ত হচ্ছিল। ভানিয়া কিন্তু প্রচণ্ড বিদ্রুপের ভঙ্গি করে খোভ্‌রাখের এই জ্বলন্ত দৃষ্টিকে দিল উড়িয়ে। বলল:

'ওরে বাবা, কী সাংঘাতিক!.. আজ রাত্তিরি ভয়ে আমার ঘুম হবে না দেখত্যেছি... উঃ, কী ভয়ডাই যে লাগতিছে আমার!'

শুনে গোর্কিপন্থী আর কুরিয়াজ-বাসিন্দার দুটো দলই হেসে উঠল হো-হো করে।

'শোরের বাচ্চা কাঁহাকা!' হিস্‌হিসিয়ে বলল খোভ্‌রাখ। তারপর খাঁটি

রাস্তার গ্‌ন্ডার ভঙ্গিতে ভানিয়ার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি হল।

আমি ডাকল্‌ম, 'খোভ্‌রাখ!'

'কী?' পেছনদিকে ঘাড় ঘ্‌রিয়ে শ্‌ধোল ও।

'এদিকে এস!'

আমার কথা মান্য করার জন্যে ওর তেমন কোনো ব্যস্ততা দেখল্‌ম না। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে দ্‌ই পকেটে হাত প্‌রে পকেট হাতড়াতে-হাতড়াতে ও কেবল স্থির দ্‌টো চোখ মেলে আমার ব্‌টজোড়ার দিকে তাকিয়ে রইল। গলাটাকে আরেকটু ধারালো আর কঠিন করে নিয়ে বলল্‌ম:

'কাছে এস বলছি!'

চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে আছে। খালি পেতিয়া মালিকভ 'উঃ' করে একটা ভিতু-ভিতু আওয়াজ তুলল।

নিচের ঠোঁটটা ঝুলিয়ে দিয়ে আর একদ্‌ষ্টে তাকিয়ে আমায় ভয় দেখানোর চেষ্টা করতে-করতে কাছে এগিয়ে এল খোভ্‌রাখ। আমার কাছ থেকে দ্‌'পা দ্‌রে এসে থামল ও, তারপর আগের দিনের মতো পাদ্‌টো দোলাতে লাগল।

চে'চিয়ে বলল্‌ম, 'অ্যাটেন্‌শন!'

'অ্যাটেন্‌শন — মানে কী ওয়ার?' বিড়বিড় করে বলল খোভ্‌রাখ। তা সত্ত্বেও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাতদ্‌টো পকেট থেকে বের করে আনল ও। তবে উস্কানি দেয়ার ভঙ্গিতে আঙ্‌লগ্‌লো ছড়িয়ে দিয়ে ডান হাতখানা পাছার ওপর রাখল।

সঙ্গে সঙ্গে হাতখানা নামিয়ে দিল কারাবানভ।

বলল, 'শোন ছেলে, যখন তোমাকে অ্যাটেন্‌শন হয়ে দাঁড়াতে বলা হবে তখন হোপাক নাচ নাচা ঠিক হবে না... মাথা উ'চু করে দাঁড়াও!'

খোভ্‌রাখ ভুর্‌ কোঁচকাল। তবে দেখল্‌ম ক্রমশ ও ধাতস্থ হয়ে আসছে। বলল্‌ম:

'তুমি এখন গোর্কি'পন্থী। কমরেডদের মর্যাদা দেয়া শিখতে হবে তোমায়। ছোট বাচ্চাদের এখন থেকে আর তুমি জ্বালাতন করবে না, কেমন তো?'

গম্ভীরভাবে চোখ পিটপিট করতে-করতে নিচের ঠোঁটখানা সামান্য একটু কাঁপিয়ে হাসির ভঙ্গি করল খোভ্‌রাখ। আমার শেষের প্রশ্নটার মধ্যে কোমল ভাবের চেয়ে শাসানির ভাব প্রকাশ পেয়েছিল বেশি। আমি বেশ ব্‌ঝতে পারছিল্‌ম যে খোভ্‌রাখ এটা লক্ষ্য করেছিল। সংক্ষেপে জবাব দিল ও:

'ঠিক আছে!'

'আ মোলো যা, ঠিক আছে নয় বল্ 'ঠিক হ্যয়'!' বেলুখিনের জোরালো চড়া গলা শোনা গেল।

বাহ্য ভদ্রতার বিন্দুমাত্র ধার না-ধেরে কাঁধদুটো ধরে খোভ্রাখকে নিজের দিকে ফিরিয়ে দিল মাত্ভেই, ওর ঝুলে-থাকা হাতের পাতাদুটোয় একই সঙ্গে দুটো চাপড় লাগাল, তারপর স্যালুটের ভঙ্গিতে কায়দাদুরস্তভাবে ওর একখানা হাত তুলে ধরে একটি-একটি করে নিচের কথাগুলো উচ্চারণ করল:

'ঠিক হ্যয় — কচি বাচ্চাদেরকে আর মারধর নয়! নে, কথাগুলো বল্ দেখি!'

খোভ্রাখের মুখখানা ঝুলে পড়ল। ও বলল:

'দোস্ত্-সব, আমারে নিয়ি পড়েছ ক্যানে? কী করেছি আমি? আমি তো বিশেষ কিছুই করি নাই। ও-ই তো আমার থুত্নিতি ঘুসো ঝাড়েছে — আমি না, ও-ই! আমি কিছুই করি নাই...'

কুরিয়াজ-বাসিন্দারা এবার মজা পেয়ে আরও কাছে ঘেঁষে এল। হাত বাড়িয়ে খোভ্রাখের কাঁধটা জড়িয়ে ধরে কারাবানভ এবার আন্তরিকতার সুরে বলল:

'ইয়ার! তুমি তো দোস্ত্ চালাক ছেলে! বুঝলে না, মিশ্কা ডিউটিতে বহাল আছে, ও সবার স্বার্থ দেখছে, শুধু ওর নিজের স্বার্থ না। চল দেখি, আমার সাথে জঙ্গলে চল, সব কথা আমি বুঝিয়ে বলব-নে...'

জঙ্গলের দিকে রওনা দিল ওরা। আর ওদের পিছুপিছু চলল নৈতিক সমস্যা নিয়ে হাতেখড়িতে উৎসুক একপাল ছেলে।

ভোলখভ এতক্ষণে নির্দেশ দিল খাবার পরিবেশনের। মুখে একজোড়া লম্বা গোঁফ নিয়ে মাথায় শাদা টুপি-পরা রাঁধুনিটি এতক্ষণ মিশার পেছন থেকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। এবার সে ভোলখভের দিকে সাগ্রহে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মতি জানিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ভানিয়া জাইচেঙ্কো তার 'ঝাঁক'-এর ছেলেদের জামার হাতায় সজোরে টান দিয়ে দ্রুত ফ্যাঁসফ্যাঁস করে বললে:

'দ্যাখ্, দ্যাখ্, রাঁধুনি শাদা টুপি মাথায় দেছে! এয়ার মানে কিছু ধরতি পেরেছিস তিম্কা? কী বুঝেছিস ক' দেখি?'

হঠাৎ লাল হয়ে উঠে চোখদুটো নামিয়ে তিম্কা বলল:

'এইডা ওয়ার নিজির টুপি। ওয়ার এট্টা টুপি ছেল বলি জানতাম!'

বিকেল পাঁচটায় সাধারণ সভা বসল। 'রাব্‌ফাক'এর ছাত্রছাত্রীদের প্রচারের দৌলতেই হোক কিংবা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, কুরিয়াজের বাসিন্দারা বেশ ভালোরকম সংখ্যায় ক্লাবঘরে এসে হাজির হল। আর তারপর, ভোলখভ যখন মিশা অভ্‌চারেঙ্কোকে ঘরের দরজায় দাঁড় করিয়ে দিল আর অসাদ্‌চি ও শেলাপ্‌তিন সেই অপরিহার্য শিক্ষা-সংক্রান্ত পদ্ধতির, অর্থাৎ বিষয়ের ফর্দ তৈরির, কাজে নেমে সভায় উপস্থিত ছেলেমেয়েদের নাম টুকে নিতে শুরু করল, তখন যারা দেরিতে আসছিল তারা ধাক্কাধাক্কি করে ঘরে ঢুকে উদ্বিগ্নভাবে শুধোতে লাগল:

'যাদের নাম খাতায় ওঠে নাই তারা রাতের খাবার পাব্যে তো?'

পুরনো গির্জের কাঠামোর মধ্যে অপরিমার্জিত মানুষের এই ঠাসাঠাসি ভিড় ধরছিল না যেন। গির্জের বেদীর সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে এই অনাথ জনসমষ্টির মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলুম আমি। এর বিপুল সংখ্যা আর মুখভাবের ভয়াবহ শূন্যতা দেখে বিচলিত হয়ে পড়ছিলুম। ভিড়ের মধ্যে খুবই অল্প কয়েকটা জায়গায় মাত্র আগ্রহোদ্দীপক, প্রাণবন্ত মুখের দেখা মিলছিল, নিতান্তই এক-আধবার কানে আসছিল মানুষের কণ্ঠস্বর, শিশুর প্রাণখোলা হাসির আওয়াজ। হলের পেছনদিকে চুল্লীটার কাছ ঘেঁষে একটা জায়গায় সন্ত্রস্তভাবে চুপচাপ জড়ো হয়ে ছিল মেয়েরা। চারিদিকে পরনের জ্যাকেট, এলোমেলো চুলে-ভরা মাথা আর বাসি ছাতাধরা গন্ধের নোংরা সমুদ্রে হাঁ-করা মুখ, ঝাপসা চোখ আর থলথলে পেশীওয়ালা নিরুৎসুক আদিম মুখাবয়বগুলি জেগে ছিল প্রাণহীন বালুচরের মতো।

আমি ওদের কাছে যথাসম্ভব সংক্ষেপে গোর্কি কলোনি ও তার জীবনযাত্রা আর কাজকর্মের পরিচয় দিলুম। বর্ণনা দিলুম আমরা নিজেদের জন্যে কী-কী কর্তব্য নির্ধারিত করে নিয়েছি তার — জানালুম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, কাজকর্ম ও পড়াশুনোর মধ্যে দিয়ে আমাদের অর্জন করতে হবে নতুন জীবন, নতুনতরো মানবিক সুখ। বললুম, তোমরা বাস করছ এমন এক সুখী দেশে যেখানে জমিদার ও পুঁজিপতি নেই, যেখানে প্রতিটি মানুষ বেড়ে উঠতে পারে স্বাধীনভাবে, আনন্দময় শ্রমের মধ্যে দিয়ে বিকাশ ঘটাতে পারে নিজের। কিন্তু মনোযোগী ও সংবেদনশীল শ্রোতার সোৎসাহ সমর্থনের অভাবে শিগ্‌গিরই আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লুম। মনে হচ্ছিল যেন কতগুলো পোশাকের আলমারি, পিপে আর বাক্সের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছি। যখন ঘোষণা করলুম

যে কলোনি-বাসিন্দাদের কয়েকটা বাহিনীতে সংগঠিত হতে হবে, প্রতি বাহিনীতে বিশ জন করে সদস্য থাকবে আর আমার শ্রোতাদের বললুম দলপতি হিসেবে চোদ্দ জনকে বেছে নিতে তখন তারা চুপ করে রইল। জিজ্ঞাস্য কিছু থাকলে আমায় প্রশ্ন করতে বললুম যখন, তখনও চুপ করে রইল তারা। কুদ্‌লাতি এসে বেদীর সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বলল:

'তোমাদের কিন্তু লজ্জা হওয়া উচিত! দিব্যি তো রুটি, আলু আর বরশ্চ গেলতেছ, কিন্তু কেডা তোমাদের ও-সকলের যোগান দিবে শুনি? কে যোগান দিবে? যদি আমি তোমাদেরে কালকে দুপুরের খানা না দিই, তাইলি কী হয়?'

ওর এই প্রশ্নেরও কোনো উত্তর এল না।

চটে উঠল কুদ্‌লাতি। বলল:

'তাইলি আমি প্রস্তাব করতেছি যে আসচে কাল থেকে প্রেত্যেকেরে ছয় ঘণ্টা করি কাজ করা লাগবে। আ মোলো যা, মাঠে বীজ বুন্‌তি লাগবে যে! কী, তোমরা কাজ করতি চাও, না, না?'

জবাবে দূরের একটা কোণ থেকে একটিমাত্র গলা ভেসে এল:

'আমরা কাজ করব্য!'

যে-দিক থেকে গলার আওয়াজ শোনা গিয়েছিল গোটা জনতা ধীরে, অতি ধীরে সেইদিকে মাথা ঘোরাল। তারপর আবার নিস্পৃহ নিষ্প্রাণ মুখগুলো সামনের দিকে ফিরল।

আমি জাদোরভের দিকে তাকালুম। সে-দৃষ্টির জবাবে জাদোরভ শুধু হাসল, তারপর আমার কাঁধের ওপর হাতখানা রেখে বলল:

'কিচ্ছু ভাববেন না, আন্তন সেমিওনভিচ, সব ঠিক হয়ে যাবে!'

৪

'ঠিকই চলছে!'

গভীর রাত পর্যন্ত সেদিন কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের সংগঠিত করার কাজ চলল আমাদের। বাহিনীগুলো পাকাপোক্তভাবে তৈরি করে ফেলার উদ্দেশ্যে 'রাব্‌ফাক'এর ছাত্রছাত্রীরা এজমালি শোবার ঘরগুলোয় ঘুরে-ঘুরে ফের একবার

কলোনি-বাসিন্দাদের নামগুলো লিস্টিভুক্ত করে নিল। পরিস্থিতি মাপার গজকাঠি হিসেবে গোর্‌কভ্‌স্কিকে সঙ্গে নিয়ে এজমালি শোবার ঘরগুলোয় ঘুরতে লাগলুম আমিও। যৌথ জীবনচর্যার যে-কোনো প্রথম লক্ষণকে মোটামুটিভাবে হলেও খুঁজে বের করা, যে-কোনো ধরনের সম্ভবপর সামাজিক আসঞ্জনের চিহ্ন আবিষ্কার আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। একেকটা অন্ধকার এজমালি ঘরে ঢুকে শ্বাস টেনে-টেনে গন্ধ শুঁকে লোকের অস্তিত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা করতে লাগল গোর্‌কভ্‌স্কি, হেঁকে বলতে লাগল:

'এই, কে আছ! কও দেখি, এখেনে কোন ঝাঁক থাকে?'

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যেতে লাগল যে ঘরগুলোতে না-আছে ঝাঁক, না-আছে কোনো ঝাঁকের কই। ওরা — কুরিয়াজ-বাসিন্দারা — যে কোথায় পালিয়ে ছিল তা একমাত্র শয়তানই জানত! অতএব আশপাশে যাদের উপস্থিত থাকতে দেখছিলুম তাদেরই চেপে ধরে জানবার চেষ্টা করতে লাগলুম যে অমুক বা তমুক এজমালি শোবার ঘরে কারা-কারা থাকে, কে কার বন্ধু, কারা খারাপ ছেলে আর কারাই-বা ভালো, ইত্যাদি — কিন্তু উত্তর যা পেতে লাগলুম তাতে আমাদের খুশি হওয়ার বড়-একটা কারণ ছিল না। দেখা গেল, বেশির ভাগ কুরিয়াজ-বাসিন্দাই তাদের প্রতিবেশীদের এমন কি নামেও চেনে না, চেনে তাদের নিজেদেরই কৌতুকচ্ছলে-দেয়া 'কেনো', 'সুকতলা', 'মশা', 'ড্রাইভার' এইসব উপনামে, কিংবা বাইরের কোনো-কোনো বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। যেমন, একটা ঘরে একজন বললে:

'মুখে বসন্তের দাগওলা এট্টা ছোঁড়া এই বিছানাডায় শোয়, আর ভাল্‌কি'র এট্টা ছোঁড়া শোয় ওধারের বিছানায়।'

কোনো-কোনো জায়গায় অবশ্য সামাজিক সংযুক্তির কিছু-কিছু লক্ষণ খুঁজে পেলুম বটে, কিন্তু আমরা যে-ধরনের আসঞ্জনের সন্ধানে ছিলুম এগুলো সেরকম কোনো ব্যাপারই ছিল না।

তবে সেদিন রাত্রের মধ্যে কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের আসল প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা জন্মাল আমার।

কুরিয়াজের বাসিন্দারা অবশ্যই ছিল খাঁটি নিরাশ্রয় রাস্তার ছেলেপিলে, তবে হুবহু একেবারে মামুলি ধরনের নয়। যে-কোনো কারণেই হোক আমাদের সাহিত্যে ও আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের মনে রাস্তার নিরাশ্রয় ছেলে বায়রনের কবিতার এক ধরনের নায়ক-চরিত্রের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে

আছে। রাস্তার অনাথ ছেলে বলতে বোঝানো হয় মস্ত দার্শনিক আর রসিক এক ব্যক্তিকে, যে নাকি নৈরাজ্যবাদী আর ধ্বংসাত্মক কাজকর্মে লিপ্ত, যে রাস্তার গুন্ডা আর সবরকম নীতিশাস্ত্রের শত্রু। সন্ত্রস্ত ও ছিঁচকাঁদুনে শিক্ষা-বিজ্ঞানীরা সমাজবিদ্যা, আচরণবিদ্যা ও বাকি সমস্ত জাঁকালো শাস্ত্রের পেখম থেকে কমবেশি ঝলমলে নানা পালক ছিঁড়ে এনে তা-ই দিয়ে রাস্তার অনাথ ছেলের এই কল্পিত চরিত্রকে আরও সাজিয়ে তুলেছেন। এঁদের দৃঢ় বিশ্বাস যে রাস্তার নিরাশ্রয় ছেলেরা রীতিমতো সংগঠিত, নিজস্ব নেতাদের পরিচালনায় নিয়মিত শৃঙ্খলা মেনে চলে তারা, চুরিবিদ্যের রীতিমতো রণকৌশল জানা আছে তাদের আর আছে তাদের নিজস্ব নিয়ম-নীতি। পণ্ডিতেরা এমন কি 'স্বতঃস্ফূর্ত যৌথ'-এর মতো সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত পরিভাষায় ও অন্যান্য নানা বাছা-বাছা বিশেষণে ভূষিত করে থাকেন রাস্তার নিরাশ্রয় ছেলেপিলেদের।

রাস্তার নিরাশ্রয়ের এই নায়কোচিত চরিত্রটিকে আরও মনোহর করে দেখানো হয়েছে রুশ এবং বিদেশী সকল পণ্ডিতমূর্খের সাধু-উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রচনাবলীতে। এঁদের রচনায় সকল অনাথই হল চোর, মাতাল, লম্পট, নেশাখোর আর সিফিলিস-ব্যাধিগ্রস্ত। পৃথিবীর গোটা ইতিহাসে মহান পিটারই একমাত্র ব্যক্তি, যাঁর চরিত্রে ইতিপূর্বে এতগুলো সাংঘাতিক দোষ আরোপিত হয়েছে। আর এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে এর ফলেই পশ্চিম ইউরোপের কুৎসারটনাকারীদের পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের জীবনযাত্রা সম্পর্কে এত বেশি নির্বোধ আর মারাত্মক গালগল্প রটনা করা সম্ভব হয়েছে।

বস্তুত, সোভিয়েত ইউনিয়নে পরিত্যক্ত ও নিরাশ্রয় রাস্তার ছেলেপিলেদের জীবন একেবারেই ওই সব চলতি গালগল্পের অনুরূপ ছিল না।

আমাদের দেশে রাস্তাব নিরাশ্রয়দের একটা স্থায়ী সমাজ আছে আর তারা আমাদের রাস্তাঘাট ছেয়ে ফেলেছে তাদের বিশেষ মতাদর্শ আর সেইসঙ্গে তাদের মারাত্মক সব অপরাধ আর ছবির মতো মনোহারী বেশভূষা দিয়ে — এই তত্ত্বকথা দৃঢ়ভাবে বাতিল করে দেয়া দরকার। সোভিয়েতের রাস্তাঘাট আর বস্তি-জগতের নৈরাজ্যবাদীদের সম্পর্কে রোমান্টিক গালগল্প বানিয়েছে যারা তারা এই ব্যাপারটা খেয়াল করতে ভুলে গেছে যে গৃহযুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের যুগের পরে লক্ষ-লক্ষ অনাথ শিশুকে গোটা দেশটার প্রাণপণ যৌথ প্রয়াসের ফলে শিশুসদনগুলিতে খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছিল। এই সব ছেলেপিলে — বলতে গেলে প্রায় সব ক'টি ক্ষেত্রেই — বহুদিন আগেই

সাবালক হয়ে উঠেছে আর এখন তারা কাজ করছে সোভিয়েতের ফ্যাক্টরি আর রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে। এই ছেলেপিলেদের মানুষ করে তোলার ব্যাপারে আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি খুব নিখুঁতভাবে কাজ করেছিল কিনা সেটা অবশ্য অন্য ব্যাপার।

প্রধানত উপরোক্ত ওই রোমান্টিকদের দৌলতেই শিশুসদনগুলির কাজকর্ম অতটা অসন্তোষজনক হয়ে উঠেছিল এবং এর ফলেই মাঝে-মাঝে কুরিয়াজের ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছিল। অতএব ছেলেপিলেরা (এক্ষেত্রে শুধু ছেলেদের কথাই বিবেচনার মধ্যে ধরা হচ্ছে) যখন প্রায়ই ফের রাস্তায় পালিয়ে যেত, তখন তার অর্থ মোটেই এই ছিল না যে তারা স্থায়ীভাবে রাস্তায় বসবাস করার জন্যেই পালাচ্ছে কিংবা রাস্তাকেই তাদের স্বাভাবিক বাসস্থান বলে মনে করছে। সত্যিসত্যিই তাদের সুনির্দিষ্ট 'রাস্তার মতাদর্শ' বলতে কিছু ছিল না, কলোনি ছেড়ে তারা কেবল পালাত আরেকটা অপেক্ষাকৃত ভালো কলোনিতে কিংবা শিশুসদনে আশ্রয় পাবে এই ভরসায়। এ-উদ্দেশ্যে শিশুকল্যাণ-সংক্রান্ত নানা ধরনের কমিটি আর কমিশনের দরজায়-দরজায় ধর্না দিয়ে ফিরত তারা। তবে সবচেয়ে বেশি করে তারা যা চাইত তা হল এমন সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ঢুকতে যেগুলো তাদের সুযোগ করে দেবে পড়াশুনোর আশীর্বাদের উৎপাত এড়িয়ে আমাদের দেশের নির্মাণকর্মে যোগ দেয়ার। তবে এ-ব্যাপারে তারা যে বড়-একটা সফল হোত তা নয়। কারণ, জেদি একগুঁয়ে শিক্ষাবিজ্ঞানী-সম্প্রদায় তার শিকারকে এত সহজে আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে যেতে দিত না, তাছাড়া 'সামাজিক শিক্ষা'র যাঁতাকলে পেষাই হয় নি এমন কোনো মানবিক জীবন যে থাকতে পারে তা-ই সে-সম্প্রদায়ের কল্পনার বাইরে ছিল। কলোনি-পালানেরা তাই অপর কোনো কলোনিতে আশ্রয় নিলে সাধারণত তাদের বাধ্য করা হোত ফিরেফিরতি আরেকবার শিক্ষার ঘানি টানতে। অবশ্য এর হাত এড়াতে ফের একবার পালানোর পথও খোলা থাকত তাদের কাছে। এক কলোনি থেকে আরেক কলোনিতে হাত-বদল হয়ে যাওয়ার ফাঁকটাতে এই তরুণ নাগরিকরা অবশ্য রাস্তাতেই তাদের জীবন কাটাত। আর অবকাশ ও পেশাগত দক্ষতার অভাব, কিংবা মতাদর্শগত ও নৈতিক সমস্যাদি নিয়ে মাথা ঘামানোর উপযুক্ত লেখাপড়ার টেবিলের অভাবে ছেলেরা স্বভাবতই তখন নীতি বা আদর্শের সাহায্য ছাড়াই খাদ্য-সংগ্রহের মতো সমস্যার সমাধান নিজেরা করে নিত। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও অবশ্য রাস্তার

এই সব বাসিন্দার ক্রিয়াকলাপ যে নীতিশাস্ত্রের আনুষ্ঠানিক বিধিবিধানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল তা নয় — সাধারণভাবেই রাস্তার অনাথ ছেলেরা আনুষ্ঠানিক আচার-আচরণের কঠোরতা পালনের ব্যাপারে তেমন মনোযোগী ছিল না। উদ্দেশ্যসাধনের উপযোগী সুযোগসুবিধে কীভাবে করে নিতে হয় রাস্তার এই অনাথদের সে-সম্পর্কে কিছুটা-যে ধারণা ছিল না তা নয়, তদুপরি মনেপ্রাণে তারা বিশ্বাস করত যে ধাতু-কারিগর কিংবা মোটর-ড্রাইভারের পেশা সরাসরি তাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে। আর সে-লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে কেবল দুটো কাজ করা দরকার — তার মধ্যে একটা হল যত দীর্ঘদিন সম্ভব কোনোরকমে বেঁচেবর্তে থাকা, এর জন্যে মেয়েদের হাতব্যাগ কিংবা ভদ্দরলোকদের ব্রিফকেস ছিনিয়ে নেয়ার দরকার পড়লে তা-ও করা — আর দ্বিতীয়ত কোনো মোটর-গারাজ কিংবা যন্ত্রচালিত কোনো ওয়র্কশপের যত কাছাকাছি থাকা যায় তার ব্যবস্থা করা।

পণ্ডিতদের পুথিপত্রে বেশ কিছু চেষ্টা দেখেছি মানুষের চারিত্র্যবৈশিষ্ট্যের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে একটা সন্তোষজনক প্রণালী আবিষ্কারের। দেখেছি, রাস্তার নিরাশ্রয়দের সেখানে 'নৈতিকতার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য' ও 'খুঁতওয়ালা' চরিত্রের শ্রেণীতে ফেলার কী প্রাণপণ চেষ্টা। আমার মনে হয় এই সমস্ত শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে খার্‌কভের দ্‌জের্‌জিন্‌স্কি কমিউন হাতে-কলমে কাজের উপযোগী যে-শ্রেণীবিন্যাসের খসড়াটি তৈরি করেছিল সেটিই ছিল সবচেয়ে সেরা।

কমিউনটির কাজ চালানোর উপযোগী এই শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী রাস্তার অনাথদের তিনটে স্তরে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম স্তরভুক্ত ছিল তারাই যারা নিজেদের ভবিষ্যৎ ভাগ্যচক্র তৈরি করার ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে হাত লাগাত, ঝুট্‌ঝামেলা বা বিপদ-আপদে পিছু হটতে জানত না যারা। এরা ছিল তারাই যারা ধাতু-কারিগরের পেশার সন্ধানে চলন্ত রেলগাড়ির কামরার যে-কোনো অংশে একটুখানি ঠাঁই করে নেয়ার জন্যে সদাই উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। বলা বাহুল্য, কামরার ভেতরে যে থাকতেই হবে এমন কোনো দাবি ছিল না তাদের, বরং ছুটন্ত এক্সপ্রেস ট্রেনের বাইরে ঝুলে ঘূর্ণিঝড়ের আস্বাদ নেয়ার একটু বিশেষরকমেরই আকর্ষণ ছিল। আর ছিল তারা ডাইনিং কারের, শোবার আর পরিচর্যার ব্যবস্থার আকর্ষণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তৎসত্ত্বেও কিছু-কিছু লোক এই সব যাত্রীর নিন্দে করত এই বলে যে তারা নাকি ট্রেনগুলোর

আশপাশে ঘুরঘুর করত ক্রিমিয়ায় বায়ু-পরিবর্তন কিংবা সোচি-র খনিজ জলের আস্বাদ নেয়ার আশায়। কথাটা কিন্তু সত্যি নয়। প্রধানত যা ওদের মন ভোলাত আর হাতছানি দিত তা হল দ্‌নেপ্রপেত্রোভ্‌স্ক, দনেত্‌স্ক আর জাপরোজিয়ের বিশাল ফ্যাক্টরিগুলো, ওদেসা আর নিকলায়েভের জাহাজঘাটা আর স্টিমারগুলো এবং খার্‌কভ আর মস্কোর শিল্প-কারখানাগুলো।

এছাড়া, দ্বিতীয় স্তরের নিরাশ্রয় ছেলেপিলেরা নানারকম গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও উপরোক্ত প্রথম স্তরের যা বৈশিষ্ট্য সেইসব উদার নৈতিক গুণের অধিকারী ছিল না মোটেই। এরাও অবশ্য ছিল নানারকম পেশার সন্ধানী, তবে এরা কাপড়-কল আর চামড়ার কারখানা থেকে মোটেই অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে নিত না, বরং ছুতোরশালে, এমন কি পেস্টবোর্ড-তৈরির কারখানাতেও কাজ করতে যেত রাজি হয়ে। এদের মধ্যে এমনও কিছু-কিছু ছেলে পাওয়া যেত যারা ভেষজ লতাপাতা সংগ্রহ করার মতো কাজে যোগ দিয়ে নিজেদের খাটো করতে কুণ্ঠিত ছিল না।

এই দ্বিতীয় স্তরের ছেলেরাও ঘুরে বেড়াত, তবে এরা পছন্দ করত ট্রামগাড়ির পেছনের বাফারে চেপে বসে ঘুরতে। ফলে জ্‌মেরিন্‌কার চমৎকার রেল-স্টেশনটা যে কেমন দেখতে, কিংবা মস্কোর নিয়মকানুন যে কতখানি কড়া সে-সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না।

দ্‌জের্‌জিন্‌স্কি কমিউনের বাসিন্দারা সর্বদাই চাইত উপরোক্ত প্রথম স্তরের নাগরিকদের তাদের কমিউনের সদস্য করে নিতে। ফলে প্রধানত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলোয় প্রচার চালিয়েই তারা কমিউনের জন্যে নতুন ছেলেপিলে সংগ্রহ করত। দ্বিতীয় স্তরের ছেলেপিলেদের অত্যন্ত নিচুস্তরের বলে কমিউনটি গণ্য করত।

কিন্তু কুরিয়াজে যে-সব ছেলেপিলের প্রাধান্য ছিল তারা ওই প্রথম স্তরের তো নয়ই, এমন কি দ্বিতীয় স্তরেরও যোগ্য ছিল না। তারা ছিল এদের চেয়ে নিচু, অর্থাৎ তৃতীয় স্তরের। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মতো রাস্তার অনাথ ছেলেপিলেদের মধ্যেও উপরোক্ত প্রথম স্তরের মানুষজন বড় বেশি ছিল না, দ্বিতীয় স্তরের মানুষও হয়তো তার চেয়ে সামান্য কিছু বেশি ছিল — আসলে তাদের মধ্যে যাদের ছিল, যাকে বলে, বিপুল সংখ্যাধিক্য, তারা হল তৃতীয় স্তরের। আর এই বিপুল সংখ্যাধিক্যের দলে পড়ত যারা তারা কলোনি ছেড়ে পালাতও না, নতুন কোনো পেশাও খুঁজত না, কেবল নিতান্ত খোলা মনে

তাদের শিশুপ্রাণের কোমল পাপড়িগুলো মেলে ধরত 'সামাজিক শিক্ষা'র সাংগঠনিক প্রভাবের আওতায়।

কুরিয়াজে আমি এই তৃতীয় স্তরের ছেলেপিলের এক অপর্যাপ্ত সঞ্চয়ের সন্ধান পেয়ে গেলুম। তাদের সংক্ষিপ্ত পূর্ব-ইতিহাস হাতড়ে দেখা গেল যে ওই ছেলেরা তার আগে দুটো কিংবা তিনটে — কেউ-কেউ আবার সংখ্যায় একেবারে এগারোটা পর্যন্ত — শিশুসদন অথবা কলোনির হাত-ফেরতা হয়ে ওখানে এসে পৌঁছেছে। তবে এ-ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত সুখী ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের আকাঙ্ক্ষার ফল ছিল না, এটা ছিল জনশিক্ষা দপ্তরের কর্মীদের সৃষ্টিশীল ক্রিয়াকলাপের পরিণতি। কিন্তু ওই কর্মীদের এই সৃষ্টিশীল ভাবনা-ধারণা এতই অবোধ্য ছিল যে এমন কি শিক্ষিত চোখের পক্ষেও পুনর্গঠন, সংমিশ্রণ, অংশে-অংশে-বিভাজন, সংখ্যাপূরণ, ছাঁটাই, বিকাশসাধন, বাতিলকরণ, পুনর্নির্মাণ, বিস্তারসাধন, বৈশিষ্ট্যের স্বরূপনির্ণয়, প্রমিতকরণ, অপসারণ আর পুনঃঅপসারণ, ইত্যাকার ব্যাপারগুলোর মধ্যে সীমারেখা নির্ণয় করা কঠিন কর্ম ছিল।

আর যেহেতু আমিও কুরিয়াজে এসেছিলুম সেই পুনর্গঠনের উদ্দেশ্য নিয়েই সেইহেতু অনাথ ছেলেদের ঔদাসীন্যের সম্মুখীন হওয়াটা ছিল আমার পক্ষেও অপরিহার্য একটা ব্যাপার। বলা বাহুল্য, জনশিক্ষা দপ্তরের শিক্ষা-সংক্রান্ত তাস-ভাঁজাভাঁজির এই রীতির কবলে পড়লে প্রতিটি অনাথ ছেলের আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়ই ছিল তখন ঔদাসীন্যের এই ভঙ্গিটার আশ্রয় নেয়া।

দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষাদান-ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল এই অবিচল ঔদাসীন্য কিছু পরিমাণে শিক্ষাবিজ্ঞানের বিপুল শক্তির পরিচায়কও ছিল বৈকি।

প্রায় সব কুরিয়াজ-বাসিন্দারই বয়স ছিল তেরো থেকে পনেরো বছরের মধ্যে, তবু তারই মধ্যে পূর্বপুরুষদের চরিত্রের নানা বৈশিষ্ট্যের ছাপ যেন পড়ে গিয়েছিল তাদের মুখে। প্রথমেই যে-জিনিসটা নজরে পড়ত তা হল সমাজচেতনার বিন্দুমাত্র আভাসেরও সম্পূর্ণ অভাব। প্রায় জন্ম থেকেই 'সামাজিক শিক্ষা'র ঝাণ্ডার নিচে বেড়ে ওঠা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে এই অভাবটা লক্ষ্য না-করে পারা যেত না। তাদের প্রতিটি নড়াচড়ার মধ্যে লক্ষ্য করা যেত এক ধরনের আদিম, অবোধ, নিষ্ক্রিয় স্বতঃস্ফূর্ততার লক্ষণ, তবে সে-স্বতঃস্ফূর্ততা জীবনের প্রতিটি ব্যাপারে সরলভাবে সোজাসুজি সাড়া

দেয়ার মতো শিশুশোভন স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল না। আসলে জীবন যে কী বস্তু তাই-ই জানত না তারা, তাদের দৃষ্টির দিগন্ত সীমাবদ্ধ ছিল নানা-ধরনের খাদ্যবস্তুর ফর্দের মধ্যে আর সেই খাবারের দিকে তারা আকৃষ্ট হোত ঘুমঘুম, গোমড়ামুখো এক ধরনের অনৈচ্ছিক প্রতিক্রিয়ার বশে। তাদের জীবনের একমাত্র সমস্যা ছিল তাদেরই মতো একপাল বুনো জন্তুর ভিড় ঠেলে কী করে স্যুপের কড়াইটার দিকে এগুনো যায়। আর এই সমস্যার সমাধান ঘটাত তারা কখনও একটু বেশি কখনও-বা একটু কম সাফল্যের সঙ্গে। তাদের ব্যক্তিগত জীবনের পেন্ডুলামের এছাড়া অন্য কোনো ধরনের নড়াচড়া বলতে কিছু ছিল না। কুরিয়াজের বাসিন্দারা একমাত্র সেই সব জিনিসই হাতাত বিনা আয়াসে যা হাত-সাফাই করা সম্ভব ছিল, কিংবা যে-সব জিনিসের ওপর জনতা সহজাত প্রবৃত্তির বশে ঝাঁপিয়ে পড়ত। এই সব বাচ্চার ইচ্ছাশক্তি বলতে যা কিছু ছিল তা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বয়স্ক ছেলেদের উৎপীড়ন, মারধর আর গালাগালির দাপটে। বলা বাহুল্য, এই ছেলেদের দিব্যি বাড়বাড়ন্ত ঘটেছিল 'সামাজিক শিক্ষা'র 'হস্তক্ষেপ বর্জন' আর 'স্বতঃশৃঙ্খলা'র উর্বর জমিতে।

তাই বলে ওই বাচ্চারা যে জড়বুদ্ধি ছিল তা নয়। তারা ছিল ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে এক আজগবি পরিস্থিতির জালে আটকে-পড়া নিতান্তই সাধারণ সব ছেলেপিলে। তারা মানুষের-মতো-মানুষ হওয়ার আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, আবার সেইসঙ্গে রুচিকর না-হলেও দৈনিক খাদ্যের বরাদ্দের অভাব না-ঘটায় নিছক বাঁচার লড়াইয়ের সঞ্জীবনী প্রভাব থেকেও ছিল বঞ্চিত।

এই পটভূমিতে ভিন্ন প্রকৃতির কিছু-কিছু ছেলের কয়েকটা দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। যে-এজমালি শোবার ঘরখানায় খোভ্রাখ থাকত স্পষ্টত সেটাই ছিল বয়স্ক ছেলেদের সদর-দপ্তর। আমার ছেলেদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলুম যে ওই ঘরখানায় ওরা সংখ্যায় ছিল পনেরো জন আর ওদের সর্দার ছিল কোরত্কভ বলে কে একটা ছেলে। ছেলেটাকে আমি অবশ্য তখনও পর্যন্ত চোখে দেখি নি, কারণ কুরিয়াজ-বাসিন্দারা তাদের বেশির ভাগ সময়টাই কাটাত শহরে। এই ছেলেদের মধ্যে এভ্গেনিয়েভের কিছু-কিছু পূর্ব-পরিচিত ছেলেও ছিল। সে আমাকে জানাল, ছেলেগুলো হচ্ছে শহরের সাধারণ চোর, নেহাত রাত্রে মাথাগোঁজার একটা আস্তানার জন্যে

কলোনিতে থাকার দরকার হচ্ছে তাদের। ভিত্‌কা গোর্‌কভ্‌স্কি কিন্তু এভ্‌গেনিয়েভের এই ধারণার সঙ্গে একমত হল না। সে বলল:

'ওদের চোর বলতেছিস কেন? ওরা তো নেহাত রকবাজ ছেলেপিলে!..'

ভিত্‌কার খবর ছিল এই যে কোরত্‌কভ, খোভ্‌রাখ, পিয়েরেত্‌স, চুরিলো আর পদ্‌নেবেস্‌নিরা তাদের প্রায় সব কাজ-কারবারই চালাত কলোনির মধ্যে। প্রথমেই তারা মাস্টারমশাইদের ঘর, ওয়র্কশপ আর ভাঁড়ারঘরগুলো ফাঁক করে দিয়েছিল। তাছাড়া অন্যান্য কলোনি-বাসিন্দার কাছ থেকেও চুরি করার মতো কিছু-না-কিছু জিনিস পেত তারা। যেমন, পয়লা মে উপলক্ষে ছেলেদের অনেকেই নতুন বুটজুতো পেয়েছিল, আর গোর্‌কভ্‌স্কির মতে এই বুটজোড়াগুলোই হয়ে দাঁড়িয়েছিল পূর্বোক্ত দলটার লুটপাটের প্রধান লক্ষ্য। এছাড়াও ওই ছেলেরা গাঁয়ে ঢুকে চুরিচামারি করত, এমন কি তাদের মধ্যে কেউ-কেউ বড়রাস্তায় রাহাজানি করতেও পিছ-পা ছিল না। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে কলোনির অবস্থানটা ছিল আখ্‌তির্‌কা হাইওয়ের ওপর।

কথা বলতে-বলতে হঠাৎ চোখদুটো সরু-সরু করে ভিত্‌কা হেসে বলল:

'আর এখন শোরের বাচ্চারা কোন কম্মে মেতে আছে তা জানেন? বাচ্চা ছেলেরা ওদেরকে ডরায়, ওদের সামনে ভয়ে থরথর করি কাঁপতি থাকে তারা। আর ওরা বনে গেছে সংগঠক, দ্যাখেন একবার কাণ্ডখান! বাচ্চাদেরে ওরা নাম দেছে 'কুকুরছ্যানা'। ওদের প্রেত্যেকের তাঁবে কয়টা করি 'কুকুরছ্যানা' আছে। প্রাতঃকালে উঠে ওরা তাদেরে কয়: 'যেথেনে খুশি চর্যে বেড়া গিয়ি, কিন্তু সাঁঝের বেলা আমারে অমুক-তমুক আন্যে দিতি লাগবে।' আর বাচ্চাদের কেউ-কেউ টেরেনে উঠে কিংবা বাজারখোলায় গিয়ি চুরিচামারি করে। তবে ওদের বেশির ভাগই জানে না কেমনে চুরি করতি হয়, তারা সরাসরি ভিক্ষা করি পয়সা উপায় করে। রাস্তায় কিংবা পুলের ধারে দাঁড়ায়ে আর নয়তো রিজোভে গিয়ি ভিখ্‌ মাগে তারা। তা এতে নাকি দিনে দুই-তিন রুব্‌ল রোজগার হয়। চুরিলোর 'কুকুরছ্যানা'রাই আবার এ-ব্যাপারি সবথেকে পাকা — তারা নাকি দিনে পাঁচ রুব্‌ল পর্যন্ত উপায় করে। ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যাপারি আবার নিয়মকানুনও আছে — সর্দারের প্রাপ্য চারভাগির তিনভাগ আর 'কুকুরছ্যানা'র একভাগ। এজমালি শোবার ঘরগুলায় কিছু নাই দেখে আপনে ওদেরে গরিব ঠাওরায়েন না! ওদের প্রেত্যেকের কয়েক প্রস্থ করি পোশাক আর বহুত ট্যাকাকড়ি আছে, তবে সবকিছুই লুকায়ে রেখেছে

ওরা। পদভোর্‌কিতে প্রচুর গোপন আস্তানা আছে যেখেনে ওরা সবকিছু লুকানোর জায়গা পায়। সারা সন্ধ্যাটা ওরা ওখেনেই কাটায়।'

এছাড়া কুরিয়াজের দ্বিতীয় দলটা ছিল জাইচেঙ্কো আর মালিকভের মতো ছেলেদের নিয়ে তৈরি। কলোনিটার সঙ্গে আরও একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটার পর দেখা গেল যে এই দ্বিতীয় ধরনের ছেলের সংখ্যা বড় কম নেই সেখানে। এদের সংখ্যা ছিল প্রায় তিরিশ জনের মতো। জীবনের নানা ঝুট্‌ঝামেলার মধ্যে দিয়ে এলেও কী এক অলৌকিক কৌশলে যেন এই ছেলেরা বজায় রাখতে পেরেছিল তাদের জ্বলজ্বলে চোখের চাউনি, তাদের মজাদার ছেলেমানুষি গোঁয়ার্তুমির ভাব আর এক ধরনের আদিম বিশ্লেষণী দক্ষতা। এর ফলে সত্যিকার লড়ুয়ে মনোভাব নিয়ে জীবনের সবরকম ঝঞ্ঝাটের মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতা রাখত তারা। সত্যি কথা বলতে কী, এই জাতীয় মানুষজন আমার ভারি প্রিয়। এদের আত্মিক প্রেরণার সৌন্দর্য আর মহত্ত্ব, এদের গভীর মর্যাদাবোধ আমার ভারি পছন্দ। এমন কি এই ধরনের ছেলেপিলেরা পুরোপুরি কৌমার্যরক্ষায় বিশ্বাসী আর স্ত্রী-বিদ্বেষী বলেও এদের আমার ভারি ভালো লাগে। আমার অগ্রবর্তী মিশ্র বাহিনীকে আসতে দেখে এই ছেলেরা মাথা তুলেছিল, নাকের ফুটো বড়-বড় করে বুক ভরে টানছিল টাটকা তাজা হাওয়ার স্রোত আর তারপর ছুটে গিয়েছিল এজমালি শোবার ঘরগুলোর দিকে। আগে যে বিশ্লেষণী দক্ষতার কথা বলেছি তা-ই তখন দ্রুত কার্যকর হয়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে। খোলাখুলি আমার দলে চলে আসতে যদিও তখনও ভয় পাচ্ছিল তারা, তবু তা সত্ত্বেও তাদের সমর্থন যে আমি পাবই এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না।

এছাড়া নেহাতই দৈবক্রমে ভিত্‌কা আর আমি কুরিয়াজ-সমাজের তৃতীয় একটি দলের সাক্ষাৎ পেয়ে গিয়েছিলুম। আর খরগোশের গন্ধ পেয়ে শিকারী কুকুর যেভাবে দাঁড়িয়ে যায় সেইভাবে ভিত্‌কা তাদের 'চিনিয়ে দিয়েছিল' আমায়। কলোনির উঠোনের দূরের একটা কোণে পুরনো পাঁচিলের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করানো হয়েছিল বিচ্ছিন্ন একটা কোঠাবাড়ি আর তার সঙ্গে সংযুক্ত কুঁদে-তৈরি কাঠের একটা বারান্দা। কোঠাবাড়িখানা দেখিয়ে ভানিয়া জাইচেঙ্কো বলেছিল:

'কৃষিবিদরা থাকে ওখেনে।'

'সে কী, কৃষিবিৎ? কতজন?'

'চোদ্দজন।'

'চোদ্দজন কৃষিবিৎ? বল কী? তা, এত বেশি কেন?'

'ওয়ারা জোয়ার বুন্যেছেল। এখন ওয়ারা ওখেনে থাকে...'

খালাবুদার কথা মনে পড়ায় আমার সন্দেহ আরও ঘনীভূত হল। বললুম:

'কৃষিবিৎ নামটা নিশ্চয় তোমাদের দেয়া, তাই না?'

কিন্তু ভানিয়াকে খুব গম্ভীর মনে হল। সে আরও জোরে মাথা নেড়ে বাড়িখানার দিকে ইঙ্গিত করে বললে:

'না-না, ওয়ারা সত্যই কৃষিবিৎ। যদি না হয় তো কী বল্যেছি! ওয়ারা জমিন চষ্যেছে তারপর জোয়ার বুন্যেছে! দ্যাখেন-না ক্যানে, ভুঁয়ে চারা ঠেলি ওঠত্যেছে! এরই মধ্যে কত বড় হয়্যি উঠ্যেছে দ্যাখেন!'

চটেমটে ভিত্‌কা জাইচেঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল:

'নীল কামিজ-গায়ে ওই ছোঁড়াগুলা? ওগুলা সাধারণ কলোনি-বাসিন্দা নয়? কী আজেবাজে বকতেছিস!'

'মোট্টেও বাজে কথা না!' রিন্‌রিনে গলায় সজোরে প্রতিবাদ করল ভান্‌কা। 'মোট্টেও না! সার্টিফিকিটের জন্যি অপিক্ষে করত্যেছে ওয়ারা। সার্টিফিকিট পালিই কলোনি ছাড়্যে চলি যাবে-নে...'

'ঠিক আছে, তাহলে চল, গিয়ে দেখে আসি কেমন তোমার সব কৃষিবিৎ!'

কোঠাবাড়িখানায় ছিল খানদুই শোবার ঘর। বিছানাগুলো ছিল অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার কম্বল দিয়ে ঢাকা। আর সেই সব বিছানায় বসে ছিল ভানিয়া যেমনটি বলেছিল ঠিক তেমনটি নীল শার্ট-পরা গুটিকয়েক তরুণ। তাদের চুলও আঁচড়ানো ছিল পরিপাটি করে আর মুখগুলোয় মাখানো ছিল ভালোমানুষি ভাব। ঘরদুটোর দেয়ালে পরিচ্ছন্নভাবে সাঁটা ছিল হরেকরকম ছবির পোস্টকার্ড আর পত্রিকা-থেকে-কাটা ছবি। তাছাড়া কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো ছোট্ট-ছোট্ট আয়নাও ছিল কয়েকখানা। আর জানলাগুলোর তাকে-সাঁটা পরিষ্কার কাগজের গোল-করে-কাটা ধারগুলো ছিল ঝুলে।

গম্ভীরমুখো ছেলেগুলো আমার সম্ভাষণের জবাবে কিছুটা নিরুত্তাপভাবে সাড়া দিল। এমন কি তারা বিন্দুমাত্র লজ্জিতও হল না ভানিয়া যখন উৎসাহের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার ছলে জানাল:

'কেমন, বল্যেছেলাম-না এনারা সকলে কৃষিবিৎ! তা, দ্যাখতিছেন তো? আর ইনি — ভস্কবোইনিকভ — হল্যেন গিয়ি এনাদের প্রধান!'

শ্বনে ভিত্‌কা গোর্‌কভ্‌স্কি এমন ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকাল যে মনে হল আমাদের সঙ্গে কৃষিবিদদের নয়, আলাপ করিয়ে দেয়া হচ্ছে এমন সব বনপরী বা জলার ভূতের যাদের অস্তিত্বে ভিত্‌কার একেবারেই বিশ্বাস নেই।

যাই হোক ছেলেগ্বলোকে বলল্বম, 'ছেলেরা, কিছ্ব মনে কোরো না, কিন্তু বল দেখি সবাই তোমাদের কৃষিবিৎ বলে ডাকে কেন?'

ভস্কবোইনিকভ ছেলেটা ছিল লম্বা আর তার ম্বখখানা ছিল অসম্ভব ফ্যাকাশে। ম্বখে এমন একটা আত্মম্ভরী ভাব ফুটিয়ে রাখত সে যার জন্যে তার ম্বখখানা সকলের দ্বিষ্ট আকর্ষণ করত। তবে এর কোনো কিছ্বতেই তার ম্বখের স্থায়ী একটা ভোঁতা ভাব চাপা পড়ত না। আমার কথা শ্বনে ভস্কবোইনিকভ এবার বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বেশ চেষ্টা করেই হাত দ্ব'খানা তার ট্রাউজার্সের সর্ব-সর্ব দ্বই পকেটে গ্বঁজে দিল। তারপর বলল:

'আমরা কৃষিবিৎ। শিগ্‌গিরই আমরা সার্টিফিকিট পাব্য...'

'কে তোমাদের সার্টিফিকেট দেবে?'

'কে আবার! ডিরেক্টার দেবে!'

'কোন ডিরেক্টার?'

'ক্যানে? প্বরানো ডিরেক্টার।'

শ্বনে হো-হো করে হেসে উঠল ভিত্‌কা। বলল:

'কে জানে, হয়তো সে আমারেও এট্টা সার্টিফিকিট দেবে?'

'অত হ্যা-হ্যা করার কিছ্ব নাই, বোঝলে?' ভস্কবোইনিকভ বলল। 'যা জানো না তা নিয়ি ফোড়ন কাটতি আস্য না। এ-ব্যাপারির কী জানো তুমি, শ্বনি?'

এবার ভিত্‌কার মেজাজ খারাপ হওয়ার পালা। সে বলল:

'জানি, জানি, তোমরা সব কয়টা হাবাগবা। এখন খ্বল্যে কও দেখি, কে তোমাদের সাথে এমন মশ্‌করা জ্বড়েছে?'

'কে জানে, তুমিই হয়তো মশ্‌করা জ্বড়ি দেছ,' রসিকতার চেষ্টা পেল ভস্কবোইনিকভ। কিন্তু এই ধাপ্পাবাজি ভিত্‌কা আর বর্‌দাস্ত করতে পারছিল না। সে বলল:

'থাক, যথেষ্ট হয়েছে!.. এখন সব কথা খ্বল্যে বল দেখি!'

বিনা আমন্ত্রণেই আমরা গিয়ে বিছানায় বসল্বম। অসন্তুষ্ট, দ্বর্বিনীত,

অপমানিত কৃষিবিদরা অনিচ্ছাভরে দু-একটা কথা বলতে লাগল আর থেকে-থেকেই সন্দেহে আর অবজ্ঞায়-বিকৃত মুখভঙ্গি করতে লাগল। তবে তাদের হামবড়াই ভাব আর আত্মসন্তুষ্টিতে যেটুকু চিড় ধরল তার ফাঁকেই খালাবুদার সেই জোয়ার-ফসলের রহস্য আর তাদের নিজেদের চমকপ্রদ পেশা অবলম্বনের আসল কথাটুকু গেল ফাঁস হয়ে। জানা গেল, তার আগের হেমন্তে জোয়ার বোনার বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে খালাবুদা কুরিয়াজে তাঁর একজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন। আর সেই প্রতিনিধিটি বড় ছেলেদের মধ্যে জনা-পনেরোকে জোয়ার বোনার কাজে ফুসলায় আর মুক্তহস্তে তাদের সুযোগসুবিধের বন্দোবস্ত করে দেয়। যথা, আলাদা একটা কোঠাবাড়িতে তাদের থাকার ব্যবস্থা করে, খাটবিছানা, চাদর, কম্বল, পোশাক, ওভারকোট ইত্যাদি কিনে দেয়, পকেটখরচা বাবদ প্রত্যেককে পঞ্চাশ রুব্‌ল করে দেয় আর কথা দেয় যে বীজবোনার কাজ শেষ হলেই তাদের কৃষিবিৎ হিসেবে সার্টিফিকেট দেয়া হবে। আর যেহেতু লোকটি বাকি সব ক'টি শর্তই পূরণ করেছিল আর খাটবিছানা আর অন্যান্য সুখসুবিধে তো নির্ভেজাল বাস্তব হয়েই দেখা দিয়েছিল, তাই সার্টিফিকেট পাওয়াটাও যে একটা বাস্তব সত্য এ-বিষয়ে ওই ছেলেদের সন্দেহ করার কোনো কারণ ছিল না। এটা ওরা বিশ্বাস করেছিল আরও এই কারণে যে সব ক'টা ছেলেই ছিল প্রায় নিরক্ষর, ওদের কেউই প্রাথমিক স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ওপরে ওঠে নি। ওদের ডিপ্লোমা দেয়ার ব্যাপারটা অবশ্য বসন্তকাল পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়া হয়েছিল। তবে এতে ছেলেরা তেমন একটা দুশ্চিন্তিত হয় নি, কেননা খালাবুদার প্রতিনিধি শিশু-সহায়তা সংস্থা-সমাহারের কোথাও শূন্যে নিপাত্তা হয়ে গেলেও কলোনির আগের ডিরেক্টর-সায়েব দয়া করে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনিই সার্টিফিকেট পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নেবেন। এমন কি কলোনি ছেড়ে চলে যাবার আগের দিনও তিনি ওদের বুঝিয়েছিলেন যে ডিপ্লোমার কাগজগুলো একেবারে তৈরি হয়েই আছে, কেবল সেগুলো কুরিয়াজে পাঠানোর যা ওয়াস্তা আর কাগজগুলো এসে পৌঁছলেই সাড়ম্বরে সেগুলো ওই কৃষিবিদদের দেয়া হবে।

সব শুনে আমি বললুম:

'ছেলেরা, তোমাদের কিন্তু বেমালুম বোকা বানানো হয়েছে! কৃষিবিদ হতে গেলে তোমাদের অনেককিছু পড়াশুনো করা দরকার, বেশ কয়েক বছর পড়াশুনো করা দরকার। কৃষিবিদ্যা পড়ানোর কলেজ আছে, টেকনিক্যাল

স্কুলও আছে, তবে তাতে ঢুকতে গেলে তার আগে সাধারণ ইশ্‌কুলে বেশ কয়েক বছর লেখাপড়া শেখা দরকার-যে!.. আচ্ছা, তুমি — হ্যাঁ, তুমি — বল তো, সাত-আটে কত হয়?'

যাকে আমি প্রশ্নটা করলুম সেই ময়লা-রঙ মিষ্টি চেহারার ছেলেটি একটু-যেন সংশয় নিয়ে জবাব দিল:

'আটচল্লিশ।'

জবাব শুনে ভানিয়া জাইচেঙ্কোর তো খাবি খাওয়ার অবস্থা! খুদে-খুদে সরল চোখদুটো গোল-গোল করে সে বলে উঠল:

'ছোঃ, নিজিদের আবার কৃষিবিদ কয়! আটচল্লিশ! তাই বটে! ভ্যালা কৃষিবিদরে আমার!'

'তরে কে নাক গলাতি কয়েছে, শুনি? আটচল্লিশ কি কত, তাতে তর কাম কী?' ভানিয়াকে সজোরে ধমকে উঠল ভস্কবোইনিকভ।

'কিন্তু ওয়া তো ছ-পঞ্চাশ!' উত্তরটা সম্পর্কে এত নিশ্চিত ছিল ভানিয়া যে কথা বলতে গিয়ে উত্তেজনায় প্রায় ফ্যাকাশে মেরে গেল। 'ছ-পঞ্চাশ হব্যে তো!'

'তাইলে, ব্যাপারডা দাঁড়াল্য কনে?' সবাই যাকে স্‌ভাত্‌কো বলে ডাকছিল চওড়া-কাঁধওয়ালা কুটিল চরিত্রের সেই ছেলেটি এবার কথা বলল। 'আমাদিগে কথা দেয়া হয়্যেল যে সভ্‌খোজে* জায়গা দেয়া হব্যে — তার কী হব্যে এখন?'

বললুম, 'সে-ব্যবস্থা করা যেতে পারে। রাষ্ট্রীয় খামারে কাজ করা তো ভালোই। তবে, বাপু, সেখানে কিন্তু তোমাদের মজুর হিসেবে কাজ করতে হবে, কৃষিবিদ হিসেবে নয়।'

একথা শুনে প্রচণ্ড রাগে বিছানার ওপর লাফিয়ে উঠে বসল কৃষিবিদরা। স্‌ভাত্‌কো তো রাগে ফ্যাকাশে মেরে গেল। বলল:

'আপনে কি ভাব্যেছেন আমরা নেয্য বিচার পেতি পারি না? জানি, জানি! সব জানি আমরা! আগির ডিরেক্টর আমাদিগে সাবধান করি দেছিলেন! আপনে জমিন চাষ করাতি চান, কিন্তু কেউই তা করতি রাজি না। এই তো? এরই জন্যি আপনে এমন সোরগোল তুল্যে দেছেন! খালাবুদারেই

* সভ্‌খোজ — রাষ্ট্রীয় খামার। — অনুঃ

ফোস্‌লায়্যেছেন আপনে! কিন্তু আপনের কোনো মতলব খাটব্যে না, এই কয়ি দেলাম!'

আরও একবার হাতদুটোকে দুই পকেটে গুঁজে আর এমনিতেই লম্বা দেহটাকে আরও টানটান করে প্রায় ঘরের ছাদে মাথা ঠেকিয়ে ভস্কবোইনিকভ বললে:

'আপনে আমাদেরে ঠকাতি এস্যেছেন, কেমন? এ-ব্যাপারি লোকে আগিই আমাদিগে হুঁশিয়ার করি দেছে। বহুত জমিনে বীজ বুন্যেছি আমরা, পরিশ্রম কর্যেছি প্রেচুর। আর এখন আপনে আমাদেরে ঠকায়্যে মতলব হাসিল করতি চান। ওসব চালাকি খাটব্যে না, কয়ি দেলাম!'

শান্তভাবে ভিত্‌কা শুধু মন্তব্য করল, 'হাঁদা কোথাকার!'

'ভালো হব্যে না কিন্তু, একখান ঘুসোতে ওয়ার থোঁতামুখ ভোঁতা কর্যে দেব!.. এঃ, ভারি আমার গোর্কি'পন্থী এস্যেছেন!.. পরের হাতি তামাক খেয়ি যাওয়ার মতলবে সব এস্যেছে এখেনে!'

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লুম। রাগী-রাগী ভোঁতা মুখগুলো আমাদের দিকে ফেরাল কৃষিবিদরা। যতটা সম্ভব শান্তভাবে ওদের কাছ থেকে বিদায় নেবার চেষ্টা কবলুম। বললুম:

'তোমরা যা ভালো বোঝো তাই কর, ছেলেরা। কৃষিবিদ যদি হতে চাও সে তো ভালো কথা... তোমাদের কাজে এখুনি অবশ্য আমাদের কোনো দরকার নেই, তোমাদের ছাড়াই কাজ চালিয়ে নেব আমরা।'

ঘর ছাড়ার জন্যে পা বাড়ালুম। কিন্তু ভিত্‌কা শেষপর্যন্ত নিজেকে সামলাতে পারল না, যাবার মুখে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে জিদ ধরে ফের একবার হড়বড় করে বলে ফেলল:

'যতই যাই হোক, তোরা কিন্তু সব গণ্ডমুর্খ, হাঁদারাম!'

কথাটা বলায় কৃষিবিদদের মধ্যে এমন একটা উত্তেজনার সঞ্চার হল যে ভিত্‌কাকে গাড়িবারান্দাটার ত্রিসীমানা ছাড়িয়ে চোঁ-চা দৌড় দিতে হল।

যে-সব কুরিয়াজ-বাসিন্দা ভালো-মন্দ নানা কৌশল প্রয়োগ করে দলপতি হিসেবে নিজেদের মনোনীত করিয়েছিল পাইওনিয়র-রুমে জোর্‌কা ভোল্‌কভ তখন তাদের কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছিল। জোর্‌কাকে আমি আগেই বলেছিলুম যে এতে কোনো কাজ হবে না, এমন দলপতিতে আমাদের দরকার নেই,

কিন্তু এটা যে খাঁটি কথা বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে জোর্‌কার কাছে তা প্রমাণিত হওয়া দরকার ছিল।

পাইওনিয়র-রুমে মনোনীত দলপতিরা সার বেঁধে বসে ছিল বেঞ্চিগুলোয় আর মাছির মতো পায়ে পা ঘষছিল বসে-বসে। জোর্‌কাকে মনে হচ্ছিল যেন সাক্ষাৎ বাঘ, ধারালো চোখদুটো দিয়ে ওর আগুন ঠিকরোচ্ছিল। নতুন দলপতিরা এমন আচরণ করছিল যে মনে হচ্ছিল তাদের ওখানে আনা হয়েছে যেন নতুন একটা খেলায় যোগ দেওয়াতে আর সে-খেলার নিয়মকানুন যেন ভারি গোলমেলে, অথচ তাদের কাছে পুরনো খেলাটাই ঠেকছিল বেশি মনঃপূত। জোর্‌কার প্রবল সাবেগ ব্যাখ্যার জবাবে তারা মুখ টিপে ভদ্রতার হাসি হাসবার চেষ্টা করছিল, আর তার বক্তৃতার এহেন ফলাফল দেখে জোর্‌কা কিন্তু মোটেই খুশি হচ্ছিল না। শুনলুম সে বলছে:

'কী, দাঁত কেলাত্যেছিস যে বড়? দাঁত কেলাত্যেছিস কেন? অ্যাঁ? আমার কথাটা বুঝেছিস? অনেক অনেক দিন ধরি তোরা অপদাথ্থ হয়ি জীবন কাটায়েছিস! বলি, সোভিয়েত-রাজ কারে কয়, বুঝিস কিছু?'

অপ্রতিভ হয়ে দলপতিরা তাড়াতাড়ি তাদের ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা মুছে ফেলে গম্ভীর হল।

'তোরা দলপতি, তাই তোদেরে সকল কথা খুল্যে বলতেছি আমি। বুঝলি? তোদের হুকুম অন্য সবারে মান্য করি চলতি লাগবে।'

'কিন্তু, ধর, যদি ওয়ারা আমাদের কথা না মান্য করে? তাইলি?' অদম্য হাসিতে মুখখানা ভরে শুধোল একটি শাদাচুলো, ঢিপ-কপাল ছেলে। ছেলেটির নাম ছিল পেত্রুশ্‌কো। ওকে এক-নজর দেখেই বুঝলুম ছেলেটা ফাঁকিবাজ আর অপদার্থ।

কাজ বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে ওখানে যাদের ডাকা হয়েছিল তাদের মধ্যে স্পিরিদোন খোভ্‌রাখও ছিল। বেলুখিন আর কারাবানভের সঙ্গে তার ক'দিন আগে কথাবার্তার ফলে ও যেন কিছুটা নরম হয়েছে মনে হল। তবে দেখা গেল, দলপতি বনে যাওয়ার ফলে ওকে এবার সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে বিশ্রী বেহুদা ঝুট্‌ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হবে এই ভেবে ও কেমন মুষড়ে পড়েছে।

ওইদিন সন্ধেয় জোর্‌কার সাবেগ তুমুল বক্তৃতা আর কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের হাসি-হাসি ঔদাসীন্য জাহিরের পালা চুকলে পর তা সত্ত্বেও একটা দলপতি-

পরিষদ খাড়া করে কলোনির যাবতীয় বাসিন্দার নাম লিস্টিভুক্ত করা হল, এমন কি পরদিনের কাজের একটা নির্দেশনামাও জারি করে দেয়া হল। ভোলখভ আর কুদ্‌লাতি পরদিনের মাঠের কাজের সাজ-সরঞ্জাম, হাতিয়ার ইত্যাদি সাজিয়ে-গুছিয়ে তৈরি করে রাখল। কিন্তু দলপতি-পরিষদ আর কাজের হাতিয়ার সবকিছুরই অবস্থা এত কাহিল ঠেকল যে রাত্রে যখন শুতে গেলুম আমরা তখন ক্লান্তি আর ব্যর্থতার একটা বোধ মনকে আচ্ছন্ন করে রইল। যদিও বরভোয় ও তার সহকারী ইতিমধ্যেই কলোনিতে কাজ শুরু করে দিয়েছিল আর ঘোর কালোরঙের মাটির স্তূপের ওপর এখানে-সেখানে চাঁছা কাঠের পাতলা ফালি চকচক করতে দেখা যাচ্ছিল, তবু কুরিয়াজের সাধারণ সমস্যা সমাধানের তখনও পর্যন্ত দিশা পাওয়া যাচ্ছিল না — সত্যিসত্যিই কাজ শুরু করার মতো কী যে আঁকড়ে ধরা যায় তারই যেন হদিশ মিলছিল না।

পরদিন খুব ভোরে 'রাব্‌ফাক'-এর ছাত্রছাত্রীরা খার্‌কভ ফিরে গেল। দলপতি-পরিষদের সভায় যেমন ঠিক হয়েছিল সেই অনুযায়ী নিদ্রাভঙ্গের ঘণ্টার সঙ্কেত বাজানো হল ছ'টায়। যদিও ইতিমধ্যে জোরালো আওয়াজওয়ালা নতুন একটা ঘণ্টা ঝোলানো হয়েছিল গির্জের দেয়ালের গায়ে, তবু তার আওয়াজ কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করল না। কলোনির মনিটর, হাতে নতুন লাল পট্টি-বাঁধা ইভান দেনিসভিচ কির্‌গিজভ গিয়ে কয়েকটা এজমালি শোবার ঘরে উঁকি দিলেন, কিন্তু ফিরে আসার সময় একমাত্র নিজের মনমরা ভাব ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে করে আনতে পারলেন না। গোটা কলোনিই ঘুমিয়ে রইল। একমাত্র প্রাণের লক্ষণ দেখা যেতে লাগল আস্তাবলে, সেখানে আমাদের অগ্রবর্তী মিশ্র বাহিনীর সদস্যরা তখন ব্যস্ত ছিল মাঠে যাওয়ার প্রস্তুতির কাজে। এর মিনিট-কুড়ি বাদে তিনখানা দু-ঘোড়ার লাঙল আর খানকয়েক জমিতে দেবার মই নিয়ে কাজে বেরিয়ে গেল বাহিনী। আর দু'চাকার ঘোড়ার গাড়িখানা নিয়ে কুদ্‌লাতি গেল শহরে আলু-বীজ আনতে। পথে ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল শহরফেরত ফ্যাকাশে, শিশিরে-ভেজা কিছু মনুষ্যমূর্তির, বাইরে রাত কাটিয়ে কলোনিতে ফিরছিল তারা। আমারও আর সামর্থ্য ছিল না ওই মূর্তিগুলোকে রাস্তায় থামিয়ে তাদের ওপর খানাতল্লাসি চালানোর কিংবা আগের রাত্রে আমাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের কথা তাদের মনে করিয়ে দেয়ার। বিনা বাধায়, নির্বিবাদে ওরা সেঁধিয়ে গেল

যে-যার এজমালি শোবার ঘরে, আর এইভাবে কার্যত কলোনিতে ঘুমন্ত লোকের সংখ্যা গেল বেড়ে।

আগের দিন সন্ধেয় তৈরি এবং দলপতি-পরিষদের সর্বসম্মত অনুমোদনক্রমে গৃহীত নির্দেশনামায় এইমর্মে প্রস্তাব করা হয়েছিল যে পরদিন কলোনির প্রত্যেককে এজমালি শোবার ঘরগুলো আর উঠোন পরিষ্কার করতে হবে, হট্‌হাউস তৈরির জন্যে একটা জায়গা সাফ করতে হবে, মঠের পাঁচিলের চারপাশ জুড়ে শব্‌জিখেত বানানোর উদ্দেশ্যে জমি খুঁড়তে হবে আর ওই গোটা পাঁচিলটাই ভেঙে ফেলতে হবে। এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার সময়ে একেকটা মুহূর্তে আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছি আমি, আর তখন নিজের শক্তির একটা সুখকর বোধে আপ্লুত হয়েছি। ভেবেছি, আমার তাঁবে আছে চার-চারশো কলোনি-বাসিন্দা! এ কি চাট্টিখানি কথা! আর্কিমিডিস যদি তাঁর তাঁবে এমন চারশো কলোনি-বাসিন্দা পেতেন, তাহলে বোধহয় পুলক-শিহরণে মারাই পড়তেন বেচারা! হয়তো তাঁর মনে হোত ভূমণ্ডলটাকে উলটে ফেলার জন্যে যে-আলম্বের সন্ধান করে ফিরছেন তিনি, এতদিনে বুঝি তার ভালোরকম একটা বিকল্পের খোঁজ পাওয়া গেল। এমন কি একশো বিশজন গোর্কিপন্থীকে বাদ দিলেও দু'শো আশিজন কুরিয়াজ-বাসিন্দাও আমার কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক অসামান্য কেন্দ্রীভূত কর্মশক্তির প্রতীক।

কিন্তু এই কেন্দ্রীভূত কর্মশক্তি সেদিন সকালে হাত-পা ছড়িয়ে চিত্‌পটাং হয়ে পড়ে ছিল ভ্যাপ্‌সা-গন্ধওয়ালা যত সব নোংরা বিছানায়, প্রাতরাশের জন্যেও বিছানা ছেড়ে ওঠার তেমন কোনো তাড়া ছিল না তাদের মধ্যে। ইতিমধ্যেই আমরা প্লেট আর চামচ কিনে ফেলেছিলুম, আর মোটামুটি সুশৃঙ্খলভাবেই সেগুলো সাজানো ছিল মঠের খাবারঘরের টেবিলে-টেবিলে। ঘণ্টাখানেক ধরে শেলাপুতিন ঘণ্টা বাজিয়ে যাবার পর খাবারঘরে প্রথম মনুষ্যমূর্তির আবির্ভাব ঘটতে দেখা গেল। অতঃপর প্রাতরাশের পালা চলল বেলা দশটা পর্যন্ত। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকবার খাবারঘরে আমি বক্তৃতা দিলুম, ফিরে-ফিরে অন্তত বারদশেক সবাইকে জানিয়ে দিলুম কে কোন বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত, কে কোন বাহিনীর দলপতি এবং প্রতিটি বাহিনীর করণীয় কাজ কী-কী কিন্তু প্লেট থেকে একবারের তরেও মাথা না-তুলে কলোনি-বাসিন্দারা চুপচাপ আমার বক্তৃতা শুনে গেল। তাদের জন্যে যে চর্বি মিশিয়ে দারুণ ঘন আর সুস্বাদু স্যুপ বানানো হয়েছে, প্রতিটি রুটির টুকরোর ওপর যে

বড় একডেলা করে মাখনের টুকরো রাখা হয়েছে, খুদে নচ্ছারগুলো এমন কি তাও খেয়াল করে দেখল বলে মনে হল না। উদাসীনভাবে স্যুপটা আর মাখনের টুকরোগুলো বেমালুম গলাধঃকরণ করে আর রুটির বাড়তি টুকরোটাকরা দুই পকেটে ভরে নিয়ে চর্বি-মাখানো নোংরা আঙুলগুলো চাটতে-চাটতে খাবারঘর থেকে গুটিগুটি বেরিয়ে গেল তারা। এমন কি আর্কিমিডিস-সদৃশ আশায় ভরপুর আমার চোখের মিনতিভরা দৃষ্টিকে পর্যন্ত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তারা চলে গেল।

ওই সময়ে গির্জের সিঁড়িতে-দাঁড়ানো মিশা অভ্চারেঙ্কোরও ধারেকাছে ঘেঁষল না কেউ। মিশার পায়ের কাছে গির্জের সিঁড়ির ওপর রাখা ছিল নতুন-নতুন সব কোদাল, জমিতে দেয়ার মই আর লম্বা হাতলওয়ালা ঝাঁটা। এর সবকিছুই কেনা হয়েছিল তার আগের দিন। মিশার হাতে ছিল নতুন একখানা লেখার প্যাড। এখানাও কেনা হয়েছিল আগের দিন। কোন বাহিনীকে কী-কী যন্তরপত্তর, সাজ-সরঞ্জাম দেয়া হল ওই প্যাডে মিশার তা লেখার কথা। কিন্তু এইসব সাজ-সরঞ্জামে পরিবৃত হয়ে বোকার মতো সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রইল মিশা, কেননা একজনও তার কাছে জিনিস নিতে এল না। এমন কি ভানিয়া জাইচেঙ্কোর বন্ধুবান্ধব নিয়ে তৈরি দশম বাহিনীর দলপতি ভানিয়া স্বয়ং, যে-ভানিয়া জাইচেঙ্কোর ওপর আমার অতখানি আশা-ভরসা ছিল, সে পর্যন্ত চাষের যন্ত্রপাতি নিতে এল না। আশ্চর্য এই যে, প্রাতরাশের টেবিলেও তাকে আমি লক্ষ্য করি নি। খাবারঘরে নতুন দলপতিদের মধ্যে যারা-যারা হাজির ছিল তাদের মধ্যে একমাত্র খোভ্রাখ এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল আর আমাদের পাশ কাটিয়ে যে-ছেলের দঙ্গল চলে যাচ্ছিল উদ্ধত দৃষ্টিতে তাদের লক্ষ্য করছিল সে। তার অধীন চতুর্থ বাহিনীর ওপর ভার ছিল মঠের পাঁচিল ভাঙার কাজ শুরু করার, মিশা ওর জন্যে কয়েকখানা শাবল আলাদা করে রেখেওছিল। কিন্তু ওর ওপর যে কোনোকিছু কাজের দায়িত্ব দেয়া আছে খোভ্রাখ সে-ব্যাপারের ধারকাছ দিয়েও গেল না। বরাবরের মতো তেলতেলা নরম ভঙ্গিতে সে আমার সঙ্গে এমন সব বিষয় নিয়ে আলাপ জুড়ে দিল যাদের সঙ্গে মঠের দেয়ালের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ছিল না। প্রথমেই সে বললে:

'আচ্ছা, এয়া কি সত্য যে গোর্কি কলোনির মেয়্যারা সোন্দর দেখতি?'

কথার জবাব না-দিয়ে ওর কাছ থেকে সরে আমি দরজার কাছে চলে এলুম।

ও কিন্তু আঠার মতো সে'টে রইল আমার সঙ্গে সঙ্গে, আর সরাসরি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল:

'শোনতেছি আপনেদের কিছু-কিছু ম্যাস্টারনীও নাকি চমৎকার দেখতি!.. ওঃ, ওয়ারা আলি যা মজা হবে-না এখেনে! এখেনেও অবশ্য কিছু ম্যাস্টারনী ছেল যারা দেখতি-শুনতি মন্দ ছেল না... কিন্তু, বোঝলেন-না, আমার চক্ষু দেখি ওয়ারা ডরাত্য! ওয়াদের দিকি একবার তাকালিই হত্য, লজ্জায় লাল হয়্যি ওঠত্য সবাই। কিন্তু, কন দেখি, আমার চক্ষু দেখ্যে এত ডরাইবার আছেডা কী!'

'তোমার বাহিনী আজ কাজে যায় নি কেন?'

'তা আমি শালার কী কর্যে জানব্য — আমার সাথে তার সম্পক্কডা কী? নিজিই তো আমি যাই নাই...'

'কেন যাও নি?'

'ক্যানে আবার — ইচ্ছা হল্য না তাই — হাঃ-হাঃ!..'

গির্জের মাথার ক্রুশকাঠের দিকে চোখ সরু-সরু করে তাকিয়ে ফের ও শুরু করল:

'এখেনে — পদভোর্কিতিও কিছু মনে ধরার মতন ছুঁড়ি আছে, বোঝলেন... হাঃ-হাঃ!.. চাইলি আপনের সাথেও তাদের আলাপ করায়্যে দিতি পারি...'

আগের দিন সন্ধে থেকে প্রায় অমানুষিক চেষ্টায় রাগ দমন করে চলছিলুম আমি। কিন্তু এই সময়ে ধৈর্য রাখা আর আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না, বুকের ভেতর কী-একটা যেন অনবরত ঠেলে-ঠেলে উঠছিল। তবু তখনও পর্যন্ত সেটা হৃদ্‌যন্ত্রের কাছাকাছি জায়গাটায় একটা চাপা ধুকধুক শব্দ হয়ে আমার কানে বাজছিল মাত্র, মনে হচ্ছিল যেন হৃদ্‌যন্ত্রের কামরার কপাটগুলো তেতে উঠছে ক্রমশ। এমন সময়ে আমার মস্তিষ্কের মধ্যে কে যেন হুকুমজারি করলে — 'স্থিরোভব!' আর সঙ্গে সঙ্গে আমার যত অনুভব, চিন্তা-ভাবনা, মস্তিষ্কের সামান্যতম ক্রিয়াকলাপ পর্যন্ত শিথিলতা পরিহার করে দেহরেখা টানটান করে তুলল। সেই একই 'কে যেন' এরপর ফের কড়াভাবে হুকুমজারি করলে: খোভ্রাথকে বাদ দাও! বরং এখুনি খোঁজ কর গিয়ে কেন ভানিয়া জাইচেঙ্কোর বাহিনী কাজে গেল না, ভানিয়াই-বা সকালে খেতে এল না কেন।

এ-কারণে এবং এছাড়া অন্য কারণেও বটে খোভ্‌রাথকে আমি বললুম:

'দূর হও এখান থেকে! অ্যাই...'

হঠাৎ আমার এই মেজাজের পরিবর্তনে হকচকিয়ে গিয়ে দ্রুত সরে পড়ল খোভ্‌রাথ। আমিও পা চালিয়ে চললুম জাইচেঙ্কোদের এজমালি শোবার ঘরের দিকে।

সেখানে গিয়ে দেখি, ভানিয়া শুয়ে আছে আঢাকা একটা গদির ওপর আর তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তার ঝাঁক। দেখলুম মাথার নিচে একখানা হাত দিয়ে শুয়ে আছে ভানিয়া, আর তার ফ্যাকাশে রোগা-রোগা হাতখানা ময়লা বালিশের পটভূমিতে ভারি পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'কী হয়েছে?'

ঝাঁকটি নিঃশব্দে আমায় পথ ছেড়ে দিল। মুখে অল্প একটু ফিকে হাসির ভাব ফুটিয়ে, প্রায়-শোনা-যায় না এমন ফিস্‌ফিস করে অদারিউক বললে:

'ওয়ারা অরে মার‍্যেছে।'

'কে মারলে?'

বালিশে মাথা রেখেই অপ্রত্যাশিতরকম জোরালো রিন্‌রিনে গলায় এবার বলে উঠল ভানিয়া:

'কয়েকজনা মিলি মার‍্যেল আমারে, বোঝলেন! কান্ডখান দ্যাখেন একবার! রাতে চুপিসারে এয়্যেল ওয়ারা, তারপর আমারে কম্বল দিয়ি জড়ায়্যে বেধড়ক মার লাগাল্য। অল্পের জন্যি প্রাণে বাঁচ্যে গেছি। বুকি ব্যাথা লাগতিছে এখন!'

ভানিয়া জাইচেঙ্কোর রোগা, শুকনো, বিবর্ণ মুখখানার সঙ্গে তার জোরালো রিন্‌রিনে গলার কিছুমাত্র সাদৃশ্য ছিল না।

মনে পড়ল কুরিয়াজে আলাদা একটা দালান আছে যাকে হাসপাতাল বলা হয়। সেখানকার নোংরা, জনশূন্য ঘরগুলোর মধ্যে একটা ঘরে কেবল একজন বৃদ্ধা নার্স থাকেন। মালিকভকে পাঠালুম তাঁকে ডেকে আনতে। যাওয়ার সময় দোরগোড়ায় মালিকভ ঠোক্কর খেল শেলাপুতিনের সঙ্গে। শেলাপুতিন এসেছিল আমার খোঁজে। আমায় দেখতে পেয়ে বলল:

'আন্তন সেমিওনভিচ, মোটরে করি এসেছে ওরা, আপনের খোঁজ করতেছে!'

গিয়ে দেখি প্রকান্ড, কালোরঙের একখানা ফিয়াটগাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে

আছেন ব্রেগেল, কমরেড জোইয়া আর খ্‌লিয়ামের। রাজেন্দ্রানীর ভঙ্গিতে একটুখানি হেসে ব্রেগেল বললেন:

'কী, ভার নিয়ে নিয়েছেন তো?'

'নিয়েছি।'

'তা, চলছে কেমন?'

'ঠিকই চলছে।'

'একেবারে ঠিক-ঠিক?'

'ওই আর কি — কখনও মাঝারিরকম, কখনও আর-একটু ভালো!'

শুনে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে কমরেড জোইয়া আমার দিকে তাকালেন। খ্‌লিয়ামের ভদ্রলোক তাকাতে লাগলেন ইতিউতি। সন্দেহ নেই, আমার একশো রুব্‌ল মাইনের মাস্টারদের এক-নজর দেখার জন্যে বড়ই ব্যস্ত হয়েছিলেন তিনি। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের বাধো-বাধো পায়ে চলার ভঙ্গিতে এই সময়ে আমাদের পাশ কাটিয়ে বয়স্কা নার্সটি জাইচেঙ্কোকে দেখার জন্যে চলে গেলেন। আর তখনই আস্তাবল থেকে ভোলখভের রাগী গলার চেঁচামেচি কানে এল:

'শোরের বাচ্চারা! তোরা তর্‌তাজা মানুষগুলারে নষ্ট করেছিস, ঘোড়াগুলারেও বারোটা বাজায়েছিস! একজোড়া ঘোড়াও কাজের যুগ্যি নাই, শোরের বাচ্চা কোথাকার। এগুলা ঘোড়া না, এগুলা বুড়া বেবুশ্যে!'

শুনতে-শুনতে লাল হয়ে উঠে কমরেড জোইয়া যেন আতঙ্কে লাফিয়ে উঠলেন। তারপর তাঁর বিদ্‌ঘুটে মাথাটা নেড়ে বললেন:

'সামাজিক শিক্ষা একেই বলে বটে!'

শুনে হো-হো করে হেসে উঠলুম আমি। বললুম:

'না, এটা সামাজিক শিক্ষা নয়। যে-লোক তার রাগ প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না এটা হল গিয়ে তার কথা!'

'কিন্তু সত্যিই কি ও ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না?' বিষাক্ত হাসি হেসে এবার খ্‌লিয়ামের বললেন। 'আমার তো মনে হয়, ওই কাজটাই একমাত্র ও পারে!'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই! প্রথমে ও ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না, পরে ও ঠিকই খুঁজে পেয়েছে।'

মনে হল ব্রেগেল কিছু বলতে যাচ্ছেন কিন্তু স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে শেষপর্যন্ত আর কোনো কথা বললেন না তিনি।

৫

কলমাকের কড়চা

পরদিনই কভালের কাছে আমি এই টেলিগ্রামখানা পাঠিয়ে দিলুম: 'গোর্কি কলোনির কভাল, কলোনি-স্থানান্তরণের কাজে তাড়া লাগাও। প্রথম যে-ট্রেন পাওয়া যাবে তাই ধরে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকার কুরিয়াজ আসা চাই।'

পরদিন সন্ধেবেলায় এর জবাবে পাল্টা টেলিগ্রাম এল: 'মালগাড়ির অভাবে দেরি হচ্ছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা আজ রওনা হচ্ছেন।'

ওইদিন রাত দুটোর সময় কুরিয়াজের একমাত্র দু'চাকার ঘোড়ার গাড়িখানা রিজোভ রেল-স্টেশন থেকে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্না, লিদিয়া পেত্রোভ্না, বুত্সাই, জুর্বিন আর গরোভিচকে নিয়ে এসে পেঁছিল। আমরা ওঁদের থাকার জায়গা করে দিলুম আগেকার শিক্ষকরা যে-অসংখ্য দুর্গসদৃশ ঘরে বাস করতেন তার মধ্যে থেকে কয়েকখানা ঘরে, আর কোনোরকমে শোওয়ার সাজ-সরঞ্জামেরও যোগান দিলুম — বলা বাহুল্য, এজন্যে শহর থেকে আগেই আমাদের গদি কিনে আনতে হয়েছিল।

আমাদের মিলনটা ভারি আনন্দের হল। শেলাপুতিন আর তোস্কা দু'জনেই পনেরো বছরে পা দেয়া সত্ত্বেও ইশ্কুলের মেয়েদের মতো প্রত্যেককে জড়িয়ে ধরে, চুমো খেয়ে আর চিল-চিৎকার করে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল, তারপর আনন্দের আতিশয্যে একে অপরের গলা জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়ে হাওয়ায় পা দোলাতে থাকল! গোর্কিপন্থীরা সবাই তর্তাজা আর হাসিখুশি ভাব নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন, ওঁদের মুখ দেখেই আমি আমার কলোনির অবস্থা সম্পর্কে নিখুঁত রিপোর্টটি পেয়ে যাচ্ছিলুম। একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্নাও সংক্ষেপে সেই কথাই জানালেন। বললেন:

'গোছগাছ করে সবাই তৈরি হয়ে আছে ওখানে। সবকিছু প্যাক করা হয়ে গেছে। শুধু মালগাড়ি পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করে আছে সবাই।'

'আর ছেলেরা? কেমন আছে তারা?'

'ছেলেরা কাঠের প্যাকিং বাক্সগুলোর ওপর বসে থাকছে। মহা অধৈর্য হয়ে উঠেছে তারা। আমার তো মনে হয় আমাদের ছেলেরা ভারি আনন্দে

আছে। আমরা সবাই সুখে আছি, তাই নয় কি? তা, আপনার অবস্থা কী?'

'আমিও এত সুখে আছি যে তা ভাষায় বলার নয়,' সংযতভাবে জবাব দিলুম। 'তবে আমার মনে হয় না যে কুরিয়াজে আর কেউ বড়-একটা সুখে আছে...'

'কেন? কেন? ব্যাপারটা কী?' উৎকণ্ঠিতভাবে শুধোল লিদচ্কা।

'না, তেমন ভয়ঙ্কর কিছু না,' রাগত গলায় জবাব দিল ভোলখভ। 'তবে আমরা এখেনে সংখ্যায় যথেষ্ট নাই, এই আর-কি। ইদিকে মাঠে অনেক কাজ করার আছে। আর এখন আমরাই হলাম গিয়ি প্রথম মিশ্র, দ্বিতীয় মিশ্র আর বাদবাকি যে-কয়টা মিশ্র বাহিনীর নাম করতি পারেন সেই সব কয়টা একসাথে।'

'আর কুরিয়াজবাসীরা? তাদের ব্যাপারটা কী?'

শুনে ছেলেরা হেসে উঠল। বলল:

'অপেক্ষা করেন, নিজির চোখিই দেখতি পাবেন সব...'

পিয়ত্‌র ইভানভিচ গরোভিচ ঠোঁটদুটো টিপে একবার ছেলেদের দিকে, একবার অন্ধকার জানলাগুলোর দিকে, তারপর আমার দিকে তাকালেন। বললেন:

'কী? ছেলেদের তাড়াতাড়ি এখানে আসা বিশেষ দরকার?'

বললুম, 'হ্যাঁ, বিশেষ দরকার। আমাদের সাহায্য করার জন্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কলোনির এসে পড়া দরকার। তা না হলে আমাদের হার মানতে হবে।'

পিয়ত্‌র ইভানভিচ এবার গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন:

'কী করা যায়? আপনাকেই তাহলে কলোনিতে একবার যেতে হয় দেখছি। এখানে অবস্থাটা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়লেও এছাড়া তো আর পথ দেখি না। রেলের লোকজন মালগাড়ির ভাড়া বাবদ অনেক টাকা চাইছে। তারা কোনো বাট্টা ছাড় দিতেও রাজি নয়। মোটের ওপর তারা বেশ বাগড়াই দিচ্ছে। কাজেই আপনাকে অন্তত একদিনের জন্যে হলেও সেখানে যেতে হবে... কভালের তো রেল-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একচোট ঝগড়াই হয়ে গেছে।'

সবাই চিন্তায় ডুবে গেলুম। ভোলখভ কাঁধদুটো চক্রাকারে ঘোরাল একবার, তারপর বুড়ো মানুষের মতো খকখক করে কেশে গলা ঝাড়ল। পরে বলল:

'তাই করলিই ঠিক হবে-নে... যত শিগ্‌গিরি পারেন আপনে চলি যান, আমরা যা-হোক তা-হোক করি একরকম চালায়ে দেব-নে। যতই যাই হোক

অবস্তা এয়ার চাইতে আর কী খারাপ হবে? — আপনে বরং আমাদের ছোঁড়াদেরকে গিয়ি বলেন হেলাফেলায় এভাবে সময় নষ্ট না করতি।'

জানলার তাকের-ওপর-বসা ইভান দেনিসভিচ প্রশান্তভাবে দন্তবিকাশ করে হাসলেন, তারপর নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। বললেন:

'ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যে একটা ট্রেন আছে। তা আপনার শেষ ইচ্ছা ও নির্দেশ কী বলে ফেলুন!'

'আমার নির্দেশ? কিন্তু নির্দেশে কী এসে-যাবে বলুন? — হ্যাঁ, একটা কথা। বলপ্রয়োগ অবশ্যই করবেন না। আপনারা এখন ছ'জন হলেন। সবাই মিলে যদি দুটো বা তিনটে বাহিনীকে আমাদের পক্ষে টানতে পারেন তাহলেই যথেষ্ট। তবে ওদের দলে টানতে চেষ্টা করুন একেবারে আস্ত একেকটা বাহিনী হিসেবে, ব্যক্তিগতভাবে নয়।'

'এর অর্থ বোধকরি প্রচার-আন্দোলন চালানো, তাই না?' সখেদে মন্তব্য করলেন গরোভিচ।

'হ্যাঁ, প্রচার-আন্দোলন তো বটেই, তবে তা খুব বেশি স্পষ্ট করে তোলা চলবে না। যতটা পারেন ওদের কাছে আমাদের কলোনির গল্প বলবেন, বিভিন্ন ঘটনা, নানা ছেলেমেয়ের ব্যক্তিগত জীবনকথা, এইসব শোনাবেন, শোনাবেন নানা নির্মাণকাজের কথা। তবে এসব তো আপনারা জানেনই, এ আর শেখাবার কী আছে। এসব কথা বলে সঙ্গে সঙ্গে যে ওদের চোখ খুলে দিতে পারবেন না এ তো জানা কথা, তবে ওদের শিকারি নাকে নতুন কিছু-কিছু গন্ধের হদিশ অন্তত দিতে পারবেন।'

আমার মাথার ভেতর তখন তুমুল আলোড়ন চলেছে। নানা ধরনের ভাবনাচিন্তা, ধ্যানধারণা, নানা ছবি সেখানে লাফালাফি জুড়েছে, পাক খাচ্ছে, গুড়ি মেরে হাঁটছে, এমন কি মাথার মধ্যে মূর্ছা যাচ্ছে বলেও মনে হচ্ছে। আর এদের মধ্যে কোনো একটাও এতটুকু আশা-ভরসার আভাস দিলেই আমার নিজের কেমন যেন সন্দেহ জাগছে যে সেই ভাবনায় নিশ্চয়ই নেশার রঙ লেগেছে।

শিক্ষা-বিজ্ঞানের জগতে তার নিজস্ব বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন আর জ্যামিতি আছে, এমন কি সে-জগতে শিক্ষা-বিজ্ঞানগত অধিবিদ্যা বলেও একটা বস্তুর অস্তিত্ব আছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, আমি কী করে সেই অন্ধকার রাত্রে ওই ছ'জন মানবধর্ম-প্রচারককে কুরিয়াজে একা ফেলে রেখে চলে

যেতে পারলুম। ওঁদের আমি প্রচার-অভিযান চালানোর কথা বলেছিলুম বটে, কিন্তু আসলে যে-ব্যাপারটার ওপর আমি নির্ভর করছিলুম তা হল — কুরিয়াজে আচমকা ছ'জন সংস্কৃতিমান, আন্তর গুণাবলী ও শুভেচ্ছাসম্পন্ন মানুষের আবির্ভাব। অবশ্য এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে এটা ছিল এক-পিপে আলকাতরায় একচামচ মধু ঢেলে সুফলের প্রত্যাশার মতোই! কিন্তু কুরিয়াজের জনসমাজ কি সত্যিই আলকাতরা ছিল? রসায়নশাস্ত্রে আমার জ্ঞান অবশ্য মোটেই চমকপ্রদ নয়। তবু মনে হয় এই মিশ্রণে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটা সম্ভব তা কেবল শোচনীয়রকমের নিস্তেজ আর নিষ্পত্তিহীন কিছু-একটা হবে। রাসায়নিক বিক্রিয়ারই যদি এক্ষেত্রে দরকার ছিল, তাহলে তা হওয়া প্রয়োজন ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ধরনের — তাহলে তাকে হতে হোত ডিনামাইটের, নাইট্রোগ্লিসারিনের রসায়ন, আচমকা, ভয়ংকর, মনে ছাপ রেখে যাওয়ার মতো এক বিস্ফোরণ, যা নাকি গির্জের দেয়াল, নোংরা শতচ্ছিন্ন জ্যাকেট, 'শিশু মনস্তত্ত্ব', গুন্ডা রকবাজ ছেলে আর 'সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত কৃষিবিদদের' উপড়ে আকাশে ছুড়ে ফেলে দেবে।

ভেতরে-ভেতরে আমি কিন্তু সত্যিই প্রস্তুত ছিলুম নিজেকে আর আমার অগ্রবর্তী মিশ্র বাহিনীটিকে পরিপাটি করে একটা পিপেয় ভরে ফেলার জন্যে। সবকিছু উপড়ে ফেলার মতো যথেষ্ট বিস্ফোরণ-শক্তি অবশ্যই আমাদের মধ্যে নিহিত ছিল। ১৯২০ সালের কথা এই সময়ে মনে পড়ছিল আমার। আমরা শুরু করেছিলুম তখন যথেষ্ট প্রচণ্ডভাবেই, ঘনঘন বিস্ফোরণের কিছুমাত্র ঘাটতি ছিল না আমাদের মধ্যে। নিজে আমি সওয়ার হয়েছিলুম তখন উড়ন্ত মেঘে গোগলের ভাকুলা চরিত্রের মতো, কিছুতেই ভয় ছিল না আমার। কিন্তু যে-সময়ের কথা বলছি তখন যেন আমার মাথা অলংকৃত করে বাঁধা ছিল, যাকে বলে, নানারঙা সব মর্যাদাসূচক রিবন, যা নাকি সকল ভণ্ডামির সেরা, পবিত্রতার ভানে-ভরা শিক্ষা-বিজ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রে মাথায় ধারণ করা একান্ত আবশ্যক বলে গণ্য হোত। — 'দিদিমা গো, দিদিমা! খেলতে আমায় দে না কেন ছোট্ট একটা বিস্ফোরণ!' — জবাবে দিদিমা বলে, 'বেশ তো বাছা, নে না তা, কেবল দেখিস আঘাত যেন না পায় যতেক শিশুমন!'

কিন্তু ওখানে তখন বিস্ফোরণ ঘটার কোনো সম্ভাবনা ছিল না!

অতএব বললুম, 'ভোলখভ — গাড়িতে ঘোড়া জোত! আমি যাব!'

আর এর এক ঘণ্টা পরে চলন্ত রেলগাড়ির কামরার খোলা জানলার ধারে

আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে ছিলুম আমি। ট্রেনখানা ছিল লজ্‌ঝড়, একেবারে চতুর্থ শ্রেণীর, সারা ট্রেনে বসার কোনো সিট ছিল না।

ভাবছিলুম, কুরিয়াজ থেকে তাহলে কি নির্লজ্জের মতো পালালুম আমি? আমার নিজের ডিনামাইটের সঞ্চয় থেকে নিজেই কি ভয়ে পিছিয়ে এলুম না? বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করতে হল নিজেকে। না, ডিনামাইট হল গিয়ে বিপজ্জনক বস্তু, তা নিয়ে মিছিমিছি খেলতে যাই কেন যখন আমার সংরক্ষণে আছে আমারই বাহাদুর গোর্কিপন্থীরা? আর তো মাত্র চার ঘণ্টা — তার পরেই এই ভ্যাপসা গুমোট, নোংরা, প্রতিকূল ট্রেনের কামরা ছেড়ে আমি গিয়ে পোঁছে যাব 'বাছাই-করা' সেরা জনমণ্ডলীর মধ্যে।

ঘোড়ার গাড়িতে চেপে পরদিন কলোনিতে পোঁছলুম যখন, তখন মনে হচ্ছিল নিজের উত্তাপে সূর্য নিজেই খাবি খাচ্ছে। আমি পোঁছতেই চারিদিক থেকে কলোনি-বাসিন্দারা ছুটে এল। কিন্তু কী বললুম, কলোনি-বাসিন্দা? আমার তো মনে হচ্ছিল ওরা বুঝি রেডিয়ম ধাতুর তেজস্ক্রিয় বিচ্ছুরণ! এমন কি গালাতেঙ্কো, যে নাকি আগে আত্ম-পরিবহণের উপায় হিসেবে দৌড়নোকে মেনে নিতে একেবারেই রাজি ছিল না, সেও যখন কামারশালের দরজা থেকে উঁকি দিয়ে আমায় দেখতে পেল তখন রাজা দারিয়ুসের বাহিনীভুক্ত হাতির মতো মেদিনী কাঁপিয়ে পায়ে-চলা পথটা দিয়ে ধুপধুপ করে পা ফেলতে-ফেলতে ছুটে এল। অভিবাদন জ্ঞাপন, বিস্ময়প্রকাশ আর অধৈর্যভাবে একের-পর-এক প্রশ্নের তুমুল হট্টগোলে গলা মেলাল সেও:

'কাজকর্ম কেমন চলতিছে ওখেনে, আন্তন সেমিওনভিচ? সবকিছু ঠিকঠিক চলতিছে তো?'

আর আমি ভাবছিলুম, কোথা থেকে অমন সাহসে-ভরা মনখোলা হাসি পেলে তুমি, গালাতেঙ্কো? কোথায় পেলে অমন সূক্ষ্ম সুন্দর মাংসপেশীটি, যা তোমার চোখের নিচের পাতাটিকে অত শোভনভাবে কুঁচকে তুলেছে? চোখে কী লাগাচ্ছ আজকাল তুমি যে চোখদুটি অমন জ্বলজ্বল করছে? সে কী কোনো মন্ত্রঃপূত আরক, নাকি এমনিই বিশুদ্ধ বসন্তকালীন জল? আর যদিও তোমার ভারি জিভটি এখনও কষ্ট করে নড়াচড়া করছে, তবু কী করে মনের আবেগকে ভাষা দিতে হয়, কীভাবে যেন তা আবিষ্কার করে ফেলেছে সে। হ্যাঁ — আবিষ্কার করে ফেলেছে আবেগ প্রকাশের ভাষা!

জিজ্ঞাসা করলুম, 'কী ব্যাপার, সবাইকে এত ফিটফাট দেখছি যে? বল-নাচের আসর জমে উঠেছে নাকি?'

'হা-হা, তাই বটে!' লাপত বলল। 'সত্যিকারের বল-নাচই বটে! আজ এই প্রেথম দিন যে-দিন আমরা কাজ করতেছি না আর সন্ধ্যাবেলা 'নীলমাছি' নাটকটা মঞ্চস্থ করতি যেতেছি। এই নাটক দেখায়ে মুজিকদের কাছ থেকে বিদায় নেব আমরা... কিন্তু বলেন দেখি, ওখেনকার ব্যাপারস্যাপার কেমন?'

কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের তাক লাগানোর উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে কেনা নতুন খাটো প্যান্ট আর ভেল্‌ভেটের আঁটো টুপিতে কলোনি-বাসিন্দাদের দেখে মনে হচ্ছিল সত্যিই বুঝি তারা ছুটির খোশমেজাজে ভরপুর। ষষ্ঠ (নাটক-সংক্রান্ত) বাহিনীর সদস্যরা কলোনিময় দৌড়ে বেড়াচ্ছিল, আসন্ন অভিনয়ের প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত ছিল তারা। শোবার ঘরগুলো, ইশ্‌কুল-বাড়িটা, ওয়ার্কশপ আর ক্লাবঘরগুলো ঠাসা ছিল রাশি-রাশি পেরেক-ঠোকা কাঠের বাক্সে, সেলাই-করা চটের বস্তায়, গোল-করে-মোড়া গদিতে আর পোঁটলাপুঁটলিতে। উৎসবের দিনের মতো গোটা কলোনি সাফসুতরো করে সাজানো-গোছানো হয়েছিল। শুর্‌কা জেভেলির নেতৃত্বাধীন একাদশ বাহিনী অধিষ্ঠিত হয়েছিল আমার ঘরখানায়। দেখলুম, আমার মা-ও তাঁর ঘরে নানাবিধ বাক্স-তোরঙ্গের মধ্যে অধিষ্ঠান করছেন, তবে ছেলেরা মহানুভবতা দেখিয়ে তাঁর শোবার জন্যে একখানা কোল্যাপ্সিব্‌ল খাট দিয়েছে। নিজেদের এই মহানুভবতায় শুর্‌কা দেখলুম খুব গর্ববোধ করছে। সে বললে:

'দিদা তো আমাদের মতন যেমন-তেমন করি শুতি পারেন না, ওনার জন্যি তাই এই ব্যবস্থা, বোঝলেন না? সব ছেলেরা কিন্তু আজকাল গোলাঘরে খড়ের উপর শুতিছে। তা, খাটবিছানার থেকে খড়ের উপর শোয়া বেশি আরামের, বোঝলেন। আর মেয়েরা শুতিছে গাড়িগুলোর উপর। আর কাণ্ডখান দেখেন একবার — মাত্তর গতকাল নেস্তেরেঙ্কো কলোনির দখল নেছে আর আজই সে লেগি গেছে আমাদের পিছনে! দেখেন কাণ্ড — ওরে আমরা গোটা কলোনি দিয়ি দেলাম আর ও সামান্য এটুু খড়ের জন্যি আমাদের মাথা খায়ে ফেলতেছে! তা, কন দেখি, দিদার মালপত্তর প্যাক করা হয়েছে কেমন?.. দিদা, আপনেই ওনারে বলেন!'

শুনে দিদা ছেলেদের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলেন বটে, তবে

তাঁরও কিছু ওজর-আপত্তি ছিল আর তাই নিয়ে তকরার শুরু করলেন তিনি। যেমন বললেন:

'গোছগাছ তো সব করেছ চমৎকার। কিন্তু শুধাই, তোমাদের ডিরেক্টর শোবে কনে?'

'ওনার জন্যি কোনো চিন্তা নাই!' উৎফুল্লভাবে চেঁচিয়ে বলল শুরকা। 'আমাদের এগারো নম্বর বাহিনী সবথেকে ভালো খড় পেয়েছে। এর জন্যি এদুয়ার্দ নিকলায়েভিচ আমাদেরে বকাবকি করেছেন পের্যন্ত — বলেছেন, অমন চমৎকার খড়ের উপর শোয়া নাকি পাপ। তৎসত্ত্বেও আমরা ওই খড়ে শুয়েছি আর তার পরে ওয়া খাতি দিছি 'মলদিয়েত্‌স'রে, আর ও গপগপ করি খায়ে ফেলেছে সব! তা, ভাববেন না দিদা, আস্তন সেমিওনভিচের জন্যি এট্টা জায়গা ঠিকই খুঁজি বার করব-নে!'

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের খালি ঘরগুলোতেও বহু কলোনি-বাসিন্দা গিয়ে রীতিমতো প্যাকিং আর পাহারাদার সংগঠন গড়ে আস্তানা গেড়েছিল। লিদচ্‌কার ঘরখানা তো হয়ে দাঁড়িয়েছিল কভাল আর লাপতের সদর-দপ্তর। রাগে আর অসম্ভব ক্লান্তিতে রক্তশূন্য হয়ে ফ্যাকাশে মেরে গিয়েছিল কভাল। আমি যেতে ঘরের জানলার তাকে চেপে বসে শূন্যে ঘুষি ছুড়তে-ছুড়তে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে গালাগাল শুরু করে দিল সে।

'যতসব হতভাগা আমলার দল! যত বলি এ-সবই বাচ্চাদের ব্যাপার, তা কিছুতে কী বিশ্বাস করতে চায়! বললাম, 'আপনারা চানটা কী, বলেন তো? আমারে কি ওদের জন্মের সন-তারিখের সার্টিফিকেট আনতে হবে নাকি? আপনারা কি জানেন না যে ছোঁড়াদের অমন কোনো কাগজপত্র নাই?' তা, ওদের সাথে কথা কয়ে লাভ কী বলেন? ওরা না-বোঝে কোনো কথা, না-কিছু! ওদের সেই এক রা, 'একজন সাবালক একটা বাচ্চারে খালি বিনা-টিকিটে নিতি পারে। কিন্তু সাবালক গার্জেন ছাড়াই কোনো বাচ্চা যদি ট্রেনে যেতে চায়, তাহলে?..' 'ওরে গর্দভের দল, বাচ্চা, বাচ্চা! বুঝতে পারছেন না, এটা হল গিয়ে শ্রম-কলোনি! তাছাড়া আমরা তো মালগাড়ি চাইছি, অন্য কিছু নয়!..' কিন্তু কে কার কথা শোনে, কাঠের কুঁদোর সাথে কথা বলা যা ওদের সাথে কথা বলাও তা! শুধু অ্যাবাকাস-যন্তরটা নিয়ে ক্লিক-ক্লিক করতেই জানে ওরা — জানে খালি: 'মাল, ক্ষতিপূরণ, ভাড়ার হার...' এইসব। শুধু তাই নয়, কোথা থেকে জানি ওরা একগাদা নিয়মকানুনও

চ্বড়ে বের করে ফেলল — ঘোড়া নিয়ে যাওয়ার জন্যে একরকম ভাড়া, বাড়ির আসবাবপত্তর হলে একরকম ভাড়া, বীজবোনার জন্যে দল নিয়ে যেতে হলে তাদের যন্তরপত্তরের জন্যে আরেকরকম ভাড়া, এমনি নানারকম। তা বললাম, 'নিকুচি করেছে আপনাদের আর আপনাদের বাড়ির আসবাবপত্তরের! আমাদের কী ঠাওরেছেন আপনারা বলেন দেখি — ব্রজোয়াদের কোনো পরিবার বাড়িবদল করছে, নাকি?..' লোকগ্রলার আস্পর্ধাটা দ্যাখেন একবার — সামান্য যতসব আপিসের কেরানি কিন্তু ভাব করতে লেগেছে এমনধারা যেন না-জানি কোন খাঞ্জাখাঁ! ওখেনে বসে-বসে শ্বধ্ব সবতাতে বাগড়া দেয়া ওদের কাজ! ওরা বলে কী, জানেন? বলে, 'আপনেরা ব্রজোয়া না চাষী তাতে আমাদের কিছ্ব যায়-আসে না। আমরা খালি চিনি রেলের যাত্রী আর মালপত্তর চালান দেয় যারা তাদেরে।' আমি ওদের শ্রেণী-দ্ষ্টিভঙ্গি বোঝানোর চেষ্টা করলাম তা বেটাদের লজ্জা নাই, সোজা আমার ম্বখের উপর বলে দিল: 'যেহেতু মাস্বলের হার বইতি লেখা আছে, তাই শ্রেণী-দ্ষ্টিভঙ্গিতি আমাদের কিছ্ব যায়-আসে না'।'

রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধে কভালের দ্বঃখের অভিজ্ঞতা কিংবা কুরিয়াজ সম্পর্কে আমার শোকাবহ বর্ণনার দিকে বিন্দ্বমাত্র মনোযোগ না-দিয়ে লাপত এতক্ষণ খালি মজার-মজার পরিচিত সব ব্যাপারের দিকে কথার মোড় ঘোরানোর চেষ্টা করছিল। এমন ভাব করছিল সে যেন কুরিয়াজ বলে কোনো জায়গার অস্তিত্বই নেই, যেন তার কয়েকদিনের মধ্যে তাকে নিজেকেই কবরখানার মতো মনোবল-ভাঙা সেই জায়গাটাতে যেতে হবে না আর সেখানে গিয়ে দলপতি-পরিষদের নেতৃত্ব দিতে হবে না। তার এই ছ্যাবলামি দেখে প্রথম দিকে আমি আরও মনমরা হয়ে পড়ছিল্বম, কিন্তু তার ঝলমলে রসিকতার মারপ্যাঁচে শিগ্‌গিরই আমার মনমরা ভাব খানখান হয়ে ভেঙে গ্বঁড়িয়ে গেল আর দেখা গেল কুরিয়াজের ভাবনা-চিন্তা বেমাল্বম ভুলে অন্যদের সঙ্গে আমিও কখন যেন হাসিতে ল্বটোপ্বটি খেতে শ্বর্ব করেছি। ধরাবাঁধা র্বটিনের হাত থেকে কয়েকদিনের মতো রেহাই পাওয়ার ওই সময়টায় লাপতের সহজাত প্রতিভা যেন আরও বিকশিত ও ফুলেফলে স্বশোভিত হয়ে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল ও যেন চুম্বকের আকর্ষণী শক্তি পেয়েছে। ওই সময়ে সর্বদাই দেখা যেত কিছ্ব-না-কিছ্ব ছেলেপিলে ওকে ঘিরে আছেই। ও ছিল তাদের কাছে ভালোবাসার, বিশ্বাসের, এমন কি আরাধনার পাত্র। এরা ছিল

নানা রকমারি হাবাগবা, ছিটগ্রস্ত, মাথা-পাগলা আর নিপীড়িত ছেলোপিলে। কীভাবে তাদের মধ্যে একের থেকে অন্যকে পৃথক করতে হয়, ভিন্ন-ভিন্ন স্তরে ভাগ করতে হয় তাদের, সস্নেহে লালন করতে হয়, আবার তাদের নিয়ে মজাও করতে হয় লাপত তা জানত। ওর তত্ত্বাবধানে তাদের চরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রঙ্‌ফেরা চমৎকার প্রকাশ পাচ্ছিল আর তাদের মনে হচ্ছিল মানবজাতির অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক সব নমুনা বলে।

ফ্যাকাশে চেহারার, চুপচাপ অথচ কেমন-যেন বিভ্রান্ত গুস্তোইভানকে লাপত বলছে শুনলুম:

'হ্যাঁ রে, ওখেনে-না উঠানটার একবারে মাঝখানে একটা গির্জা আছে। তা, গির্জা চালানোর জন্যি আমাদের ডীকন লাগবে না — তুই-ই ডীকন হতি পারবি।'

শুনে গুস্তোইভানের গোলাপি ঠোঁটদুটো একটু কুঁচকে উঠল মাত্র। কলোনিতে আসার আগে কেউ-না-কেউ ওকে ধর্মের এতখানি আফিম গিলিয়ে বুঁদ করে ফেলেছিল যতখানি আফিম হয়তো ঘোড়ার সেব্য হতে পারত, আর সেই আফিমের ঘোর ওকে একেবারে কাবু করে ফেলেছিল। প্রতি সন্ধেয় শোবার ঘরের অন্ধকার কোণটায় সেঁধিয়ে ও প্রার্থনাটা সেরে নিত বলে জানা ছিল সকলের। আর শহীদ-শহীদ ভাব করে এ-বাবদে কলোনি-বাসিন্দাদের ঠাট্টা-তামাশাও নির্বিবাদে চুপচাপ হজম করে যেত। গাড়ির চাকা-বানানেওয়ালা কোজির কিন্তু অত চুপচাপ ঠাট্টা হজম করার পাত্র ছিল না। সে বলে উঠল:

'অমন কথা বলতি হয় না, কমরেড লাপত! পেরভু তমারে য্যান ক্ষ্যামা করে! গুস্তোইভান ডীকন বনি যাবে কী কর্যে? ধম্মোপ্রেচারকের দীক্ষাদান ছাড়া ওয়া তো হতি পারে না!'

হেসে মাথাটা পেছনদিকে হেলিয়ে দিল লাপত। বলল:

'আহা, ওতে যেন বড্ড বেশি এসি-যাবে! দীক্ষাদান, না হাতি! আরে, ওরে আমরা এমনেই দীক্ষা নেয়ার পোশাক পরায়ে দেব-নে আর ও কেমন একখান মরি-মরি ডীকন বনে যাবে দ্যাখবে-নে!'

কোজির তবু তার জিদ ছাড়তে রাজি হল না। অনুনাসিক চড়া সুরে সে বলল, 'কিন্তু দীক্ষাদানডা দরকার যে বটে! বিশপরে অর মাথায় হাত রাখতি লাগবে-যে।'

এবার গোড়ালিতে ভর দিয়ে উবু হয়ে কোজিরের সামনে বসল লাপত। তারপর ওর মসৃণ, ফোলা-ফোলা চোখের পাতাদুটো পিটপিট করতে-করতে নিচু থেকে ওপরে তার দিকে তাকিয়ে বলল:

'এক-মিনিট রয়েন দেখি, বুড়াকত্তা! বলি, বিশপের কি ক্ষ্যামতা আছে... না নাই?'

'বিশপের ক্ষ্যামতা আছে বৈকি...'

'আর দলপতি-পরিষদ? তার কি ক্ষ্যামতা আছে? কী মনে ভাবেন? তাইলে দলপতি-পরিষদ যদি তাদের হাত ওর মাথায় রাখে তবে কী হয়? বলি ফেলেন দেখি!'

'কিন্তু দলপতি-পরিষদ তো ও-কাজ করতি লারবে, খোকন। পরিষদ তো দীক্ষা দিতি পারে না,' মাথাটি একপাশে হেলিয়ে জবাব দিল কোজির। বোঝা গেল, আলোচনার ধরন দেখে ও চমৎকৃত হয়েছে।

দুই হাত কোজিরের দুই হাঁটুতে রেখে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সুরে লাপত এবার বলল:

'পারে, কোজির-ভাই, পারে! দলপতি-পরিষদ এমন দীক্ষা দিতি পারে যা শুনে তোমার বিশপ বিলকুল ভেড়া বনে ব্যা-ব্যা করতি থাকবে!'

বৃদ্ধ, সহৃদয় কোজির, সন্তপ্রতিম কোজির লাপতের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনল, একেবারে ওর হৃদয়তন্ত্রীতে যেন ঘা দিতে দিল কথাগুলোকে। মনে হল, এই অপ্রতিরোধ্য যুক্তিজালের ফাঁদে ও যেন প্রায় ধরা দিতে যাচ্ছে। সত্যিই তো, দুনিয়ার বিশপকুল আর যত সাধুসন্ত ওর উপকারার্থে কী করেছে জীবনে? কিছুই না। অথচ দলপতি-পরিষদ ওর যা উপকার করেছে তা একেবারে প্রত্যক্ষ বাস্তব — ওরা কোজিরকে স্ত্রীর হাত থেকে বাঁচিয়েছে, থাকার জন্যে ওকে দিয়েছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আলো-হাওয়াযুক্ত একখানা ঘর আর খাট-বিছানা, আর দিয়েছে গুতের নেতৃত্বে আমাদের প্রথম বাহিনীর হাতে-গড়া একজোড়া শক্তপোক্ত মানানসই বুটজুতো। হতে পারে বৃদ্ধ কোজির মারা যাওয়ার পর যখন স্বর্গে যাবে তখন হয়তো অবশেষে 'পেরভু' ঈশ্বরের কাছ থেকে সারা জীবন কষ্টভোগের কিছু ক্ষতিপূরণ পাবে, তবে এই মাটির পৃথিবীতে জীবন কাটানোর জন্যে দলপতি-পরিষদের সাহায্য কিন্তু ওর পক্ষে অপরিহার্য ছিল।

'লাপত — তুই এখেনে আছিস?' বলতে-বলতে জানলা দিয়ে গালাতেঙ্কোর গম্ভীর মুখখানা উঁকি দিল।

দীক্ষাদানের মজাদার আলোচনা থেকে জোর করে নিজেকে ছিনিয়ে এনে লাপত চেঁচিয়ে সাড়া দিল, 'হ্যাঁ, আমি এখেনে! কেন, ব্যাপার কী?'

হাতের ভর দিয়ে হিঁচড়ে নিজেকে জানলার তাকের ওপর খানিকটা তুলল গালাতেঙ্কো। আর তখন লাপতের চোখে পড়ল ওর দেহের গোটা পাত্র ভরে উপচে-পড়া প্রচণ্ড ক্রোধের অভিব্যক্তি আর সেই তরল ক্রোধ থেকে ধীরে-ধীরে ঘুরে-ঘুরে ওঠা মানবিক যন্ত্রণাবোধের তপ্ত ধোঁয়া। গালাতেঙ্কোর বড়-বড় কটা চোখদুটো জলে ভরে উঠেছে দেখা গেল।

'অরে বল্, লাপত, বুঝায়ে বল্ অরে!.. নিজির উপর বিশ্বাস নাই আমার কী জানি অর থোতাখান যদি ভাঙ্যে থুই...'

'কিন্তু, কারে বুঝায়ে কব?'

'তারানেত্স্রে!'

এমন সময় আমার দিকে চোখ পড়ল গালাতেঙ্কোর। তাড়াতাড়ি হেসে চোখের জল মুছে ফেলল সে।

'কী হয়েছে, গালাতেঙ্কো?'

'অর কী অধিকার আছে কন দেখি? চতুর্থ বাহিনীর দলপতি হয়্যেছে বলি ও ঝ্যান ধরারে সরাজ্ঞান করতিছে... অরে কওয়া হয়্যেল 'মলদিয়েত্স'-এর জন্যি একখান ডালাখোলা খাঁচা বানাতি। তা ও কয় কী — 'একখান খাঁচা 'মলদিয়েত্স'-এর জন্যি, আর একখান গালাতেঙ্কোর জন্যি'। দ্যাখেন তো!'

'কাকে একথা বলেছে ও?'

'ছুতারমিস্তিরিদেরে — অর অধীন ছেল্যাদেরে।'

'তারপর?'

''মলদিয়েত্স'-এর জন্যি ডালাখোলা একখান খাঁচা বানানোর দরকার পড়্যেছে, যাতে ও লম্ফ দিয়ি মালগাড়ি থ্যেকে পড়্যে না-যায় তার জন্যি। আর ছোঁড়ারা করল্য কী শোনেন, আমারে চাপ্যে ধরি মাপজোক শুরু করে্য দেল, আর তারানেত্স অদেরে কয়্যেল — ''মলদিয়েত্স' থাকব্যে বাঁয়ের খোপে আর গালাতেঙ্কো ডাইনের খোপে'।'

'তার মানে?'

'ওই ডালাখোলা খাঁচাডার দুই খোপে আর-কি!'

সব শুনে চিন্তিতভাবে কানের পেছনটা চুলকোতে লাগল লাপত, আর এ-ব্যাপারে লাপতের বক্তব্য কী তা শোনার জন্যে ধৈর্য ধরে একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে রইল গালাতেঙ্কো।

'কিন্তু তুই তো আর মালগাড়ি থেকে লাফ দিয়ি পড়বি না, তাই না?'

জানলার ওধারে দাঁড়িয়ে গালাতেঙ্কো পা বদলাল। তারপর নিজের পায়ের দিকে তাকাল। বলল:

'ক্যানে, লম্ফ দিব ক্যানে? লম্ফ দিয়ি যাবই-বা কনে? আর দ্যাখ দেখি ও কয় কিনা, 'শক্ত করো্যে ডালাখোলা একখান খাঁচা বানা দেখি, নইলি ও লাথায়্যে মালগাড়িখান খানখান করো্যে দিবে-নে'।'

'কে খানখান করবে?'

'কে আবার — আমার কথা কয়্যেল ও!..'

'কিন্তু তুই তো মালগাড়ি ভাঙবি না। ভাঙবি নাকি?'

'কী কথা! য্যান আমি মালগাড়ি ভাঙব্য!..'

'তারানেত্স মনে করে তোর গায়ি সাংঘাতিক জোর কিনা, তাই! তা, তুই একথায় দোষ নিস না।'

'আমার গায়ি জোর আছে ঠিকই... কিন্তু ডালাখোলা খাঁচা লাগব্যে কী জন্যি, শুনি?'

খোলা জানলা দিয়ে লাফিয়ে বাইরে নেমে ব্যস্তসমস্তভাবে ছুতোরশালের দিকে চলল লাপত। গালাতেঙ্কোও চলল তার পিছুপিছু।

লাপতের চরিত্র-সংগ্রহশালায় আর্কাদি উজিকভও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর্কাদিকে লাপত অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য একটা মনুষ্য-নমুনা হিসেবে গণ্য করত আর সত্যিকার আগ্রহ নিয়েই ওর সম্পর্কে আলাপ করত। একদিন বলল:

'আর্কাদির মতন ছোঁড়ার দেখা পাওয়ার সৌভাগ্যি জীবনে একবারই মাত্তর হয়। ও কিছুতি আমার পিছু ছাড়ে না, বোঝলেন! ছোঁড়াদেরে ও যমের মতন ডরায়। খাওয়া ঘুমানো সবই ও আমার সাথে করে।'

'ও তোমার এতই ভক্ত নাকি?'

'নয় আবার! তবে এর মধ্যি একদিন হল কী জানেন। আমার কাছে কিছু টাকা ছিল, কভাল আমারে দেছিলেন দড়ি কেনার জন্যি। তা, আর্কাদি টাকাটা হাতসাফাই করে মেরে দিল...'

বলেই হঠাৎ সজোরে হো-হো করে হেসে উঠে আর্কাদির দিকে তাকাল

লাপত। ওর পাশেই একটা প্যাকিং বাক্সের ওপর বসে ছিল আর্কাদি।

'এই ছোঁড়া, বল্-না আমাদের টাকাটা কোথায় লুকায়েছিলি?'

বসার ভঙ্গি বদল না-করে এবং কিছুমাত্র অপ্রস্তুত হওয়ার ভাব না-দেখিয়ে আর্কাদি অবসন্নভাবে জবাব দিল:

'ট্যাকাডা আমি তর পুরানো ট্রাউজার্সের জেবে রাখ্যেছেলাম।'

'তারপর? তারপর কী হল?'

'তুই পায়্যে গেলি।'

'ওরে গন্দভ, আমি হঠাৎ পেয়ে যাই নাই, আমি তোরে টাকাটা রাখতি দেখেছিলাম। কী বলিস, তাই না?'

'হ্যাঁ, দেখ্যেছিলি।'

আর্কাদির নিষ্প্রভ চোখদুটো এতক্ষণ আগাগোড়া লাপতের মুখের ওপর স্থির হয়ে ছিল, একবারের জন্যেও নড়ছিল না তা। কিন্তু সে-চোখদুটোকে মানুষের চোখ বলা চলে না, সে-দুটো ছিল এক ধরনের মানবেতর, নিষ্প্রাণ, কাচের অলঙ্কারের মতো।

'আপনের থেকেও ও টাকাপয়সা চুরি করবে কিন্তু, আন্তন সেমিওনভিচ! সত্যি করবে! তাই-না, আর্কাদি?'

উজিকভ জবাব দিল না, চুপ করে রইল।

'করবে, করবে!' মহা খুশি হয়ে চেঁচিয়ে উঠল লাপত। আর উজিকভ তার স্বভাবসিদ্ধ প্রাণহীন ওর উচ্ছল ধরনধারণ চোখ মেলে দেখতে লাগল।

লাপতের অপর এক রসিকতার পাত্র ছিল নিত্সেঙ্কো। ছেলেটার গলাটা ছিল লম্বা টিনটিনে, কণ্ঠার হাড় উঁচু, আর তার ঘাড়ের ওপর ছোট্ট মাথাটা ছিল এমনভাবে বসানো যে দেখে মনে হোত যেন তা অসম্ভব ঔদ্ধত্যে-ভরা একটা উটের মাথা। ওর সম্পর্কে লাপতের মন্তব্য ছিল এইরকম:

'এই হাবাগবা ছোঁড়াটারে দিয়ি কত জিনিস-যে বানায়ে নিতি পারেন আপনে তার ঠিক নাই — ঘোড়া জোতার গাড়ির ডাণ্ডা, চামচ, জাবনার পাত্তর, কোদাল, কতকিছু। আর ও নিজিরি বিশ্বকর্মা বলি ঠাওরায়!'

এই সব অদ্ভুত প্রকৃতির ঝড়তিপড়তি ছেলেপিলে যে লাপতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওকে ঘিরে থাকছিল এতে আমি খুশিই হলুম। এর ফলে গোর্কিপন্থীদের বাকি দলবল থেকে এদের পৃথক করে রাখার ব্যাপারে

আমায় একরকম সাহায্যই করছিল লাপত। ওর ঠাট্টা-তামাশার অফুরান বন্যা এই ছেলেদের ওপর এক ধরনের সংক্রামক-রোগবীজাণুনাশক ওষুধ ছড়ানোর কাজ করছিল বলে মনে হচ্ছিল এবং এর ফলে সাধারণভাবে কলোনির আঁটোসাঁটো শৃঙ্খলা ও কর্মদক্ষতা সম্পর্কে আমার ধারণা আরও পাকাপোক্ত, আরও জোরালো হয়ে উঠছিল। যে-সময়ের কথা বলছি বিশেষ করে সেই সময়ে আমার এই বোধ সত্যিই অত্যন্ত জোরালো হয়ে উঠেছিল, এমন কি বলা যায় এটা একটা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের অভিজ্ঞতার চেহারা নিয়েছিল।

সব কলোনি-বাসিন্দাই আমার কাছে কুরিয়াজ সম্বন্ধে খোঁজখবর নিচ্ছিল বটে, তবে আমি বেশ বুঝতে পারছিলুম যে দেখা হলে ভদ্রতা করে লোকে যেমন পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করে 'কী খবর, আছেন কেমন', এটাও সেইরকমই একটা ভদ্রতার ব্যাপার ছিল মাত্র। কুরিয়াজ সম্পর্কে আগ্রহ ইতিমধ্যেই আমাদের যৌথ সংস্থার মনোভূমিতে কোনো-এক সুদূর কোণে নির্বাসিত হয়েছিল, আর তারপর তা শুকিয়ে গিয়ে উবে গিয়েছিল একদিন। ওই সময়ে সেই জায়গায় প্রধান হয়ে উঠেছিল অন্যান্য নানাবিষয়ে আগ্রহ আর নতুন-নতুন অনুভবের অভিজ্ঞতা — যথা, রেলের মালগাড়ি, 'মলদিয়েত্‌স' আর গালাতেঙ্কোর জন্যে ডালাখোলা খাঁচা, কলোনি-বাসিন্দাদের দায়িত্বের ওপর পুরোপুরি ন্যস্ত যাবতীয় জিনিসপত্র ও তা দিয়ে ঠাসা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের থাকার ঘরগুলো, খড়ের ওপর রাত্রিযাপন, 'নীলমাছি' নাটকের অভিনয়, নেস্তেরেঙ্কোর নীচ মন, পোঁটলাপুঁটলি, কাঠের বাক্স, ঘোড়ার গাড়ি, ভেল্‌ভেটের নতুন আঁটো টুপি আর সুকুমার প্রেমের নবোদ্ভিন্ন অঙ্কুর দীর্ঘদিন ধরে মনের মাটিতে জীইয়ে রাখার অলঙ্ঘ্য পরোয়ানাপ্রাপ্ত গন্‌চারোভ্‌কার যতসব মারুসিয়া, নাতাল্‌কা আর তাতিয়ানাদের সকরুণ মুখচ্ছবি। আমাদের যৌথ সমাজের ওপরের স্তরগুলো বহুবিচিত্র ধরনে আন্দোলিত হচ্ছিল মজার-মজার গালগপ্পে আর হাসিতামাশায়, দমফাটা হাসির কলরবে আর নির্দোষ ব্যঙ্গের চাপল্যে। ছেলেদের মধ্যেকার এই উদ্বেল আলোড়ন ছিল অনেকটা পাকা গমের খেতে ঢেউয়ের মাতনের মতো। আর তাই দূর থেকে দেখলে মনে হতে পারত যে সেই খেতটা বুঝি নিশ্চিন্ত, দুর্ভাবনাহীন আর হালকা খেলায় মত্ত। অথচ বাস্তবে ওই খেতের ফসলের প্রতিটি শিষে ঘুমিয়ে ছিল সংহত শক্তি আর নরম হাওয়ায় দোদুল দোলা তার একেকটি শিষ একটিও দানার বৃথা অপচয় ঘটাচ্ছিল না কিংবা দুর্ভাবনায়

ভুগছিল না এক মুহূর্তের জন্যেও। আর গমের শিষ যেমন তার আসন্ন মাড়াই নিয়ে মাথা ঘামায় না, তেমনই কলোনি-বাসিন্দাদেরও কুরিয়াজ নিয়ে দুশ্চিন্তিত হবার দরকার পড়ছিল না। সময় উপস্থিত হলেই যেমন ফসল মাড়াই করতে হয়, তেমনই ছেলেরা জানত যে যথাসময়ে কুরিয়াজে গিয়ে উপস্থিত হলেই তাদের কাজে মেতে যেতে হবে।

ওই সব দিনে কলোনি-বাসিন্দাদের জুতোছাড়া খালি পাগুলো তপ্ত মাটির পায়ে-চলা পথ বেয়ে বিলম্বিত তালে-লয়ে শোভন গতিচ্ছন্দে চলাফেরা করত, চলাফেরার সময় বেল্ট-বাঁধা দেহগুলো তাদের অল্পস্বল্প হেলত দুলত। আমাকে দেখে তাদের চোখগুলো যেন হেসে উঠত প্রীতিভরে আর বন্ধুর হার্দ্য সম্ভাষণে ঠোঁটগুলো নড়ত প্রায়-অলক্ষিতে। ত্রেপ্‌কে-তালুকের মাঠেঘাটে, বাগানে, বিচ্ছেদবিধুর অযত্নরক্ষিত বেঞ্চিগুলোয়, ঘাসের ওপর, নদীর ধারে, সর্বত্রই ছোট-ছোট এককেটা দলকে জটলা করতে দেখা যাচ্ছিল তখন। সেই সব জটলায় অপেক্ষাকৃত বয়স্ক অভিজ্ঞ ছেলেরা অন্যদের কাছে গল্প বলত তাদের অতীত জীবনের — তাদের মা-মাসিদের গল্প, মেশিনগানের গল্প, স্তেপ অঞ্চল আর জঙ্গলে আশ্রয়-নেয়া যতসব বাহিনীর কাহিনী। আর তাদের মাথার ওপর ঝুঁকে থাকত গাছের নিশ্চল ছত্রাকার মাথা আর ভেসে বেড়াত ঝাঁকবাঁধা মৌমাছি, 'তুষার-রানী' আর শাদা অ্যাকেশিয়া ফুলের সৌগন্ধ্য।

হঠাৎ আমার মনে হল, আরে, এ যে দেখছি এক মূর্তিমান রাখালিয়া গীতি-কবিতার বিষয়! আর কথাটা মনে হতে নিজের কাছে নিজেই কিছুটা লজ্জিত হয়ে পড়লুম যেন। ব্যাপারটা অসম্ভব ঠেকলেও আমার মনে অনবরত হানা দিতে থাকল রাখাল, বাতাসের অধিদেবতা আর প্রণয়োপাখ্যানের যতসব কল্পিত কাব্যিক প্রতিমূর্তি। কিন্তু স্থূল জীবনও কখনও-কখনও আমাদের সঙ্গে রসিকতা করে আর তার রসিকতা সময়-সময় প্রায় বেপরোয়া ধরনের হয়ে থাকে! লাইলাক ঝোপের নিচে বসে ছিল 'খাঁদা নাকী' বলে পরিচিত বোঁচা-নাক, হাড়-জিরজিরে একটি পুঁচকে ছেলে, আর মুখখানাকে যথাসম্ভব কুঁচকে গেঁয়ো একটা পুঁচকে বাঁশিতে ফুঁ দিচ্ছিল সে। কিন্তু আমার কেন যেন মনে হল, ও যেটা বাজাচ্ছে সে-বস্তুটা মোটেই গেঁয়ো একটা একসুরের বাঁশি নয়! বস্তুটা নিশ্চয়ই একটা রাখালিয়া বাঁশি, এমন কি বনদেবতা প্যান-এর বাঁশি হলেও হতে পারে তা, তা না হলে 'খাঁদা নাকী'র মুখখানা রোমান রাখাল-দেবতা 'ফ্যন'-এর মতো অমন দুষ্টু-দুষ্টু কেন। মাঠে বসে মেয়ের দল মালা

গাঁথছিল। আর সেখানে নীল ঝুমকোফুলের মালা-গলায় নাতাশা পেত্রিয়েঙ্কোর স্বর্গীয় সৌন্দর্য দেখে চোখে জল এসে গেল আমার। এমন সময় একেবারে আচমকা একটা এল্‌ডার-ঝোপের জালিকাজ-করা দেয়ালের আড়াল থেকে স্বয়ং বনদেবতা 'প্যান' বেরিয়ে এসে আবির্ভূত হল পায়ে-চলা পথটার ওপর। আর পাকা গোঁফজোড়া হাসিতে কাঁপিয়ে হাল্‌কা নীল চোখদুটো সরু-সরু করে আমার দিকে তাকাল। বলল:

'সম্বত্তর তোমারে ঢুঁইড়্যা বেড়াইতাছি! অরা বলতেছিল তুমি নাকি শহরে গেছ। তারপর, অপদাথ্থগুলারে বাগে আনবার পারছ তো? বাচ্চাগুলার এখন ওখেনে যাওয়া উচিত, অথচ অরা — ইডিয়েটগুলা — আমাগো দেরি করাইয়া দিতেছে!..'

বললুম, 'কালিনা ইভানভিচ, আমি বলি কি, ছেলেরা এখানে থাকতে-থাকতেই তুমি বরং একবার শহরে তোমার ছেলের কাছ থেকে ঘুরে এস। আমরা চলে গেলে তোমার পক্ষে যাওয়া আরও শক্ত হবে।'

তামাকের পাইপটার খোঁজে ওয়েস্টকোটের গভীর খোঁদলওয়ালা পকেটগুলো হাতড়াতে লাগল কালিনা ইভানভিচ। অবশেষে বলল:

'সব থেইক্যা পেরথমে আসছি, সবার শেষে এ-জায়গা ছাড়ুম আমি। মুজিকগুলা আমারে এখেনে আনছে, অখন অরাই — অপদাথ্থগুলা — আমারে ঠাঁইনাড়া করুক-আনে! ওই মুসি-বেটার সাথে সকল বন্দোবস্ত কইর‍্যা ফেলছি আমি। আমারে ঠাঁইনাড়া কইরতে মোট্টেও বেগ পাইতে হইব না। দুনিয়াটা যে কতদিন ধইর‍্যা টিইক্যা আছে বইতে নিশ্চয় তুমি তা পড়ছ। আর সেই আদিকাল হইতে আমার মতন কত-যে বুড়া-হাবড়ারে ঠাঁইনাড়া করা হইছে, অথচ এয়ার জন্যি একজনাও অক্কা পায় নাই! ভাব কী, আমারেও অরা ঠাঁইনাড়া করব, হি-হি-হি!..'

কালিনা ইভানভিচ আর আমি বাগানের পথে পায়চারি শুরু করলুম। পাইপ টানতে-টানতে ও খুঁটিয়ে দেখতে লাগল ঝোপঝাড়ের মাথাগুলো, বাঁধ-দিয়ে-আটকানো কলমাকের ঝলমলে স্থির জল, গলায় মালা-দোলানো মেয়ের দঙ্গল আর বাঁশি-হাতে 'খাঁদা নাকী'কে। হঠাৎ একসময় বলল:

'কিছু-কিছু অপদাথ্থ যেমন পারে আমিও যদি অমনে মিথ্যা কথা কইবার পারতাম তাইলে বলতাম, যে-কোনো একদিন তোমাগো সাথে কুরিয়াজে আমি দেখা করতে যামু। কিন্তু এই আমি সাফ বইল্যা দিতেছি — কোনোদিনও

যামু না আমি। মানুষ বড়ই দুব্বল প্রাণী, বোঝলা, বয়সকালে কোনোদিন কাজকাম করুক-বা না-করুক একবারে পলকা চারাগাছের মতন সে, একটা উপদ্রবের সামিল — তত্ত্বকথা আওড়াইলে বলতে হয় সে মানুষ বটে, কিন্তু আসলে সে অপদাথ। কেবল গ'দের আঠা তৈয়ের হওয়ার যোগ্য সে। লোকে যখন আরও বুদ্ধিমান হইয়া ওঠব তখন তারা বুড়া মানষিগো গালাইয়া আঠা বানাইব-আনে। অগো গালাইলে চমৎকার আঠা তৈয়ের হইব-আনে...'

তার আগে বেশ কয়েক রাত্তির না-ঘুমিয়ে আর শহরে অনবরত দৌড়োদৌড়ি করে আমার অবস্থাটা তখন কেমন যেন একধরনের ভঙ্গুর হয়ে উঠেছিল। বিশ্বজগৎ আমার কানে যেন ঝিঁঝির ডাক শোনাচ্ছিল আর আমার চোখে ঝলমলে প্যাঁচালো একটা বস্তুর মতো অনবরত ঘুরছিল। অতীত দিনের নানা ঘটনা, নানা কথা নিয়ে আলোচনা করছিল কালিনা ইভানভিচ, কিন্তু আমি কেবল তার ওই সময়ের বুড়ো বয়সটার কথাই ভাবতে পারছিলুম আর সখেদে ভাবছিলুম বড্ড বেশি বুড়ো হয়ে পড়েছে সে।

'তোমার জীবনটা কিন্তু তেমন মন্দ কাটে নি, কালিনা ইভানভিচ!..'

পাইপ থেকে পোড়া তামাক ঝেড়ে ফেলার জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে কালিনা ইভানভিচ বলল, 'তাইলে বলি শোন, আমি কারো তাঁবেদার ভাঁড় না। কত ধানে কত চাল হেয়া আমার জানা। আসলে ভাইব্যা দেখলে বলতে হয় জীবনটা একটা গোলমাল্যা ব্যাপার! এই তুমি খাইতাছ, এই খাবার হজম করতাছ, এই ঘুমাইতাছ, তারপর ফের আবার খাইতাছ — তা সে রুটি কিংবা মাংসও হইতে বাধা নাই...'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও! আর কাজকর্ম? সে-ব্যাপারটা কী?'

'তোমার ওই কাজকাম কে করবার চায় শুনি? এ-দুনিয়ায় কাজকামের বন্দোবস্তটা কেমনধারা জান-নি — তোমার কাজকামে যাগো প্রেয়োজন আছে তারা, রক্তশোষাগুলা, নিজেরা কাম করে না, আর যাগো নিজিগো কামের কোনো প্রেয়োজন নাই তাগো কাম করন লাগে বলদের মতন।'

হঠাৎ কেমন চুপ মেরে গেলুম আমরা।

একটু পরে কালিনা ইভানভিচ ফের শুরু করল, 'বলশেভিকগো অধীনে আমি-যে বড়ই কম সময় বাঁচলাম হেয়াই আমার দুঃখ। শয়তানগুলা সকলকিছু নিজিগো মনের মতন কইর‍্যা করতাছে। লোকগুলা ষণ্ড গুণ্ডা, আমি আবার

ষণ্ডামি মোটেই পছন্দ করি না। তবু অগো অধীনে জীবনটা কেমন যেন অন্যরকম হইয়া গেছে গিয়া। অগো একমাত্তর মাথাব্যথা তুমি তোমার নিজের কাজকাম ঠিকমতন করতাছ কিনা — তা বাদে অন্য কিছুতে অগো উৎসাহ নাই। এমন কথা এয়ার আগে আর কোনোদিন শোনছ-নি তুমি? এখন সক্কলে তোমার কাছে কাম চায়। তয় আমাগো মতন কিছু মোটাবুদ্ধি লোক আছে যাগো কোনো ব্যাপারে হুস্বিদীর্ঘি জ্ঞান নাই, তারা খালি কামই করবার পারে আর ইস্তিরিরা আইস্যা তাগাদা না-দিলে খাইতে পের্যন্ত বিস্মরণ হয়। মনে আছে তোমার একবার আমি আইস্যা তোমারে শুধাইলাম, 'দুপারের খাওয়া হইছে-নি তোমার?' তখন পেরায় সন্ধ্যা হইয়া আসছে। আর আমার কথা শুইন্যা তুমি কী করলা? হি-হি! তুমি মাথামুড় খুঁইড়্যা মনে আনবার চেষ্টা করতে লাগলা দুপারের খানা খাইছ কিনা। বললা, 'মনে তো হয় খেয়েছি, কিংবা কে জানে হয়তো গতকালের পর আর খাওয়াই হয় নি!' বোঝ কাণ্ড, বিলকুল ভুইল্যা বইস্যা ছিলে তুমি! হি-হি!.. এমনধারা কাণ্ডমাণ্ডর কথা শোনছ-নি জেবনে?'

অন্ধকার ঘনিয়ে আসা পর্যন্ত কালিনা ইভানভিচ আর আমি সেদিন তালুকের মাঠেঘাটে পায়চারি করে কাটালুম। আর আকাশের প্রকাণ্ড দীপাধারে দিনের আলো নিভে গেল যখন, তখন দেখি গাছের একটা ভাঙা ডাল দিয়ে পায়ে বাড়ি মেরে মশা তাড়াতে-তাড়াতে ছুটে আসছে কোস্তিয়া শারোভ্স্কি। সে এসে অত্যন্ত চটেমটে আমাদের বললে:

'ওরা এরিমধ্যে মেক-আপ শুরু করি দেছে আর আপনেরা দু-জন কিনা পায়চারি করতেছেন তো করতেছেনই! খালি-খালি একবার এধার একবার ওধার করতেছেন! উদিকে ছোঁড়ারা বলতিছে আপনেদেরে আসা লাগবে। ওঃ, জাররে-যে কী মজাদার দেখতি হয়েছে-না, একবার দ্যাখেন আসি! লাপত নিজি জার সাজিছে — আর যা-একখান ইয়া লম্বা নাক লাগায়েছে-না, কী বলি!.'

গাঁ থেকে আর খামারখোলাগুলো থেকে আমাদের সকল বন্ধু এসে ইতিমধ্যে ভিড় জমিয়েছিল থিয়েটর-হলে। লুনাচার্স্কি কমিউনের লোকজন তো সদলবলেই এসে হাজির হয়েছিল। যবনিকা ওঠার তখনও সময় হয় নি, তাই পর্দার আড়ালে সিংহাসনখানায় চেপে বসে নেস্তেরেঙ্কো ছেলেদের আক্রমণ ঠেকানোর চেষ্টা করছিল আর ছেলেরা ওর নীচতা. অকৃতজ্ঞতা আর কঠিন হৃদয় নিয়ে নানা অভিযোগ আনছিল। ওদিকে জারের মেয়ের ভূমিকায়

অভিনয় করবে বলে ওলিয়া ভোরনভা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তখন নিজের মেক-আপ ঠিক করছিল। ছেলেদের রকমসকম দেখে সে তো দুশ্চিন্তিত হয়ে পড়ল। বলল:

'খুনসুটি করে ওরা দেখি আমার নেস্তেরেঙ্কোর জানটাই বার করি দিবে!..'

'নীলমাছি' নাটকের অভিনয় ওইবারই-যে প্রথম কলোনিতে হচ্ছিল তা নয়, তবে এবার অভিনয়ের ব্যবস্থা করা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই কারণে যে প্রধানত যে-দু'জন লোক আমাদের থিয়েটরে মেক-আপ ম্যানের কাজ করতেন সেই বুত্সাই আর গরোভিচ তখন কুরিয়াজ চলে গিয়েছিলেন। ফলে সকলেরই মেক-আপ একটু বেশিমাত্রায় ক্যাট্কেটে হয়ে উঠেছিল। তবে এ-নিয়ে কারো তেমন মাথাব্যথা ছিল না, কেননা এই নাটকের অভিনয়টা নিছকই আমাদের বিদায় উপলক্ষে সম্মিলনের অজুহাতমাত্র ছিল। অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় গ্রহণের প্রয়োজন ছিল যৎসামান্যই। পিরগোভ্কা আর গন্চারোভ্কা গাঁয়ের মেয়েদের তো যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফের ঠেলে ফেলে দেয়া হল, কারণ তাদের মনোজগতে ইতিহাসের প্রথম সূচনাই ঘটেছিল কলমাকের তীরে অপ্রতিরোধ্য গোর্কিপন্থীদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। ময়দা-কলের প্রকাণ্ড আটচালাটার কোণে-কোণে, তার আগের মার্চ মাস থেকে আগুনের ছোঁয়াচ লাগে নি যে-চুল্লীগুলোয় তাদের ধারেকাছে, স্টেজের পেছন দিককার অন্ধকার চলার পথগুলোয়, হাতের কাছে বসার মতো যে-বেঞ্চি পাওয়া গিয়েছিল তাতে, গাছের হেলানো গুঁড়িতে, থিয়েটরের যত রকমের 'সম্পত্তি' ছিল তাদের ওপর — সর্বত্রই বসে ছিল সেই মেয়েরা আর তাদের ফুলতোলা মাথার রুমালগুলো কাঁধের ওপর খসে পড়ে বিচ্ছেদবেদনায় আনত সোনালি-কটা চুলে-ভরা তাদের মাথাগুলিকে প্রকট করে তুলেছিল। কোনো সান্ত্বনা-বাক্য, স্বর্গীয় সুরলহরী কিংবা দীর্ঘশ্বাস ওই সব বিধুর কুমারী-হৃদয়কে আনন্দে ভরে তুলতে সমর্থ ছিল না। কোমল, করুণ ওদের আঙুলগুলো হাঁটুর ওপর ছড়ানো শালের প্রান্তগুলো নিয়ে খেলা করছিল। আর এই ব্যাপারটাও ছিল ওদের শোভন সুষ্ঠু আচরণের অতিরিক্ত ও বিলম্বিত লয়ের একটা নমুনা। কলোনি-বাসিন্দারা মেয়েদের পাশে-পাশে দাঁড়িয়ে এমন ভাব দেখানোর চেষ্টা করছিল যেন দুঃখে তাদেরও হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। আর থেকে-থেকে অভিনেতাদের ড্রেসিং-রুম থেকে

উ'কি দিয়ে এই দৃশ্যটা দেখছিল লাপত। বিরহ-বেদনার প্রতি ঠাট্টাচ্ছলে সহানুভূতি জানানোর ভঙ্গিতে নাকটা কুঁচকে করুণ, কান্না-কান্না গলায় একবার সে হে'কে বললে:

'পেতিয়া, দোস্ত্! মারুসিয়া ওখেনে একটুক্ষণ বসে থাকুক, তুই না-থাকলি ও কথাটি বলবে না — তুই বরং গিয়ি সাজটা পরে নে এবার! তুই কি ভুলে গেলি যে তোরে ঘোড়া সাজতি লাগবে?'

পেতিয়া সুকৌশলে তার হাঁফ-ছেড়ে-বাঁচার বেহায়া নিশ্বাসকে বিদায়গ্রহণের করুণ দীর্ঘনিশ্বাসে পরিণত করে মারুসিয়াকে একা ফেলে রেখে সরে পড়ল। মারুসিয়াদের পক্ষে এটা সৌভাগ্যই বলতে হবে যে তাদের হৃদয়গুলো অসংবদ্ধ কয়েকটা পৃথক অংশ দিয়ে তৈরি। আমি বেশ বুঝতে পারছিলুম যে ওই সময় থেকে মাস দুয়েকের মধ্যে মারুসিয়া তার হৃদয় থেকে পেতিয়ার মরচে-ধরা ছবিখানা স্ক্রু খুলে আলাদা করে ফেলবে আর তারপর নতুন আশার স্পিরিট দিয়ে ঘষে হৃদয়টাকে ঝকঝকে করে তুলে আগের ছবিখানার খালি জায়গাটাতে নতুন একটা অংশ জুড়ে নেবে আর সেই অংশটা হয়তো হবে স্তরজেভোয়ে গাঁয়ের পানাস-এর প্রতিমূর্তি। আর কে বলতে পারে, ওই সন্ধেয় যে-পানাস একদল কলোনি-বাসিন্দার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গোর্কিপন্থীদের সকরুণ বিদায় জানাচ্ছিল সে হয়তো মারুসিয়ার হৃদয়ের খালি আসনখানায় তার দখল ওই মুহূর্তেই গোপনে-গোপনে পাকা করে তুলছিল। যাই হোক, মোটের ওপর দুনিয়ায় সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিল বা চলেছে, আর পেতিয়াও সেদিনকার নাটকে আতামান প্লাতভের ত্রয়কার ঘোড়ার পার্টে অভিনয় করতে পেয়ে খুব খুশি হয়েছিল।

অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে ভাবগম্ভীর বিদায়গ্রহণ পর্ব শুরু হল। হৃদয়তাপে-ভরা ভালো-ভালো কথা, সনির্বন্ধ অনুরোধ, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, কর্মযজ্ঞের মধ্যে দিয়ে পারস্পরিক সংহতিসাধন, ইত্যাকার কথাবার্তা সাঙ্গ হলে পর অবশেষে নাটকের যবনিকা উঠল। আর মঞ্চের ওপর দেখা গেল একটা বোকা তুচ্ছাতিতুচ্ছ মানুষকে — অর্থাৎ জারকে, আর তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে-থাকা, অনবরত কাঠের গুঁড়োঝরা তার যতসব অথর্ব সেনাপতিদের। আর দেখা গেল একজন পরিচারক শামুকের মতো গুটিগুটি পায়ে অনবরত সেই কাঠের গুঁড়ো ঝাঁটিয়ে সাফ করে চলেছে। এমন সময় কারখানার আটচালার খিড়কি-দরজা দিয়ে বেরিয়ে সবেগে স্টেজের ওপর দৌড়ে এল গাড়িতে-জোতা

তিনটে মন্দা ঘোড়া — গালাতেঙ্কো, করিতো আর ফেদরেঙ্কো। লাগামের কড়িয়ালি কামড়াতে-কামড়াতে, অবিকল ঘোড়ার মতোই ভারি মাথাগুলো ঝাঁকিয়ে থিয়েটরের 'সম্পত্তি' বা আসবাবপত্র ভেঙেচুরে তছনছ করে আর ওদের গাড়ির কোচোয়ান তারানেত্‌সের হাতের লাগামগাছে টান লাগিয়ে প্রায় ছিঁড়ে ফেলার যোগাড় করে খটাখট আওয়াজ তুলে স্টেজে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছেলে তিনটে। ওদের পায়ের দাপে স্টেজের পুরনো কাঠের তক্তাগুলো উঠল মড়মড় করে। দেখা গেল তারানেত্‌সের কোমরের বেল্‌ট ধরে পেছনদিকে ঝুলে আছে আড়ষ্ট একটা মূর্তি। এটা ছিল কসাক-সর্দার প্লাতভ, আমাদের একজন উঠতি মঞ্চ-তারকা অলেগ ওগ্নিয়েভ এই ভূমিকায় অভিনয় করছিল। আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনার শেষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গটুকু নির্মমভাবে নিবিয়ে দিয়ে থিয়েটর-দর্শকরা ঝাঁপ দিল নাট্যাভিনয়ের কল্পনা আর সৌন্দর্যের জলাশয়ে। কালিনা ইভানভিচ সেদিন বসে ছিল একেবারে সামনের সারিতে আর মজাদার অভিনয়ের গুণে সবকিছু ভুলে হাসির দমকে চোখ-থেকে-বেরুনো জল চোপসানো হলদে আঙুল দিয়ে মুছছিল।

আর হঠাৎ, একেবারে আচমকাই এই সময়ে কুরিয়াজের ছবি আমার মনের চোখে ভেসে উঠল।

আহ্‌! না-না, লোকে এখন আর কৃপাভিক্ষা করে প্রার্থনা জানায় না, আমার ঠোঁটের কাছ থেকে এই বিষের পাত্র সরিয়ে নেবার কেউ নেই এখন! হঠাৎ টের পেলুম আমি বড় ক্লান্ত, বড়ই অবসন্ন আমি।

অভিনেতাদের সাজঘরটা উজ্জ্বল আলোকিত ও আরামদায়ক হয়ে ছিল। রাজার পোশাক পরে মুকুটটা মাথার পেছনদিকে ঠেলে দিয়ে লাপত সেখানে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌নার নিচু আর্মচেয়ারখানায় বসে গালাতেঙ্কোকে এই বলে আশ্বস্ত করছিল যে ঘোড়ার ভূমিকায় তার অভিনয় নাকি অপূর্ব হয়েছে।

'থিয়েটারে তো দূরের কথা, আমার জীবনে আমি এমন একখান তেজিয়ান ঘোড়া দেখি নাই!'

আমাকে দেখে ওলিয়া ভোরনভা লাপতকে বললে, 'এই, ওঠ্‌, ওঠ্‌! আন্তন সেমিওনভিচরে বসতি দে দেখি।'

আর সেই আরামদায়ক আর্মচেয়ারটিতে বসতে পেয়ে নাট্যাভিনয় শেষ হওয়ার জন্যে অপেক্ষা না-করেই ঘুমে ঢুলে পড়লুম। ঘুমের মধ্যেই একবার

শুনতে পেলুম একাদশ বাহিনীর ছেলেরা গলা সপ্তমে তুলে নিজেদের মধ্যে তর্ক জুড়ে দিয়েছে:

'ওনারে চেয়ারসুদ্ধ বাইরি নিয়ি যাই চল্!'

কিন্তু সিলান্তি ওদের নিরস্ত করবার প্রয়াস পেল। ফিস্ফিস করে বলল:

'অত চিচ্কার দিও না তো! মান্ষিরে সোয়াস্তিতে ঘুমাত্যে দ্যাও দিকি! এই হল্য গে ব্যাপার, বোঝলে!'

৬

পাঁচটা দিন

পরদিন কালিনা ইভানভিচ, ওলিয়া আর নেস্তেরেঙ্কোর কাছ থেকে সকরুণ বিদায় নিয়ে ত্রেপ্কে তালুক ছাড়লুম আমি। আর আমাদের যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি মালগাড়িজাত করার পরিকল্পনাটি কাঁটায়-কাঁটায় পূরণ করার এবং গোটা কলোনিকে নিয়ে পাঁচ দিনের মধ্যে খার্কভ রওনা হওয়ার উদ্দেশ্যে কভাল রয়ে গেল পেছনে।

অজানা কোন এক ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনায় আমি মনে-মনে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলুম। মনের স্বাভাবিক ভারসাম্য আমার সাময়িকভাবে বিচলিত হয়ে পড়েছিল, অমঙ্গলের আশঙ্কায় পূর্ণ হয়ে ছিল মন। আর বাস্তবিকই কুরিয়াজ মঠের সিংদরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকামাত্র ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লুম। রিজোভ স্টেশনে নেমে মঠে পৌছতে দুপুর প্রায় একটা বেজে গিয়েছিল।

দেখলুম সেখানে রীতিমতো একটা তদন্তকারী দল এসে উপস্থিত হয়েছে। দলে আছেন ব্রেগেল, খ্লিয়ামের, ইউরিয়েভ আর একজন পাবলিক প্রসিকিউটর। আমি যখন গিয়ে হাজির হলুম তখন দলটি একটি অধিবেশন বসিয়েছিল —আর ঠিক কী কাবণে জানি না কুরিয়াজের প্রাক্তন ডিরেক্টর-সায়েব দলটির আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিলেন। আমাকে দেখেই ব্রেগেল কড়াসুরে বললেন:

'ছেলেরা ইতিমধ্যেই নিজেদের মধ্যে মারপিট শুরু করেছে।'

'তাই নাকি? কে কাকে মারল আবার?'

'দুঃখের বিষয় আমরা এখনও জানতে পারি নি এটা কার কাজ... আর এ-সবের পেছনেই বা কারা আছে...'

চশমা-চোখে মোটাসোটা পাবলিক প্রসিকিউটর ভদ্রলোক ব্রেগেলের দিকে চোরাচোখে একবার তাকিয়ে গলা নামিয়ে বললেন:

'আমার তো মনে হয় মামলাটা... পরিষ্কার... এতে উস্কানির ব্যাপার না-ও থাকতে পারে। হয়তো কোনো পুরনো আক্রোশ বা ওই ধরনের কিছু ছিল, বুঝলেন... বাস্তবিকপক্ষে এটা তেমন কোনো গুরুতর মারামারির ব্যাপারই না। তবু কে বা কারা মেরেছে এটা জানতে পারলে ভালো হোত। যাই হোক, স্বয়ং ডিরেক্টর এখন এসে গেছেন... হয়তো উনিই ব্যাপারটা সম্পর্কে আরও বেশি খোঁজখবর যোগাড় করতে আর আমাদের জানাতে পারবেন।'

ব্রেগেল স্পষ্টতই পাবলিক প্রসিকিউটরের আচরণে খুশি হতে পারেন নি। আমার সঙ্গে আর একটিও বাক্য-বিনিময় না-করে তিনি সোজা গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন। অপ্রতিভভাবে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন ইউরিয়েভ। এইভাবে কমিশন বিদায় নিল সেদিন।

ব্যাপারটা ঘটেছিল এই: এজমালি শোবার ঘরগুলো থেকে মোটামুটি নতুন আধ-ডজন বুটজুতোর জোড়া হাতিয়ে নিয়ে কলোনি-বাসিন্দা দরোশ্‌কো যখন মঠের সিংদরজা দিয়ে বাইরে যাচ্ছিল তখন মঠের উঠোনেই কে বা কারা তাকে ধরে মারে। রাত্তিরবেলার এই ঘটনার পারিপার্শ্বিক লক্ষণ-প্রমাণ থেকে বোঝা গেল যে মারধরের ব্যাপারটা বেশ সুসংগঠিত ছিল এবং দরোশ্‌কো যখন বুটজোড়াগুলো চুরি করছিল তখন তার ওপর নজর রাখা হয়েছিল। ও যখন সিংদরজার ঘণ্টাঘরের কাছাকাছি পৌঁছেছিল তখন আশপাশের কোনো বার-বাড়ির পাশের অ্যাকেশিয়া-ঝোপের পেছন থেকে কেউ একজন এসে ওকে একটা কম্বল চাপা দিয়ে মাটিতে পেড়ে ফেলে, তারপর আচ্ছা করে মার লাগায়। আমাদের গোর্‌কভ্‌স্কি ঠিক সেই সময়টায় আস্তাবল থেকে বেরিয়ে আসছিল। অন্ধকারের মধ্যে সে দেখতে পায় কয়েকটা বাচ্চা-বাচ্চা মূর্তি চারিদিকে ছুটে পালাচ্ছে; দরোশ্‌কো যেখানে মাটিতে পড়ে ছিল তাকে সেখানেই ফেলে তবে কম্বলখানা নিজেদের সঙ্গে নিয়ে পালাচ্ছিল তারা। দোষীদের ধরার জন্যে এজমালি শোবার ঘরগুলোয় সঙ্গে সঙ্গে তল্লাসি চালিয়েও কিন্তু কোনো ফল হয় নি — দেখা যায় ঘরগুলোয় সবাই অকাতরে

ঘুমোচ্ছে। দরোশ্‌কোর গোটা দেহ থে'তলে গিয়েছিল আর কালশিরায় ভরে ছিল। তাকে কলোনির হাসপাতালে ভর্‌তি করা হয়। যে-ডাক্তারটিকে ডাকা হয় তিনি পরীক্ষা করে বলেন দেহে গুরুতর কোনো জখম হয় নি। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও গরোভিচ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটার কথা ইউরিয়েভকে জানান।

অতঃপর ব্রেগেলের নেতৃত্বে তদন্ত-কমিশন উৎসাহভরে কাজ শুরু করে দেয়। মাঠ থেকে আমাদের অগ্রবর্তী মিশ্র বাহিনীকে ডেকে পাঠানো হয় আর বাহিনীর সদস্যদের প্রত্যেককে আলাদা-আলাদা ভাবে জেরা করা হয়। আমাদের গোর্কিপন্থীরাই যে এই মারধরের জন্যে দায়ী এটা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে বিশেষ করে খ্‌লিয়ামের খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। একজনও শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে জেরা করা হল না, বস্তুত তাঁদের সঙ্গে সকল সংযোগ এড়িয়েই চলা হয়েছিল। কমিশন কেবল তাঁদের মধ্যে এ'কে-ওঁকে ব্যক্তিগতভাবে ডেকে পাঠিয়েই সন্তুষ্ট থাকছিল। আর কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের মধ্যে ডাকা হয়েছিল একমাত্র পিয়েরেত্‌স আর খোভ্‌রাখকেই আর তাদের জেরা করা হয়েছিল আলাদা একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে। তবে এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে এটা করা হয়েছিল তারা জানলার ওধার থেকে চ্যাঁচামেচি করে নিচের এই কথাগুলো বলেছিল বলে। তারা বলেছিল:

'আমাদেরে শুধান-না ক্যানে! ওয়াদেরে জিজ্ঞেসা কর‍্যে লাভ কী? ওয়ারা বুঝি আমাদেরে কোঁতকানি দিবে আর আমরা কাউর কাছে নালিশ-ফৈরেদ করতি পারব্য না?'

ষোল বছরের ক্ষয়া চেহারার ছেলে দরোশ্‌কো ছোট্ট হাসপাতালটায় শয্যাশায়ী হয়ে ছিল। আমি যেতেই আমার দিকে স্থির, শুকনো চোখে তাকিয়ে ফিস্‌ফিস করে বলতে লাগল:

'আমি কতদিন ধর‍্যে যে কথাডা আপনেরে বলব্য-বলব্য করত্যেছি...'

'তোমাকে মেরেছে কে?'

'ওয়ারা এয়ার মধ্যি নাক গলাতি এয়্যেল ক্যানে?.. কে আমারে মার‍্যেছে না-মার‍্যেছে তাতে কী আস্যে-যায়? আমি আপনেরে বলত্যেছি আমারে আপনের ছোঁড়ারা মারে নাই, অথচ ওয়ারা এয়াই প্রেমাণ করতি চায় যে তারাই আমারে মার‍্যেছে। আপনের ছোঁড়ারা না-থাকলি অরা আমারে মার‍্যেই ফেলত। আপনের ওই দলপতি ছোঁড়া... ভাগ্যে বাইরিয়্যে এয়্যেল তাই তো ছোঁড়ারা সক্কলে পলায়্যে গেল...'

'তা, ছোঁড়ারা কারা?'

'আমি আপনেরে তা বলত্যেছি না... নিজির জন্যি আমি চুরি করি নাই। ও .. সকালে আমারে কয়েল...'

'কে বলেছিল? খোভ্রাখ?'

চুপ।

'বল-না? খোভ্রাখ বলেছিল?'

মুখটা বালিশে গুঁজে কাঁদতে লাগল দরোশ্কো। ওর ফোঁপানির ঠেলায় কথাগুলো ভালো করে আমি ধরতেই পারছিলুম না। শুনলুম ও বলছে:

'ও জানতি পারব্যে .. আমি ভাবলাম... এই তো শেষবারের মতন... আমি ভাবলাম...'

ও শান্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলুম। তারপর ফের শুধোলুম:

'তাহলে, কে বা কারা তোমায় মেরেছে তা তুমি জানো না?'

হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে দু'হাতে নিজের মাথাটা চেপে ধরে তীব্র দুঃখের দমকে ডাইনে-বাঁয়ে দুলতে লাগল ও। তারপর মুখ টিপে হাসল — তখনও ওর মাথাটা দু'হাতে ধরা, চোখদুটো তখনও জলে ভর্তি। বলল:

'না-না, সত্যাই জানি না! তয় এয়া গোর্কিওলাদের কাজ না। গোর্কিওলারা ওইভাবে আমারে মারত্য না...'

'তারা হলে কীভাবে মারত?'

'কীভাবে তা আমি জানি নে, তয় এয়া ঠিক যে ওয়ারা কম্বল ব্যাভাব করত্য না... কখ্খনো যে ওয়ারা কম্বল ব্যাভার করত্য না এয়াতে কোনো ভুল নাই...'

'কিন্তু তুমি কাঁদছ কেন? যন্ত্রণা হচ্ছে কি?'

'না, যন্তন্না হতিছে না, এয়া হল্য গে... আমি ভাব্যেলাম শেষবারের মতন কামড়া সার্যো নিই... আর আপনে কিছুই জানতি পারব্যেন না...'

বললুম, 'ঠিক আছে। আগে ভালো হয়ে ওঠ তো, তারপর দ্যাখো-না — এ-সবকিছু আমরা ভুলে যাব...'

'আন্তন সেমিওনভিচ, দয়া কর্যো সবকিছু ভুল্যে যান...'

এতক্ষণে অবশেষে ও শান্ত হল।

অতঃপর নিজে থেকেই আমি এ-ব্যাপারের তদন্ত শুরু করলুম। গরোভিচ আর কির্গিজভের কাছে খোঁজখবর করতেই তারা পাগলের মতো হাত-পা

ছ্বড়তে লাগল আর তেলে-বেগ্বনে জ্বলে উঠল। এমন কি ইভান দেনিসভিচও ভুর্ কুঁচকে ম্বখ গোমড়া করে থাকার প্রয়াস পেলেন। তবে দীর্ঘকাল ধরে তাঁর ম্বখের ওপর প্রশান্ত ভাবের এমন একটা বর্মসদৃশ আস্তরণ পড়েছিল যে তাঁর এই ম্বখবিকার আমার হাসিরই উদ্রেক করল। বললুম:

'ইভান দেনিসভিচ, আপনি কী নিয়ে এত মেজাজ খারাপ করে আছেন?'

'আমি? কই, না তো! ওরা একে অপরকে খ্বন করতে চায় কেন তা আমি কী করে জানব? কে জানে, হয়তো-বা প্বরনো আক্রোশ মেটানোর জন্যেই...'

'আক্রোশটা খ্বব বেশি প্বরনো কিনা আমার সন্দেহ আছে!'

'কেন? প্বরনো হবে না-ই বা কেন?'

'আমার মনে হয়, এ-সব একেবারেই নতুন রাগের ব্যাপার। ওঃ, হ্যাঁ, ভালো কথা — আচ্ছা, আপনি কি এ-ব্যাপারে যথেষ্ট নিশ্চিত যে গোর্কিপন্থীরা এর সঙ্গে জড়িত ছিল না?'

'অমন কথা বলবেন না, দোহাই আপনার!' মৃদ্ব অন্বযোগ করে বললেন ইভান দেনিসভিচ। 'আমাদের কারো কী দায় পড়েছে এমন কাজ করবার?'

আমার প্রশ্ন শ্বনে ভোলখভ হিংস্র দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল বলল:

'কে? আমাদের ছেলেরা? অমন এট্টা দ্বধের বাচ্চারে! অরে ধরে পেটাবে? আমাদের মধ্যি কে এমনধারা কাজ করতে পারে, শ্বনি? তবে হ্যাঁ, এটা যদি খোভ্রাখ কি চুরিলো কি কোরত্কভ হোত — তাইলে আপনের অন্বমতি পেলে আমি নিজিই অদেরে পেটাতাম! ছোঁড়াটা কয়জোড়া ব্বট চুরি করেছিল তো হয়েছেটা কী? অমন কত জিনিসই তো প্রেতি রাত্তিরে চুরি হতেছে। তাছাড়া আর কয়জোড়াই-বা ব্বটজ্বতা রয়ে গেছে কলোনিতি? আমাদের দোস্তরা এখেনে এসে পেঁছিতি-পেঁছিতি ওয়ার একজোড়াও আর টিকে থাকবে না। তা, চুলায় যাক ওরা — যত ইচ্ছা প্রাণ ভরে চুরি করুক! আমরা ওসব দিকি নজর দিই না। কিন্তু অরা কেউ কাজ করতেছে না — এটা হল গে অন্য ব্যাপার...'

একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্না আর লিদচ্কাকে খ্বঁজতে গিয়ে দেখলুম তাঁদের আসবাবহীন ফাঁকা ঘরখানায় দ্ব'জনে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে বসে আছেন। অন্য সবকিছ্বর চেয়ে এই তদন্ত-কমিশনের আবির্ভাবই তাঁদের বিচলিত

করেছিল বেশি করে। ছন্নাকার জঞ্জালে-ভরা উঠোনটার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে জানলার পাশে বসে ছিল লিদচ্‌কা। আমি ঘরে ঢুকতে করুণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকালেন একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না।

বললেন, 'কেমন? আপনি খুশি তো?'

'কিসে?'

'সবকিছুতে — এই মঠ, এখানকার ছেলেদের, আপনার কর্তাদের, সবকিছু নিয়ে?'

একমুহূর্ত ভাবলুম: সত্যিই কি আমি খুশি? কিন্তু অখুশি হবারই-বা বিশেষ কারণ কী ঘটেছে? এ-পর্যন্ত সবকিছুই তো ঘটেছে কম-বেশি আমার আশানুরূপ।

বললুম, 'হ্যাঁ, আমি খুশি। আর, যাই হোক, আপনি তো জানেনই যে আমি নাকে কাঁদার লোক নই।'

একটুও না-হেসে কিংবা এতটুকু উত্তেজনার লক্ষণ না-দেখিয়ে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না বললেন, 'আমি নাকে কাঁদছি! হ্যাঁ, আমিই নাকে কাঁদছি! আমি বুঝতে পারছি না আমাদের এত নিঃসঙ্গ হয়ে পড়তে হচ্ছে কেন? এখানে আমাদের চোখের সামনে রীতিমতো দুর্ভাগ্যজনক একটা ব্যাপার ঘটল, সত্যিকার একটা মানবিক ট্র্যাজেডি, আর মাতব্বরি চাল নিয়ে আমাদের দিকে ঘেন্নায় নাক সিঁটকে একধরনের... কিছু অভিজাত ব্যক্তি আমাদের দর্শন দিতে এলেন! এমন নিঃসঙ্গ অবস্থায় আমরা কিছুতেই ঠিকপথে টিকে থাকতে পারব না... না, আমি অন্তত পারব না।'

জানলার তাকে আঙুল দিয়ে আস্তে-আস্তে টোকা দিতে-দিতে লিদচ্‌কা প্রাণপণে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌নাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে সে নিজেই অনেক কষ্টে চোখের জল সামলে রেখেছে।

লিদচ্‌কা বলছিল, 'আমি কেউ নই... সামান্য লোক... কিন্তু আমি কাজ করতে চাই, কাজ করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছি আমি। কে জানে, হয়তো বড় কিছু কাজও করে ফেলতে পারি। কিন্তু আমি... আমি তো মানুষ বটে, অস্তিত্বহীন শূন্য তো নই।'

জানলার দিকে আবার ও মুখ ফিরিয়ে নিল। আর আমি ওদের ঘরের দরজাটা শক্ত করে ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলুম উঁচু নড়বড়ে বারান্দাটায়।

সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল ভানিয়া জাইচেঙ্কো আর কোস্তিয়া ভেত্‌কোভ্‌স্কি। কোস্তিয়া হাসতে-হাসতে বলছিল:

'তারপর? তারপর? ওরা সবকিছু খায়ে সারল বুঝি?'

অভিজাতসুলভ একটা ভঙ্গি করে ভানিয়া হাত দিয়ে দিগন্তবরাবর রেখা টানল যেন।

বলল, 'সব কয়ডা! ওয়ারা মাঠে আগুনের কুণ্ড জ্বাল্যে পুড়াল্য, তারপর সবকিছু প্যাটে পুরি ফেলল। ব্যাস, ফুরায়্যে গেল! বোঝলা? আর তারপর ওয়ারা ঘুমাবার জন্যি মাঠে শুয়ি পড়ল্য, আর নাক ডাকায়্যে যা একখান ঘুম দিল-না যে কী বলি! আমাদের বাহিনী ওয়াদের পাশেই কাজ করত্যেছেল, আমরা তরমুজের বীজ বোনতে ছেলাম। ওয়াদের কাণ্ডকারখানা দেখ্যে আমরা হাসত্যেছেলাম, তা ওয়াদের দলপতি পেত্রুশ্‌কো সে-ও হাসত্যে লাগল্য... এই আর-কি! তা, সে আবার বলে কী, 'আলুপোড়া দিয়ি দিব্যি ভোজ হল্য আমাদের!''

'বলতি চাস ওরা সকল আলু খায়ে সারল? মাঠে তো মোট চল্লিশ পুদ আলু ছিল।'

'আরে, সব-সব! বেবাক আলু পুড়ায়্যে খায়্যে সারল ওয়ারা। কিছু আলু অবিশ্যি বনের মধ্যি লুকায়্যে ফেলল্য আর নয়তো মাঠের ইদিক-সিদিক ছড়ায়্যে-ছিটায়্যে ফেলল্য। আর তারপর সক্কলে মিলি ঘুম লাগাল্য। ওয়ারা দুপারের খানা খাতিও আসে নাই। পেত্রুশ্‌কো তো সাফ জবাব দিল: 'আমাদের দুপারের খানার দরকারডা কী, আমরা তো মাঠে আলু বোনত্যেছি!' তা, অদারিউক অরে বলল: 'শালা শোর কোথাকার!' আর কী, সাথে-সাথে দুই-জনার লড়াই লাগ্যে গেল। তমাদের মিশা গো, গোড়ায় সে-ও হোথায় ছেল। কী কর্যে আলুবীজ বোনতি হয় তা বুঝায়্যে দিতেছিল সে। কিন্তু পরে তারে কমিশনের সামনি হাজিরা দিতি ডাক্যে নিয়ি গেল।'

ভানিয়া এ-সময়ে আর তার আগেকার লম্বা ঝুলের ছেঁড়াখোঁড়া ট্রাউজার্সটা পরছিল না। তার পরনে ছিল শর্ট্‌স — পাশ-পকেটওয়ালা এমন একধরনের শর্ট্‌স যা একমাত্র বানানো হোত গোর্কি কলোনিতেই। বোঝা গেল, হয় শেলাপুতিন নয় তোস্‌কা তার পোশাক ভানিয়ার সঙ্গে ভাগাভাগি করে পরছে। ভেত্‌কোভ্‌স্কির সঙ্গে কথা বলার সময় ভানিয়া অনবরত এদিক-ওদিক হাত ছুড়ছিল, রোগা-রোগা দু'খানা ঠ্যাঙের ওপর ভর দিয়ে নাচছিল

যেন আর বারবার আড়চোখে আমাকে দেখছিল। আর থেকে-থেকে তার চোখদুটোয় ঝিলিক হানছিল বাচ্চাসুলভ মনোরম ব্যঙ্গবিদ্রুপের বিদ্যুৎ।

আমি শুধোলুম, 'তুমি এখন বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছ তো, ইভান?'

নিজের বুকে চাপড় দিয়ে ভানিয়া জবাব দিল, 'হা! আমি বলে কবেই ঠিক হয়্যে গেছি! এখন কাজ করত্যেছি একের-ত মিশ্রয়। আমরা তরমুজের বীজ বোনত্যেছেলাম। পেরথমে দেনিস আমাদের সাথে কাম করত্যেছেল, তাম্পরে ওয়ারে ডাক্যে নিয়ি গেলে আমরা নিজিরাই কাম করতি লাগলাম। দ্যাখেন-না, কেমন সোন্দর-সোন্দর তরমুজ পাওয়া যাবে-নে! তা, গোর্কিপন্থীরা আসতেছে কবে? পাঁচ দিনির মধ্যি? অদেরে -- গোর্কিপন্থীদেরে দ্যাখতে কেমন হবে তা ভাব্যে ভারি মজা লাগতেছে! ভারি মজা, তাই না!'

'তোমার কী মনে হয় ভানিয়া — দরোশ্‌কোকে মারল কে?'

শুনে কৌতূহলে-ভরা মুখখানা হঠাৎ আমার দিকে ফেরাল ভানিয়া, তারপর আমার চশমার কাচদুটোয় ওর স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করল। গালদুটো ওর কেঁপে উঠল একবার, তারপর স্থির হল, তারপর ফের একবার কেঁপে উঠল। মাথাটা ঝাঁকিয়ে, একটা আঙুল কানের ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত বুলিয়ে হাসল ও। তারপর বলল:

'জানি না তো।'

তারপর মতলব করেই আমার কাছ থেকে সরে চলে যেতে লাগল।

'ভানিয়া, এক-মিনিট! তুমি নিশ্চয়ই জানো, আর তোমাকে তা বলতে হবেই!'

একেবারে গির্জের দেয়ালটার পাশে গিয়ে থামল ভানিয়া, তারপর দূরে থেকে আমার দিকে তাকাল। মনে হল এক মুহূর্তের জন্যে যেন একটু অপ্রস্তুত বোধ করল ও। তারপর সহজ, শান্তভাবে পরিণতবয়স্ক লোকের মতোই প্রতিটি কথায় জোর দিয়ে বলল:

'আমি আপনেরে সত্য কথাই কব। আমি ওখেনে ছেলাম, কিন্তু আর যে কে-কে ছেল তা আমি আপনেরে বলতেছি না। ও ছোঁড়ার চুরি করা উচিত হয় নাই!'

দু-জনেই আমরা চুপ করে গেলুম। কোস্তিয়া ইতিমধ্যেই সরে পড়েছিল। দু-জনেই আমরা অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগলুম। অবশেষে আমি ভানিয়াকে বললুম:

'তোমাকে গ্রেপ্তার করা হল। পাইওনিয়র-র‍ুমে চলে যাও। ভোলখভের কাছে রিপোর্ট কর গিয়ে যে রাত্রে শ‍ুতে যাওয়ার বিউগ‍্ল বাজা পর্যন্ত তোমাকে গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছে।'

ভানিয়া ম‍ুখ তুলে তাকাল। একটিও কথা না-বলে ঘাড় নাড়ল শ‍ুধ‍ু। তারপর একছ‍ুটে পাইওনিয়র-র‍ুমে চলে গেল।

সে-সময়ের ওই পাঁচটা দিন আমার চেতনায় একটা ফাঁক, একটা শ‍ূন্যতা হিসেবে থেকে গেছে। শ‍ুধ‍ুই শ‍ূন্যতা, আর কিছ‍ু নয়। ওই সময়ে আমার কাজকর্মের খ‍ুঁটিনাটি কোনো বিবরণ এখন মনে করা আমার পক্ষে শক্ত হবে। সম্ভবত যাকে আমি ওই সময়ের 'কাজকর্ম' বলছি তা ঠিক কাজকর্ম বলতে যা বোঝায় তা ছিল না, ছিল কোনো এক ধরনের আন্তর আলোড়ন, কিংবা সম্ভবত স‍ু-নিয়ন্ত্রিত ও সংহত শক্তিসম‍ূহকে নিছকই ঠেকিয়ে রাখার একটা ব্যাপার। ওই সময়ে আমার কিন্তু মনে হচ্ছিল যে আমি সাংঘাতিক কাজকর্মে লিপ্ত আছি, এটা বিশ্লেষণ করছি, ওটার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি — এইসব। অথচ বাস্তবে আমি তখন নিছক গোর্কিপন্থীদের আসার প্রতীক্ষায় দিন গ‍ুনেছি।

তব‍ু, তা সত্ত্বেও, কিছ‍ু-কিছ‍ু ব্যাপারে তখনই আমরা সাফল্য অর্জন করেছি।

যেমন, আমার মনে পড়ে, আমরা নিয়মিত প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় ঘ‍ুম থেকে উঠেছি আর আমাদের এই উদাহরণ অন‍ুসরণ করার ব্যাপারে কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের চরম ঔদাসীন্য নিয়মিত ধৈর্য আর ক্রোধ নিয়ে লক্ষ্য করে গেছি। ওই সময়টায় আমাদের অগ্রবর্তী মিশ্র বাহিনী প্রায় কোনো রাত্রেই ঘ‍ুমোয় নি বলতে গেলে, কারণ সর্বদাই তখন কোনো-না-কোনো অত্যন্ত জর‍ুরি কাজ করবার মতো থেকে গেছে। আমার কুরিয়াজে ফিরে আসার পরের দিনই শেরে ওখানে পেঁাছে গিয়েছিলেন। অতঃপর ঘণ্টা দ‍ুই ধরে তিনি খেত, উঠোন, বার-বাড়িগ‍ুলো আর টিলার গায়ে থাক-কাটা জমিগ‍ুলো মাপজোক করে কাটিয়ে দিয়েছিলেন। গোটা এলাকাটায় ফৌজী ফিল‍্ড-মার্শালের ভঙ্গিতে হেঁটেচলে ঘ‍ুরে বেড়াচ্ছিলেন যখন তখন তাঁকে কিছ‍ুটা বিষণ্ণই বোধ হচ্ছিল। একেবারে চুপচাপ হয়ে ঘ‍ুরে বেড়াচ্ছিলেন তিনি আর সেই সর্বব্যাপী আগাছার রাজত্ব থেকে ছিঁড়ে-নেয়া নানারকম জঞ্জাল দাঁতে খ‍ুঁটে দেখছিলেন। আর ওই দিন সন্ধেবেলা দেখা গেল রোদে-পোড়া, রোগা-রোগা, ধ‍ুলোয়-

মাখামাখি গোর্কিপন্থীরা একটা জমি পরিষ্কার করতে লেগে গেছে। ওই জমিটায় আমাদের পোষা শুয়োরের বিশাল পালের জন্যে খোঁয়াড় তৈরির কথা ছিল।

অসময়ে কৃত্রিম উপায়ে ফল ফলানোর উপযোগী কাচঘরগুলো আর হট্‌হাউসটা তৈরির উদ্দেশ্যে বাগান খোঁড়াখুঁড়ি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। ওই সময়টায় দলপতি আর সংগঠক হিসেবে ভোলখভ দারুণ কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছিল। ও তখন মাঠে দু'জোড়া ঘোড়ার পেছনে তদারকির জন্যে একজনমাত্র লোক দিয়ে বাকি সবাইকে অন্য-অন্য কাজে নিযুক্ত করছিল। আর দেখা যেত সকালবেলায় কাজে বেরুনোর সময় পিয়ত্‌র ইভানভিচ গরোভিচ একমিটার চওড়া কানাওয়ালা একটা খড়ের টুপি মাথায় দিয়ে, বিশেষরকম জাঁকালো একখানা কোদাল নাচিয়ে-নাচিয়ে দল-বেঁধে দাঁড়িয়ে-থাকা কৌতূহলী কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের হেঁকে বলছেন:

'হে সাহসী বীরবৃন্দ, মাটি খুঁড়বে এস!'

কিন্তু দেখা যেত 'সাহসী বীরবৃন্দ' সঙ্গে সঙ্গেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে যে-যার ধান্দায় সরে পড়ছে। আর পালাবার পথে যদি কখনও তাদের সঙ্গে অন্ধকার রাতের মতো কালো, শর্ট্‌স-পরিহিত বুত্‌সাইয়ের দেখা হয়ে যেত আর গুরুগম্ভীর গলায় বুত্‌সাই যদি তাদের এই বলে আমন্ত্রণ জানাতেন যে 'ওরে কুঁড়ের বাদশা অপদার্থের দল, আর কতকাল আমি তোদের হয়ে কাজ করব বল্‌?' তখনও তারা তেমনি লাজুক ভঙ্গিতে তাঁর কথা শুনে যেত মাত্র।

আমাদের 'রাব্‌ফাক'-এর কিছু-কিছু ছাত্রছাত্রী সন্ধের দিকে মাটি কাটার কাজ করবে বলে আসত. কিন্তু আমি তাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফের খার্‌কভে ফেরত পাঠিয়ে দিতুম। তাদের সামনে তখন বসন্তকালীন পরীক্ষা আসন্ন, আর আমি জানতুম পরীক্ষাটা খেলাকথা ছিল না। আমাদের প্রথম ঝাঁকের 'রাব্‌ফাক' ছাত্রছাত্রীদের তখন 'ভ. উ. জ'-এ ঢোকার কথা।

আমার মনে পড়ছে ওই পাঁচ দিনে নানা ধরনের বহু কাজ নিষ্পন্ন হয়েছিল আর সূত্রপাত ঘটানো হয়েছিল আরও বহু কাজের। বড়সড় একসার হাওয়া-প্রতিরোধী পায়খানা তৈরির কাজ বরভোয় তখন দ্রুত শেষ করে আনছিল আর তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ছুতোরমিস্ত্রিদের রীতিমতো একটা বাহিনী। তার বাহিনীটি কাজ করে যাচ্ছিল মাটির নিচের ঠাণ্ডাই ভাঁড়ারঘর, স্কুলবাড়ি

ও শোবার ঘরগ্নলোর মেরামতির ব্যাপারে আর তৈরি করছিল দ্রুত ফসল ফলানোর কাচঘরগ্নলো ও একটা হট্‌হাউস... বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানায় কাজ করছিল জনা-তিনেক বিদ্যুৎ-মিস্ত্রি। এছাড়া আরও তিনজন মিস্ত্রি এখানে-ওখানে উঠোনের মাটি খ্বঁড়ে-খ্বঁড়ে সন্ধান করে ফিরছিল মাটির নিচেকার জলের পাইপের। পদভোর্‌কির বাসিন্দাদের কাছ থেকে আমরা জেনেছিল্বম যে কুরিয়াজ যখন সন্ন্যাসীদের মঠ হিসেবে ব্যবহৃত হোত তখন নাকি ওই টিলার মাথায় কলের জলের সরবরাহ ছিল, আর এই কথাটা যে সত্যি তার প্রমাণ মিলেছিল ঘণ্টাঘরের ওপরতলায় বেশ শক্তপোক্ত একটা জলের ট্যাঙ্ক আবিষ্কৃত হওয়ায়। যাই হোক, মিস্ত্রিদের চেষ্টার ফলে শিগ্‌গিরই আমরা মাটির নিচে পোঁতা জলের পাইপের সন্ধান পেয়ে গেল্বম।

কুরিয়াজের উঠোনটা ওই সময়ে বোঝাই হয়ে ছিল নানা আকারের কাঠের তক্তা, ছিল্‌কে আর গাছের গ্বঁড়িতে আর ক্ষতবিক্ষত হয়ে ছিল টানা-টানা গর্তে। কুরিয়াজ প্বনরব্দ্ধারের পর্ব শ্বর্ব হয়ে গিয়েছিল প্বরো মাত্রায়।

ময়লা আবর্জনা ইত্যাদি সাফ করার ব্যবস্থা করে কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটানোর ব্যাপারে ওই সময়ে আমরা খ্বব কমই মনোযোগ দিতে পারছিল্বম। সত্যি কথা বলতে কী, আমরা নিজেরাই তখন খ্বব কম স্নানটান করতুম। প্রতিদিন সকালে ভোর থাকতেই শেলাপ্বতিন আর সলভিয়েভ বালতি নিয়ে টিলাটার নিচের নাবাল জমির সর্বরোগহর 'অলৌকিক' ঝর্ণা থেকে জল আনতে যেত। কিন্তু যতক্ষণে তারা টিলার খাড়াই চড়াই বেয়ে হোঁচট খেতে-খেতে আর অমন মহাম্বল্যবান জল ছলকে-ছলকে ফেলতে-ফেলতে ওপরে উঠে আসত ততক্ষণে আমরা আমাদের নানাবিধ নির্দিষ্ট কাজে যাবার জন্যে ছ্বট লাগাতুম, ছেলেরা চলে যেত যে-যার মাঠের কাজে, আর বালতির জলটা পাইওনিয়র-র্বমের গ্বমোট আবহাওয়ায় বিনা ব্যবহারে অপ্রয়োজনে গরম হতে থাকত। এছাড়া স্বাস্থ্যরক্ষা-সম্পর্কিত ব্যাপারের ধার ঘেঁষে গেছে এমন অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যাপারস্যাপার তেমন ভালোভাবে চলছিল না। ভানিয়া জাইচেঙ্কোর দশম বাহিনীটি ইতিমধ্যে কায়মনোবাক্যে প্বরোপ্বরি আমাদের দিকে চলে এসেছিল, আর তারা বিন্দ্বমাত্র হ্বঁশিয়ারি না-দিয়ে ও এ-সম্পর্কে নির্দেশদানের কোনো তোয়াক্কা না-রেখে হঠাৎ একদিন আমাদের ঘরে এসে উঠল আর মেঝের ওপর তাদের নিজের-নিজের কম্বল বিছিয়ে

শুরুতে আরম্ভ করল। বলা বাহুল্য, বাহিনীটি নয়নানন্দদায়ক ছেলেপিলে দিয়ে তৈরি হলেও তারা আমাদের ঘরে ছারপোকার বংশবিস্তার করে ছাড়ল।

বিমূর্ত শিক্ষা-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এটাকে অবশ্য তেমন কিছু দারুণ দুর্ভাগ্য বলে গণ্য করার কারণ ছিল না, তবে কিনা লিদচ্কা আর একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্না পইপই করে আমাদের বারণ করে দিয়েছিলেন যে আমরা যেন নিতান্ত প্রয়োজন না-হলে তাঁদের ঘরে না-ঢুকি আর যদি-বা ঢুকিই তাহলে যেন তাঁদের আসবাবপত্র ব্যবহার না-করি কিংবা টেবিল-চেয়ার. বিছানা, ইত্যাদি ছারপোকা-বহনক্ষম জিনিসপত্রের ধারেকাছে না-ঘেঁষি। এভাবে তাঁরা সত্যিই নিজেদের বাঁচাতে পেরেছিলেন কিনা এবং আমাদের ব্যাপারে তাঁদের অমন খুঁতখুঁতে হয়ে লাভ কী হয়েছিল এ-নিয়ে আমার মনের ধন্দ অবশ্য এখনও কাটে নি। কারণ আমাদের জানা ছিল যে আমাদের কম্‌সমোল সংগঠনের বিশেষভাবে ছকা একটা পরিকল্পনা অনুযায়ী ওই দুই মহিলাকে ওই সময়ে সারা দিন ধরে কুরিয়াজের এজমালি শোবার ঘরগুলোয় ঘুরে-ঘুরে ওখানকার ছাত্রাবাস-সম্পর্কিত ব্যাপারের খুঁটিনাটি বিবরণ সংগ্রহের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হচ্ছিল।

আমি চাইছিলুম কলোনির সব ক'টা বাড়ির অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাকে একেবারে ঢেলে সাজতে। আগেকার ছাত্রাবাসের যে লম্বা-লম্বা টানা ঘরগুলোকে কুরিয়াজ-বাসিন্দারা ইদানীং ইশ্‌কুল নাম দিয়েছিল সেগুলোকে এজমালি শোবার ঘরে পরিণত করে ওই একখানা দালানেই চার শো কলোনি-বাসিন্দার সকলের থাকার বন্দোবস্ত করতে চাইছিলুম। আগেকার ইশ্‌কুলের সাজসরঞ্জামের অবশিষ্টাংশ এই বাড়িটি থেকে বিদায় করে দিয়ে বাড়িটিতে প্লাস্টার-মিস্ত্রি, ছুতোরমিস্ত্রি, রঙ-মিস্ত্রি আর জানলা-দরজার কাচমিস্ত্রি দিয়ে ভরে দিতে তাই বেশি সময় লাগল না। ইশ্‌কুলের জন্যে আমি নির্দিষ্ট করে দিলুম দরজার পাল্লাহীন সেই বাড়িটা যেখানে তখনও পর্যন্ত 'প্রথম যৌথ' বাস করে আসছিল, অবশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত বাড়িটা কুরিয়াজ-বাসিন্দায় ভরা ছিল ততক্ষণ সেটা মেরামত করার প্রশ্নই উঠছিল না।

হ্যাঁ, কাজকর্ম চলছিল যথেষ্টই, তবে তা শিক্ষাদান-সংক্রান্ত কাজকর্ম নয়। কলোনির এমন একটা কোণ বা ঘোঁজঘাঁজ ছিল না যেখানে সে-সময়ে কিছু-না-কিছু কাজ চলছিল না। প্রতিটি বস্তুই ছিল মেরামত, তেল দেয়া, রঙ করা

আর ধোয়া-পাখলানোর আওতায়। এমন কি মঠের খাবারঘরের দেয়ালে যতসব পুরুষ আর স্ত্রী সন্তদের মূর্তির মুখগুলোয় রঙ করার ফরমায়েশ করে আমরা বাইরের উঠোনে বসেই খাওয়াদাওয়া সারতে লাগলুম। একমাত্র এজমালি শোবার ঘরগুলোই তখনও পর্যন্ত পুনরুদ্ধার-কর্মের এই উদ্দীপনার ছোঁয়া বাঁচিয়ে থাকছিল।

আর সেখানে আগের মতোই কুরিয়াজ-বাসিন্দারা ঘুমোচ্ছিল, খাবার হজম করছিল, যত্রতত্র ছারপোকা পুষছিল, একে অপরের তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিসপত্র হাতাচ্ছিল আর আমার ও আমার কাজকর্ম সম্বন্ধে নানারকম গোপন অভিসন্ধি মনে-মনে পোষণ করে চলেছিল। ওসব ঘরে যাওয়া আমি অবশ্য বন্ধ করে দিয়েছিলুম। সাধারণভাবে বলতে গেলে, কুরিয়াজের ছ'টি 'যৌথ'-এর আন্তর জীবন সম্পর্কে আগ্রহী হওয়া থেকে বিরত ছিলুম আমি। আমার সঙ্গে কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল স্পষ্ট ও কড়াকড়িভাবে সুনির্দিষ্ট। তা ছিল এইরকম: খাবারঘর খুলত সকাল সাতটায়, দুপুর বারোটায় আর সন্ধে ছটায়; আমাদের একটি ছেলে ওই সময়গুলোয় ঘণ্টা বাজাত আর কুরিয়াজ-বাসিন্দারা খেতে আসত একে-একে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। তবে খেতে আসতে দেরি করাটা তাদের পক্ষে সুবিধেজনক হোত না, এর কারণ শুধু-যে খাবারঘর একটা বিশেষ সময়ের পরে বন্ধ হয়ে যেত তাই নয়, যারা আগে খেতে আসত তারা নিজেদের খাবারের ভাগ এবং যারা তখনও খেতে আসে নি তাদের ভাগটুকুও খেয়ে বসে থাকত বলেও। ফলে দেরিতে আসত যারা তারা আমাকে, রান্নাঘরের কর্মীদের আর সোভিয়েত গভর্নমেন্টকে শাপ-শাপান্ত করত বটে, তবে তার চেয়ে আরও জোরালো কোনো ব্যবস্থা অবলম্বনে ইতস্তত করত। এর কারণ, আমাদের খাদ্য-বিতরণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কম্যান্ডান্ট ছিল স্বয়ং মিশা অভ্‌চারেঙ্কো।

মনে-মনে গোপন বিদ্বেষ পুষে আমি সে-সময়ে লক্ষ্য করছিলুম যে কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের পক্ষে পথ করে খাবারঘরে যাওয়া আর তারপরে ক্ষুৎপিপাসা শান্ত হলে নিজের-নিজের ধান্দায় রোঁদে বেরুনো ওই সময়ে কত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেননা তখন তাদের হাঁটাচলার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে ছিল যতসব গাছের গুঁড়ি, খানাখন্দ, দুই হাতলওয়ালা করাত, উঁচনো কুড়ুল, আধা-তরল কাদার কুন্ড, চুনের ঢিবি আর... আর তাদের নিজেদের বিবেক। সব ক'টি লক্ষণ মিলিয়ে আমি টের

পাচ্ছিল্ম ওই সব ছেলেপিলের অন্তরের অন্তস্তলে সত্যিকার বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় ঘটে চলেছে — নিছক রোমাঞ্চকর মেলোড্রামার নয়, একেবারে খাঁটি শেক্সপিয়রীয় ট্র্যাজেডির। ওদের কাছে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল এইরকম — 'হবে কি হবে না, সমস্যা হল এ-ই...'।

যেখানেই কাজ চলছিল ছোট-ছোট দলে ভাগ হয়ে কুরিয়াজ-বাসিন্দারা দাঁড়িয়ে থাকত সেইখানেই, আর তারপর চুপিসারে আড়চোখে প্রত্যেকে সঙ্গীসাথীদের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে অপরাধী-অপরাধী ভাব করে চিন্তিতভাবে পা চালাত এজমালি ঘরগ্নলোর দিকে। কিন্তু এজমালি ঘরগ্নলোতেও তখন আর উত্তেজনা জাগানোর মতো কিছ্ন ছিল না, এমন কি চুরি করার মতো কোনো বস্তুও আর অবশিষ্ট ছিল না সেখানে। ফলে কিছ্নক্ষণের মধ্যে আবার তারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে কাজের জায়গাগ্নলোর কাছে ঘেঁষতে চাইত, অথচ সন্ধির শাদা নিশান তুলে অন্তত পক্ষে কোনো একটা জিনিস এক-জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বয়ে নিয়ে যাওয়ার অন্নমতি চাইতেও লজ্জা পেত — পাছে সঙ্গীসাথীদের কাছে মানমর্যাদা ক্ষ্নন্ন হয়। এদিকে গোর্কি-পন্থী ছেলেরা ওদেরই পাশ ঘেঁষে দৌড়োদৌড়ি করে কাজ করত একেবারে পালতোলা ছ্নটন্ত নৌকোর মতো। যে-কোনো বাধাবিপত্তি বাতাসে লম্ফ দিয়ে পেরিয়ে যাওয়ার জন্যে সর্বদাই প্রস্তুত থাকত তারা। অভীষ্টসাধনে এমন প্রবল একাগ্রতা দেখে অভিভূত কুরিয়াজ-বাসিন্দারা ফের একবার হ্যামলেট কিংবা কোরিওলেনাসের পোজ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। তবে তাদের অবস্থাটা দাঁড়িয়েছিল সম্ভবত আরও বেশি কর্নণ, কেননা কে কবে শ্ননেছে যে হ্যামলেটকে কেউ চড়া গলায় হেঁকে বলছে:

'সরো, সরো, পথ ছাড়ো দেখি! খাওয়ার টাইম হতি এখনও দ্নই ঘণ্টা বাকি, বোঝলে!'

একই রকম নিন্দনীয় বিদ্বেষের মনোভাব নিয়ে আমি তখন লক্ষ্য করছিল্ম যে গোর্কি-পন্থীদের নাম উচ্চারণ করলে কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের ব্নকটা কেমন ধ্বক করে ওঠে বলে মনে হয়। আমাদের অগ্রবর্তী মিশ্র বাহিনীর সদস্যরা কখনও-সখনও এমন ধরনের সব কথা বলত যা বলা থেকে নিশ্চিতই বিরত থাকত যদি তারা কোনো শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে বের্নত। যেমন, হয়তো কখনও তারা বলত:

'এট্ন সব্নর কর্ না! আমাদের দলবল এসে পড়ল বলে এখেনে, তখন

দেখবি-নে অন্যের ঘাড়ে চাপ্যে খাওয়া কারে বলে তা তারা বার করে দেবে ভালো করে...'

কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের মধ্যে কিছু-কিছু অপেক্ষাকৃত বয়সে-বড় আর বেশি বেপরোয়া ছেলেপিলে তখন হয়তো আসন্ন এই ঘটনাটার গুরুত্বকে কিছুটা খাটো করে দেখার প্রয়াস পেত, কিছুটা বিদ্রুপের ভঙ্গিতেই হয়তো সন্দেহ প্রকাশ করে বলত:

'বটে! তা তারা সাংঘাতিক কী কাণ্ডটা করব্যে শুনি? হাতে মাথা কাটব্যে?'

এ-ধরনের প্রশ্ন কেউ করলে দেনিস কুদ্‌লাতি সঙ্গে সঙ্গে তার জবাব দিত এই বলে:

'জানতি চাস? হা! বলি শোন্‌! ওরা তোদেরে প্যাঁদানি দিয়ি এমন টিট করে দিবে যে তোদের গভ্‌ভধারিণী মা-রাও তাদের ছ্যানাপোনারে চিনতি লারবে!'

মিশা অভ্‌চারেঙ্কো আবার কথায়-বার্তায় আভাস-ইঙ্গিতের বা অস্পষ্টতার ধার ধারত না। কাজেই সে এসব ক্ষেত্রে আরও স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিত:

'যে-কয়ডা অপদাত্থ কাজ করবে না তাদেরে চোখে কালশিটা ফেলায়ে ঘুরি বেড়াতে হবে, এই আর-কি! তা, এমনধারা আছে কয়জনা — দুই শত আশি জনা? মরি মরি! তখন তোদের মুখগুলা না-জানি কেমনই-না দেখতি লাগবে! দেখতি ভয়ঙ্কর লাগবে নিশ্চয়!'

এ-সমস্ত কথা শুনলে খোভ্‌রাখ দাঁত চেপে শুধু চিবিয়ে-চিবিয়ে বলত:

'এঃ, চোক্ষুতি কালশিটা! বলল্যেই হল্য! এয়া তদের গোর্কি কলোনি না, বুঝলি! এখেনে খার্‌কভের সাথে মোকাবিলা করতি লাগব্যে-নে!'

খোভ্‌রাখের এই কথাটা মিশার কাছে এতখানি গুরুত্বপূর্ণ মনে হল যে এক মুহূর্তের জন্যে হাতের কাজ থামিয়ে সে বন্ধুত্বের ভানে গলার স্বর নরম করে বললে:

'আরে, আরে ইয়ার! কী যেন বললি তুই? এয়া গোর্কি কলোনি নয়, খার্‌কভের সাথে মোকাবিলা, আরও যেন কী? কিন্তু ইয়ার, তোরে মিনিমাগনা থার্কাত-খাতি দিবে কে বলে মনে ভাবতেছিস? নিজিরেই শুধা-না — তোর জন্যি কার এত মাথাব্যথা পড়ি গেছে?'

কথা বলতে-বলতেই মিশা ফের কাজে মন দিল। যন্ত্রের হাতল আগের মতোই মুঠোয় চেপে ধরল সে।

'তোর নামটা যেন কী?' সে ফের কথা বলল।

অবাক হবার ঠেলায় খোভ্‌রাখ যেন হকচাকিয়ে গেল।

'কী বললি?'

'এই বলতেছিলাম, তোর নামটা কী! নেঙ্‌টি ইঁদুর? নাকি, কাঁটাচুয়া?'

বিরক্তিতে, বিভ্রান্তিতে লাল হয়ে উঠল খোভ্‌রাখ।

'কী আজেবাজে ফ্যাঁচ্‌ফ্যাঁচ..?'

'তা তোর নামটা তো বললে পারিস, নাকি পারিস না?'

'আমার নাম খোভ্‌রাখ...'

'অ — ঃ! খোভ্‌রাখ!.. তাই বল্‌! পেরায় ভুলিই গেছলাম নামটা! অবিশ্যি পেরায়ই চোখে পড়ে যে গাজরগণেশ কী-এট্টা বস্তু যেন সব্বদাই পায়ে-পায়ে বেধে থাকে অথচ কাউর কোনো উপগারে লাগে না... তা, তুই যদি কাম-কাজ কিছু এট্টা করতি ইয়ার, যা হোক কিছু এট্টা কাজ, তাইলে পেরায়ই কেউ-না-কেউ তোরে ডাক দিয়ি বলত: 'খোভ্‌রাখ, আমারে ওইটা দে! খোভ্‌রাখ, তুই এখনও তৈয়ের হোস নাই? খোভ্‌রাখ, বুড়া ইয়ার, ধর্‌ দেখি এইটা!' কিন্তু কাজকম্মো না-করলি নাম-টাম অতশত মনে থাকে কি ছাই!.. তা, যা দেখি এখন তুই, কাট্যে পড়্‌ দেখি! দেখতি পাচ্ছিস না, আমি ব্যস্ত আছি? এই পিপাটা আমারে মেরামত করতি লাগবে, বুঝলি। ওরা এখন সুপ, চা, ধোয়া-পাখলার জল, সবকিছু একটা পাত্তরেই রাখতেছে। তোদেরে তো খাওয়াতে লাগবে. নাকি? আর যদি তোদেরে খাতি দেয়া না-হয় তাইলে তোরা পটল তুলবি আর তারপর পচা মড়ার গন্ধ ছাড়তে থাকবি। আর সেইটা খুব ভালো ঠেকবে না আমাদের কাছে, তাই তোদের জন্যি তখন কফিন বানাতে লাগবে আমাদের — আর এর অথ্থ, আমাদের কাজ আরও বাড়বে...'

অবশেষে খোভ্‌রাখ মিশার কবল এড়িয়ে পালাতে পথ পায় নি সেদিন। সে যখন চলে যাচ্ছে মিশা তখন পেছন থেকে তাকে নরম সুরে ডেকে বলেছিল:

'যা, বাইরে গিয়ি এট্টু হাওয়া খেয়ি আয়... এয়াতে তোর উপগার হবে — দারুণ উপগার হবে তোর...'

কিন্তু খোভ্রাখ কি সত্যিই বাইরের তাজা হাওয়ার উপকারিতায় বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল আর কুরিয়াজের গোটা অভিজাত সম্প্রদায়কে তার এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করে তুলছিল? কে জানে! কিন্তু সে যাই হোক, ওই সময়টায় ছেলেগুলো সত্যিই আমাদের চোখ এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করছিল। তবে তার আগেই কুরিয়াজ শাখার অভিজাত-বংশীয়দের সঙ্গে আমি পরিচিত হয়ে উঠেছিলুম। মোটের ওপর দেখতে গেলে ওরা অবশ্য তেমন খারাপ ছেলেপিলে ছিল না। আর যাই হোক, ওদের প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ছিল আর এই জিনিসটা সর্বদাই ছিল আমার পছন্দসই। ওদের মধ্যে বিশেষ করে পিয়েরেত্স ছিল আমার প্রিয়পাত্র। সে রীতিমতো মেজাজী চালে হেঁটেচলে বেড়াত, মাথার সামনের চুলের গোছা ঝুলিয়ে দিত একেবারে ভুরু পর্যন্ত, টুপি পরত একচোখ ঢেকে, শুধুমাত্র নিচের ঠোঁট দিয়ে সিগারেট ঝুলিয়ে রাখত আর কায়দা করে থুথু ফেলার ব্যাপারে ছিল দারুণ নিপুণ। কিন্তু আমি বেশ টের পাচ্ছিলুম যে তার বসন্তের দাগে-ভরা মুখখানা আমাকে কৌতূহল নিয়ে লক্ষ্য করছিল। আর তা ছিল বুদ্ধিমান, প্রাণবন্ত একটি ছেলের কৌতূহল।

এক সন্ধেবেলায় আমি এমন কি ওদের দলে গিয়েও ভিড়েছিলুম। আমাদের শুয়োরদের রোদ্রস্নানের কাচঘর তৈরির জন্যে উঠোনে যে-পাথরগুলো রাখা ছিল তার ওপর চেপে বসে ছিল ওরা সব ক'জন আর সিগারেট ফুঁকতে-ফুঁকতে কথাবার্তা বলছিল উদাস অবসন্নভাবে। আমি ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম, তারপর ওদের কারো কাছ থেকে একটু আগুন চেয়ে নেবার প্রস্তুতি হিসেবে খবরের কাগজের টুকরো দিয়ে নিজের জন্যে একটা সিগারেট পাকানো শুরু করে দিলুম। হঠাৎ পিয়েরেত্স আমার দিকে তাকিয়ে বন্ধুভাবে খুশি-খুশি গলায় হেঁকে বললে:

'কমরেড ডিরেক্টার, আপনে তো কঠিন পরিশ্রম করতিছেন কিন্তু সিগ্রেট ফোঁকার বেলা ফুঁকতিছেন বাজে ফালতু তামাক। তা, সোভিয়েত গভর্নমেন্ট তো আপনের জন্যি সিগ্রেট বানায়ো দিলি পারে?'

কথাটা কানে যেতে পিয়েরেত্সের কাছে গিয়ে প্রথমে তার হাতের ওপর ঝুঁকে পড়ে নিজের সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিলুম। তারপর ওরই মতো খুশি-খুশি চড়া গলায় আর গলার স্বরে কর্তৃত্ব-প্রকাশক সামান্য একটুখানি ঝাঁজ মিশিয়ে বললুম:

'আচ্ছা, এবার টুপিটা খুলে ফেল দেখি!'

পিয়েরেত্‌সের দু'চোখে হাসির ছটা দেখতে-দেখতে বিস্ময়ে রূপান্তরিত হল, কিন্তু মুখে ওর তখনও হাসি লেগে রইল। বলল:

'অ্যাই দেখ, কী হল্য আবার?'

'টুপি খোল শিগ্‌গির — আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, না কী?'

'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে — খোলত্যেছি টুপি...'

হাত দিয়ে ওর কপালের ওপর ঝুলে-পড়া চুলের গোছা ঠেলে ওপরে তুলে দিলুম। তারপর ওর কিছুটা-সন্ত্রস্ত মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলুম। পরে বললুম:

'হ্যাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে, এতেই চলবে!'

পিয়েরেত্‌স তখন চোখ তুলে আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে। কিন্তু আমি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না-করে সিগারেট ধরাবার পর কয়েকটা সুখটান দিয়ে ওদের দিকে পেছন ফিরে পা চালালুম ছুতোরশালের দিকে।

ওই সময়ে একেবারে আক্ষরিক অর্থেই আমার প্রতিটি চালচলনে, বেল্‌টের বকলসের মৃদু চকমকানিসহ আমার পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতিটি খুঁটিনাটিতে আমি অনুভব করছিলুম আমার শিক্ষকজনোচিত কর্তব্যবোধের পূর্ণ অভিঘাত। আর তা ছিল এই: ওই ছেলেদের দিয়ে আমাকে ভালো লাগাতেই হবে। অপ্রতিরোধ্য সহানুভূতি দিয়ে বিচলিত করে তুলতে হবে ওদের হৃদয়, আবার সেইসঙ্গে ওদের একেবারে অন্তরের অন্তস্তলে অনুভব করতে দিতে হবে যে ওদের সহানুভূতিকে আমি কানাকড়িও মূল্য দিই না — ওরা যত খুশি অসন্তুষ্ট হতে পারে, শাপ-শাপান্ত করতে পারে আমায়, নিষ্ফল আক্রোশে দাঁত-কিড়মিড় পর্যন্ত করতে বাধা নেই ওদের, কিন্তু তাতে অবস্থার কোনো হেরফের ঘটবে না।

ছুতোরমিস্ত্রিদের দিনের কাজ তখন শেষ হওয়ার মুখে। খারাপ তিসির তেলের চাইতে ভালো তিসির তেলের গুণ কত বেশি তা-ই নিয়ে বরভোয় সবে গুরুগম্ভীর আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছে। এই নতুন সমস্যাটা আমাকে এত বেশি কৌতূহলী করে তুলেছিল যে প্রথমটায় আমি লক্ষ্যই করি নি পেছন থেকে কেউ আমার জামার হাতা ধরে টানছে। হঠাৎ আরও একবার টান পড়ায় পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি পিয়েরেত্‌স আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

'কী?'

'শোনেন — আপনে তখন আমার দিকি অমন করো্য তাকো্যছেলেন ক্যানে? অ্যাঁ?'

'উঁ? না, বিশেষ কোনো কারণে নয়... শোনো, বরভোয় — আমাদের কিন্তু ঠিক-ঠিক তেলটাই পেতে হবে, বুঝলে!..'

বরভোয়ও সানন্দে ফের ঠিক-ঠিক তেল সম্বন্ধে আলোচনা জুড়ে দিল। আমি লক্ষ্য করছিলুম বরভোয়ের কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে-করতে পিয়েরেত্‌স ওর দিকে রাগে কটমট করে তাকাচ্ছিল। অবশেষে বরভোয় প্রচণ্ড হুড়ুমদুড়ুম আওয়াজ করে তার যন্ত্রপাতির বাক্সটা তুলল আর আমরা সবাই মিলে সিংদরজার ঘণ্টাঘরের দিকে এগোতে লাগলুম। ওপরের ঠোঁটটা হাত দিয়ে খুঁটতে-খুঁটতে পিয়েরেত্‌স আমার পাশে-পাশে হাঁটছিল। অতঃপর বরভোয় টিলার ঢাল বেয়ে গাঁয়ের দিকে নেমে চলল আর আমি পেছনদিকে একটা হাত মুড়ে পিয়েরেত্‌সের মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়ালুম।

বললুম, 'কী ব্যাপার? কী চাও তুমি?'

'আমার দিকি তাকো্যছেলেন ক্যানে? জবাব দ্যান!'

'তোমার নাম তো পিয়েরেত্‌স, তাই না?'

'উঁ? হুঁ!'

'আর তোমার নামের প্রথম অংশ তো স্তেপান?'

'কী করো্য জানলেন?'

'তুমি তো সুভের্‌লোভ্‌স্ক থেকে এসেছ, তাই না?'

'তা, যদি এসিই থাকি তো হয়ে্যছেডা কী?.. কিন্তু আপনে কী করো্য জানলেন?'

'সবই জানি আমি। তুমি-যে চুরি কর আর ঝগড়া-মারামারি কর তা-ও জানি। কেবল তুমি বোকা না চালাক সেটাই জানতুম না।'

'তা, কী দ্যাখলেন?'

'তখন সিগারেট সম্বন্ধে ওই যে প্রশ্নটা করলে-না তুমি, ওটা নেহাতই বোকার মতো প্রশ্ন ছিল... একদম বোকার মতো! ওর চেয়ে বোকার মতো প্রশ্ন আর হয় না! তা, তাকিয়ে থেকে যদি তোমার মনে কষ্ট দিয়ে থাকি তো সেজন্যে দুঃখিত ..'

সন্ধের সেই আবছা আলোতেও আমি দেখতে পাচ্ছিলুম পিয়েরেত্‌স

কেমন লাল হয়ে উঠেছে, ওর দুই রগের শিরাগুলোর রক্ত টিপ্‌টিপ করছে কতখানি বেগে, কতখানি উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ও... আনাড়ির মতো এক-পা পিছিয়ে গিয়ে একবার ও পেছন ফিরে কী-যেন দেখল। তারপর বলল:

'ও ঠিক আছে, দুঃখিত হওয়ার কিছু নাই! কিন্তু... কিন্তু আমার ওই কথাডায় বোকামির কী ছেল?'

'কী ছিল তা-ও বুঝলে না? তুমি তো জানোই আমায় অনেক কাজ করতে হয়, শহরে গিয়ে-যে সিগারেট কিনব তারও সময় নেই। এ তো তুমি জানোই। আর আমার সময় নেই কেন? না, সোভিয়েত গভর্নমেন্ট আমার ওপর দায়িত্ব চাপিয়েছেন **তোমার** জীবনকে আরও একটু ভালো, আরও একটু সুখী করে তোলার জন্যে। বুঝলে, **তোমারই** জীবন! আমার কথাটা বুঝেছ?.. কে জানে, হয়তো বোঝ নি! তাহলে আর কী, শুতে যাওয়া যাক চল।'

বুটের আগা দিয়ে মাটি খুঁড়তে-খুঁড়তে পিয়েরেত্‌স ধরা গলায় বলল, 'বুঝ্যেছি।'

'তাহলে বুঝেছ শেষপর্যন্ত?'

বলে দারুণ একটা অবজ্ঞার ভাব নিয়ে ওর চোখের মধ্যে, চোখের মনিদুটোর একেবারে মধ্যিখানটায় তাকিয়ে রইলুম। আমি দেখতে পাচ্ছিলুম আমার চিন্তা আর আমার ইচ্ছাশক্তি ওই দুটো চোখের মনির মধ্যে কীভাবে সজোরে নিজেদের স্থান করে নিচ্ছে। হঠাৎ পিয়েরেত্‌স মাথাটা নামিয়ে নিল।

'তুমি তাহলে কথাটা বুঝেছ, অপদার্থ কোথাকার! অথচ তবু তুমি সোভিয়েত গভর্নমেন্টের নামে খোঁচা দিতে ছাড় না। তুমি বোকা, সত্যিই হাঁদারাম!'

কথাগুলো বলে পাইওনিয়র-রুমের দিকে পা চালাবার উদ্যোগ করলুম। কিন্তু একখানা হাত ছড়িয়ে দিয়ে পিয়েরেত্‌স আমার পথ আটকাল। বলল:

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমারে হাঁদারাম বলেন, যা পরান চায় বলেন!.. তো তাতে হল্য কী?'

'তো তাই তোমার মুখের দিকে আমি এক-নজর ঠাহর করে দেখলুম। আমি জানতে চাইছিলুম সত্যি-সত্যিই তুমি বোকা কিনা।'

'তা জানতি পারল্যেন তো?'

'হ্যাঁ, জানতে পেরেছি।'

'কী জেন্যেছেন?'

'যাও, গিয়ে আয়নায় নিজের মুখখানা দ্যাখো। তাহলে নিজেই জানতে পারবে।'

অতঃপর পিয়েরেত্‌সের ভাবাবেগের আর কী অভিব্যক্তি ঘটল তা দেখার জন্যে অপেক্ষা না-করে আমি ঘরে চলে গেলুম।

কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের মুখগুলোর সঙ্গে আরও খানিকটা পরিচিত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমি সেইসব মুখে অভিব্যক্তির কিছু-কিছু পরিবর্তন আবিষ্কার করতে সমর্থ হলুম। দেখলুম ওদের মধ্যে অনেকগুলো মুখই আমার দিকে খোলাখুলি সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছে, আমাকে দেখলেই মুখগুলো জ্বলজ্বল করে উঠছে সারল্য ও অপ্রতিভতায় মেশামেশি সেই নয়নানন্দদায়ক হাসিতে। অমন হাসি একমাত্র রাস্তার অনাথ ছেলেদের মুখেই দেখা যায়। ইতিমধ্যে আমি বহু ছেলেকেই নামে চিনে ফেলেছিলুম এবং কারো-কারো গলার আওয়াজ শুনেই ছেলেটা যে কে তা ঠাহর করতে পারছিলুম।

দীর্ঘদিনের জমানো ধুলো-ময়লাতেও যা চাপা পড়ে নি সেই গোলাপি গাল আর চোখের চারপাশের মাংসপেশীর সূক্ষ্ম নড়াচড়া নিয়ে বোঁচা নাকু ভলোদিয়া জোরেনকে দেখতে পেতুম প্রায়ই সে আমার পায়ে-পায়ে ঘুরছে। ছেলেটার বয়স ছিল তেরো বছর, হাতদুটো সর্বদাই সে পেছনে মুড়ে রাখত, কথা বলত কম, তবে হেসে যেত অনবরত। কালো-কালো, ওলটানো চোখের পাতাসহ বাচ্চাটাকে দেখতে লাগত সুন্দর। কখনও-কখনও ধীরেসুস্থে চোখের পাতাদুটো তুলে কালো-কালো মনিদুটোয় কোন এক অতল গভীর থেকে যেন ছড়িয়ে দিত অপরূপ এক দ্যুতি, তারপর মাথাটা পেছনে হেলিয়ে কোনো কথা না-বলে শুধু মুখ টিপে হাসত।

আমি অনেক সময় তাকে অনুনয় করে বলতুম, 'যা হোক কিছু বল, জোরেন। তোমার গলার আওয়াজটা যে কেমন তা জানতে পারলে ভারি ভালো লাগত!'

শুনে লজ্জায় লাল হয়ে উঠে কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েই সরে যেতে-যেতে সে ধরা-ধরা ফ্যাঁসফেঁসে গলায় টেনে-টেনে বলত:

'তা-তা-তা...'

ভলোদিয়ার এক বন্ধু ছিল ভলোদিয়ার মতোই গোলাপি রঙ, চাঁদা-মুখো আর ওর মতো সুন্দর দেখতে। নাম ছিল তার মিত্‌কা নিসিনভ। ছলাকলাহীন, নিরীহ ভালোমানুষ ছিল সে। পুরনো রাজত্বের আমলে অমনধারা ছেলেপিলেদের বানানো হোত মুচির শিক্ষানবিশ আর সরাইখানার বেয়ারা। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে প্রায়ই আমি ভাবতুম: 'মিত্‌কা, ওরে মিত্‌কা, তোকে আমরা কী বানাব বল্‌ দেখি? সোভিয়েত পটভূমিতে তোর জীবনটাকে কীভাবে পুনর্গঠিত করা যাবে?'

ভলোদিয়ার মতো মিত্‌কাও লাল হয়ে উঠে সামনে থেকে সরে যেত। তবে সে ধরাগলায় ফিস্‌ফিসিয়ে কথা বলত না, কেবল তার সোজা-সোজা কালো ভুরুদুটোকে কুঁচকে ঠোঁটদুটো নিঃশব্দে নাড়তে থাকত। আমি কিন্তু মিত্‌কার গলার আওয়াজ শুনে ফেলেছিলুম — সে আওয়াজ ছিল গভীর খাদের একেবারে মেয়েলি গলা — শ্রুতিমধুর, মার্জিত আর কিছুটা-বা আবদেরে। আর সেই আওয়াজে মিশে থাকত মেয়েলি একটানা সুরের ওঠাপড়া আর থেকে-থেকে হঠাৎ-হঠাৎ তাতে নাইটিঙ্গেলের কূজনের গমক। মিত্‌কা যখন আমাকে কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের খবরাখবর জানাত, আমি তখন খুশিমনে ওর এই গলার আওয়াজ কান পেতে শুনতুম। ও বলত:

'ওই-যে একজনারে দেখতিছেন ওইদিকে — ওই-যে ছোটত্যেছে? আরে মোলো যা, হুড়পাড় কর্যে ও যাতিছে কনে? ভলোদিয়া, দ্যাখ্‌, দ্যাখ! ও হল্য গিয়ে বুরিয়াক!.. কী? বুরিয়াকেরে চিনেন না? ও তিরিশ গেলাস দুধ চোঁ-চোঁ কর্যে মার্যে দিতি পারে এককে বারে... ও এখন যাতিছে গোয়ালঘরে... আর ওই-যে অরে দেখতিছেন — ও হল্য গিয়ে ইন্দুর — ওই-যে জানলা দিয়ি মুখ বারি কর্যে দেখতিছে — ওঃ, ওইডা এট্টা আস্ত ইন্দুর! ছোঁড়াডা এমন এট্টা মোসাহেব, আপনে ধারণা করতি পারব্যেন না, একবারে তেলপানা পিছল ওই ছোঁড়া। আমি বাজি রাখ্যে কতি পারি, ও নিঘ্‌ঘাত আপনেরেও তেল দিতি শুরু কর্যেছে!'

'ওইডা ভান্‌কা জাইচেঙ্কো,' অসন্তুষ্টভাবে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে জোরেন বলল। তারপর আচমকা লাল হয়ে উঠল।

মিত্‌কা ছিল ভারি ধূর্ত বাচ্চা। জোরেন এরকম মুখ ফসকে মনের ভাব প্রকাশ করে বসায় ও কিছুটা লজ্জিতই হল। বন্ধুর ছলাকলার অভাবের জন্যে চোখের দৃষ্টিতে ও যেন ক্ষমা চাইল বলে মনে হল।

মুখে বলল, 'আরে, না-না! আমি ভান্‌কার কথা ভাব্যে বলি নাই! ও ওয়ার নিজির নাইনে চলে।'

'তা, ওর লাইনটা কী?'

'ওয়ার নাইন হল্য...'

কিছুটা ইতস্তত করতে লাগল মিত্‌কা। পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটিতে কিছু একটা আঁকতে শুরু করল।

'কী? বলে ফ্যালো!'

'কওয়ার মতন তেমন কিছু না। যে-মুহূর্ত্তে ভান্‌কা কলোনিতি এয়্যেল সেই মুহূর্ত্ত থ্যেকেই ও দল পাকাতি শুরু করল্য। তাই না রে, ভলোদিয়া? তা, ওয়ারা দলভারে মারল্য পয্যন্ত, তবু তারা নিজির তালে ঘুরতি লাগল্য...'

নিসিনভের গভীর দার্শনিক তত্ত্বকথা পরিষ্কার বুঝে ফেলেছিলুম আমি। ওর সেই দর্শন যে কী বস্তু তা আমাদের পণ্ডিতপ্রবররা স্বপ্নেও ভাবতে পারবেন না।

কুরিয়াজে গোলাপি গালওয়ালা ছেলেপিলে ছিল অনেক। তাদের কেউ-কেউ ছিল সুদর্শন, কেউ-কেউ ততটা সুদর্শন নয়, কিন্তু নিজস্ব 'লাইন'-এর অধিকারী হওয়ার মতো সৌভাগ্য ছিল না আর কারো। তখনও-পর্যন্ত-শত্রুভাবাপন্ন, গোমড়া-মুখো, সদা-সন্দিহান বাচ্চা মুখগুলোর মধ্যে ক্রমশ বেশি-বেশি করে এমন সব বাচ্চা আমার চোখে পড়তে লাগল অন্যের ছকে-দেয়া বাঁধা লাইনে জীবন যাদের হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চলেছিল। পুরনো আমলের বিচারে অবশ্য এটা — এই তথাকথিত পরনির্ভর জীবন — একেবারেই একটা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল।

আর তাই জোরেন আর নিসিনভ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোমশ সোব্‌চিয়েঙ্কো, বিষণ্ন আর গম্ভীর ভাসিয়া গার্দিনভ, কাল্‌চে-মুখ শান্ত সের্গেই খুরাব্‌রিয়েঙ্কো মুখে করুণ হাসি ফুটিয়ে আর ভুরুগুলো কুঁচকে ঘুরতে লাগল আমার পিছু-পিছু, তবু সরাসরি আমার পক্ষে এসে ভিড়ে যেতে পারল না। নতুন জীবনের লাইন-বরাবর সাহসের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে-পড়া ভানিয়া জাইচেঙ্কো ও তার দলটাকে এরা কাতরভাবে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখত, অথচ নিজেরা অপেক্ষা করে থাকা ছাড়া আর কিছুই করে উঠতে পারছিল না...

প্রত্যেকেই ওরা অপেক্ষা করছিল। ব্যাপারটা যেমন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, তেমনই বোঝার পক্ষেও ছিল সহজ। ওরা অপেক্ষায় ছিল গোর্কিপন্থীদেব

আসার। গোর্কিপন্থী — না জানি কী রহস্যময় অশরীরী, কী দুর্বোধ, কী অননুভবনীয় অথচ আকর্ষণীয়! ওদের আগমন কি বিপর্যয় ঘটাবে, নাকি আনন্দের কারক হবে — তা জানা নেই, তবু প্রতিটি ঘণ্টা সেই আগমনকে নিকটবর্তী করে তুলছিল। এমন কি কুরিয়াজের মেয়েদের মধ্যেও প্রতিটি দিন বয়ে নিয়ে আসছিল কিছু-না-কিছু নতুন আর আনন্দময় ব্যাপার। কর্মোদ্দীপনায় টগবগ করে ফুটতে-ফুটতে ওল্‌গা লানভা ইতিমধ্যেই তার বাহিনী বা ষষ্ঠ বাহিনীটি গঠন করে ফেলেছিল। বাহিনীটি তার বাসস্থল বা এজমালি শোবার ঘরে ভিড় জমিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল কাপড়চোপড় রিফু করায় আর কাচাকুচিতে, ঘর চুনকাম করায়, এমন কি এক সন্ধেয় গানের তালিম নেয়ায় পর্যন্ত। আর ব্যস্তসমস্তভাবে সর্বদাই ছুটোছুটি করছিলেন গুলিয়ায়েভা, আর তাঁর দোমড়ানো-মোচড়ানো বিস্রস্ত ব্লাউজটা আমার কাছ থেকে লুকোবার চেষ্টা করতে-করতে থেকে-থেকে ছুটে এজমালি ঘরখানায় ঢুকছিলেন। সন্ধেগুলোয় কুদ্‌লাতি প্রায়ই গিয়ে মেয়েদের ঘরে অতিথি হোত আর খোলাখুলিই মেয়েদের রক্ষা করার ব্যাপারে উৎসাহ দেখাত। তবে মেয়েদের ওই ষষ্ঠ বাহিনী মাঠে কাজ করতে যেত না, কুরিয়াজের ঐতিহ্যের এত বড় একটা অবমাননার ফলে সংঘটিত বিস্ফোরণের নিচে পাছে সে চাপা পড়ে এই ভয়ে।

কোরত্‌কভও অপেক্ষা করছিল। ও ছিল কুরিয়াজের ঐতিহ্যের প্রধান ধারক-বাহক। চমৎকার কূটনীতিক ছিল ছেলেটা। কথা, কাজ কিংবা ধরনধারণ কোনো দিক থেকেই ও কিন্তু ভুল পথে পা বাড়াত না। অন্যদের থেকে ওকে বেশি করে দোষী সাব্যস্ত করার উপায় ছিল না — অন্যেরা যেমন ও-ও তেমনি কাজ করতে যেত না, এইমাত্র। কিন্তু আমাদের অগ্রবর্তী মিশ্র বাহিনী ওর বিরুদ্ধে আক্রোশে ফুঁসছিল, আমাদের ছেলেরা ঘেন্না করত ওকে এবং তারা সন্দেহাতীত রকমে দৃঢ়নিশ্চিত ছিল যে কুরিয়াজে আমাদের প্রধান শত্রু বলতে ছিল এই কোরত্‌কভ।

পরে আমি জেনেছিলুম যে ভোলখভ, গোর্‌কভ্‌স্কি আর জোর্‌কা ভোল্‌কভ ছোট্ট একটু শলা-পরামর্শের মধ্যে দিয়ে এই অবস্থার অবসান ঘটাবার প্রয়াস পেয়েছিল। তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে পুকুরপাড়ে তারা ডেকে পাঠিয়েছিল কোরত্‌কভকে, তারপর তাকে পরামর্শ দিয়েছিল যেন সে নিজে থেকেই কলোনি ছেড়ে চলে যায়। বলেছিল, যেখানে তার খুশি

চলে যাক সে। কিন্তু কোরত্‌কভ এই পরামর্শে কর্ণপাত করে নি, খালি বলেছিল:

'এখ্‌নি আমার চলি যাওয়ার কোনো প্রেয়োজন নাই। যেখেনে আছি সেইখেনেই থাকব্য আমি।'

ফলে শলা-পরামর্শের ইতি ঘটেছিল ওইখানেই। কোরত্‌কভ তখনও পর্যন্ত আমার সঙ্গে বিশেষ কিছু কথাবার্তা বলে নি এবং আমার ব্যক্তিত্ব নিয়ে কোনো ধরনেরই কোনো ঔৎসুক্য প্রকাশ করে নি। পথের মধ্যে যখনই আমাদের দেখা হয়ে গেছে তখনই ও মাথার কেতাদুরস্ত হালকারঙের টুপিটা বিনীতভাবে তুলে সহৃদয়, গমগমে পুরুষালি গলায় এই বলে অভিবাদন জ্যানয়েছে:

'কী খবর, কেমন আছেন, কমরেড ডিরেক্টর!'

আর যখনই ওর সুদর্শন মুখখানা সুকুমার পাতার ঝালরে-মোড়া কালো-কালো চোখদুটো তুলে আমার দিকে সৌজন্য-সহকারে তাকিয়েছে তখনই আমি নির্ভুলভাবে ওর চোখে এই অব্যক্ত কথাগুলো পড়েছি:

'বোঝলেন তো, আমাদেরে একে অপরের পথে পাড়া দিবার দরকারডা কী! আপনে আপনের পথে থাকেন, আমি থাকি আমার পথে। নমস্কার, কমরেড ডিরেক্টর!'

কিন্তু পিয়েরেত্‌সের সঙ্গে আমার সেদিন সন্ধেবেলার সেই কথাবার্তার পরদিন সকালবেলার জলখাবারের সময় কোরত্‌কভ হঠাৎ রান্নাঘরের জানলার ফোকরটার পাশে আমার কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। আমি যখন কী একটা ব্যাপারে একটা কী নির্দেশ দিচ্ছিলুম তখন সে বিবেচনা দেখিয়ে একটুখানি সরেও দাঁড়াল। পরে হঠাৎ আমাকে বলল:

'কিছু মনে করব্যেন না, কমরেড ডিরেক্টর। আচ্ছা, গোর্কি কলোনিতি কি হাজত আছে?'

'না, হাজত নেই,' একই রকম গাম্ভীর্য নিয়ে আমি জবাব দিলুম।

আমি যেন কিছু-একটা দর্শনীয় বস্তু এইভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে সে ফের শান্তভাবে বলল:

'কিন্তু লোকে যে কয় আপনে নাকি ছেল্যাপেলাদেরে গ্রেপ্তার করি রাখেন।'

'তাতে ব্যক্তিগতভাবে তোমার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই,' নীরসভাবে আমি ওকে আশ্বস্ত করে বললুম। 'আমি কেবল আমার বন্ধুদেরই গ্রেপ্তার করে

থাকি।' কথাটা বলেই সঙ্গে সঙ্গে আমি সেখান থেকে অন্যত্র চলে গেলুম, ওর মুখের আলোছায়ার সূক্ষ্ম খেলার দিকে আর কিছুমাত্র মনোযোগ দিলুম না।

পনেরো মে তারিখে আমার হাতে একখানা টেলিগ্রাম এসে পেঁছিল:

'আগামী কাল সন্ধ্যায় সবাই ট্রেনে রওনা হচ্ছি। লাপত।'

রাত্রে খাবার সময় টেলিগ্রামের খবরটা সবাইকে জানিয়ে দিলুম। সেইসঙ্গে বললুম:

'আগামী পরশু কমরেডদের সঙ্গে আমাদের দেখা হচ্ছে। আমি খুবই চাই, খুব বেশিরকমই চাই যে তাদের আমরা সবাই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করি। বুঝেছ তো, এখন থেকে আমরা সবাই মিলেমিশে একত্র থাকব, একত্র... কাজ করব।'

মেয়েরা হঠাৎ সবাই চুপচাপ হয়ে গেল, ঝড় ওঠার আগে পাখিদের মতো। নানা ধরনের যতসব বাচ্চা ছেলে তেরছা চোখে তাদের সাথীদের দিকে তাকাতে লাগল। কিছু-কিছু মুখে হাঁ-মুখের গর্তটা বেশ খানিকটা বড়সড় হয়ে দেখা দিল আর গোটা একটা সেকেন্ড রয়েও গেল ওইভাবে।

খাবারঘরের জানলার কাছের কোণটায় কোনো বেঞ্চি ছিল না, টেবিল ঘিরে সেখানে ছিল কয়েকখানা চেয়ার। কোরত্‌কভ আর তার বন্ধুরা সেখানে বসে হঠাৎ অতিরিক্তরকম খুশিতে মেতে উঠল। সজোরে হাসতে লাগল তারা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হল তারা নিজেদের মধ্যে কোনোরকম রঙ্গরসিকতা করছে।

ওইদিন রাত্রে আমাদের অগ্রবর্তী মিশ্র বাহিনী গোর্কিপন্থীদের কুরিয়াজে সংবর্ধনা জানানোর ব্যাপারটা নিয়ে খুঁটিনাটি আলোচনায় বসল। আমাদের কম্‌সমোল কেন্দ্র এ-সম্পর্কে যে-বিশেষ ঘোষণাপত্রটি প্রকাশ করেছিল তার প্রতিটি দফা বক্তব্য নিয়েও আলোচনা হল। আর কুদ্‌লাতির হাতখানা অন্যান্য দিনের চেয়ে আরও ঘনঘন মাথার পেছনদিকে পাড়ি জমাতে লাগল।

'বুঝলি, আমাদের ছেলেরা এখেনে আসতেছে এটা ভাবতিই কেমন যেন লজ্জা করতিছে।'

এমন সময় আস্তে-আস্তে ঘরের দরজাটা একটুখানি ফাঁক হল আর সেই ফাঁক দিয়ে জোর্‌কা ভোল্‌কভ কষ্টেসৃষ্টে ঠেসেঠুসে নিজের দেহটা ঘরের মধ্যে ঢোকাল। একটা টেবিল আঁকড়ে ধরে সে কোনোমতে নিজেকে একটা

বেঞ্চের ওপর বসাল, তারপর মাত্র একটা চোখ মেলে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। চোখ তো নয়, মনে হল ফোলা-ফোলা নীলচে একটা মাংসের ঢিবির মধ্যে সরুমতো চেরা একটা গর্ত।

'কী রে, কী হল?'

'ওরা আমারে কষে প্যাঁদানি দেছে,' ফিস্‌ফিস করে বলল জোর্‌কা।

'কারা করল এ-কাজ?'

'ভগা জানে কে যে করল! জনা-কয়েক মুজিক হবে... ইস্টিশান থেকে ফিরে আসতেছিলাম... তা, চৌরাস্তার মোড়ে ওরা আমারে ছাঁক্যে ধরল... তাম্পর প্যাঁদানি দিল...'

'দাঁড়া, একমিনিট!' ভোলখভ চেঁচিয়ে বলল। 'খালি তো বলতেছিস প্যাঁদানি দিল আর প্যাঁদানি দিল! প্যাঁদানি যে দেছে সে তো আমরা নিজিরাই দেখতে পাচ্ছি!.. কিন্তু ব্যাপারখান কী ঘটেছেল? কোনো কথাবাত্তা হয়েছিল, নাকি? কীভাবে শুরু হল, ক' দেখি?'

বিষণ্ণ একটা মুখভঙ্গি করে জোর্‌কা জবাব দিল, 'বিশেষ কিছু কথাবাত্তা হয় নাই। ওদের একজনা খালি বলল: 'এই-যে কম্‌সমোল!.' আর তাম্পরই আমার থুতনিতে একখান ঘুসো ঝাড়ল।'

'তারপর? তুই কী করলি?'

'সে আর বলতি? আমিও তারে একখান ঘুসো ঝাড়লাম কিন্তু ওদের দলে লোক ছিল চারজনা।'

'তারপর? তুই কি পলালি নাকি?' ভোলখভ শুধোল।

'না, পলাই নাই,' জবাব দিল জোর্‌কা।

'তাইলে কী করলি তারপর?'

'দেখতি পাচ্ছিস না? আমি তো এখনও চৌরাস্তার মোড়ে রয়ে গেছি।'

শুনে জাপরোজিয়ে'র কসাকদের আকাশপাতাল কাঁপানো অট্টহাসিতে* ফেটে পড়ল ছেলেরা। তবে ভোলখভ তার বন্ধুর যন্ত্রণাক্লিষ্ট হাসির দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল।

* সম্ভবত মাকারেঙ্কো এখানে শিল্পী রেপিনের আঁকা জাপরোজিয়ে কসাকদের খ্যাত ছবিটির ইঙ্গিত করছেন। — অনুঃ

৭

তিন শো তিয়াত্তর নম্বর 'স্পেশ্যাল'

এগিয়ে গিয়ে গোর্কিপন্থীদের কুরিয়াজে নিয়ে আসতে সতেরোই তারিখ ভোরবেলা আমি গিয়ে উপস্থিত হলুম খারকভ থেকে তিরিশ কিলোমিটার দূরের লুবোতিন স্টেশনে। নোংরা দৈন্যদশাগ্রস্ত স্টেশন-প্ল্যাটফর্মটায় তখনই বেশ গরম লাগছিল। দীর্ঘ পথযাত্রায় স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবে বিপর্যস্ত কৃষক-যাত্রীরা প্ল্যাটফর্মের এমুড়ো থেকে ওমুড়ো নির্জীবভাবে হাঁটাচলা করে বেড়াচ্ছিল। আর তেলকালিমাখা মালবওয়া-মজুররা ঢিলেঢালাভাবে ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছিল ভারি বুটের মচমচ আওয়াজ তুলে। আমার মনটাকে আমি-যে সাটিনের তৈরি পোশাকে সাজিয়ে নিয়ে এসেছি আর সেটা-যে বেখাপ্পা ঠেকছে তা প্রমাণ করার জন্যে মনে হচ্ছিল সবকিছু যেন জোট বেঁধেছে। কিংবা কে জানে, পোশাকটা হয়তো সাটিনের ছিল না, হয়তো ছিল সত্যি-সত্যিই নিছক 'তেকোনা টুপি আর ফৌজী ওভারকোটমাত্র'।

দিনটা ছিল বিরাট আর নির্ধারক এক লড়াইয়ের দিন। জবুস্থবু ওই-যে বুড়ো মুটে আমাকে অসতর্কভাবে ধাক্কা দিয়ে চলে গেল আর তার এই কাজে মর্মাহত হওয়া দূরে থাক আমায় এমন কি লক্ষ্যই-যে করল না তাতে কী! স্টেশনমাস্টার আমায়-যে যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা দেখাল না তাই নয়, তিন শো তিয়াত্তর নম্বর 'স্পেশ্যাল' ট্রেনটার বর্তমান হালচাল সম্পর্কে আমার প্রশ্নের উত্তরে সে-যে অভদ্রভাবে খেঁকিয়ে উঠল পর্যন্ত তাতেই-বা কী! এইসব হালকা চরিত্রের লোকজন ভান করছিল যেন তারা জানে না যে তিন শো তিয়াত্তর নম্বর 'স্পেশ্যাল' ট্রেনটা আমার প্রধান বাহিনীকে বয়ে নিয়ে আসছে, বয়ে নিয়ে আসছে মার্শাল কভাল আর মার্শাল লাপতের নেতৃত্বাধীন মহিমান্বিত সেনাবাহিনীকে, যেন ওরা জানে না যে লুবোতিন স্টেশনটা ওইদিন আমার কুরিয়াজ আক্রমণের প্রস্তুতির বা সৈন্য-সমাবেশের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াতে যাচ্ছে! উপরোক্ত ওইসব লোকজনকে আমি কেমন করে বোঝাতুম, কিসের দোহাই পেড়ে বোঝাতে পারতুম যে আমার ওইদিনকার ঝুঁকিটা ছিল কোনো-এক অস্টারলিত্‌সের কিংবা অন্য কোনো রণক্ষেত্রের ঝুঁকির চেয়ে অনেকগুণে বড় আর অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ? স্বয়ং নাপোলেয়র গৌরবসূর্যও আমার

'ওইদিনকার মহিমাকে ম্লান করে দিতে সক্ষম ছিল না। নাপোলেয়ঁ'র পক্ষে আমার চেয়ে অনেক সহজ ছিল যুদ্ধ পরিচালনা করা। নাপোলেয়ঁ যদি আমার মতো 'সামাজিক শিক্ষা'র নিয়মাবলীতে বাঁধা থাকতেন তাহলে তিনি-যে কী রকম লড়াই করতেন তা দেখার সাধ জাগে আমার মাঝে-মাঝে!

প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে-করতে আর যেদিকে কুরিয়াজ দিগন্তের সেই দিকটায় থেকে-থেকে তাকাতে-তাকাতে হঠাৎ আমার মনে পড়ল যে ওইদিন শত্রুপক্ষ তাদের আত্মিক দুর্বলতার কিছু-কিছু লক্ষণ প্রকাশ করে ফেলেছিল।

সেদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠা সত্ত্বেও তখনই কলোনিতে লোকজনের চলাফেরার আওয়াজ পাচ্ছিলুম। যে-কোনো কারণেই হোক পাইওনিয়র-রুমের জানলাগুলোর কাছে সেদিন প্রচুর ছেলেকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম। এছাড়া আরও বহু ছেলে দেখলুম বালতির ঝনঝন আওয়াজ তুলে টিলার ঢাল বেয়ে সর্বরোগহর 'অলৌকিক' ঝর্ণাটায় নেমে যাচ্ছে। জোরেন আর নিসিনভকে দেখলুম সিংদরজার ঘণ্টাঘরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে তারা।

আমায় দেখে মিত্‌কা গম্ভীরভাবে শুধিয়েছিল, 'গোর্কিপন্থীরা আসতিছে কখন? আজ সকালেই?'

'হ্যাঁ। তা, তোমরা-যে আজ বড় ভোর-ভোর উঠে পড়েছ!'

'উঁ? হুঁ... কেন জানি ঘুমাত্যে ইচ্ছা হল্য না... ওয়ারা কি রিজোভ হয়ি আসতিছে?'

'হ্যাঁ। তবে তোমরা এখানেই তাদের অভ্যর্থনা জানাবে।'

'শিগ্‌গিরি আসতিছে নাকি ওয়ারা?'

'তা, তোমরা হাতমুখ ধোবার সময় পাবে।'

'মিত্‌কা, চলি আয়!' বলেই জোরেন তাড়াতাড়ি চলে গেল। সম্ভবত আমার পরামর্শটা কাজে পরিণত করতেই।

যাবার আগে গরোভিচকে আমি বলে গিয়েছিলুম যে গোর্কিপন্থীরা এসে পৌঁছুলে কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের উঠোনে সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে ও পতাকা অভিবাদন করিয়ে যেন গোর্কিপন্থীদের অভ্যর্থনা জানানো হয়। তবে এ-ও বলেছিলুম এ-নিয়ে যেন বিশেষ কোনো জোরাজুরি না করা হয়।

'ওদের শুধু অনুরোধ জানিও, এইমাত্র।'

অবশেষে স্টেশন-গার্ডের রূপ ধরে জবুস্থবু চেহারার এক সদাশয় ব্যক্তি লুবোতিন স্টেশনের দুর্গসদৃশ গোলকধাঁধার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে একটা

ঘণ্টায় ঘা দিল। ঘণ্টা বাজানোর পর লোকটি আমার কাছে তার এই প্রতীকী কাজের রহস্য উদ্‌ঘাটন করল এই বলে:

'তিন শো তিয়াত্তর নম্বর 'স্পেশ্যাল' সিগ্‌ন্যাল দেছে। গাড়িটা বিশ মিনিটের ভিত্‌রি এসি পড়ব্যে।'

কিন্তু গোর্কিপন্থীদের অভ্যর্থনার আগে-থেকে-ছকে-রাখা পরিকল্পনাটা অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ জটিল হয়ে উঠল আর ওই মুহূর্তটি থেকে সবকিছুই কেমন তালগোল-পাকানো আর ছেলেমানুষি আমোদ-আহ্লাদের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। ব্যাপারটা হল এই যে তিন শো তিয়াত্তর নম্বর 'স্পেশ্যাল' ট্রেনটি এসে পৌঁছনোর আগেই শহরতলিগামী একখানা লোকাল ট্রেন প্ল্যাটফর্মে এসে ঢুকল আর সেই ট্রেনের কামরা থেকে আমাদের 'রাব্‌ফাক' কম্‌সমোল-এর ছাত্রছাত্রীদের প্রাণমাতানো একটা স্রোত বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। তাদের মধ্যে বেলুখিনের হাতে ছিল একগোছা ফুল। সে বলল:

'ফুল এনেছি পঞ্চম বাহিনীরে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যি — ওরা যেন সব বড়ঘরের জেনানা, ভাবখানা এই আর-কি। তা, আমার মতন বুড়োয় ওদেরে অভ্যর্থনা জানালি দোষ নাই।'

ভিড়ের মধ্যে থেকে সোনালি-চুলো অক্‌সানার আনন্দে গদ্‌গদ চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলুম। হঠাৎ আমার নজরে পড়ল সূর্যালোকে ঝলমল রাখিলের অবিচল শান্ত হাসিটি। হাতে যেন ঘোড়ার চাবুক ধরা আছে এইভাবে হাতদুটো দোলাতে-দোলাতে ব্রাত্‌চেঙ্কো চেঁচাচ্ছিল, তবে বিশেষ কারোকে যে উদ্দেশ করে তা নয়। বলছিল:

'হো-হো! আমি এখন স্বাধীন কসাক! 'মলাদিয়েত্‌স'-এর পিঠে চড়তে হবে আজ!'

এমন সময় কে যেন চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে ছুটে এসে খবর দিল:

'ট্রেন এসে গেছে বহুক্ষণ আগে!.. গাড়িখান দশ নম্বর লাইনে দাঁড়িয়ে আছে...'

'যাঃ — সত্যি?'

'বললাম তো, গাড়ি আছে দশ নম্বর লাইনে!.. স্টেশনে এসে গেছে বহুক্ষণ আগে!..'

এই নতুন খবরের থমকে-দেয়া আঘাত থেকে আমরা তখনও সামলে উঠেছি কিনা সন্দেহ, এমন সময় তিন নম্বর লাইনে একখানা মালগাড়ির নিচে থেকে

লাপতের দুষ্টুমি-ভরা মুখখানাকে দেখা গেল। ফোলা-ফোলা চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে ও তখন আমাদের দলটার দিকে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে তাকিয়ে ছিল।

কারাবানভ দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, দ্যাখেন-দ্যাখেন, মালগাড়ির নিচে কিলবিল করছে ওটা কে — লাপত-না!'

সঙ্গে সঙ্গে গোটা দলটা ওকে লক্ষ্য করে ছুটল। কিন্তু ও ট্রাকের নিচে সেঁধিয়ে গিয়ে গম্ভীরভাবে জানাল.

'একে-একে আস! একে-একে আস! তবে মনে রেখো — আমি শুধু অক্সানা আর রাখিলরেই চুমা দেব, বাকি সবার জন্যি হাতে হাতঝাঁকানিই যথেষ্ট।'

কারাবানভ পা চেপে ধরে লাপতকে টেনে মালগাড়ির নিচে থেকে বের করল। লাপতের জুতোছাড়া খালিপায়ের পাতাদুটো হাওয়ায় কেঁপে-কেঁপে উঠছিল।

'ঠিক আছে, যা চলে! তোরা আমারে চুমা দিতি পারিস,' বলে লাপত মাটিতে বসে পড়ে তার বসন্তের দাগওয়ালা গালটা বাড়িয়ে দিল।

অক্সানা আর রাখিল সত্যি-সত্যিই আনুষ্ঠানিক চুম্বনের রীতি যথাযথভাবে পালন করল আর বাকিরা মালগাড়ির নিচ দিয়ে লাইন পেরিয়ে ওদিকে ছুটল।

অনেকক্ষণ আমার হাত ধরে ঝাঁকাল লাপত। ওর মধ্যে সচরাচর যেমনটা দেখা যেত না সেইরকম একটা আন্তরিক, সহজ আনন্দে মুখখানা ওর ঝলমল করছিল।

'ট্রেনে আসতে কষ্ট হয় নি তো?'

'নাঃ। মেলা দেখতি যাওয়ার মতন আনন্দে এসেছি,' বলল লাপত। 'কেবল 'মলদিয়েত্‌স' দুষ্টামি করতেছিল। মালগাড়ির কামরায় সারারাত্র দাপাদাপি করেছে ও। কামরা-টামরা ভাঙ্যে একদম চুরচুর হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদেরে আর কতক্ষণ এখেনে থাকতি হবে? আমি ছোঁড়াদেরে সব তৈরি থাকতে কয়েছি। যদি আমাদেরে বেশিক্ষণ এখেনে থাকতি হয় তাইলে হাতমুখ ধুয়েটুয়ে নিলি মন্দ হয় না...'

'যাও। ব্যাপারটা একবার খোঁজ করে দ্যাখো দেখি!'

লাপত স্টেশন-বাড়িটার দিকে দৌড় লাগাল আর আমি দ্রুত পা চালালুম ট্রেনের দিকে। ট্রেনটায় ছিল পঁয়তাল্লিশখানা কামরা। কামরাগুলোর হাট-

করে-খোলা দরজা আর ওপরদিকের বাতাস-চলাচলের ফাঁকগ্লোর মধ্যে দিয়ে ঝাঁক-ঝাঁক গোর্কিপন্থী আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, হাসছিল, চেঁচাচ্ছিল আর টুপি নাড়ছিল। কাছাকাছির একটা কামরার হাওয়া-চলাচলের গর্ত দিয়ে প্রায় কোমর পর্যন্ত দেহখানাকে হিঁচড়ে বের করে এনে আবেগে চোখদ্টো পিটপিট করতে-করতে গ্ত্ গাঁক-গাঁক করে বললে:

'আস্তন সেমিওর্নভিচ. অ আস্তন সেমিওনভিচ, কন দেখি — এয়া কি ঠিক? না, এয়া ঠিক না। এয়া কি আইনসম্মত? না, এয়া আইন-সম্মত না।'

'এই-যে গ্ত্। তা, তোমার আপত্তিটা কী নিয়ে বল দেখি?'

'ওই শয়তান লাপতটা! ও কয়েছে, বিউগ্লে সংকেত বাজানোর আগে যে ট্রেন থেকে নামবে তার মাথা কাট্যে ফেলা হবে। তা, আপনে তাড়াতাড়ি আমাদের ভার নেন দেখি, লাপত আমাদেরে জ্বালাতন করে মারতেছে! ও আমাদের দলপতি হয় কী করে? ও তো হতি পারে না, পারে কী?'

লাপত ইতিমধ্যে কখন আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। সে এখন গ্তের বলার ভঙ্গি নকল করে একই স্রে বলল:

'বিউগ্ল-সংকেত বাজবার আগে একবার তুই ট্রেন থেকে নামবার চেষ্টা করে দ্যাখ্-না! দ্যাখ্-না, দ্যাখ্ একবার! তুই কি মনে করিস যে তোর মতন ম্খফোড় ভিতুগ্লারে শায়েস্তা করতি আমার খ্ব মজা লাগে, নাকি? যা-না, যা, ট্রেন থেকে নাম্-না!'

'তুই কি ভাবতেছিস ট্রেন থ্যেকে নামার জন্যি পেরানটা আমার বাইরিয়ে যেতেছে!' গ্ত্ এবার কর্ণস্রে বললে। 'আমি এখেনে দিব্যি ভালো আছি। তবে কিনা এয়া হল গিয়ে নীতির কথা, তাই বলতেছিলাম।'

'এই তো সোজা পথে এসেছিস,' লাপত বলল। 'তা, সিনেন্‌কিরে একবার ডাক দেখি!'

একমিনিট পরে সিনেন্‌কির বাচ্চা-বাচ্চা মিষ্টি ম্খখানা গ্তের কাঁধের পেছন থেকে দেখা দিল। সদ্য-ঘ্মভাঙা চোখদ্টো অবাক বিস্ময়ে পিটপিট করতে-করতে আর নরম-নরম লাল ঠোঁটদ্টো কান-এঁটো-করা হাসিতে ছড়িয়ে সে বলে উঠল:

'আস্তন সেমিওনভিচ!..'

'বল্ 'কেমন আছেন', তা না। গাধা কোথাকার! বলি, ভদ্রতা-সভ্যতা তোর গেল কোন চুলায়?' ওকে ধমকে উঠল গ্ত্।

কিন্তু সিনেন্‌কি তখনও ঠায় তাকিয়ে আছে আমার দিকে, আর লাল হয়ে উঠে অপ্রস্তুতভাবে বিড়বিড় করে বলছে:

'আন্তন সেমিওনভিচ? এ কি সত্য? আপনে আন্তন সেমিওনভিচ তো? নাকি? না-না, সত্যই আপনে?'

হাতের মুঠো দিয়ে চোখদুটো রগড়ে নিল ও। তারপর হঠাৎ গুতের ওপর সত্যি-সত্যিই খেপে উঠল। বলল:

'তুমি না বলেছিলে সময় এলি আমারে ডাক্যে দিবে? ডাক্যে দিবে বলেছিলে-না?.. তুমি মোটেও দলপতি না, তুমি এট্টা যাচ্ছেতাই বুড়া গুত্‌! নিজি তো ঠিক উঠে বসে আছ দেখতেছি!.. তা, আমরা কি কুরিয়াজ পেঁছে গেছি? পেঁছেছি কি? এয়া কি কুরিয়াজ?'

লাপত হেসে বলল:

'এটা কুরিয়াজ না। এটা লুবোতিন ইস্টেশান। তা ওঠ্‌ দেখি, উঠে বিউগ্‌লের সংকেত বাজা।'

শুনে সিনেন্‌কি সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে উঠল। এতক্ষণে ও পুরোপুরি জেগে উঠেছিল। বলল:

'সংকেত বাজাব? ঠিক হ্যয়!'

পুরোপুরি জেগে উঠে এতক্ষণে সে আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল। তারপর স্নেহসিক্ত গলায় বলল:

'কেমন আছেন, আন্তন সেমিওনভিচ!' তারপর বিউগ্‌লটা পাড়তে শরীরটাকে হিঁচড়ে সিটের ওপর ওঠাল।

দু'সেকেন্ডের মধ্যে বিউগ্‌লটা বের করে এনে আমার দিকে তাকিয়ে আরও একবার দেবদূতসুলভ হাসি হেসে হাত দিয়ে নিজের ঠোঁটদুটো একবার মুছল ও। তারপর ভারি সুঠাম একটা ভঙ্গিতে বিউগ্‌লের মাউথপীসে ঠোঁটদুটো লাগাল। সঙ্গে সঙ্গে স্টেশন-চত্বর মুখরিত হয়ে উঠল আমাদের সেই পরিচিত নিদ্রাভঙ্গের বিউগ্‌ল-সংকেতে।

কলোনি-বাসিন্দারা সবাই লাফিয়ে এবার ট্রেনের কামরা থেকে নামল। আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লুম ঘুরে-ঘুরে সকলের সঙ্গে করমর্দন করায়। লাপত ইতিমধ্যেই ট্রেনের ছাদে গিয়ে উঠেছিল। সেখান থেকে আমাদের সবাইকে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে সে বলল:

'আজ তোরা এখেনে এসেছিস কী জন্যি? পিরিত জানানোর জন্যি?

তাইলে হাতমুখ ধুবি কখন সব, ট্রেনের কামরাই-বা সাফ করবি কখন? তোরা বোধহয় ভেবেছিস কামরাগুলা নোংরা করি ফেলে রেখে চুলার দোরে দিয়ি চলে যাব সবাই, তাই না? জল্‌দি, জল্‌দি কর্‌ সব, নইলে মজা টের পাওয়াব-নে! আর যে-যার নূতন শর্ট্‌স পরে নে। আজকের ডিউটিতে যে-দলপতি আছে সে কোথায়? অ্যাঁ?'

কাছাকাছি একটা ব্রেক-প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে এবার মুখ বাড়াল তারানেত্‌স। তার পরনে একজোড়া দোমড়ানো-মোচড়ানো, রঙ্‌চটা শর্ট্‌স ছাড়া আর কিছু ছিল না। আর খালি-হাতে কনুইয়ের ওপরে বাঁধা ছিল শুধু একটা নতুন লাল পট্টি।

'এই-যে আমি!'

'শৃঙ্খলা সম্বন্ধে এই বুঝি তোর ধারণা?' ওকে দেখে গর্জে উঠল লাপত। 'জল পাওয়া যাবে কোথায়? জানিস কিছু? আমরা এখেনে কতক্ষণ থাকব — তার খোঁজ রাখিস? জলখাবার তৈরি হবে কখন — তা জানিস? কী জানিস — বল দেখি আমারে!'

তারানেত্‌সও ট্রেনের ছাদে উঠে লাপতের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর একেকটা প্রশ্নের জবাব দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা করে আঙুল মটকে জানাল যে ট্রেনটা ওই স্টেশনে আরও চল্লিশ মিনিট থাকবে আর ছেলেমেয়েরা সামনের ওই টাওয়ারটার পাশে গিয়ে হাতমুখ ধুতে পারে। এছাড়া ফেদরেঙ্কো ইতিমধ্যেই জলখাবার তৈরি করে ফেলেছে, অতএব যখন খুশি সবাই খাওয়া শুরু করতে পারে।

এবার লাপত কলোনি-বাসিন্দাদের হেঁকে বললে, 'কী? কথাগুলা শুনলি তো সবাই? তা, শুনে থাকিস যদি তাইলে ওখেনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাঁ করে আকাশের তারা গুনতেছিস কেন?'

সঙ্গে সঙ্গে লুবোতিন স্টেশনের রেললাইনগুলো টপকে-টপকে সর্বত্র দাবড়ে বেড়াতে লাগল কলোনি-বাসিন্দাদের রোদে-পোড়া প্যাগুলো, রেল-গাড়ির কামরাগুলো সাফ করা চলতে লাগল গাছের ডালপালায়-তৈরি ঝাড়ু দিয়ে আর চতুর্থ মিশ্র প্রতিটি কামরার সামনে গিয়ে সেই জঞ্জাল সংগ্রহ করতে শুরু করল। এদিকে ভের্‌শ্‌নেভ আর অসাদ্‌চি ট্রেনের একেবারে শেষের কামরা থেকে তখনও-পর্যন্ত-ঘুমন্ত কভালকে তুলে নিয়ে এসে তাকে সাবধানে একটা নিচু রেলওয়ে সিগন্যাল-পোস্টের ওপর বসিয়ে দিল।

'আমাদের ঘুম এখনও ভাঙে নাই,' কভালের সামনে উবু হয়ে বসে বলল লাপত।

পোস্টের ডান্ডার মাথা থেকে কভাল হঠাৎ হড়কে পড়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে লাপত মন্তব্য করল, 'এখন আমরা জেগে উঠেছি!'

কভাল গম্ভীরভাবে বলল, 'ওরে লালচুলো, তুই আমারে পাগল করবি দেখছি!' তারপর করমর্দনের জন্যে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এই ছোঁড়ারে ঠেকানো অসম্ভব। সারা রাত ধরে ও খালি লম্ফঝম্প করে বেড়িয়েছে — কখনও ট্রেনের কামরার ছাদে, কখনও ইঞ্জিনের কামরায়, কখনও মালগাড়িতে শুয়োরের খাঁচার আশপাশে। ওর মাথায় হঠাৎ পোকা নড়ে উঠল যে শুয়োরের খাঁচায় কিছু-একটা গণ্ডগোল ঘটেছে। লাপতের দোষেই গত কয়দিন খামোকা দৌড়ঝাঁপ করতে-করতে আমার জান নিকলে গেছে... তা, আমরা হাতমুখ ধুচ্ছি কোথায়?'

'আমরা জানি, কোথায়!' অসাদ্‌চি বলল। 'চল্‌ কোল্‌কা, ওনারে আমরা নিয়ি যাই!'

কভালকে ওরা হাতে-হাতে উঁচু করে তুলে টাওয়ারের দিকে নিয়ে চলল। লাপত বলল:

'দ্যাখেন, দ্যাখেন, তবুও উনি খুশি নন! বোঝলেন, আন্তন সেমিওনভিচ, গত এক হপ্তার মধ্যি মাত্র গতরাতেই কভাল দুই চোখের পাতা একটু এক করেছেন!'

এর আধঘণ্টার মধ্যে ট্রেনের কামরাগুলো সব সাফসুতরো হয়ে গেল আর ঝলমলে ঘোর নীলরঙের শর্ট্‌স আর শাদা শার্ট গায়ে দিয়ে কলোনি-বাসিন্দারা জলখাবার খেতে বসল। কলোনির কর্মীদের কামরায় আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল সবাই আর আমাদের মাদী শুয়োর 'মারিয়া ইভানভ্‌না'র মাংসের একটা টুকরোও মুখে দিতে হল আমাকে।

নিচে লাইনের ধার থেকে কে যেন চেঁচিয়ে বললে:

'লাপত, ইস্টিশানমাস্টার বলতেছেন আর মিনিট-পাঁচেকের মধ্যি আমাদের ট্রেন ছাড়বে।'

গলার স্বরটা পরিচিত ঠেকায় ফিরে তাকালুম। দেখলুম মার্ক শেইন্‌হাউসের মস্ত-মস্ত চোখদুটো গম্ভীরভাবে আমাকে নিরীক্ষণ করছে আর সে-চোখে প্রচণ্ড আবেগের অন্ধকার ঢেউগুলো বারে বারে আছড়ে পড়ছে।

বললুম, 'কী খবর, মার্ক! তোমাকে এতক্ষণ দেখতে পাই নি যে?'

'নিশানের কাছে আমি ডিউটিতে ছিলাম,' সংযতভাবে জবাব দিল মার্ক।

'তা তোমার চলছে কেমন? নিজের চরিত্র নিয়ে এখন সন্তুষ্ট তো?'

কামরা থেকে লাইনের ওপর লাফিয়ে নামলুম। মার্কও আমার সঙ্গ ধরল আর আমাকে একা পাওয়ার এই সুযোগটা নিয়ে সজোরে ফ্যাঁসফ্যাঁস করে বলতে লাগল:

'আন্তন সেমিওনভিচ, এখনও আমার চরিত্র নিয়ি পুরামাত্রায় খুশি নই। আমি আপনেরে ফাঁকি দিতি চাই না, আমি সত্যই পুরামাত্রায় খুশি নই।'

'আচ্ছা?'

'বোঝলেন — সারাটা পথ ওয়ারা সবাই গান গাইতি-গাইতি এসেছে। ওয়ারা খুবই খুশি, সে আর বলাতি! কিন্তু আমার মাথায় জট পাকায়ে ছিল খালি চিন্তা আর চিন্তা। মোট্রে আমি ওয়াদের সাথে গান গাইতি পারি নাই। এটা তো চরিত্রের পরিচয় নয়, তাই নয় কী?'

'তা, তুমি কী নিয়ে অত চিন্তা করছ?'

'ওয়ারা ভয় পাতিছে না, অথচ আমি এত ভয় পাই ক্যানে — এই নিয়ি চিন্তা।'

'নিজের জন্যে কি তোমার এত ভয়?'

'না-না, নিজির জন্যি আমার ভয়ের কিছু নাই। নিজির জন্যি আমার কানাকড়িও ভয় নাই। আমার ভয় আপনের জন্যি, আর সবার জন্যি, আমার ভয়টা সাধারণভাবেই। আমি খালি ভাবি, ওখেনে ওয়াদের সবার জীবন এত ভালো ছিল অথচ কুরিয়াজে হয়তো জীবন তেমন ভালোভাবে কাটবে না, আর শেষপর্যন্ত যে কী ঘটবে তা কে জানে।'

'অ, এই! কিন্তু ওরা-যে লড়াই করতে চলেছে। আরও উন্নত জীবনের জন্যে লড়াইয়ে যখন কেউ যোগ দেবার সুযোগ পায় তখন সেটা-যে দারুণ আনন্দের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, মার্ক!'

'আমিও নিজিরে তাই বলি, নিজিরে তাই বোঝাই। ওয়ারা সবাই সুখী, আর তাই ওয়ারা গান গাইতি পারে। কিন্তু সে গানে আমি ক্যানে গলা মিলাতি পারি নে, সব সময়ে আমারে চিন্তা করতি হয় ক্যানে?'

এমন সময়ে সিনেন্‌কি একেবারে আমার কানের পাশ ঘেঁষে কানে-তালা-ধরানো আওয়াজ তুলে সাধারণ সভার বিউগ্‌ল-সংকেত বাজিয়ে দিল।

মনে-মনে ভাবলুম, 'আক্রমণের সংকেত দেয়া হল।' তারপর বাকি সকলের সঙ্গে হুড়োহুড়ি করে ট্রেনের কামরায় গিয়ে উঠলুম। যেতে-যেতে ঘাড় ফিরিয়ে একবার দেখলুম কত সহজে খালিপায়ের গোড়ালিদুটো পেছনদিকে ছুড়তে-ছুড়তে মার্ক তার কামরার দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। ভাবলুম, যুদ্ধে জয় বা পরাজয় কাকে বলে এই ছেলেটি তার আস্বাদ পাবে আজ। আর তারপরই ও হয়ে উঠবে বলশেভিক।

এঞ্জিনে হুইস্‌ল পড়ল। তখনও পর্যন্ত স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে পড়ে-থাকা কাকে যেন দেখে গর্জন করে উঠল লাপত। অতঃপর ট্রেন চলতে শুরু করল।

এর চল্লিশ মিনিট পরে ফোঁসফোঁস করতে-করতে আস্তে-আস্তে ট্রেনটা গিয়ে রিজোভ স্টেশনে থামল। তবে থামল গিয়ে একেবারে তিন নম্বর লাইনে। মুখে আনন্দের উচ্ছ্বাস ফুটিয়ে স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে তখন দাঁড়িয়ে ছিলেন একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না, লিদচ্‌কা আর গুলিয়ায়েভা।

কভাল আমার কাছে এল। বলল:

'অযথা দেরি করে লাভ কী? মাল নামানো শুরু করি তাহলে?'

অতঃপর ও স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে দেখা করতে ছুটল। তখন জানা গেল ট্রেনখানাকে নাকি শান্‌ট করিয়ে এক নম্বর লাইনে নেয়া হবে একেবারে প্ল্যাটফর্মের ওপর — মাল খালাসির জন্যে, কিন্তু ট্রেন শান্‌ট করার মতো বাড়তি এঞ্জিন নেই বলে সমস্যা। যে-এঞ্জিন আমাদের স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে এসেছিল সেটা নাকি ততক্ষণে খারকভ ফিরে গিয়েছিল আর অন্য কোন একটা জায়গা থেকে নাকি একখানা বিশেষ শান্‌টিঙ্‌ এঞ্জিন আসার কথা। রিজোভে এর আগে আর কখনও এই ধরনের ট্রেন আসে নি বলে স্টেশনে শান্‌টিঙ্‌ এঞ্জিনের কোনো বন্দোবস্ত নেই।

খবরটা প্রথমে সবাই চুপচাপ শুনল। কিন্তু তারপর আধঘণ্টা কেটে গেল, তারপর আরও একঘণ্টা। ট্রেনের আশেপাশে ঘুরঘুর করতে-করতে আমরা অবশেষে রীতিমতো বিরক্ত হয়ে উঠলুম। সূর্য ক্রমশ আকাশ বেয়ে ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে 'মলদিয়েত্‌স'ও বেশি-বেশি অস্থির হয়ে ওঠায় তার জন্যেও আমরা চিন্তিত হয়ে পড়ছিলুম। আগের রাত্রে 'মলদিয়েত্‌স' পায়ের চাট মেরে মালগাড়ির কামরার কাঠের দেয়ালগুলো ভেঙে চুরমার করে ফেলেছিল আর ওই সময়ে সে হামলা শুরু করেছিল বাকি অংশটার ওপর। ইতিমধ্যে ওর মালগাড়িখানার সামনে দিয়ে নানাজাতীয় রেল-কর্মচারি পায়চারি করছিল

আর নোংরা নোটবইগ্‌লোয় কী সব হিসেবপত্রের আঁকজোক কষছিল। স্টেশনমাস্টার স্বয়ং রেললাইনগ্‌লোর ওপর দিয়ে এমনভাবে এদিক-ওদিক দৌড়োদৌড়ি করছিলেন যেন সেগ্‌লো লোহার লাইন নয় ঘোড়দৌড়ের রাস্তা, আর বারবার খালি সাবধান করে দিচ্ছিলেন যে ছেলেরা যেন ট্রেনের কামরা থেকে না-নামে কিংবা লাইনের ওপর দিয়ে হাঁটাচলা না-করে। আর দেখছিল্‌ম প্যাসেঞ্জার, লোকাল ট্রেন আর মালগাড়িগ্‌লো অনবরত লাইনগ্‌লো ধরে গড়িয়ে চলেছে।

'কিন্তু ইঞ্জিনটা আসতেছে কখন?' তারানেত্‌স অনবরত তাঁকে প্রশ্ন করতে লাগল।

শ্‌নতে-শ্‌নতে হঠাৎ একসময়ে মেজাজ খারাপ করে স্টেশনমাস্টার জবাব দিলেন, 'তা কী কর্যে বলব্য? তুমি যা জানো আমিও তাই জানি। কে জানে, হয়তো কালও আসতি পারে।'

'কাল? তাইলে বলতি হয় আমি আপনের থেকে বেশি জানি!..'

'বেশি? বেশি আবার কী?'

'বেশি মানে — আপনের থেকে বেশি জানি।'

'কী বলতি চাও তুমি?'

'আমি বলতি চাই — ইঞ্জিন যদি না-পাওয়া যায় তাইলে আমরা নিজিরাই ট্রেনখানারে এক নম্বর লাইনে টান্যে নিয়ি আসব।'

'হ্‌ঃ, যত্তোসব'-গোছের একটা অসহিষ্ণুতার ভঙ্গি করে স্টেশনমাস্টার তারানেত্‌সের নাগাল এড়িয়ে চলে গেলেন। এদিকে তারানেত্‌স আমাকে জ্বালাতন করে মারতে লাগল:

'কী বলেন, আমরা ট্রেনখানারে সরায়ে আনি তাইলে, আন্তন সেমিওনভিচ? আপনে দ্যাখেন, আমরা নিশ্চয়ই পারব! আমি জানি আমরা পারবই। লাইনের উপর দিয়ি গাড়ি সরানো খ্‌ব সোজা, গাড়িতি মাল বোঝাই থাকলিও। আর পেত্যেকখানা বগির পিছনে আমরা তিনজন করে আছি। আপনে আসেন, ইস্টিশানমাস্টারের সাথে এ-নিয়ি একবার কথা বলেন।'

'বাজে কথা ছাড়ো তো, তারানেত্‌স!'

এমন কি কারাবানভ যে কারাবানভ সে-ও হাত দ্‌খানা ছড়িয়ে দিয়ে বলল:

'ও ভাবছে ট্রেন শান্‌ট করানো ব্‌ঝি অতই সহজ! জানে না যে ট্রেনখানারে

লাইনের সব ক'টা জোড়ের পয়েন্ট ছাড়িয়ে একেবারে দূরের ওই সিগ্‌ন্যাল-পোস্ট পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে গিয়ে তবে শান্ট করানো যাবে।'

কিন্তু তারানেত্‌স তবু জিদ করতে লাগল। বহু ছেলে ওকে সমর্থনও করল।

লাপত বলল, 'ফালতু তক্ক করে লাভ কী? আসেন, কাজের সংকেতের জানান দিয়ি একবার চেষ্টা করে দেখা যাক — না-পারলি না-পারব, এতে ক্ষেতি তো নাই। যদি আমরা ট্রেনটারে শান্ট করাতি পারি — তাইলে তো খুবই ভালো, আর যদি না-পারি তো না-পারব, ট্রেনেই তাইলে রাত কাটাব আজ।'

'আর স্টেশনমাস্টাররে সামলানো যাবে কী করে?' কারাবানভ শুধোল। দেখা গেল, উৎসাহে ওর চোখ ইতিমধ্যেই ঝিলিক হানতে শুরু করেছে।

'ইস্টিশানমাস্টার?' লাপত জবাব দিল। 'ইস্টিশানমাস্টারের মাত্তর দুইখান হাত আর একটা জিভ আছে। তা সে হাত দুইখান নাড়তি আর প্রাণ ভরে চ্যাঁচাতি থাকবে! তাতে মজা আরও খোলতাই হবে-নে।'

বললুম, 'না। আমরা এসব করতে পারি না। এতে আমাদের কেউ অন্য ট্রেনের নিচে চাপাও পড়তে পারে। আর তাহলেই একেবারে চিত্তির হবে আর-কি!'

'ব্যাপারখান আমরা বুঝি ঠিকই। তা, এর জন্যি সিগ্‌ন্যাল ডাউন করে দিতি লাগবে।'

'না-না, ছেলেরা, ওসব বুদ্ধি ছাড়ো!'

কিন্তু ছেলেরা নাছোড়বান্দা। তারা আমাকে চারদিক থেকে প্রায় ছেঁকে ধরল। যারা পেছনে ছিল তারা ব্রেকভ্যানগুলোর ওপর আর ট্রেনের ছাদে উঠে এল আর তারপর সবাই সমস্বরে আমাকে রাজি করানোর চেষ্টায় মাতল। কেবলমাত্র একটা কাজ করার জন্যে তারা আমার অনুমতি চাইল — তা হল ট্রেনখানাকে দু'মিটারখানেক নড়ানো।

'মাত্তর দুই মিটার, তাম্পরই থামব আমরা। এয়াতে তো কাউর কোনো ক্ষেতি নাই! আমরা কাউর কাজে বাধা দিব না। মাত্তর দুই মিটার, তা যদি না-করি তাইলে আপনে নিজি আমাদেরে বলবেন।'

অবশেষে হাল ছেড়ে দিতে হল। সিনেন্‌কি আবার বিউগ্‌ল-সংকেত বাজাল — তবে এবার অবশ্য কাজের জন্যে। কলোনি-বাসিন্দারা ইতিমধ্যেই বুঝে গিয়েছিল তাদের কতটা কী করতে হবে, আর তাই তারা এখন ট্রেনের

কামরাগুলোর ধারে-ধারে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল। সামনে কোনো একটা জায়গায় মেয়েরা থেকে-থেকে আতঙ্কিত চিৎকারে ফেটে পড়ছিল। এমন সময় লাপত প্ল্যাটফর্মের ওপর লাফিয়ে পড়ল, তারপর মাথার টুপিটা নাড়তে লাগল।

'দাঁড়া, দাঁড়া, একমিনিট দাঁড়া!' তারানেত্স হঠাৎ চিৎকার করে উঠল। 'আমি আগে ইস্টিশানমাস্টাররে ডাক্যে আনি। উনি আমার থেকে ব্যাপারটা ভালো বোঝেন।'

স্টেশনমাস্টার ছুটে এলেন প্ল্যাটফর্মে। ওঁর হাত দুখানা তখন মাথার ওপর তোলা।

'কী করত্যেছ তমরা? কী করত্যেছ?' চ্যাঁচাতে লাগলেন উনি।

'কিছু না, মাস্তর মিটার দুই সরাচ্ছি!' তারানেত্স বলল।

'খবরদার! কোনোরকমেই না! কোনোরকমেই না!.. এমন কথা ভাবত্যে পারল্যে কী করি?'

'বলছি তো, মাস্তর দু'মিটার!' কভাল চেঁচিয়ে বলল। 'কথাটা কী বুঝতে পারছেন না?'

হাত দুখানা একই ভাবে ওপরে তুলে রেখে কভালের দিকে শূন্যচোখে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন স্টেশনমাস্টার। কামরাগুলোর পাশে-পাশে দাঁড়িয়ে ছেলেরা হাসাহাসি করছিল। এমন সময় মাথার টুপিখানা হাতে নিয়ে লাপত ফের একবার হাতখানা ওপরে তুলল, আর অমনি সবাই কামরাগুলোর গায়ে নিজেদের দেহের ভর দিয়ে, খালি পাগুলো বালির ওপর চেপে ধরে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে লাপতের দিকে তাকিয়ে রইল। লাপত টুপি নাড়ল, আর ওর ভঙ্গি নকল করে স্টেশনমাস্টারও মাথা নাড়লেন আর তাঁর মুখখানা হাঁ হয়ে এল। এমন সময় ট্রেনের পেছন থেকে কে যেন চেঁচিয়ে বলল:

'মারো ঠেলা — হেঁইয়ো!'

একমুহূর্তের জন্যে — এক-সেকেন্ড কি দু'সেকেন্ড — আমার মনে হল এতে লাভ কিছুই হবে না। কেননা ট্রেনখানা মোটেও নড়ছিল না। কিন্তু তারপরই চাকাগুলোর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ লক্ষ্য করলুম যে সেগুলো আস্তে-আস্তে ঘুরছে যেন, আর তার পরের মুহূর্তেই দেখতে পেলুম গোটা ট্রেনখানাই নড়ছে। কিন্তু এরপরই লাপত চিৎকার করে কী যেন বললে আর ছেলেরা ট্রেন ঠেলা বন্ধ করল। এই সময় স্টেশনমাস্টার আমার দিকে

তাকালেন, মাথার ওপরকার টাকটা মুছলেন একবার, তারপর বৃদ্ধের দন্তহীন মুখে মিষ্টি করে হাসলেন। বললেন:

'চালাও, চালাও... ঠিক আছে... তয় দেখ্যো, কাউরে চাপা-টাপা দিও না য্যানে...'

মাথা ঝাঁকিয়ে এবার হঠাৎ হাসিতে ফেটে পড়লেন উনি।

'কুত্তির বাচ্চাগুলান! এখন এয়া দেখ্যে কার কী বলার আছে তাই কও, শুনি! ঠিক আছে, মারো ঠেলা — হেঁইয়ো!'

'কিন্তু সিগ্ন্যাল নিয়ি কিছু করতি লাগবে না?'

'সে আমি দ্যাখব-নে। ওয়া নিয়ি মাথা-ঘামানের দরকার নাই।'

'রে-এ-এ-ডি —!' চেঁচিয়ে উঠল তারানেত্স। আর ফের একবার লাপত তার টুপিটা তুলে ধরল।

এর এক-মিনিট পরে ট্রেনটা গড়িয়ে সোজা সিগ্ন্যাল পর্যন্ত চলে গেল, যেন একটা শক্তিশালী স্টিম-এঞ্জিন ঠেলে নিয়ে গেল তাকে। মনে হচ্ছিল ছেলেরা যেন কাঠামোর খাড়াই থাম্বাগুলো ধরে-ধরে কামরাগুলোর পাশে-পাশে এমনিই হেঁটে চলেছে। আর দেখা গেল কী এক অলৌকিক কৌশলে যতসব ব্রেক-প্ল্যাটফর্মের ওপর কিছু-কিছু ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে আছে — দরকারমতো যাতে ট্রেনের ব্রেক কষতে পারে সেইজন্যে।

লাইনের বার-মুখো পয়েন্টগুলো পেরিয়ে গিয়ে ট্রেনখানাকে সরিয়ে আনার দরকার ছিল স্টেশনের অপর প্রান্ত থেকে দু'নম্বর লাইনে যাতে সেটাকে ফের পিছু হটিয়ে এনে প্ল্যাটফর্মের গায়ে ভেড়ানো যায়। ট্রেনটা যখন দ্বিতীয় লাইন বরাবর স্টেশন-প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে পিছিয়ে যাচ্ছিল এবং আমি গভীরভাবে শ্বাস টেনে-টেনে জরুরিকালীন অবস্থার তীব্র আবহাওয়াকে আত্মস্থ করে নিচ্ছিলুম ঠিক সেই মুহূর্তে প্ল্যাটফর্ম থেকে কে যেন আমায় ডাকল:

'কমরেড মাকারেঙ্কো!'

ফিরে তাকালুম। দেখলুম প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছেন ব্রেগেল, খালাবুদা আর কমরেড জোইয়া। আল্গা, পাঁশুটেরঙের কোট গায়ে মাথা তুলে মহিমান্বিত ভঙ্গিতে প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে-থাকা ব্রেগেলকে দেখে আমার মনে পড়ছিল ক্যাথারিন-দ-গ্রেটের প্রস্তরমূর্তির কথা — ভঙ্গিটি তাঁর এমনই রাজকীয় হয়ে উঠেছিল!

আর তাঁর ওই পাদপীঠের ওপর দাঁড়িয়ে একই রকম রাজকীয় কণ্ঠস্বরে তিনি আমাকে ডেকে বলছিলেন:

'কমরেড মাকারেঙ্কো — এরা কি আপনারই ছাত্রছাত্রী?'

অপরাধীর মতো ব্রেগেলের দিকে চোখ তুলে তাকালুম। আর সেই মুহূর্তে তাঁর সম্রাজ্ঞীশোভন কণ্ঠস্বর ফের আমার কানে এসে বিঁধল:

'প্রতিটি কাটা পায়ের জন্যে আপনাকে কিন্তু জবাবদিহি করতে হবে!'

ব্রেগেলের কণ্ঠস্বরে এমন একটা ইস্পাতকঠিন শক্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল যা যে-কোনো সম্রাজ্ঞীর পক্ষেও ঈর্ষার কারণ হতে পারত। সম্রাজ্ঞীশোভন ভঙ্গিটিকে আরও যথাযথ করে তোলার জন্যে উনি আবার ডানহাতের তর্জনীটি আমাদের ট্রেনের একখানা চাকার দিকে হেলিয়ে নিচু করে ধরে ছিলেন।

আমি যখন এইমর্মে জবাব দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছি যে ছেলেরা খুবই সাবধানে গাড়ি ঠেলছে আর সবকিছু ভালোয়-ভালোয় মিটে যাবে বলেই আমি আশা করছি, এমন সময় কমরেড জোইয়া আমার বিনম্রভাবপ্রসূত এই সৎ আবেগে বাধার সৃষ্টি করে প্ল্যাটফর্মের ধারের দিকে ছুটে এসে একেবারে মুখে ফেনা তুলে হুড়মুড় করে কথা বলতে লাগলেন আর কথার তালে-তালে নিজের প্রকাণ্ড মাথাটা দোলাতে লাগলেন। তিনি বলছিলেন:

'না-জেনেশুনে সবাই বোকার মতো বকবক করে থাকে যে কমরেড মাকারেঙ্কো নাকি তাঁর ছাত্রছাত্রীদের ভারি ভালোবাসেন... উনি-যে ছাত্রছাত্রীদের কেমন ভালোবাসেন তা লোকগুলোকে একবার এনে দেখাতে পারলে ভালো হোত!'

কথাটা শুনে আমার বুকের মধ্যে কী যেন একটা নড়ে উঠল আর তা উঠে এসে গলাটা চেপে ধরল। তবে ওই সময়ে আমার মনে হয়েছিল যে খুবই শান্ত ও ভদ্রভাবে এ-কথার জবাবে আমি বলছিলুম:

'ওহ্, কমরেড জোইয়া, তাহলে তো আপনি খুব নির্মমভাবে প্রতারিত হয়েছেন বলতে হবে। আমি এমনই কঠিনপ্রাণ যে সবচেয়ে উদ্দাম ভালোবাসার চেয়েও সাধারণ বুদ্ধি আমার বেশি পছন্দ!'

এই জবাব শুনে কমরেড জোইয়া হয়তো প্ল্যাটফর্মের ওপর থেকে আমার দিকে তেড়েই আসতেন আর ওইখানেই হয়তো আমার শিক্ষাবিরোধী কাজকর্ম-সম্পর্কিত এই কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটত, যদি-না ওই মুহূর্তে খালাবুদা

খুবই সহজভাবে, একজন শ্রমিকের পক্ষে যেভাবে কথা বলা সম্ভব সেইভাবে, বলে উঠতেন:

'ছোঁড়াদের — রাস্কেলগুলানের ট্রেন ঠেলা দেখতিও ভারি মজা লাগতিছে! দ্যাখেন ব্রেগেল, দ্যাখেন... ওই বাচ্চা শয়তানডার দিকি দ্যাখেন একবার!.. ছোঁড়া একবারে মুর্তিমান বান্দরছ্যানা!..'

খালাবুদা ইতিমধ্যে আমাদের ভাস্কা আলেক্সেয়েভের কাছে চলে গিয়ে তার পাশে-পাশে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ভাস্কা আলেক্সেয়েভ ছিল পিতৃমাতৃহীন অনাথ, তবে তার আগে তার বাপ-মা যে কতবার বদল হয়েছিল তার ঠিকঠিকানা নেই। যাই হোক, ইতিমধ্যে খালাবুদার সঙ্গে ভাস্কার দু-একটা কথার আদানপ্রদানও হয়ে গিয়েছিল, আর কমরেড জোইয়া আর আমার মধ্যে ক্রুদ্ধ কথা-কাটাকাটি ফের শুরু হওয়ার আগেই আমরা দেখতে পেলুম ট্রেনের কামরার গায়ে কোনো কিছুতে হাত লাগিয়ে খালাবুদাও প্রাণপণে গাড়ি ঠেলতে শুরু করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথারিনের মুর্তির প্রস্তরীভূত রাজমহিমার দিকে চকিতে একটা দৃষ্টি ছুড়ে আর কমরেড জোইয়াকে ঘিরে বিদ্বেষের বিদ্যুদ্দমকের পাশ কাটিয়ে আমি স্বয়ং ট্রেনের দিকে দ্রুত পা চালালুম।

এর মিনিট-কুড়ি পরে 'মলদিয়েত্স'কে আধা-বিচুর্ণ মালগাড়ির মধ্যে থেকে বের করে আনা হল। আর বহুদূর পর্যন্ত পেছনটা ধুলোর মেঘে অন্ধকার করে রেখে আর বিধ্বস্ত স্নায়ুতন্ত্রী সহ রিজোভের কুকুরগুলোকে পেছনে ফেলে 'মলদিয়েত্স'-এর পিঠে সওয়ার হয়ে কুরিয়াজে ধেয়ে চলল ব্রাত্চেঙ্কো।

অসাদ্চির নেতৃত্বে একটা মিশ্র বাহিনীকে প্ল্যাটফর্মে রেখে আমরা স্টেশনের সামনের ছোট্ট চত্বরটায় গিয়ে দলবলকে দুটো লাইন করে দাঁড় করালুম। ব্রেগেল আর তাঁর বন্ধু ওই সময়ে একখানা মোটরকারে গিয়ে উঠছিলেন আর এদিকে আমাদের বিউগ্লগুলো বেজে উঠেছিল, ড্রামের বজ্রগর্জনে সম্মান জানানো হচ্ছিল পতাকার প্রতি আর রেশমী-খাপে-মোড়া পতাকাকে সার-বেঁধে-দাঁড়ানো আমাদের গম্ভীরমুখ ছেলেমেয়েদের সামনে দিয়ে বয়ে তার যথাস্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। আর তখন ব্রেগেলদের ঈর্ষায় কালো-হয়ে-যাওয়া মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে-মনে আরও একবার পরমানন্দ উপভোগ করলুম। অবশেষে আমিও গিয়ে সারিতে দাঁড়ালুম। কভাল মার্চ অর্ডার দিল আর স্টেশনের

একপাল কৌতূহলী বাচ্চা ছেলের পরিবৃত হয়ে সারবাঁধা গোর্কি বাহিনী যাত্রা শুরু করল কুরিয়াজ অভিমুখে। ব্রেগেলদের গাড়িখানা আমাদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় ব্রেগেল একবার বললেন:

'আসুন, উঠে পড়ুন!'

শুনে অবাক হয়ে কাঁধ ঝাঁকালুম আমি, তারপর দুই হাত তুলে বুকে

দিনটা ছিল নিথর নিস্তব্ধ আর ঈষদুষ্ণ। আমাদের যাত্রাপথ ছিল মাঠের মধ্যে দিয়ে, তারপর অখ্যাত একটা সরু খালের ওপরকার ছোট্ট সাঁকোটা পেরিয়ে। একেক সারিতে ছ'জন করে হাঁটছিলুম আমরা। আগে-আগে যাচ্ছিল চার জন বিউগ্‌ল-বাদক আর আট জন ড্রাম-বাজিয়ে। তারপর তাদের পেছনে কুচকাওয়াজ পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত দলপতি তারানেত্‌স আর তার সঙ্গে আমি আর আমাদের পেছন-পেছন পতাকাবাহী ব্রিগেড। পতাকাটা আমাদের তখনও খাপে-ঢাকা আর তার সোনালি রঙ-করা ট্যাস্‌লগোছা দোল খাচ্ছে পতাকাদণ্ডের ঝলমলে মাথাটা থেকে ঠিক লাপতের মাথার ওপর। লাপতের পেছনে ঝকঝক করছিল শাদা শার্টের সারবাঁধা শুভ্রতা আর কলোনি-বাসিন্দাদের সারি। অল্পবয়সের প্রাণবন্ত ছন্দে তাদের খালি পাগুলো তালে-তালে উঠছিল-পড়ছিল। নীল স্কার্টপরা মেয়েদের চারটে সারি হাঁটছিল ছেলেদের সারিগুলোর মাঝখানে।

এক মুহূর্তের জন্যে লাইন ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আমি দেখলুম কলোনি-বাসিন্দাদের চেহারাগুলো হঠাৎ কেমন আগের চেয়ে বেশি কঠোর আর প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। যদিও আমরা মাঠের এবড়োখেবড়ো জমি ভেঙে এগোচ্ছিলুম তবু ছেলেমেয়েরা একেবারে কড়াকড়িভাবে লাইন বজায় রেখে চলছিল, কখনও দৈবাৎ চলার তাল কেটে গেলে তা সংশোধন করে নিচ্ছিল সঙ্গে সঙ্গে। মাঠের মধ্যে একমাত্র আওয়াজ উঠছিল আমাদের ড্রামের বাজনার আর সেই বাজনার ঢেউ-খেলানো প্রতিধ্বনি মনে হচ্ছিল দূরের কুরিয়াজ-মঠের দেয়ালে যেন ধাক্কা খেয়ে ফিরছে। ড্রামের ঝমঝম বাজনা ওইদিন আমাদের সতর্কতার বোধকে শিথিল করে দিচ্ছিল না। বরং ব্যাপারটা ঘটছিল উল্‌টো। যতই আমরা কুরিয়াজের কাছাকাছি আসছিলুম আমাদের ড্রামের বাজনাও ততই জোরালো আর কর্তৃত্বসূচক হয়ে উঠছিল, কেবল আমাদের পাগুলোকেই

যে সে তার কড়া নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য করছিল তা-ই নয়, আমাদের হৃদয়ের প্রতিটি অনুভবকেও বাধ্য করছিল তা মানতে।

সার বেঁধে মার্চ করতে-করতে আমরা ঢুকলুম পদভোর্‌কি গ্রামে। গাঁয়ের বাসিন্দারা তাদের কাঠের গেট আর ডালপালার বেড়ার ওধারে দাঁড়িয়ে দেখছিল আমাদের আর তাদের কুকুরগুলো গলার বকলসে টান ধরিয়ে হিংস্রভাবে ডাকাডাকি করছিল। এইসব কুকুরের পূর্বপুরুষই বোধহয় একদিন মঠের সম্পত্তির পাহারাদার ছিল। গ্রামটার লোকজন এবং সেইসঙ্গে কুকুরগুলোও লালিত হয়েছিল মঠের ইতিহাসের সুফলা চারণভূমিতে। ওদের সকলের জন্ম, লালনপালন আর ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ সবকিছুই নিষ্পন্ন হোত সেইসব তামার পয়সার মূল্যে যাদের বিনিময়ে পুণ্যার্থীরা কিনত আত্মার মুক্তি, রোগের নিরাময়, পবিত্র কুমারীমাতার চোখের জল এবং প্রধান দেবদূত গাব্রিয়েলের ডানাখসা পালক। বানের জলে ভেসে এসে কত ধরনের লোকই-যে আটকে গিয়েছিল পদভোর্‌কির ডোবায় — কত প্রাক্তন পুরুত, সন্নিসি, আধা-সন্নিসি, ঘোড়ার সহিস, মঠের রাঁধুনি, বাগানের মালি আর বেশ্যার দল।

গ্রামখানার মধ্যে দিয়ে যেতে-যেতে বাসিন্দাদের বিদ্বেষভরা দৃষ্টি আর কাঠের বেড়ার ওধারে জড়-হওয়া নানা দল-বেদলের মধ্যে চাপা কানাকানি তীব্রভাবে বিঁধছিল আমাকে। আমাদের সম্পর্কে ওরা-যে কী ভাবছে, কী বলছে আর কী কামনা করছে তা-ও মোটামুটি সঠিকভাবে আন্দাজ করতে পারছিলুম।

ওইখানেই, পদভোর্‌কির ওই রাস্তা দিয়ে যেতে-যেতেই হঠাৎ আমি আমাদের এই পদযাত্রার বিপুল ঐতিহাসিক তাৎপর্য উপলব্ধি করলুম, যদিও এ-ব্যাপারেও আমি পুরোপুরি সচেতন ছিলুম যে পদযাত্রাটা আমাদের গোটা যুগের তুচ্ছাতিতুচ্ছ একটা পর্যায়মাত্র। গোর্কি কলোনি সম্পর্কে আমার ধারণাটাও আচমকা বাহ্য ধরনধারণ ও শিক্ষাদানগত রঙের রকমারি বাহার থেকে মুক্ত হয়ে গেল। আমি দেখলুম, কলমাকের আঁকাবাঁকা নদীতীর, পুরনো ত্রেপ্‌কে তালুকের জটিল নকশাকাটা যতসব দালানকোঠা, দু'শো গোলাপঝাড়, ফাঁপা কন্‌ক্রিটে-তৈরি শুয়োরের খোঁয়াড় — সবই হয়ে গেছে অতীতের ব্যাপার। শিক্ষাবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম যতসব সমস্যা ফুলের পাপড়ির মতো শুকিয়ে গিয়ে অজান্তে কখন কোথায় ঝরে গেছে রাস্তার ধুলোয়। আর কোনো কিছুই অবশিষ্ট নেই, আছে শুধু মানুষ, নতুন অভিজ্ঞতায় বলীয়ান মানুষ

আর পৃথিবীর বুকে একটা নতুন জায়গা। আর একেবারে হঠাৎ আমি উপলব্ধি করলুম যে আমাদের কলোনি এমন একটা কর্তব্য পালন করে চলেছে যা তুচ্ছ হতে পারে কিন্তু তবু তা তীব্রভাবে রাজনৈতিক, সত্যিকার একটা সমাজতান্ত্রিক কর্তব্য সেটা।

আর তাই মনে হচ্ছিল পদভোর্‌কির রাস্তা দিয়ে কুচকাওয়াজ করে যাওয়াটা এমন একটা শত্রুদেশের মধ্যে দিয়ে যাওয়া যেখানে মানুষ, তাদের বহুতর স্বার্থ, পরস্পরের মধ্যে স্বার্থের মাকড়শাসুলভ সামঞ্জস্যবিধান তখনও পর্যন্ত থিরথির কাঁপুনির মধ্যে দিয়ে জীবনের স্পন্দন প্রকাশ করে চললেও আসলে তা সজোরে আঁকড়ে ছিল মৃত অতীতকে।

আর তখনই নজরে পড়ল মঠের পাঁচিলটা। ভাবছিলুম, ওই পাঁচিল-ঘেরা জায়গাটায় স্তূপীকৃত হয়ে জমে আছে এমন সমস্ত ধ্যানধারণা ও কুসংস্কার যা আমার কাছে ঘৃণার্হ। ওখানে জমে আছে বুদ্ধিজীবীদের ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে আদর্শ বানানোর ভাবোচ্ছ্বাস, গদ্যময় অতি-মামুলি আনুষ্ঠানিকতার আতিশয্য, কথায়-কথায় চোখের জল ফেলা আর আমলাতন্ত্রের অবিশ্বাস্য আজগবি অজ্ঞতা। এই অগুন্‌তি আবর্জনা-স্তূপের বিশাল এলাকাটা যেন মনের চোখে দেখছিলুম আমি — ভাবছিলুম, কয়েক বছর ধরে এর মধ্যে দিয়ে হাঁটছি, পার হয়ে এসেছি কয়েক হাজার কিলোমিটার পথ, তবু এই জঞ্জাল সর্বত্র — আমাদের সামনে, ডাইনে-বাঁয়ে — এখনও পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে আর পচছে, এখনও পর্যন্ত ঘিরে রেখেছে আমাদের। আর সবরকম বৈষয়িক বন্ধনসূত্র-খণ্ডিত, সবরকম সংযোগসূত্র, আস্তানা আর আত্মসোদর থেকে বিচ্ছিন্ন আমাদের শিশু গোর্কি কলোনিকে এই জঞ্জাল-পরিবৃত অবস্থায় খুবই খুদে বলে ঠাহর হচ্ছে। ত্রেপ্‌কে পরিত্যক্ত হয়েছে চিরকালের মতো, অথচ কুরিয়াজ তখনও জিতে নেয়া যায় নি।

ড্রাম-বাজিয়ের দল ইতিমধ্যেই কুরিয়াজের টিলার গা বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করেছিল। মঠের সিংদরজা চোখে পড়ছিল। হঠাৎ দেখা গেল সিংদরজার ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল শর্ট্‌স-পরনে ভানিয়া জাইচেঙ্কো, তারপর একমুহূর্তের জন্যে যেন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল জায়গাটায়, আর তারপরই তীরের মতো ছিটকে নামতে লাগল টিলার উত্‌রাই বেয়ে আমাদের দিকে। ওর রকমসকম দেখে আমি তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলুম, ভাবছিলুম আবার নতুন কিছু অনর্থ বুঝি ঘটল। কিন্তু না, আমার সামনে এসে ভানিয়া সজোরে

নিজেকে রাশ টেনে থামাল, তারপর একটা আঙুল দিয়ে গালে গড়িয়ে-পড়া চোখের জল মুছতে-মুছতে অনুনয় করে বলল:

'আন্তন সেমিওনভিচ, আমারে আপনেদের সাথে যাতি দ্যান! আমি ওখেনে খাড়ায়্যে থাকতি চাই না!'

'ঠিক আছে, আমাদের সঙ্গেই চল!'

আমার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে ভানিয়াও তালে-তালে পা ফেলতে লাগল আর মাথাটা রাখল খাড়া করে। তারপর, আমি ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি লক্ষ্য করে ফের একফোঁটা চোখের জল মুছে আশ্বস্তি আর আবেগে মেশানো মনখোলা হাসি হাসল।

ঘণ্টাঘরের নিচে সুড়ঙ্গের মতো সিংদরজার দেউড়িতে ঢুকে ড্রামের আওয়াজে কানে তালা ধরে গেল যেন। উঠোনে তখন কুরিয়াজ-বাসিন্দারা কয়েকটা লাইনে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আর তাদের সামনে স্যালুটের ভঙ্গিতে ডান হাতখানা তুলে নিঃস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে গরোভিচ।

৮

হোপাক নাচ

গোর্কি ব্রিগেডের সারিগুলিকে আর কুরিয়াজের জনতাকে সাত-আট মিটার তফাতে পরস্পরের মুখোমুখি করে দাঁড় করানো হল। পিয়তর ইভানভিচ কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের তাড়াহুড়ো করে কোনোরকমে জড় করেছিলেন, তাই তাদের সারিগুলো একটু এলোমেলো হয়ে ছিল। আমাদের ছেলেমেয়েদের লাইনগুলো স্থির হয়ে দাঁড়ানোমাত্রই কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের লাইনগুলো ভেঙে ছত্রখান হয়ে গেল। তারপর গির্জের গেট ছাড়িয়েও অনেক দূর ছড়িয়ে পড়ে আর লাইনের শেষ প্রান্তগুলো বেঁকে এসে আমাদের পাশ থেকে ঘেরার, এমন কি চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলার উপক্রম করল।

কুরিয়াজ-বাসিন্দারা এবং গোর্কিপন্থীরা উভয়পক্ষই অবশ্য চুপচাপ করে ছিল — প্রথমোক্তরা চুপ করে ছিল নিছক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আর শেষোক্তরা পতাকার নিচে দাঁড়ানোর দরুন শৃঙ্খলার বশবর্তী হয়ে। ওই সময় পর্যন্ত কুরিয়াজ-বাসিন্দারা গোর্কি কলোনির বাসিন্দা বলতে শুধু আমাদের অগ্রবর্তী

মিশ্র বাহিনীকেই দেখেছিল, আর তাও আবার সর্বদাই কাজের পোশাকে, ক্লান্ত-অবসন্ন অবস্থায়, ধুলো-মাখামাখি হয়ে আর আ-ধোয়া দেহে। আর ওইদিন হঠাৎ তারা মুখোমুখি হয়ে গেল যতসব গম্ভীর প্রশান্ত মুখ, বেল্টের ঝকমকে বকলস আর রোদে-পোড়া পায়ের ওপর কেতাদুরস্ত শর্টসের নিয়মিত সারির।

আমি প্রয়াস পেলুম প্রায় অমানুষিক ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে মনোযোগ সংহত করে কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের মুখে পরিস্ফুট অভিব্যক্তির অন্তর্নিহিত মৌল তাৎপর্য এক-সেকেন্ডের খণ্ডাংশের মধ্যে আমার চেতনায় মুদ্রিত করে নিতে। কিন্তু কিছুতেই তা পেরে উঠলুম না। কুরিয়াজে আমার প্রথম দিনের দেখা জনতার মতো ওইদিনের জনতা আর একঘেয়ে ও বৈশিষ্ট্যহীন ছিল না। যতই আমি ওদের একটা থেকে আরেকটা দলের মুখের দিকে তাকাচ্ছিলুম ততই নতুন-নতুন অভিব্যক্তি চোখে পড়ছিল, আর তাদের কিছু-কিছু তো আমার কাছে ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত। ওদের মধ্যে খুবই কম ছেলে নিরাসক্ত নিস্পৃহভাবে তাকিয়ে ছিল। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সীদের মধ্যে প্রায় কেউই উৎসাহ চেপে রাখতে পারছিল না, ঈর্ষা কিংবা অহঙ্কার উদ্রেকের অতীত অনুপম কোনো খেলনা চোখে দেখে তা হাতে পাওয়ার জন্যে ওই বয়সের ছেলেরা যতখানি ব্যগ্র হয়ে ওঠে ঠিক ততখানিই উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল ওরা। পরস্পর গলা-জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে নিসিনভ আর জোরেন ঠাহর করে দেখছিল গোর্কিপন্থীদের। একে অপরের কাঁধে মাথা রেখে মনে হচ্ছিল যেন স্বপ্ন দেখছে ওরা — স্বপ্ন দেখছে সম্ভবত সেই সময়ের যখন ওরাও ওই ছেলেমেয়েদের মোহময় সারিগুলোয় নিজেদের স্থান করে নেবে আর যেমন এখন তেমনই তখনও ওদের মতো 'বাইরের' বাচ্চা ছেলেরা মুগ্ধ বিস্ময়ে হাঁ করে দেখবে ওদের। এছাড়া ছিল আরও এমন বহু মুখ যাতে ফুটে উঠেছিল গভীর মনোযোগের চিহ্ন, উত্তেজিত হয়ে উঠলে মুখের মাংসপেশী যেমন কখনও-কখনও আচমকা টানটান হয়ে ওঠে সেইরকম। এইসব মুখে চোখগুলো চাউনি সেঁটে রাখার জন্যে একটা সুবিধেমতো জায়গা খুঁজছিল। মুখগুলো হয়ে উঠেছিল প্রচণ্ড আবেগের আধার — এক-সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে এই মুখগুলো থেকে মনের কিছু-কিছু খবরাখবর পাওয়া গেল, দ্রুত একের-পর-এক সেগুলো থেকে বিচ্ছুরিত হতে লাগল সম্মতি, সন্তোষ, সন্দেহ বা ঈর্ষা। কিন্তু দেখা গেল আগে-থেকে-তৈরি-করা তাচ্ছিল্য আর ঘেন্নার

ভাব ফুটিয়ে-তোলা বিদ্রূপমাখানো মুখগুলো থেকে ওই সব ভঙ্গি আস্তে-আস্তে মোলায়েম হয়ে আসছে। এর আগে এই মুখের অধিকারী ছেলেরা যখনই দূর থেকে আমাদের ড্রামগুলোর গুরগুর আওয়াজ শুনেছিল তখন থেকেই হাতগুলো পকেটে পুরে বেশ একখানা পিঠচাপড়ানো 'তা বেশ, তা বেশ' ভঙ্গি নিয়ে আমাদের আসার অপেক্ষায় ওত্ পেতে বসে ছিল। তবে এদের অনেকেই একেবারে সঙ্গে সঙ্গে মাত্ হয়ে গেল ফেদরেঙ্কো, করিতো আর নেচিতাইলোর মতো প্রথম সারির গোর্কিপন্থীদের চমৎকার বুকের পাটা আর হাতের গুলি দেখে। ফেদরেঙ্কোদের দেহসৌষ্ঠবের তুলনায় তাদের বোলবোলা একেবারে ম্লান হয়ে গেল যেন। এছাড়া এদের বাকি সবাইয়ের মনে দ্বিধা দেখা দিল আরেকটু পরে, যখন এটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল যে এই এক শো-কুড়িজন বীরপুঙ্গবের মধ্যে সবচেয়ে ছোটখাটটির গায়েও নিরাপদে হাত ঠেকানো চলে না। আর ওদের মধ্যে সেই সবচেয়ে খুদেটি — আমাদের ভান্‌কা সিনেন্‌কি — তখন দাঁড়িয়ে ছিল সবার সামনে, বিউগ্‌লটি হাঁটুর কাছে নামিয়ে, আর তার দু'চোখে এমন একটা দুর্জয় সাহস বিচ্ছুরিত হচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল ও যেন গতকালের রাস্তার অনাথ ছেলে নয়, ও বুঝি খুদে রাজপুত্তুর বেরিয়েছে দিগ্বিজয়ে, আর ওর পেছনে সদাসর্বদা পাহারায় দাঁড়িয়ে আছে স্থাণুর মতো রাজার নিযুক্ত-করা বিশেষ রাজপ্রহরী।

আসলে এই নিঃশব্দ নিরীক্ষণের পালা চলেছিল মাত্র কয়েকটা সেকেন্ড ধরে। কারণ আমার পক্ষে দরকার হয়ে পড়েছিল একেবারে এক-ঘায়ে দুই শিবিরের মধ্যেকার সাত মিটার দূরত্বের ব্যবধানটা ভেঙে ফেলা, ওদের পরস্পরকে পর্যবেক্ষণের অবসান ঘটানো।

তাই আমি চেঁচিয়ে বললুম, 'কমরেডস, এই মুহূর্ত থেকে আমরা সবাই — আমরা চার শো জন মিলে একটিই যৌথ সমাজ, যার নাম গোর্কি শ্রম-কলোনি। তোমাদের কারো এক মুহূর্তের জন্যেও এ-কথাটা ভোলা উচিত হবে না যে প্রত্যেককে তোমাদের নিজেকে গোর্কিপন্থী বলে গণ্য করতে হবে আর অপর প্রতিটি গোর্কিপন্থীকে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সাথী ও সেরা বন্ধু মনে করতে হবে, তাকে সম্মান দেখাতে হবে, বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করতে হবে তাকে, সাহায্যের দরকার পড়লে সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে হবে, আবার ভুল করলে সে-ভুল শুধরেও দিতে হবে তার। আমাদের নিয়মশৃঙ্খলায় খুবই কড়াকড়ি থাকবে। কেননা শৃঙ্খলা রাখা আমাদের দরকার — কাজটা কঠিন বলে আর

আমাদের অনেককিছু করতে হবে বলেও। আর শৃঙ্খলা বজায় না থাকলে আমরা কোনো কাজই ভালোভাবে করে উঠতে পারব না।’

আরও অনেক কথা বলে চললুম আমি। আমাদের সামনে যে-সব সমস্যা ঝুলছিল তাদের কথা বললুম। বললুম আমাদের বড়লোক হতে হবে, লেখাপড়া শিখতে হবে, নিজেদের আর আগামীর গোর্কিপন্থীদের ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কার করতে হবে, আমাদের শিখতে হবে খাঁটি প্রলেতারিয়ানদের মতো জীবনযাপন করতে আর খাঁটি কম্‌সমোল বনে গিয়ে তবেই কলোনি ছাড়তে, যাতে কলোনি ছেড়ে বেরিয়েও আমরা প্রলেতারিয়ান রাষ্ট্রকে মজবুত করে গড়ে তুলতে পারি।

আমার এইসব কথায় কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের অপ্রত্যাশিতরকম মনোযোগ দিতে দেখে নিজেই অবাক হলুম। বরং দেখলুম গোর্কিপন্থীরাই আমার কথা কিছুটা অন্যমনস্কভাবে শুনছে। হয়তো আমার কথাগুলো তাদের কাছে নতুন ঠেকে নি আর এই সবকিছু উপদেশ তাদের মর্মে-মর্মে একেবারে গেঁথে ছিল বলেও এমনটা হতে পারে।

কিন্তু এটা কী করে সম্ভব হল যে এ-ঘটনার সপ্তাহ-দুয়েক আগে এই একই কুরিয়াজ-বাসিন্দারা এর চেয়ে ঢের বেশি আবেগবহ ও যুক্তিনিষ্ঠ আমার আবেদন-নিবেদনে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করে নি? সত্যি, শিক্ষাবিজ্ঞান কী-যে একটা কঠিন শাস্ত্র, কী বলি! ব্যাপারটা নিশ্চয়ই এই জন্যে ঘটে নি যে এবার আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল গোর্কিপন্থীদের গোটা বাহিনী, কিংবা সাটিনের খাপে-মোড়া আমাদের পতাকা গোর্কি বাহিনীর ডানদিকে নিস্পন্দ কঠোর মূর্তিতে মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে ছিল! ওরা আমার কথায় নিশ্চয়ই এ-সবকিছুর জন্যে মন দেয় নি, তাই না? এসব নিশ্চয়ই কোনো কারণ হতে পারে না — কেননা এ-ব্যাপারের এমন ব্যাখ্যা তো শিক্ষাবিজ্ঞানের সব ক'টা স্বতঃসিদ্ধ সত্য ও উপপাদ্যের বিরুদ্ধে যায়!

যাই হোক, আমি বক্তব্য শেষ করলুম এই বলে যে ওই সময়ের আধঘণ্টার মধ্যে গোর্কি কলোনির একটি সাধারণ সভার অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে এবং মধ্যের ওই আধঘণ্টায় কলোনি-বাসিন্দারা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ও করমর্দনের সময় পাবে, তারপর একসঙ্গে তারা সভায় আসবে। আর ইতিমধ্যে আমাদের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পতাকাটিকে আমরা বাড়ির মধ্যে বয়ে নিয়ে যাব... অতঃপর নির্দেশ দিলুম:

'লাইন ভাঙো!'

গোর্কিপন্থীরা কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের কাছে এগিয়ে যাবে আর তারপর চতুর্দিকে করমর্দনের পালা যাবে শুরু হয়ে — আমার এই আশা অবশ্য পূর্ণ হল না। গোর্কিপন্থীরা লাইন ভেঙে বন্দুকের গুলির মতোই ছিটকে বেরিয়ে গেল, তারপর খ্যাপার মতো সোজা ছুট লাগাল এজমালি শোবার ঘর, ক্লাবঘর আর ওয়র্কশপগুলোর দিকে। আর কুরিয়াজ-বাসিন্দারাও তাদের প্রতি এহেন অমনোযোগ প্রদর্শনে দোষ না-ধরে গোর্কিপন্থীদের পিছু-পিছু ছুটল। কেবল কোরত্‌কভ একা তার দলবল সহ দাঁড়িয়ে রইল উঠোনে। মনে হল নিজেদের মধ্যে কী নিয়ে যেন ওরা আলোচনা করছে। ব্রেগেল আর কমরেড জোইয়া এতক্ষণ গির্জের দেয়ালটার পাশে জড়-করে-রাখা পাথরগুলোর ওপর বসে ছিলেন। ওঁদের দিকে এগিয়ে গেলুম।

ব্রেগেল বললেন, 'আপনার ছেলেরা তো রীতিমতো ফুলবাবু দেখছি।'

'কিন্তু ওদের থাকার জন্যে শোবার ঘরের বন্দোবস্ত কি হয়েছে?' কমরেড জোইয়া জিজ্ঞেস করলেন।

জবাব দিলুম, 'শোবার ঘর ছাড়াই চালিয়ে নেব'খন।' তারপর তাড়াতাড়ি অন্য একটা নতুন ঘটনার দিকে চোখ ফেরালুম।

স্থুপিত্‌সিনের বাহিনীর পরিচালনায় আমাদের শুয়োরের পাল ঠিক সেই সময়টায় মঠের সিংদরজা দিয়ে ধীর ভারিক্কি চালে ভেতরে ঢুকছিল। পালটাকে তিনটে অপেক্ষাকৃত ছোট দলে ভাগ করা হয়েছিল: প্রথমে ছিল মাদী শুয়োরের পাল, তারপর তাদের পেছনে শুয়োরছানারা, আর সবশেষে ভারি চেহারার মন্দা শুয়োররা। সঙ্গে সঙ্গে কান-এঁটো-করা হাসি নিয়ে ভোলখভ তার সাঙ্গপাঙ্গসমেত ওদের অভ্যর্থনা জানাতে ছুটল। ওদিকে দেনিস কুদ্‌লাতি ততক্ষণে আমাদের সকলের প্রিয়পাত্র পাঁচ মাসের শুয়োরছানা 'চেম্বারলেন'-এর কানের পেছনটা আদর করে চুলকোতে লেগে গেছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে ওই নামের রাষ্ট্রনীতিবিদটির কুখ্যাত চরমপত্রের স্মৃতিরক্ষার্থে ইয়ার্কি করে শুয়োরছানাটির নামকরণ করেছিলুম আমরা।

ওদের জন্যে বিশেষভাবে তৈরি খোঁয়াড়ের চালাঘরগুলোয় শুয়োরের পালটাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল। এমন সময় দেখা গেল স্থুপিত্‌সিন, শেরে আর খালাবুদা কী-একটা ব্যাপার নিয়ে গভীর আলোচনায় মশগুল হয়ে সিংদরজা দিয়ে ঢুকছেন। খালাবুদা তখন একটা হাত নেড়ে সমানে

বক্তৃতা চালিয়ে যাচ্ছেন আর অপর হাতটা দিয়ে বুকের মধ্যে চেপে ধরে রেখেছেন সবচেয়ে খুদে আর সবচেয়ে গোলাপি একটা শুয়োরছানাকে।

আমাদের দলটার দিকে এগিয়ে আসতে-আসতে খালাবুদা চ্যাঁচামেচি করে বলতে লাগলেন, 'আরে-আরে, ওয়াদের শুয়রগুলান একবার দ্যাখো দেখি! ওয়াদের ছেল্যাপিলাগুলান যদি শুয়রগুলানের অর্ধেক যুতেরও হয় তাইলিই ওয়ারা কেল্লা ফতে করব্যে-নে, এই আমি কয়্যে থুলাম!'

পাথর ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ব্রেগেল এবার কঠিন স্বরে বললেন:

'আমার তো মনে হয় কমরেড মাকারেঙ্কো শুয়োরের চেয়ে মানুষের কথাই আগে ভাবেন।'

'আমার কিন্তু তাতে সন্দেহ আছে,' কমরেড জোইয়া বললেন। 'কেননা এখানে শুয়োরদের থাকার একটা জায়গা তৈরি হয়েছে দেখছি, কিন্তু ছেলেপিলেদের থাকার জায়গার বেলায় শুনলুম — 'সে আমরা চালিয়ে নেব'খন'...'

এরকম একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কথা শুনে ব্রেগেলের যেন হঠাৎ চমক ভাঙল।

তিনি বললেন, 'জোইয়ার মন্তব্যটা কিন্তু ভারি যুতসই হয়েছে। এ-বিষয়ে কমরেড মাকারেঙ্কোর কী বলার আছে তা শুনতে পারলে ভালো হোত — তবে শুয়োরপালক মাকারেঙ্কোর নয়, অবশ্যই শিক্ষাবিজ্ঞানী মাকারেঙ্কোর বক্তব্য।'

খোলাখুলি শত্রুতার এই মনোভাব প্রকাশে হতবুদ্ধি হলেও একই রকম রূঢ়ভাবে জবাব দিয়ে এমন একটা সুন্দর দিন নষ্ট করতে প্রবৃত্তি হল না আমার।

বললুম, 'ওই-যে দুই ব্যক্তির কথা বললেন না, ওদের পক্ষ থেকে, যাকে বলে, যৌথভাবে উত্তর দেয়ার অনুমতি দেবেন কি?'

'নিশ্চয়।'

'কলোনি-বাসিন্দারা, বুঝলেন কিনা, হল গিয়ে এখানকার কত্তা, আর শুয়োররা সেই কত্তাদের রক্ষণাধীন।'

'আর আপনি কী?' অন্যদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ব্রেগেল।

'মনে তো হয় আমি কত্তাদেরই কাছাকাছির লোক।'

'কিন্তু আপনার নিশ্চয়ই শোবার একখানা ঘর আছে, তাই না?'

'আমিও শোবার ঘর ছাড়াই চালিয়ে নেব।'

বিরক্তিতে ব্রেগেলের কাঁধদুটো কুঁচকে উঠল একটু।

কমরেড জোইয়ার দিকে তাকিয়ে নিরুত্তাপভাবে তিনি বললেন, 'কথাবার্তা চালিয়ে লাভ নেই কিছু। কমরেড মাকারেঙ্কো সবকিছুকে একেবারে চরম সীমায় নিয়ে যাওয়া পছন্দ করেন।'

শুনে সজোরে হেসে উঠলেন খালাবুদা।

বললেন, 'তা, তাতে ক্ষেতিডা কী? ওনি তো ঠিক কাজই করতিছেন — সবকিছুরে একদম চরমে নিয়ি যাওয়া হবে না-ই বা ক্যানে? নরম কাজে ওনার দরকারডা কী?'

কথাটা শুনে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুচকি হাসলুম আমি। আর তাই না দেখে জোইয়া ফের আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

বললেন, 'আমি জানি না, মানুষকে শিক্ষাদীক্ষা দেয়ার আদর্শ হিসেবে শুয়োর পালাকে তুলে ধরা আপনারা খুব একটা চরম, কিংবা নরম ব্যাপার বলে মনে করেন কিনা।'

এই বলে কমরেড জোইয়া ফের তাঁর দুরন্ত ক্রোধের এঞ্জিনগুলো চালু করে দিলেন আর তাঁর ঢেলা-বের-করা চোখদুটো মনে হতে লাগল যেন প্রতি সেকেন্ডে হাজার-বিশেক বার পাক খেতে-খেতে আমাকে অনবরত এফোঁড়-ওফোঁড় করতে লেগেছে। আমি তো রীতিমতো ঘাবড়েই গেলুম। আর ঠিক এমনি সময়ে সিনেন্‌কি উত্তেজিত হয়ে গোলাপি গাল আর বিউগ্‌লখানা হাতে নিয়ে ছুটে এল আমার কাছে; তারপর একই রকম বেগে কিচিরমিচির শুরু করে দিল:

'লাপত বলতেছে... কিন্তু কভাল আবার বলতেছেন: সবুর কর! কিন্তু লাপত চটে গেছে, সে বলতেছে: তোরে যা বলা হতিছে তাই কর্, ব্যস ফুইরে গেল!.. তাম্পর সে বলে কী: জিনিসটারে যদি অমন টানাহেঁচড়া করি বার করেন... আর ছেলেপিলেরা তারাও... আর উঃ, শোবার ঘরগুলা, উঃ, কী যে সব! আর ছেলেরা বলতেছে, আমরা এসব সহ্য করতি রাজি না, তা কভাল বলতেছেন কী, তিনি আপনেরে না শুধায়ে কিছু করবেন না...'

'ছেলেরা কী বলছে আর কভাল কী বলছে তা তো বুঝলুম, কিন্তু তুমি আমাকে কী করতে বলছ তা তো বুঝছি না।'

শুনে লজ্জা পেয়ে গেল সিনেন্‌কি।

'আমি আপনেরে কিছু করতি বলতেছি না... খালি লাপত বলতেছে...'

'কী বলছে?'

'আর কভাল বলতেছেন — এ নিয়ি আমাদের কথা বলতি লাগবে...'

'কিন্তু লাপত ঠিক কী বলেছে সেটা জানা দরকার। ওটাই কিন্তু সবচেয়ে জরুরি, কমরেড সিনেন্‌কি।'

ওকে সম্বোধনের এই ধরন দেখে এত খুশি হয়ে গেল সিনেন্‌কি যে আমি ঠিক কী বলতে চাইছি তা ধরতে পারল না।

'অ্যাঁ?'

'লাপত কী বলেছে বল দেখি।'

'ও, হ্যাঁ! লাপত বলেছে: 'সভা ডাকার জানান্‌ দে'।'

'তা, এই কথাটাই প্রথমে আমায় বলা উচিত ছিল তোমার!'

'তাই তো বলতিছিলাম...'

কমরেড জোইয়া সিনেন্‌কির গোলাপি গালদুটো নিজের তর্জনী ও বুড়ো আঙুলে চেপে ধরলেন, ফলে চাপ খেয়ে ওর ঠোঁটদুটো গোলাপি গোলাপফুলের মতোই ফুটে উঠল।

'আহা রে, কী মিষ্টি বাচ্চাটা!'

সিনেন্‌কির কিন্তু ব্যাপারটা পছন্দ হল না। জোর করে জোইয়ার আদর-ভরা হাত থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে জামার হাতা দিয়ে মুখখানা মুছল সে। তারপর জোইয়ার দিকে তেরছা চোখে তাকিয়ে মুখ গোমড়া করে বলল:

'এঃ, কী কথা! বাচ্চা!.. আমি যদি আপনের গাল ধরে অমন করি তাইলে কেমন লাগে!.. আমি মোট্টেও বাচ্চা না... কখ্‌খনো না! আমি হলাম গিয়ি কলোনি-বাসিন্দা...'

বিনা আয়াসে, সহজেই বিউগ্‌ল সহ সিনেন্‌কিকে এবার কোলে তুলে নিলেন খালাবুদা। বললেন:

'বাহবা, বাহবা, এই তো চাই! তবু, তুই এট্টা কচি শোরছ্যানাই, বুঝলি!'

তার এই নতুন খেতাব কিন্তু খুশি হয়েই মেনে নিল সিনেন্‌কি — বোঝা গেল শুয়োরছানা বলাতে তার কোনো আপত্তি নেই। আর এটাও জোইয়ার দৃষ্টি এড়াল না।

'দেখা যাচ্ছে শুয়োর খেতাবটাই এখানে সবচেয়ে সম্মানের বলে মনে করা হয়।'

'আরে, যথেষ্ট হয়েছে, এবার ছাড়ান দ্যাও !' কথাগুলো বলে সিনেন্‌কিকে মাটিতে নামিয়ে দিলেন খালাবুদা।

মনে হল একটা বেশ গরম-গরম তর্ক শুরু হতে যাচ্ছে। তবে এই সময়ে কভাল আর তার পায়ে-পায়ে লাপত এসে পড়ায় তর্কটা এড়িয়ে যাওয়া গেল।

কর্তৃপক্ষস্থানীয় লোকজন সম্বন্ধে কভালের ছিল মজ্জাগত গ্রাম্য ভয়। সে ব্রেগেলের পেছনে দাঁড়িয়ে চোখ টিপে আমাকে ইঙ্গিত করতে লাগল যাতে আমি একপাশে সরে গিয়ে তার সঙ্গে একান্তে কথা বলতে পারি। কিন্তু লাপতের ওসব ভয়ডরের বালাই ছিল না। সে বলল:

'এই-যে আমাদের কভাল! এনার ধারণা ছিল পালকের গদিবিছানা দেয়া হবে এনারে। কিন্তু আমি মনে করি আসল কাজ পিছায়ে দিয়ি কোনো ফায়দা নাই। আমাদেরে এখুনি মিটিং ডাকতে হবে আর ওদেরে আমাদের ঘোষণাপত্র পড়ে শোনাতি হবে।'

একে কর্তৃপক্ষস্থানীয় তায় আবার মহিলা — যাদের সে নাকি মনে-মনে নিতান্তই মাটো দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বলে গণ্য করত — তাদের সামনে কথা বলতে বাধ্য হওয়ায় কভাল কিছুটা লাল হয়ে উঠল, তবু নিজের বক্তব্য বুঝিয়ে বলতে ছাড়ল না সে।

'তোমার ওসব পালকের বিছানাটিছানা চাইছেটা কে? ওসব বাজে বকুনি ছাড় দেখি!.. আমি যা জানতে চাই তা হল, আমাদের ঘোষণাপত্র মেনে চলতে আমরা কি ওদের বাধ্য করতে পারি? তা যদি হয় তাহলে কীভাবে তা শুরু করতে হবে? কীভাবে আমরা ওদের পাকড়াও করব — জামার কলার ধরে? শার্টের সামনেটা চেপে ধরে?'

কথা বলতে-বলতে অপ্রস্তুতভাবে কভাল বারবার ব্রেগেলের দিকে তাকাচ্ছিল। কিন্তু দেখা গেল বিপদটা ঘনিয়ে এল সম্পূর্ণ অন্য দিক থেকে।

'কী বললে? শার্টের সামনেটা চেপে ধরে?' আতঙ্কিত হয়ে উঠে ওর কথার পুনরাবৃত্তি করলেন কমরেড জোইয়া।

ফলে আরও লাল হয়ে উঠে কভাল বলল, 'না-না, ও আমার একটা কথার কথা। ওদের শার্ট নিয়ে আমার কী দরকার, শার্টফার্ট চুলোয় যাক! কালই আমি শহর-কমিটির কাছে গিয়ে বলব, ওরা যেন আমারে ফের গাঁয়ে পাঠিয়ে দেয়...'

'কিন্তু তুমি তো এইমাত্র বললে: 'আমরা ওদের বাধ্য করব'। তা, কীভাবে তোমরা ওদের বাধ্য করতে চাও শুনি?'

চটেমটে কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধে ওর ভয়ভাবনা ভুলেই গেল কভাল। উলটে একেবারে বিপরীত আচরণ শুরু করে দিল। হুড়মুড় করে তীব্র ভাষায় একগাদা আধা-অস্পষ্ট অভিযোগ দায়ের করল, তার মধ্যে 'মেয়েদের বাচালতা'কে চুলোর দোরে পাঠানো পর্যন্ত হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ পেছন ফিরে হনহন করে ক্লাবঘরের দিকে রওনা দিল, ধুলোমাখা বুটজোড়া মসমসিয়ে মঠের উঠোনের শেষ অবশিষ্ট ইটের টুকরোগুলো গুঁড়িয়ে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে।

জোইয়ার দিকে ফিরে লাপত এবার হাত দুখানা অসহায়ভাবে ছড়িয়ে দিল দু-দিকে। বলল:

'ওদেরে বাধ্য করা বলতি কী বোঝায় আমি বলতেছি আপনেরে। বাধ্য করা বলতি বোঝায় — বলতি বোঝায় — বোঝায় বাধ্য করা, এই আর-কি!'

'তাহলেই বুঝেছ! তাহলেই বুঝেছ!' চিৎকার করে বলতে-বলতে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন কমরেড জোইয়া। তারপর ব্রেগেলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, 'তাহলে? এখন কী বলার আছে তোমার?'

আমি বললুম, 'সিনেন্‌কি, মিটিঙের সংকেত বাজিয়ে দাও।'

সঙ্গে সঙ্গে খালাবুদার হাত থেকে বিউগ্‌লটা ছিনিয়ে নিয়ে সেটাকে তুলে ধরল সিনেন্‌কি, তারপর গির্জের গম্বুজের মাথায়-বসানো ক্রুশকাঠগুলোর দিকে মুখ করে যথাযথ, ভয়ঙ্কর তীব্র কয়েকটা কাটা-কাটা আওয়াজ তুলে নিস্তব্ধতা ভেঙে চুরমার করে দিল। কমরেড জোইয়া চমকে উঠে তাড়াতাড়ি কানে হাতচাপা দিলেন।

'ওহ্, ঈশ্বর! আর পারা যায় না যতসব বিউগ্‌ল, কমান্ডার আর ব্যারাকের গুঁতোয়!..'

লাপত বলল, 'ও কিছু না! আসল কথা হল কিসে কী বোঝায় তা জানলিই হল!'

মৃদুস্বরে প্রতিবাদ জানিয়ে ব্রেগেল বললেন, 'কিন্তু ঘণ্টা বাজালে তো এর চেয়ে অনেক মিষ্টি শোনাত।'

'না-না! কী যে বলেন! ঘণ্টা মিষ্টি কিসের? ঘণ্টার আওয়াজ তো বোকা-বোকা, সব্বদাই একই কথা বলে। কিন্তু এই-যে বিউগ্‌ল বাজল-না, এটা এমন এট্টা সংকেত যা শুনে বোঝা যায় — এটার অর্থ, 'সাধারণ সভা ডাকা হচ্ছে'।

এছাড়া দলপাতিদের মিটিঙের এট্টা সংকেত আছে, আরেট্টা আছে রাতে শুতে যাবার সংকেত। আর এছাড়া আরও এট্টা আছে — বিপদসংকেত! ওহ্, সে যা একখান সংকেত-না! আমাদের ভানিয়া যদি বিউগ্লে বিপদসংকেত বাজায় তো কবর ছেড়ে মড়া পর্যন্ত উঠি আসবে — যেখেনে থাকেন আপনের ছুটে না এসি উপায় নাই!'

ইতিমধ্যে কলোনি-বাসিন্দাদের ছোট-ছোট দল ঘরবাড়ি, চালাঘর আর গির্জের দেয়ালের আশপাশ আর পেছন থেকে ক্লাবঘরের দিকে আসতে শুরু করেছিল। অপেক্ষাকৃত কমবয়সীরা মাঝে-মাঝে ছুট লাগাচ্ছিল, তবে বারে-বারেই তারা থেমে যাচ্ছিল হরেকরকমের ব্যাপারস্যাপার হঠাৎ-হঠাৎ চোখে পড়ে যাওয়ায়। দেখা গেল, গোর্কিপন্থী আর কুরিয়াজ-বাসিন্দারা ইতিমধ্যেই পরস্পর মেলামেশা শুরু করে দিয়েছে আর এখানে-সেখানে তাদের মধ্যে আলাপ চলছে স্পষ্টতই গোর্কি কলোনির রকমসকমের খবর দেয়ানেয়ার সূত্রে। তবে কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের অধিকাংশই কিন্তু তখনও পর্যন্ত তফাতে-তফাতে থাকছিল।

অবশেষে সকলে এসে ভিড় জমাল আসবাবশূন্য, ঠাণ্ডা ক্লাবঘরখানায়। তবে দেখলুম গোর্কিপন্থীদের শাদা শার্টগুলো বিশেষ করে ঘরখানার প্রার্থনা-মঞ্চের আশপাশেই নজরে পড়ছে বেশি করে। বুঝলুম, তারানেত্সের নির্দেশেই অমন ব্যবস্থা করা হয়েছে। দরকার পড়লে সে যাতে তার দলবলকে এক-জায়গায় একত্রে পেতে পারে তার জন্যেই এহেন ব্যবস্থা।

ঘরটার মধ্যে গোর্কিপন্থীদের সংখ্যাগত দুর্বলতা আরও বেশি নির্মমভাবে প্রকট হয়ে উঠল। এর কারণ, আমাদের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও দশম বাহিনী তখনও পর্যন্ত কলোনি-পালিত জীবজন্তুগুলোকে তাদের নতুন খোঁয়াড়ে ঠিকমতো স্থিতু করার ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে ছিল, তাছাড়া আমাদের 'রাব্ফাক' ছাত্রছাত্রীর গোটা দলটিকে বাদ দিয়েও আরও জনা-বিশেক ছেলে অসাদ্চির নেতৃত্বে তখনও রয়ে গিয়েছিল রিজোভ স্টেশনে। এর ফলে সভায় উপস্থিত চার শো জনের মধ্যে গোর্কিপন্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল মাত্র জনা-পঞ্চাশেকের মতো। অবশ্য আমি গোর্কিপন্থী মেয়েদের এই হিসেবের মধ্যে ধরি নি। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে কুরিয়াজের মেয়েরা আমাদের মেয়েদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিল মর্মস্পর্শী স্নেহ-ভালোবাসা, চুম্বন আদানপ্রদান আর স্বাগত সম্ভাষণের মধ্যে দিয়ে। ওল্গা লানভার অত্যন্ত সযত্ন তত্ত্বাবধানে সাজানো-

গ্ছনো মেয়েদের এজমালি ঘরে তাদের থাকার জায়গা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল কুরিয়াজের মেয়েরা।

সভা শ্রুর হওয়ার কথা ঘোষণা করার আগে জোর্কা ভোল্কভ ফিস্ফিস করে আমায় শ্বধোল:

'আমরা কি সরাসরি যা বলার বলব?'

'হ্যাঁ, যা বলার সরাসরি বল!'

প্রার্থনা-মঞ্চের ওপর উঠে গেল জোর্কা, তারপর যাকে আমরা ইয়ার্কি করে 'ঘোষণাপত্র' নাম দিয়েছিল্ম সেটি পড়বার তোড়জোড় করতে লাগল। এই প্রস্তাবটি পাশ করেছিল আমাদের কম্সমোল সংগঠন। প্রস্তাব রচনার ব্যাপারে জোর্কা, ভোলখভ, কুদ্লাতি, জেভেলি আর গোর্কভ্স্কির উদ্যোগ আর জ্ঞানব্দ্ধির অশেষ ভাণ্ডার অসামান্য কাজে লেগেছিল। তারা মিলিয়েছিল ব্যাপ্ত র্শ দ্ষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মার্কিনদেশীর যোগ্য হিসেবনিকেশ আর তার সঙ্গে ঢালাওভাবে মিশিয়ে দিয়েছিল আমাদের নিজস্ব গোর্কিপন্থী গোলমরিচ, কমরেডশোভন ভালোবাসা আর এরই ফাঁকে-ফাঁকে বেশ কিছ্ পরিমাণে স্নেহশীল, কমরেডস্লভ নিষ্ঠুরতাও।

'ঘোষণাপত্র'টিকে তখনও পর্যন্ত 'গোপন দলিল' হিসেবে গণ্য করা হচ্ছিল, যদিও সেটি নিয়ে আলোচনায় কত-যে লোক যোগ দিয়েছিল তার ঠিকঠিকানা নেই। প্রস্তাবটি নিয়ে কুরিয়াজে আমাদের পরিচালক-ব্যরোর সভাগ্লিতে ফিরে-ফিরে বারে-বারে আলোচনা হয়েছিল, তাছাড়া কলোনিতে ফিরে যাওয়ার পর আমি কভাল আর আমাদের কম্সমোলের সক্রিয় কর্মীদের সঙ্গে বসেও ওটি ফিরেফিরতি পড়ে ও খতিয়ে দেখেছিল্ম।

যাই হোক, সেদিন সভার শ্রুতে জোর্কা ম্খবন্ধ হিসেবে নিচের কথাগ্লি বললে:

'কমরেড কলোনি-বাসিন্দাগণ, অযথা ধানাই-পানাই করে সময় নষ্ট করতে চাই না! কেবল কোথা থেকে যে শ্রু করব তা ব্ঝতে পারতেছি না, ধ্ত্তেরি ছাই! আমি বরং তোমাদেরে কম্সমোল সংগঠনের প্রস্তাবখান পড়ে শ্নায়ে দিই, তাইলে তোমরা নিজিরাই ব্ঝতে পারবে কোথা থেকে আমাদের শ্রু করতে হবে আর সবকিছ্ কেমনভাবে চলবে। এখন তোমরা কাজ করতেছ না, তোমরা এখন না-কম্সমোল না-পাইওনিয়র। ধ্ত্তেরি, তোমরা এখন নোংরার মধ্যি গড়াগড়ি দিতেছ। তোমরা যে কী চিজ্ তাই জানতি ইচ্ছা

করে! জানতি ইচ্ছা করে, তোমাদেরে কী চোখে দেখা উচিত আমাদের! দেখা উচিত বোধ করি ছারপোকা, উকুন, তেলাপোকা, নীলমাছি আর যতরকম পোকামাকড় আছে তাদের সব্বাইর খাদ্য হিসাবে!'

'কিন্তু এয়া কি আমাদের দোষ?' কে একজন চেঁচিয়ে বলল।

জোর্‌কা কিন্তু দমবার পাত্র নয়, চটপট এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সে জবাব দিল:

'নিশ্চয়! তোমাদের দোষ বৈকি! এ তো তোমাদেরই দোষ! নিষ্কম্মা পরগাছা, ছিঁচকাঁদ্‌নে আর হতচ্ছাড়া হয়ি বেড়ে ওঠার কী অধিকার আছে তোমাদের? কোনো অধিকার নাই! তোমাদের একবারে কোনো অধিকার নাই, এই হল গিয়ে ব্যাপার! আর কী নোংরার মধ্যি তোমরা বাস করতেছ একবার তাকায়ে দেখ দেখি! এমন নরকে বাস করার অধিকার আছে কার? আমাদের শুয়রগুলোরে প্রতি হপ্তায় আমরা সাবান দিয়ি ছ্যান করাই। দেখে তোমাদের শেখা উচিত! তা কী ভাবো, ছ্যান করতি নারাজ এমন একটাও শুয়র আছে মনে কর নাকি? নাকি ভাবো একটা শুয়রও বলে: তোমার ওই সাবান-টাবান নিয়ি চুলায় যাও তুমি? মোট্টেও তা বলে না! বরং খুশি হয়ে সেলাম করি বলে: ধন্যবাদ! আর তোমরা? মাস-কয়েকের মধ্যি এক-টুকরা সাবান তো চক্ষেই দেখ নাই তোমরা!..'

'কেউ আমাদেরে সাবান দেয় না!' ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন বলে উঠল। বোঝা গেল, আঁতে ঘা লেগেছে তার।

শুনে জোর্‌কার চাঁদপানা গোল মুখখানা — ক'দিন আগে শ্রেণীশত্রুর সঙ্গে রাতের সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ায় কালশিটের দাগে-ভরা মুখখানা ওর — যেন কালো আর লম্বাটে হয়ে উঠল। ও বলল:

'তা, তোমাদেরে সাবান দিবেটা কে? সাবান দেয়া কার কাজ, শুনি? এখেনকার মালিক তো তোমরাই! তোমাদের কী লাগবে না-লাগবে সে তো তোমাদেরই ঠিক করা উচিত!'

'আর তমাদের মালিকটা কে, শুনি? মাকারেঙ্কো!' হঠাৎ কে যেন জিজ্ঞাসা করল। আর সঙ্গেসঙ্গেই ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল সে।

যেদিক থেকে গলার আওয়াজটা এসেছিল সেইদিকে মাথা ঘোরাল সবাই, কিন্তু যে-জায়গাটা থেকে আওয়াজ এসেছিল মাথা-ঘোরানোর ফলে তৈরি কতগুলো বৃত্ত ছাড়া সেখানে আর কিছুই নজরে এল না। কেবল হলের

মাঝামাঝি জায়গায় অল্প কয়েকটা মুখে বেশ আত্মতৃপ্ত ব্যঙ্গের হাসি ফুটে থাকতে দেখা গেল।

এবার একগাল হেসে দিল জোর্‌কা। বলল:

'তোরা একপাল রামছাগল, তাই না? আন্তন সেমিওনভিচরে আমরা বিশ্বাস করি, কারণ তিনি আমাদেরই একজন, আর সবাই আমরা মিলিমিশি কাজ করি। তোদের মধ্যি যে ওই প্রশ্নটা শুধালি সে একটা আস্ত বোকাপাঁঠা! তবে ঘাবড়ানোর কিছু নাই, আমরা বোকাপাঁঠাদেরে পর্যন্ত শিখায়ে-পড়ায়ে নিতি পারব। আসলে ওয়ার মতন ছোঁড়ারা কোনো কম্মের না, তারা খালি ইঁতিউঁতি চায় আর ব্যা-ব্যা করি শুধায়: 'ওগো আমার মালিক কনে গেল গো?''

আচমকা দমকা হাসির দাপটে হলঘরখানা গমগম করে উঠল। বোকাটে মুখে শূন্য চোখে রাস্তার একটা গবা ছেলে সর্বত্র তার মালিককে খুঁজে বেড়াচ্ছে — এই রকম একটা চরিত্রে জোর্‌কার একমুহূর্তের অভিনয় একেবারে অপ্রতিরোধ্য রকমের মজাদার হয়ে উঠেছিল।

ফের শুরু করল জোর্‌কা:

'সোভিয়েত দেশে প্রলেতারিয়ান আর শ্রমিকই হল গিয়ে মালিক। কিন্তু তোরা? তোরা খালি রাষ্ট্রের যোগান-দেয়া খাবার প্যাটে পুরতেছিস আর কাজের মধ্যি কাজ করতেছিস কী — না, পায়খানা করে মাটি নোংরা করতেছিস। হুতোমপ্যাঁচার রাজনৈতিক চেতনা যতখানি তোদেরও তাই!'

ইতিমধ্যে আমি অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছিলুম। ভাবছিলুম, জোর্‌কা কি কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের একটু বেশি গালাগালি দিয়ে ফেলছে না? ওদের সঙ্গে আর-একটু নরম সুরে কথা বললেই কি ও ভালো করত না? আর ঠিক এই সময়ে সেই এক নাগাল-এড়ানো গলা ফের শোনা গেল:

'আচ্ছা, আচ্ছা, আমরাও দ্যাখব তরা কেমনধারা হাগিস!'

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্বেষে-ভরা চাপা একটা হাসির ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল সারা হলে, আর তার সঙ্গে কিছু-কিছু মুখে ফের ফুটে উঠল সবজান্তার আত্মতুষ্ট হাসি।

'ইচ্ছা হলি তাও দেখতে পারিস,' গাম্ভীর্য বজায় রেখে সহৃদয়তার ভাব দেখিয়ে জোর্‌কা বলল। 'পায়খানার ধারে আমি একখান আরামকেদারা রেখে দেব-নে, তোরা তাতে বসি ভালো করে ঠাহর করতি পারিস। এতে তোদের

উবগারই হবে, কেননা তোরা তো পায়খানা পর্যন্ত ব্যাভার করতি জানিস না। পায়খানা ঠিকঠিক ব্যাভার করতি পারা মস্ত কিছু বড় ব্যাপার না, তবু সব্বাইরে তা শিখতি হয়, বুঝলি!'

শুনে কুরিয়াজ-বাসিন্দারা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, তবু ওর কথার ধরনে না-হেসে পারল না। একে অপরকে জাপটে ধরে আনন্দে দুলে-দুলে তারা হাসতে লাগল। ওদিকে মেয়েরা 'ও মা' বলে আর্তনাদ করে উঠে বক্তা যে তাদের লজ্জাবোধকে পীড়িত করেছে তা বোঝাতে মঞ্চের দিকে পেছন ফিরে বসল। একমাত্র গোর্কিপন্থীরাই সংযত গর্বভরা চোখে জোর্কার দিকে তাকিয়ে নিতান্ত সুরুচিবোধেই হাসি চাপল নিজেদের।

প্রাণভরে হেসে নেয়ার পর কুরিয়াজ-বাসিন্দারা এবার যে-চোখে জোর্কার দিকে তাকাল তা আগের চেয়ে অনেক বেশি আন্তরিকতায়-ভরা আর আতিথ্যে পূর্ণ ছিল। ওদের ভাবখানা এমন ছিল যে জোর্কার কাছ থেকে সেইমাত্র ওরা যা শুনল তা যেন সত্যিসত্যিই একটা গ্রহণযোগ্য আর প্রয়োজনীয় কর্মসূচি।

মানুষের জীবনে যে-কোনো কর্মসূচির ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ-সংসারে নিতান্তই নির্বোধ-যে সে-ও যখন অনির্দিষ্ট তেপান্তরের মাঠে পড়ে পাহাড়, গিরিখাত, জলাজমি আর উলুখাগড়ার বনের মধ্যে চলার মতো সামান্য একটুখানি পথের হদিশ পায়, তখন সঙ্গেসঙ্গেই খুশি হয়ে উঠে সে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা শুরু করে দেয়। ওই পথটুকু নিতান্তই পায়ে-চলা পথ হোক, কিংবা নানানতরো বাঁক, ব্রিজ, পথের ধারের সাজানো বাগান আর সাইনপোস্টওয়ালা পাকা রাস্তাই হোক তা ওই পথিককে তার নিজের কাজকর্মের সুনির্দিষ্ট স্তর নিয়ে পরিকল্পনায় নিয়োজিত করে। এমন কি প্রকৃতি স্বয়ং তার চোখে বেশি তাৎপর্যময় হয়ে উঠতে শুরু করে, কেননা পথিক ইতিমধ্যে চিনতে শেখে বাঁ-দিক আর ডানদিক, দীর্ঘ আর হ্রস্বতর পথ।

আমরাও ভবিষ্যতের যে-কোনোরকম পরিকল্পনার — এমন কি এক-চিমটে স্বাদু মশলার কিংবা এককণা মিষ্টত্বের মিশেল নেই যাতে তারও — গুরুত্ব ইচ্ছাকৃতভাবেই মেপে দেখেছিলুম, আর এই মনোভাব নিয়েই কম্‌সমোল সংগঠনের পূর্বোক্ত ঘোষণাপত্রটি ছকে ফেলা গিয়েছিল। অবশেষে জোর্কা সেই ঘোষণাপত্রটি সভায় পড়া শুরু করল।

'গোর্কি' শ্রম-কলোনির ল.ন.ক.ল*-এর পরিচালন-কেন্দ্রের
গৃহীত প্রস্তাব — ১৫ মে, ১৯২৬ সাল

'১। আদি গোর্কিপন্থীদের সকল বাহিনী এবং সেইসঙ্গে কুরিয়াজের সকল বাহিনী ভেঙে দেয়া হল বলে অতঃপর গণ্য হবে এবং অবিলম্বে নিম্নোল্লিখিত সদস্য সহ কুড়িটি নতুন বাহিনী গঠন করতে হবে... (অতঃপর জোর্কা প্রতিটি বাহিনীতে ভাগ-ভাগ করে কলোনি-বাসিন্দাদের নামের একটা তালিকা পড়ল আর প্রতি বাহিনীর দলপতির নামটা আলাদা করে উল্লেখ করে গেল।)

'২। কমরেড লাপত দলপতি-পরিষদের সম্পাদক থাকছে। দেনিস কুদ্‌লাতি থাকছে সরবরাহ ম্যানেজার আর আলেক্সেই ভোল্‌কভ ভাণ্ডারী।

'৩। দলপতি-পরিষদকে দেখতে হবে যেন আলোচ্য প্রস্তাবের সব ক'টি নির্দেশ যথাযোগ্যভাবে পালিত হয় এবং প্রথম আঁটিবাঁধার উৎসবের দিনে কলোনিটিকে শিক্ষা-সংক্রান্ত জনকমিশারিয়েত ও আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী কমিটির প্রতিনিধিবৃন্দের হাতে নিখুঁত শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় তুলে দিতে হবে। প্রথম আঁটিবাঁধার উৎসবের ওই দিনটিও যথাযোগ্যভাবে উদ্‌যাপন করতে হবে।

'৪। প্রাক্তন কুরিয়াজ-কলোনির সদস্যদের কাছ থেকে সর্বপ্রকার জামাকাপড়, অন্তর্বাস, বিছানার চাদর, কম্বল, গদি, তোয়ালে, ইত্যাদি যাবতীয় ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির অবিলম্বে, অর্থাৎ ১৭ মে বিকেলের মধ্যে, দখল নিয়ে তা নির্বীজনের কাজ সারতে হবে এবং পরে সেগুলির রিফু, মেরামত ইত্যাদি করতে হবে।

'৫। আদি গোর্কি কলোনির মেয়েদের তৈরি শর্ট্‌স আর স্পোর্ট্‌স-শার্ট সকল কলোনি-বাসিন্দাকে দেয়া হবে। এছাড়া দ্বিতীয় প্রস্থ এই পোশাক দেয়া হবে এক সপ্তাহের মধ্যে — প্রথম প্রস্থ পোশাক কাচতে দেয়ার সময়।

'৬। মেয়ে-সদস্যরা বাদে সকল কলোনি-বাসিন্দার চুল প্রায় মাথা মুড়িয়ে ছেঁটে দেয়া হবে। চুল ছাঁটার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় পরার জন্যে তারা ভেল্‌ভেটের বাটিটুপি পাবে।

* ল.ন.ক.ল — লেনিনবাদী নওজোয়ান কমিউনিস্ট লীগ। — অনুঃ

'৭। সকল কলোনি-বাসিন্দাকে — যে যেখানে পারে — আজ স্নান সারতে হবে। ধোপাখানা মেয়েদের হেফাজতে ছেড়ে দেয়া হবে।

'৮। প্রনো স্কুলবাড়িতে যাবতীয় মেরামতির কাজ শেষ করা আর নতুন এজমালি শোবার ঘরগ্লো সরঞ্জামে সাজিয়ে না-ফেলা পর্যন্ত কলোনি-বাসিন্দাদের সব ক'টি বাহিনীকে নিজ-নিজ দলপতির সম্মতিক্রমে ঘরের বাইরে, ঝোপের নিচে কিংবা তাদের পছন্দমতো অন্য কোনো জায়গায়, রাত্রিবাস করতে হবে।

'৯। বাহিনীগ্লিকে আদি গোর্কি কলোনি থেকে আনা গদি, কম্বল আর বালিশে শ্তে হবে। বিছানাগ্লি বাহিনীগ্লির সদস্যদের বিনা তর্কে কিংবা তা পর্যাপ্ত নয় এহেন অন্যোগ ছাড়াই নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিতে হবে।

'১০। ঘ্মনোর উপয্ক্ত খাটবিছানা নেই এমন অন্যোগ করা চলবে না। সমস্যার য্ক্তিসম্মত সমাধান খ্ঁজে বের করতেই হবে।

'১১। কলোনি-বাসিন্দাদের দ্ই শিফ্‌টে বাহিনীওয়ারি ভাবে খেতে হবে। খাওয়ার স্বিধার জন্যে এক বাহিনী থেকে নাম কাটিয়ে অন্য বাহিনীতে যোগ দেয়া চলবে না।

'১২। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষার দিকে কড়া নজর রাখতে হবে।

'১৩। পয়লা অগস্ট পর্যন্ত একমাত্র দর্জিখানা ছাড়া অপর কোনো ওয়র্কশপে কাজ চলবে না। ওই তারিখের আগে নিম্নলিখিতগ্লিই হবে আমাদের একমাত্র কাজ। যথা:

'মঠের চারপাশের পাঁচিল ভেঙে ফেলতে হবে এবং ওই ইট দিয়ে তিন শো শ্য়োর থাকার উপযোগী একটা খোঁয়াড় বানাতে হবে।

'সব ক'টা জানলার ফ্রেম, দরজা, রেলিঙ্ আর খাট রঙ করতে হবে।

'ফসলের খেতে আর সব্‌জি-বাগানে কাজ করতে হবে।

'আসবাবপত্র মেরামত করতে হবে।

'উঠোন এবং টিলার গড়ানে ধারগ্লো পরিষ্কার করতে হবে, পায়ে-চলা পথ ও ফুলবাগান তৈরি করতে হবে। একটি হট্‌হাউসও বানাতে হবে।

'প্রতিটি কলোনি-বাসিন্দার জন্যে ভালো একপ্রস্থ করে পোশাক তৈরি করাতে হবে এবং শীতের জন্যে ব্টও কিনতে হবে। গ্রীষ্মকালে সকল কলোনি-বাসিন্দা খালিপায়ে চলাফেরা করবে।

'পুকুরটা এমনভাবে পরিষ্কার করতে হবে যাতে তাতে স্নান করা সম্ভব হয়।

'টিলার দক্ষিণের গড়ানে জমিতে একটা নতুন বাগান তৈরি করতে হবে।

'পয়লা অগস্ট থেকে ওয়র্কশপগুলোয় ব্যবহার করার জন্যে লেদ-মেশিন, কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির যোগান সম্পূর্ণ করে তুলতে হবে।'

বক্তব্যের আপাত-সরলতা সত্ত্বেও ঘোষণাপত্রটি সবাইকে গভীরভাবে প্রভাবিত করল। তার নিরাভরণ যথাযথতায় ও কাজ আদায়ের কঠিন সুরে এমন কি আমরা — তার রচয়িতারাও — চমৎকৃত হলুম। তদুপরি এটা সঙ্গে সঙ্গে সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠল (কুরিয়াজ-বাসিন্দারা তো এটা বিশেষ করে বুঝতে পারলই) যে গোর্কিপন্থীরা এসে পড়ার আগে আমাদের চুপচাপ ভাব ও নিষ্ক্রিয় আচরণ আসলে দৃঢ় সংকল্পের এবং হাতের কাছে যা-কিছু সহায়-সম্পদ ছিল তার যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার সহ আমাদের গোপন প্রস্তুতির মুখোশমাত্র ছিল।

কম্‌সমোলের ছেলেরা নতুন বাহিনীগুলিতে সদস্য সমাবেশ ঘটিয়েছিল চমৎকারভাবে। জোর্‌কা, গোর্‌কভ্‌স্কি ও জেভেলির তিন মাথার মিলিত প্রতিভার জোরে তারা কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের একেবারে যতদূরসম্ভব যথাযথভাবে বিভিন্ন বাহিনীতে বেঁটে দিয়েছিল। অর্থাৎ, এই বাঁটোয়ারার সময় তারা সর্বপ্রকার বন্ধুত্বের সূত্র, শত্রুতার দূরত্ব এবং ব্যক্তিগত স্বভাব, প্রবণতা, ইচ্ছে-অনিচ্ছে ও খেয়ালিপনা ইত্যাদি সবকিছুই হিসেবের মধ্যে ধরেছিল। আমাদের অগ্রবর্তী মিশ্র বাহিনী যে গোটা-দুই সপ্তাহ এজমালি শোবার ঘরগুলোয় ঘুরে বেড়িয়েছিল তা এমনি-এমনি ছিল না।

আদি গোর্কিপন্থীদেরও একই রকম বিবেকবুদ্ধি নিয়ে বাহিনীতে-বাহিনীতে ভাগ করে দেয়া হয়েছিল। সবল-দুর্বল, চটপটে ও ঢিলেঢালা, গম্ভীর আর হাসিখুশি, সত্যিকার মানুষ ও তার কাছাকাছি শ্রেণীর লোক — এদের সকলকেই নানাবিধ বিবেচনা অনুযায়ী যথানির্দিষ্ট স্থান করে দেয়া হয়েছিল।

ঘোষণাপত্রের জোরালো ধারাগুলো এমন কি বহু আদি গোর্কিপন্থীকেও অবাক করে দিয়েছিল, আর জোর্‌কার সেগুলো আওড়ানোর কায়দায় কুরিয়াজ-বাসিন্দারা তো হয়ে গিয়েছিল পুরো ঘায়েল। ঘোষণাপত্রটি পড়া

হচ্ছিল যখন তখন শ্রোতাদের মধ্যে কেউ-কেউ তাদের কান-এড়িয়ে-যাওয়া কোনো কথা পাশের ছেলেপিলের কাছ থেকে জেনে নিচ্ছিল, কেউ-বা আবার পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ডিঙি মেরে বারে-বারে পেছন ফিরে তাকাচ্ছিল অবাক হয়ে, আর বিশেষ একেকটা কড়া নির্দেশ পড়া হচ্ছিল যখন তখন থেকে-থেকে বিস্ময়সূচক 'ওহ্' শব্দ শোনা যাচ্ছিল। জোর্কার পড়া শেষ হতে হলে হঠাৎ নৈঃশব্দ্য নেমে এল, তবে সে নৈঃশব্দ্য ছিল অব্যক্ত নানা প্রশ্নে স্পন্দিত। যথা, আমাদের কী করা উচিত এখন? মেনে নেব? না প্রতিবাদ জানাব, হৈ-হল্লা শুরু করে দেব? হাততালি দেব? হাসব? নাকি গালিগালাজ, বাপান্ত করব?

ভালোমানুষের মতো কাগজটা ভাঁজ করে ফেলল জোর্কা। আর ফোলা-ফোলা পাতার নিচে লাপতের চোখদুটো ব্যঙ্গভরে, গভীর মনোযোগের ভঙ্গিতে গোটা জনতার ওপর দিয়ে পাক খেয়ে এল, ওর মুখে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল জ্বালা-ধরানো একটা হাসি। লাপত বলল:

'না, এটা আমার পছন্দ না! আমি হলাম গিয়ি ঘাগী গোর্কিওয়ালা! নিজির খাট-বিছানায়, নিজির কম্বলে অভ্যস্ত আমি! আর এখন কিনা আমারে বলা হচ্ছে ঝোপের নিচি শুতে! কিন্তু সেই ঝোপটা কোথায়, শুনি? কুদ্লাতি, তুই তো আমার দলপতি — তা, বল্ শুনি সেই ঝোপটা কোথায়?'

'তোর জন্যি বিশেষ এট্টা ঝোপের কথা অনেক দিন থেকে ভেবে রেখেছি আমি!'

'তা, সেই ঝোপে কি কোনো ফলফুলুরি ফলে? ঝোপটা বোধহয় চেরি কিংবা আপেলগাছের, তাই না? আশা করি সেখেনে নাইটিঙ্গেল পাখিও আছে... কুদ্লাতি, সে-ঝোপে নাইটিঙ্গেল আছে তো?'

'এখনও নাইটিঙ্গেল আসে নাই সেখেনে, তবে চড়ুই আছে গাদাখানেক।'

'গাদাখানেক চড়ুই? আরে রামোঃ! চড়ুইয়ের আমি বড়-এট্টা ভক্ত না। ওদের গান অতি বাজে, তাছাড়া ওরা ভারি অগোছালো, বুঝলি! নিদেনপক্ষে তুই ওখেনে এক-আধটা সোনাফিঞ্চ কিংবা আর কোনো পাখি ছেড়ে দে!'

হাসতে-হাসতে কুদ্লাতি বলে, 'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে, তোরে এট্টা সোনাফিঞ্চ দেব-নে।'

যেন সহানুভূতি পাওয়ার আশায় চারপাশে একবার তাকাল লাপত। তারপর বলল, 'আর তাছাড়া... তা, আমাদের বাহিনী তো তৃতীয়, তাই না?

নামের ফর্দখান একবার দেখা যাক তো! উঁ-হুঁ-হুঁ... এই তো তৃতীয়... বাহিনীতে আছে এক, দুই, তিন... সবসুদ্ধ আটজনা খোদ গোর্কিওয়ালা। কাজেই আমাদের বাহিনীতে থাকছে আটখান কম্বল, আটখান বালিশ আর আটখান গদি, অথচ সবসুদ্ধ আছে বাইশটা ছোঁড়া। এই সব কাণ্ডমাণ্ড আমার পছন্দ না! আচ্ছা, কে-কে আছে একবার দেখা যাক তো! আচ্ছা — স্তেগ্‌নি! তা, কোথায় স্তেগ্‌নি? হাত তোল, হাত তোল! গতরখান তুলে এদিকে এসে পড় দেখি! এসে পড়, এসে পড়, ভয়ের কিছু নাই!'

প্রার্থনা-মঞ্চের ওপর এবার হুড়মুড়ম করে উঠে এল যে-ছেলেটি তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সুদূর প্রস্তর-যুগের আমল থেকে সে না করেছে স্নান না-চুল কেটেছে। ছেলেটার মাথায় ছিল রোদে জ্বলে-যাওয়া শাদাটে চুল আর তার গায়ের স্বাভাবিক রঙ, রোদে পোড়ার ছোপ আর ধুলোময়লা সবকিছু মিলেমিশে তার গালের ওপর এমন পুরু একটা পরদা পড়েছিল যাতে এমন কি ফাট ধরার চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। স্পষ্টতই অপ্রস্তুত হয়ে ধুলোর সরপড়া পা-দু'খানা নিয়ে আর দাঁত-বের-করা লজ্জার হাসি হাসতে-হাসতে মঞ্চে এসে দাঁড়াল স্তেগ্‌নি। তারপর ঝকঝকে শাদা দাঁত নিয়ে একদৃষ্টে সকলের দিকে তাকিয়ে রইল।

'অ! তাইলে তোর সাথে আমারে কম্বল ভাগাভাগি করে শুতি হবে! তুই বোধহয় ঘুমের মধ্যি বেশি জোরে লাথ ছুড়িস না, তাই না?'

স্তেগ্‌নির ঠোঁটে লালার বুদ্বুদ ফুটে উঠল। হাতের মুঠোদুটো তেলকালিতে কালো হয়ে থাকায় হাত দিয়ে ঠোঁটের লালা মোছার সহজ প্রবণতা থেকে বিরত হয়ে সে তার অসম্ভব লম্বা আর ছেঁড়াখোঁড়া শার্টের নিচের ঝুলটা দিয়ে মুখটা ঘষল।

'আমি ল-লাথ ছুড়ি না...'

'খুব ভালো কথা! তা, কমরেড স্তেগ্‌নি বল্ দেখি, যদি বিষ্টি নামে তাইলে আমরা কী করব?'

'পলাব, হি-হি-হি...'

'কিন্তু পালাবটা কোথায়?'

একমুহূর্ত ভেবে স্তেগ্‌নি আম্‌তা-আম্‌তা করে বলল:

'তার আমি কী জানি?'

লাপত এবার দুশ্চিন্তাভরা চোখে দেনিসের দিকে তাকাল।

'বিষ্টি নামলে আমরা যাব কোথায়, দেনিস?'

শুনে দেনিস এগিয়ে এল। তারপর ধূর্তামিভরা ইউক্রেনীয় ভঙ্গিতে চোখদুটো সরু-সরু করে সভার শ্রোতাদের দিকে তাকাল। বলল:

'এমনধারা ব্যাপার ঘটলে অন্য দলপতিরা যে কী করবে তা আমার জানা নাই। সত্য কথা বলতে কী, ঘোষণায় এই ব্যাপারটা খেয়াল করা হয় নাই বলিই মনে নিতেছে। তবে তোমাদেরে এই পস্ট কথাটা আমি বলতি পারি — যদি বিষ্টি নামে বা অমন কোনো ঝামেলা বাধে, তৃতীয় বাহিনীর তাতে ভয় করার কিছু নাই। কেননা নদী আমাদের খুব কাছে, আর আমি তখন বাহিনীটারে সোজা নিয়ে গিয়ি নদীতে নামাব। আর একবার নদীতে গিয়ি নামলে বিষ্টিতে আমাদের কাঁচকলা ক্ষেতি হবে, আর যদি জলে ডুব দিই তো কথাই নাই, বিষ্টির ফোঁটা আমাদের গায়িই লাগবে না। কাজেই নদীতে নামা যেমন নিরাপদ তেমনই খুবই স্বাস্থ্যকর।'

এই বলে নিতান্ত ভালোমানুষি-ভরা চোখে লাপতের দিকে এক-লহমা তাকিয়ে একপাশে সরে গেল দেনিস। আর লাপত, হঠাৎ যেন রাগে জ্ঞানহারা হয়ে গেছে এমন ভাবে, স্তেপ্‌নির দিকে ফিরে চিৎকার করে উঠল। স্তেপ্‌নিকে দেখে মনে হচ্ছিল এতগুলো অস্বাভাবিক গোলমেলে ঘটনার জট খোলার চেষ্টায় তার যেন বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়েছে।

'অ্যাই, শুনছিস — অ্যাই?'

লাপতের চিৎকারে হুঁশ ফিরে পেয়ে হঠাৎ খুশি হয়ে উঠল স্তেপ্‌নি। বলল, 'শুন্‌তেছি তো।'

'তাইলে শুনে রাখ্‌! আমার কম্বলেই আমরা দু-জনায় ঘুমাব, তা যা থাকে কপালে! তবে তার আগে তোরে নদীতে নিয়ে গিয়ি ফেলে ভালোরকম ঘষামাজা করব আর তোর লোম ছাঁটাই করব। বুঝেছিস?'

'বুঝেছি,' হেসে জবাব দিল স্তেপ্‌নি।

এতক্ষণে লাপত তার ভাঁড়ামির মুখোশ খুলে ফেলল। মঞ্চের আরও সামনে এগিয়ে এসে বলল:

'তাইলে, সবকিছু পরিষ্কার বোঝা গেছে তো?'

'একবারে পরিষ্কার!' কয়েকটা দিক থেকে একসঙ্গে জবাব এল।

'খুব ভালো কথা! তাইলে, সবকিছুই যখন পরিষ্কার, তখন মন খুলে কথা কওয়া যাক। এই প্রস্তাবটা অবিশ্যি খুব-যে একটা... মজাদার জিনিস

তা নয়। তবু আমাদের সাধারণ সভারে এটা পাশ করাতি লাগবে — এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নাই।'

এই বলে হতাশাব্যঞ্জক একটা করুণ ভঙ্গি করে কাঁদো-কাঁদো ধরা-গলায় ফের সে বলল:

'জোর্‌কা, ভোট নে!'

হাসিতে ঝমরে উঠল গোটা সভা। এবার জোর্‌কা হাত তুলল। বলল:

'আচ্ছা, ভোট নিতেছি। যারা-যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে তারা-তারা হাত তোল!'

হাতের অরণ্যে ঢেকে গেল সভা। তীক্ষ্ণ, একাগ্র দৃষ্টিতে আমার রক্ষণাধীন সেই বিশাল জনশক্তির প্রতিটি আনাচকানাচ আতিপাতি করে সন্ধান করতে লাগলুম আমি। দেখলুম, সবাই প্রস্তাবের সপক্ষে ভোট দিয়েছে, এমন কি দরজা-ঘিরে-দাঁড়ানো কোরত্‌কভের দলটা পর্যন্ত। মেয়েরাও হাত তুলে আছে — কমনীয় হাতের ঝাঁক দেখিয়ে, হাসিহাসি মুখে, মাথাগুলি একপাশে হেলিয়ে। কিন্তু আমি তাজ্জব বনে গিয়েছিলুম — কোরত্‌কভের দল কী মনে করে প্রস্তাবের সপক্ষে ভোট দিচ্ছে? কোরত্‌কভ স্বয়ং দাঁড়িয়ে ছিল দেয়ালে হেলান দিয়ে ধৈর্য ধরে হাতখানা তুলে, সুন্দর চোখদুটো মঞ্চের-ওপর-দাঁড়ানো আমাদের ছেলেদের দিকে শান্তভাবে নিবদ্ধ করে।

বরভোয়ের আকস্মিক আবির্ভাবে ওই মুহূর্তটির আনুষ্ঠানিক গাম্ভীর্য যেন কিছুটা ক্ষুণ্ণ হল। বেপরোয়া স্ফূর্তি নিয়ে চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল বরভোয়, ফলে তার হাতের প্রকাণ্ড অ্যাকর্ডিয়নটা থেকে কানফাটানো একটা আওয়াজ উঠল।

ঘরে ঢুকেই সে চেঁচিয়ে উঠল, 'আহা-আহা! মালিকরা এসি গ্যাছেন দেখতেছি! খাড়ান একমিনিট... আমি এট্টা অভ্যথনার... বাজনা বাজাব্য — এট্টা বাজনা... জানা আছে আমার...'

এমন সময় কোরত্‌কভ তার হাতখানা বরভোয়ের কাঁধে নামিয়ে রাখল, তারপর তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে কী যেন ইঙ্গিত করল। অমনি মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে চুপ করে গেল বরভোয়। তবে অ্যাকর্ডিয়নখানা বাজাবার জন্যে তৈরি অবস্থায় হাতে ধরে রইল। অর্থাৎ, যে-কোনো মুহূর্তে বাজনা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়ে গেল।

জোর্‌কা অবশেষে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করল।

'কম্‌সমোল সংগঠনের প্রস্তাবের সপক্ষে ভোট পড়েছে — তিন শত চুয়ান্ন। বিপক্ষে — একটাও না। কাজেই আমরা ধরে নিতি পারি যে প্রস্তাবটি সব্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়ি গেছে।'

গোর্কিপন্থীরা হাততালি দিল, পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় করল হাসি-হাসি চোখে। ওদিকে কুরিয়াজ-বাসিন্দারা মত-প্রকাশের এমন একটা অভিনব পদ্ধতির সুযোগ নিল আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে। মঠের প্রতিষ্ঠার পর সম্ভবত এই প্রথম তার গম্বুজাকার ছাদের ভেতরটা গমগম করে উঠল মানবিক যৌথের সম্মতিসূচক হাততালির প্রাণমাতানো আওয়াজে। বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত কমবয়সীরা হাততালি দিল অনেকক্ষণ ধরে, আঙুলগুলো টানটান করে ছড়িয়ে দিয়ে — হাত দুখানা একবার মাথার ওপর তুলে ধরে, একবার কানের পাশে নিয়ে এসে। যতক্ষণ-না জাদোরভ মঞ্চে উঠে দাঁড়াল ওদের হাততালি চলল ততক্ষণ।

জাদোরভ-যে কখন কলোনিতে এসে পৌঁছেছিল আমি তা লক্ষ্য করি নি। মনে হল, রিজোভ থেকে সে কোনো কিছু ঘাড়ে করে বয়ে এনেছে, কারণ তার মুখে আর জামাকাপড়ে কিসের যেন শাদা-শাদা ছোপ লেগে ছিল। আগেও যেমন তেমনই তখনও ওকে দেখে কেমন একটা অকলঙ্ক শুভ্রতা ও খোলামেলা সহজ আনন্দের অভিভাব জাগছিল আমার মনে। আর ওইদিনও বক্তৃতা শুরু করার আগে ও সভার দিকে তাকিয়ে ওর সম্মোহনী হাসি হাসল। তারপর বলতে শুরু করল:

'বন্ধুগণ, আমি অল্প কয়েকটা কথা বলতে চাই। তা হল এই: আমি হচ্ছি একেবারে গোড়ার দিকের একজন গোর্কিপন্থী, আর-সকলের চেয়ে বয়সে বড় আর একসময়ে ছিলাম সবচেয়ে গুঁচা। সম্ভবত সেকথা আন্তন সেমিওনভিচের খুব ভালো করেই মনে আছে। আর এখন আমি প্রযুক্তিবিদ্যার ইন্‌স্টিট্যুটে একজন ছাত্র। কাজেই আমার কথা শুনতে পার তোমরা — এইমাত্র তোমরা ভারি চমৎকার একটা প্রস্তাব পাশ করেছ, বলতে পারি, দারুণ একটা প্রস্তাব। তবে বিশ্বাস কর, প্রস্তাবটা ভারি কড়া — ওহ্‌, নিদারুণ কড়া প্রস্তাব বটে একখানা!'

বলে মাথা নাড়ল জাদোরভ, যেন প্রস্তাবটার কাঠিন্যে পীড়িত হয়ে পড়েছে সে। প্রীতিপূর্ণ নরম হাসি উঠল হল জুড়ে। জাদোরভ বলে চলল:

'কিন্তু কড়া হোক বা না হোক, প্রস্তাব তোমরা পাশ করে ফেলেছ। আর

পাশ যখন করে ফেলেছ তখন তার আর চারা নেই! এটা কিন্তু তোমাদের মনে রাখতে হবেই। হয়তো তোমাদের কেউ-কেউ এখন ভাবছ — এখন তো প্রস্তাব পাশ করলাম তারপর সেটাকে কাজে লাগাব কিনা তা সময়কালে ভাবা যাবে। কিন্তু এমন কথা যে ভাবতে পারে সে মানুষ না, সে একটা ছুঁচো! আমাদের আইন অনুযায়ী সাধারণ সভায় পাশ-করা প্রস্তাব যে-ছেলে মানে না তার পক্ষে একমাত্র পথ হল — গেটের বাইরে পালানো! গেট দিয়ে সে স্বচ্ছন্দে বাইরে চলে যেতে পারে!'

শাদা-হয়ে-যাওয়া ঠোঁটদুটো সজোরে টিপে রইল জাদোরভ। তারপর মুঠিবাঁধা হাতখানা মাথার ওপর তুলল।

'গেটের বাইরে চলে যাক সে!' কর্কশ কণ্ঠে কথাগুলো বলে ওপরে-তোলা হাতখানা সজোরে নিচে নামিয়ে আনল।

হলের জনতা চুপ মেরে গেল। আরও নতুন কী ভীতিপ্রদর্শন হয়, বোধহয় তার অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু ইতিমধ্যে ভিড় ঠেলে কারাবানভকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। তারও সারা গায়ে কী-যেন একটা মাখানো ছিল, তবে এ-জিনিসটা ছিল কালোরঙের। হতচকিত সেই স্তব্ধতার মধ্যে কারাবানভ শুধোল:

'গেট দিয়ে কারে বার করে দিতে হবে? বল্, এক-লহমায় কাজটা সেরে ফেলি!'

'জাদোরভ কথাটা সাধারণভাবে বলেছে আর-কি,' তৈলাক্ত গলায় ফোড়ন কাটল লাপত।

'কাজটা আমি সাধারণভাবে করতে পারি আবার তুই যেভাবে চাস সেভাবেও করতে পারি,' কারাবানভ বলল। 'কিন্তু তোরা সবাই এখেনে আঠাসাঁটা হয়ে বসে আছিস-যে বড়, মেলায় গাঁয়ের পুরোতদের মতন মনমরা ভাব করে?'

'আমরা বেশ আছি!' কে যেন একজন চেঁচিয়ে বললে।

'অ! বেশ আছিস, তাই বুঝি? তা, তাইলে মাথাগুলো অমন লট্‌কিয়ে পড়েছে কেন? গান-বাজনা কই?'

'এই যে, এই যে, এইখেনে বাজনা!' খুশি হয়ে এবার চেঁচিয়ে উঠল বরভোয়। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকর্ডিয়নটায় ছোট্ট একটা ঝঙ্কারও তুলে দিল।

'অ! তাইলে বাজনাও আছে! এস, তাইলে সবাই মিলে গোল হয়ে দাঁড়ানো যাক! মেয়েরা, তোমরাও চলে এস, চুল্লির ধারে বসে গা সেঁকা বন্ধ

কর এবার! হোপাক নাচ নাচতে পারে কে? নাতাল্‌কা, প্রিয়সখি, চলে এস! ছেলেরা, দ্যাখো, আমাদের নাতাল্‌কা কেমনধারা মেয়ে দ্যাখো একবার!'

ছেলেগুলো চন্‌মন করে উঠে নাতাশা পেত্রিয়েঙ্কোর শয়তানি বুদ্ধিতে-ভরা স্বচ্ছ চোখ, লম্বা-লম্বা বেণী আর ঝলমলে হাসির ফাঁকে বেরিয়ে-পড়া তার বাঁকা গজদন্তটির দিকে তাকিয়ে রইল।

'তাইলে, কমরেড-সব, তমরা হোপাক নাচির বাজনা চাও, কেমন তো?' ওস্তাদ বাজনদারের সূক্ষ্ম হাসি নিয়ে শুধোল বরভোয়। আর ফের একবার তার অ্যাকর্ডিয়ন সজোরে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

'তা, তুমি কী চাও তাই বল না?'

'আমি ওয়াল্‌ত্‌সের বাজনা বাজাতি পারি, পায়ির তালঠোকা নাচির বাজনাও পারি, স্প্যানিশ নাচির বাজনাও বাজাতে পারি অক্লেশে — সবরকম বাজনাই বাজাতি পারি আমি!'

'পায়ের তালঠোকা নাচ পরে হবে-নে। খুড়ো, এখন তুমি হোপাক নাচের বাজনা ধর দেখি!'

নাচ সম্বন্ধে কারাবানভের এহেন শাদামাটা রুচির পরিচয়ে প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে মুচকি হেসে বরভোয় মাথাটা একপাশে হেলিয়ে একমুহূর্ত খালি ভেবে নিল, তারপর আচমকা হাতের বাজনাটাকে টেনে লম্বা করে সম্পূর্ণ নিজস্ব ধরনের একটা ছটফটে কাটা-কাটা নাচের সুর ধরে দিল। ওদিকে কারাবানভ হাতদুটো ছড়িয়ে দিয়ে ইউক্রেনীয় নাচের পরিচিত ভঙ্গিতে আধ-বসা অবস্থায় প্রচণ্ড উত্তেজিতভাবে প্রাণ খুলে পাদুটো একবার পেছনে একবার সামনে ছুড়ে নাচ শুরু করল। আর নাতাশার চোখের পাতাগুলো একমুহূর্ত প্রজাপতির ফুরফুরে ডানার মতো পিটপিট করে উঠল আর চোখদুটো নিজের লজ্জারাঙা গালদুটোর ওপর নিবদ্ধ হল। কারও দিকে দৃকপাতমাত্র না-করে নোঙরছেঁড়া নৌকোর মতো মেঝের ওপর দিয়ে যেন ভেসে চলে এল সে, ঝুলওয়ালা স্কার্টের ইস্ত্রি-করা ভাঁজগুলো তার দুলে-দুলে একটু-একটু ঘুরতে লাগল। মেঝের কাঠের তক্তায় জুতোর গোড়ালি ঠুকে আওয়াজ তুলে, মুখে বিজয়ীর হাসি নিয়ে সেমিওন নাতাশার চারপাশে ঘুরে-ঘুরে নাচ শুরু করল। মেঝেয় দ্রুত-ঠুকে-চলা ওর গোড়ালির আওয়াজে ভরে উঠল ঘর, এমন মাথা-খারাপ-করা দ্রুততায় ওর প্রবল বাঙ্ময় পা-দুটো চতুর্দিকে ঘুরতে লাগল যে মনে হল মাত্র একজোড়া পা নয় পুরো এক-ডজন পা-ই বুঝি অনবরত

সামনে-পেছনে লাথি ছুড়ে চলেছে। নাতাশা একবার তার চোখদুটো তুলল, তারপর নাচের সঙ্গীর দিকে এমন একটা দৃষ্টি হানল যা মেয়েরা বিশেষ করে হোপাক নাচে ব্যবহারের জন্যেই জমিয়ে রাখে। সে দৃষ্টির অর্থ খানিকটা এইরকম: 'দেখতে তো তুমি দিব্যি ছেলেটি, নাচতেও তো জানো দেখছি — তবে সাবধান কিন্তু, শেষপর্যন্ত এ'টে উঠতে পারবে তো?..'

বরভোয় তার বাজনার লয় দ্রুত করে তুলল, শেষপর্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল সেমিওন আর নাতাশা তার খুশির লাগাম আলগা করে দিল। তার স্কার্ট এখন আর অল্প-অল্প দুলছিল না, বরং তার পায়ের চারপাশে ভাঁজে-ভাঁজে ঢেউ খেলিয়ে চক্রাকারে ঘুরছিল। কুরিয়াজ-বাসিন্দারা ইতিমধ্যে তাদের বৃত্তটাকে ছড়িয়ে আরও বড় করে তুলেছিল। এখন জামার হাতায় দ্রুত নাক মুছতে-মুছতে উত্তেজিত কিচিরমিচির শুরু করে দিয়েছিল সবাই মিলে। অ্যাকর্ডিয়নের ঝমঝমে সুর আর হোপাক নাচের প্রবল গতিবেগ সারা ঘর জুড়ে ক্রমশ বড়-বড় বৃত্তের আকারে ছড়িয়ে পড়তে লাগল আর তার বাজনার মাতাল-করা ছন্দ ঘরের গম্বুজাকার ছাদে ফিরতে লাগল ধাক্কা খেয়ে।

আর হঠাৎ এই সময়ে দেখা গেল দর্শকদের ভিড়ের একেবারে মধ্যিখান থেকে একজোড়া ছড়িয়ে-দেয়া হাত এলোমেলোভাবে জনস্রোত ঠেলে এগিয়ে আসছে। তবে সে জনস্রোতও ছিল অনুকূল, পথ করে দেয়ার জন্যে ব্যস্ত। আর দেখতে-দেখতে পিয়েরেত্‌স দুই হাত কোমরে রেখে, পা ছুড়ে তাল দিতে-দিতে আর নাতাশার দিকে একবার চোখ টিপে ঢুকে পড়ল নাচের ঘূর্ণিতে। আর শান্ত, সহৃদয় নাতাশা আধবোঁজা চোখের ফাঁকে পিয়েরেত্‌সের মুখের ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে তার একেবারে নাকের কাছে ছুড়ে দিল ওর তুষার-শাদা এমব্রয়ডারি-করা জামার হাতাটা। তারপর হঠাৎ একগাল হাসল, হাসল সেই সরল সখ্যে-ভরা প্রাজ্ঞ ও বুঝদার বন্ধুর হাসি, হাসল কম্‌সমোল-সদস্যের হাসি, যেন পিয়েরেত্‌সের দিকে বাড়িয়ে দিল সে সাহায্যের হাত।

এমন একখানা দৃষ্টি আর এমন হাসিতে সাড়া না-দিয়ে পারল না পিয়েরেত্‌স। একমুহূর্ত, যেন একমুহূর্তের অন্তহীন অবসরে অস্বস্তিভরে সে একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখল, তারপর নিজের ভেতরকার বাধাকে অগ্রাহ্য করেই যেন হঠাৎ পাগলের মতো শূন্যে লাফ দিয়ে উঠল সে আর বহুকালের পুরনো টুপিটা মাটিতে ছুড়ে ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়ল নাচের ঘূর্ণিঝড়ে। দেখে সেমিওন একগাল হাসল, আর মনে হল নাতাশা যেন

কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের মুখে তুড়ি মেরে আরও দ্রুত বন্‌বন ঘুরতে লেগেছে। পিয়েরেত্‌স তার নিজের উদ্‌ভাবিত কয়েকটা নাচের তাল দেখাল — প্রথমে মজাদার ব্যঙ্গের ইঙ্গিত-দেয়া আর চোর-বদমায়েশদের জগৎ ও তার ধরনধারণের প্রচ্ছন্ন আভাসমাখানো সে নাচ।

আর ঠিক তখনই আমার চোখের দৃষ্টি খুঁজতে-খুঁজতে পেয়ে গেল কোরত্‌কভকে। সদাসতর্ক চোখদুটো কুঁচকে ছিল ও, ফর্সা কপালটা থেকে কাঁপা-কাঁপা ঠোঁটদুটোয় ওর প্রায় ধরা যায়-কি-যায় না এমন ছায়ার আনাগোনা চলছিল। হঠাৎ একবার গলাটা ঝাড়ল ও, তারপর চারপাশে তাকাল। আর স্থিরদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে-থাকা আমার চোখে চোখ পড়ায় হঠাৎ ও পথ করে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। এগিয়ে আসতে-আসতে আমাদের মধ্যে যখন একটিমাত্র ছেলের ব্যবধান রইল তখন ও হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে ধরা-ধরা গলায় বললে:

'আন্তন সেমিওনভিচ, আজ আপনারে 'কেমন আছেন' বলা হয় নাই আমার।'

হাসিমুখে, ওর চোখে চোখ রেখে বললুম, 'কী খবর, ভালো তো?'

নাচের দিকে একবার ফিরে তাকাল ও। তারপর জোর করে ফের আমার দিকে তাকাল, মাথাটা ঝাঁকাল একবার, আর প্রাণপণে গলাটাকে মিঠে করে কথা বলার চেষ্টা করল। তবু সেই শুকনো, খরখরে গলাই বেরুল। বলল:

'ওঃ, অরা যা নাচতিছে-না — কুত্তির বাচ্চাগুলান!..'

৯

ধর্মান্তরণ

সাধারণ সভা শেষ হবার সঙ্গেসঙ্গেই ধর্মান্তরকরণের কাজ শুরু হয়ে গেল আর তা শেষ হতে লাগল আরও তিন ঘণ্টা। বলতে গেলে যে-কোনো ধরনের ধর্মান্তরণের পক্ষে এটা একটা রেকর্ড করার মতো অল্প সময়।

জোর্‌কা হাত নেড়ে যেই জানান দিল যে মিটিঙ শেষ হয়ে গেল অমনি ক্লাবঘরে একটা হৈচৈ-চিৎকার উঠল। আঙুলে ভর দিয়ে ডিঙি মেরে দাঁড়িয়ে দলপতিরা গলা ছেড়ে নিজ-নিজ বাহিনীর সদস্যদের ডাকাডাকি করতে লাগল।

ঘরের মধ্যে তৈরি হয়ে গেল গোটা-বিশেক ঘূর্ণিস্রোতের কেন্দ্র। আর প্রথম কয়েক মুহূর্ত এই স্রোতের ধারাগুলো কখনও মুখোমুখি মিশে গিয়ে কখনও-বা একে অপরের পাশ কাটিয়ে পুরনো গির্জেটার চার-দেয়ালের মধ্যে পাগলের মতো এদিক-সেদিক ছুটে বেড়াতে লাগল। এইভাবে একসময় ঘরখানার কোণে-কোণে বিভিন্ন বাহিনীর মিটিঙ গেল শুরু হয়ে — চুল্লির পাশে, দেয়ালের নানা খাঁজে, কিংবা সরাসরি ঘরের মাঝখানে মেঝের ওপর। আর প্রতিটি দঙ্গলে নোংরা, ধুলোমাখা পাঁশুটে রাস্তার ছেলের ভিড়ের মধ্যে ধীরেসুস্থে নড়াচড়া করতে দেখা গেল অল্প কয়েকটি গোর্কিপন্থীর শাদা শার্টে-মোড়া সুপুষ্ট কাঁধগুলো।

অতঃপর কলোনি-বাসিন্দারা ক্লাবঘর থেকে উঠোনে বেরিয়ে এসে শোবার ঘরগুলোর দিকে রওনা দিল। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে ক্লাবঘরে আর উঠোনে পূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল, কেবল থেকে-থেকে সে-নৈঃশব্দ্য ভাঙতে লাগল কিছু-কিছু বার্তাবহ বালক-দেবদূতের নিজ-নিজ বাহিনীর বিশেষ কাজ উপলক্ষে এদিক-সেদিক দৌড়োদৌড়ির ফলে।

আমিও সেই ফাঁকে হাঁফছাড়ার কিছুটা সময় পেয়ে বাঁচলুম।

গির্জের সিঁড়ির ওপর বসে-থাকা মহিলাদের দলটার দিকে এগিয়ে গেলুম, যাতে ওই উঁচু জায়গাটা থেকে ঘটনার গতি-পরিণতি ভালো করে লক্ষ্য করতে পারি। কথা বলার আর ভাবনাচিন্তার হাত থেকে সাময়িকভাবে রেহাই পাওয়া — ওই মুহূর্তে এর চেয়ে বেশি কিছু আমার আর কাম্য ছিল না। সিঁড়ির মাথায় উঠে দেখলুম দুশ্চিন্তা দূর হওয়ায় একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না আর লিদচ্‌কা ভারি খুশি। কমরেড জোইয়ার অফুরন্ত প্রশ্নের জবাব দিয়ে চলেছেন তাঁরা ঢিলেঢালাভাবে, আর জবাব দিয়ে প্রশ্নকর্ত্রীকে মোটেও সন্তুষ্ট করতে পারছেন না। ব্রেগেল দাঁড়িয়ে ছিলেন সিঁড়ির রেলিঙে ভর দিয়ে। শুনলুম তিনি গুলিয়ায়েভাকে বলছেন:

'জাঁকজমকের এই ঠাট আপাতদৃষ্টিতে শৃঙ্খলার একটা ভাব-যে গড়ে তুলেছে তা টের পাচ্ছি। কিন্তু এতে হলটা কী? এ তো একেবারেই ওপর-ওপর ব্যাপার।'

শুনে গুলিয়ায়েভা মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল। বলল:

'আন্তন সেমিওনভিচ, আপনিই এর উত্তর দ্যান! এসব ব্যাপার আমি ভালো বুঝি নে।'

'তত্ত্বকথায় আমি নিজেও বিশেষ পটু নই,' কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না, তবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবাব দিলুম।

শুনে কেউ কোনো কথা বলল না। আর এর ফলে একমুহূর্তের তুচ্ছাতিতুচ্ছ খণ্ডাংশের একটুখানি অবসর জুটে গেল আমার। ফলে চারপাশটা একটুখানি তাকিয়ে দেখার আর আমরা যাকে বিশ্বজগৎ বলে থাকি সেই বিস্ময়কর বস্তুটা এক-নজর পর্যবেক্ষণের একটা সুযোগ ঘটে গেল। তখন দুপুর প্রায় দুটো। পুকুরটার অপর পাড়ে গ্রামখানার ঘরবাড়ির খড়ের চালগুলো আরামে রোদ্দুর পোয়াচ্ছিল। কুরিয়াজ মঠের ওপরকার আকাশে কেবল শাদা-শাদা ছোট-ছোট মেঘ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মনে হচ্ছিল মেঘগুলোকে যেন বিশেষ হুকুম দিয়ে ওইখানে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে — দরকার পড়লে যাতে তাদের জলের সঞ্চয় কাজে লাগানো চলে।

ওই মুহূর্তে কলোনিতে যে কী ঘটছিল তা আমি জানতুম। ছেলেরা এজমালি শোবার ঘরগুলোয় বিছানাপত্র গুটিয়ে তুলছিল, গদি আর বালিশ পিটিয়ে খড়কুটো বের করে ফেলছিল আর সবকিছু বেঁধে ফেলছিল পুঁটলি করে। কম্বল, বিছানার চাদর, নতুন আর পুরনো বুটজুতো — সবকিছুই পুঁটলি করে বাঁধা হচ্ছিল। আর গাড়ি রাখার আটচালায় আলিওশা ভোল্‌কভ এই সবকিছু জঞ্জাল হাত পেতে নিচ্ছিল, তার বিবরণ ইত্যাদি লিখে রাখছিল খাতায়, তারপর তা পাঠিয়ে দিচ্ছিল বীজাণুনাশক চেম্বারে। বীজাণুনাশক এই চেম্বারটি শহর থেকে আমাদের পাঠানো হয়েছিল। চেম্বারটির নিচে ছিল চাকা লাগানো। সেটি কাজ করছিল ফসল-মাড়াইয়ের চালায়। এ-কাজের ভার ছিল দেনিস কুদ্‌লাতির ওপর। এদিকে গির্জের অপর দিকের সিঁড়ির চাতালে দাঁড়িয়ে নামের তালিকা মিলিয়ে-মিলিয়ে দ্‌মিত্রি জেভেলি বিভিন্ন বাহিনীর দলপতি কিংবা তাদের সহকারীদের হাতে নতুন পোশাক আর সাবান তুলে দিচ্ছিল।

নানারকম দায়িত্বের ভারে ন্যুব্জ সিনেন্‌কি হঠাৎ এই সময় গির্জের দেয়াল ঘুরে ছুটতে-ছুটতে আমার কাছে এল।

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে হাতের বিউগ্‌লখানা নাড়তে-নাড়তে সে দ্রুত বলে গেল, 'তারানেত্‌স আমারে বলতেছে খাবারঘরে দলপতি-পরিষদের মিটিঙ ডাকার সংকেত বাজাতি।'

'ঠিক আছে, বাজাও।'

অদৃশ্য ডানায় ঝাপট দিয়ে খাবারঘরের দরজায় যেন উড়ে চলে গেল সিনেন্‌কি। তারপর দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে তিন সুরের একটা সংক্ষিপ্ত সংকেত বার-কয়েক বাজিয়ে দিলে।

ব্রেগেল এতক্ষণ সকৌতূহলে সিনেন্‌কির কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিলেন। এবার আমার দিকে ফিরে বললেন:

'ওকে কী বলে — সংকেত না কী — তাই বাজাতে বাচ্চাটি বারবার আপনার অনুমতি চাইছে কেন?.. যতই যাই হোক, এ তো একটা তুচ্ছ ব্যাপার!'

'এটাই আমাদের নিয়ম — নিয়মিত কর্মসূচিতে নেই এমন প্রতিটি সংকেতের কথা আগে থেকে আমাকে জানাতে হয়। এটা আমার জানা দরকার।'

'অবশ্য এই সবকিছুই বেশ... কী বলব?.. চমক দেয়ার মতো জাঁকালো। কিন্তু এ-সবই তো দেখানেপনা মাত্র। এটা আপনি স্বীকার করেন তো?'

ভেতরে-ভেতরে চটে উঠতে লাগলুম। এমন একটা দিনে এরা আমায় এমন জ্বালাতন করে মারছে কেন? তাছাড়া, ওদের উদ্দেশ্যটাই-বা কী? পুরনো কুরিয়াজ কলোনি আর রইল না বলে দুঃখ হচ্ছে? নাকি? কে জানে!

'আপনার এইসব পতাকা, ড্রাম আর স্যালুট -- বাচ্চাদের এসব ওপর-ওপর সংগঠিত করে মাত্র।'

ইচ্ছে হচ্ছিল চিৎকার করে বলি: 'চুপ করুন দেখি!' কিন্তু কার্যত তা না করে অপেক্ষাকৃত সৌজন্যসূচক উত্তরেই নিজেকে নিবদ্ধ রাখলুম। বললুম:

'মনে হচ্ছে অল্পবয়সীদের, নাকি বলব বাচ্চাদের, আপনারা একধরনের বাক্স বলে মনে করেন। তার একটা বাইরের দিক বা মোড়কের মতো কিছু-একটা আছে, আর আছে ভেতরের দিক বা নাড়িভুঁড়ি। মনে হয় আপনারা ভাবেন আমাদের শুধু তাদের নাড়িভুঁড়ির দিকেই নজর দিতে হবে অন্য কিছুর দিকে নয়। অথচ এটা বোঝেন না যে ওই মূল্যবান নাড়িভুঁড়ি যদি ঠিকমতো মোড়কে মোড়া না-থাকে তাহলে তা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়।'

খাবারঘরের দিকে ছুটে-চলা ভেত্‌কোভ্‌স্কির চেহারার দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে থেকে ব্রেগেল বললেন:

'যা-ই আপনি বলেন তাতেই কেমন ফৌজী প্রশিক্ষণ স্কুলের গন্ধ পাওয়া যায়...'

'দেখুন, ভার্‌ভারা ভিক্তরভ্‌না,' আমার পক্ষে যতদূর সম্ভব ততদূর বিনীতভাবে বললুম, 'আমাদের এ-ধরনের আলোচনা বোধহয় আর না-করাই ভালো। মানে... ইয়ের সাহায্য না-নিয়ে আমাদের আলোচনায় কোনো লাভ নেই।'

'কিসের সাহায্য না-নিয়ে?'

'দোভাষীর সাহায্য না-নিয়ে।'

ব্রেগেলের প্রকাণ্ড পাঁশুটেরঙের চেহারাখানা হাঁসফাঁস করে রেলিঙের ঠেকো থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল, তারপর দ্রুত আমার দিকে নেমে এল। হাতদুখানা পেছনে মুঠো বেঁধে দাঁড়িয়ে রইলুম আমি। উনি কিন্তু গলার কাছের কোনো একটা জায়গা থেকে জোর করে এক-টুকরো হাসি কুড়িয়ে নিয়ে চোখ খারাপ থাকলে লোকে যেভাবে ধীরেসুস্থে চশমাজোড়া পরে নেয় সেইভাবে ঠোঁটে সেঁটে নিলেন হাসিটা। তারপর বললেন:

'দোভাষী পেতে দেরি হবে না, কমরেড মাকারেঙ্কো!'

'তাহলে দোভাষীর জন্যে অপেক্ষা করা যাক!'

সিংদরজার দিক থেকে প্রথম বাহিনীটি এই সময়ে আমাদের দিকে আসছিল। বাহিনীর দলপতি গুত্‌ গির্জের সিঁড়ির দিকে দ্রুত এক-নজর তাকিয়ে নিয়ে চেঁচিয়ে কাকে যেন শুধোল:

'এই দরজা কখনও ব্যাভার করা হয় নাই তাই বলতেছিলি-না, উস্তিমেঙ্কো?'

বছর পনেরোর ময়লারঙের একটি ছেলে — তারই নাম উস্তিমেঙ্কো। দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলল:

'না, না... বলত্যেছি তো, না। এ-দরজা কেউ কোনোদিন ব্যাভার করে নাই। সব্বদাই তালাবন্ধ থাকতি দেখ্যেছি এডারে। ওইডা, আর হু-ই দরজাডা ওয়ারা ব্যাভার কর্যেল, কিন্তু এডারে একদম ব্যাভার করে নাই। আমার কথা বিশ্বেস কর ক্যানে!'

পেছন থেকে আর কে যেন বলল, 'দরজাটার ওধারে আলমারি আছে। মোমবাতি আর কী-কী সব যেন...'

সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে ওপরে উঠে গেল গুত্‌। তারপর সিঁড়ির সবচেয়ে ওপরের চাতালে উঠে টাল সামলে দাঁড়িয়ে হেসে বলল:

'এয়ার চেয়ে ভালো জায়গা আর মিলবে কোথায়? আহ্‌, যা তোফা একখান বেবস্তা হবে না! এমন চমৎকার একখান চাতাল ফালতু পড়ি আছে।

আর বিশ্টি হলি তারও প্রেতিকার আছে, ছাদ আছে মাথার উপর... অবিশ্যি শোওয়ার পক্ষি মাটিটা বোধহয় এট্টু শক্ত। নাকি তেমন শক্ত না, কী বলিস?'

পুরনো গোর্কিপন্থী ও গুতের বাহিনীর একজন ঝানু জুতো-কারিগর কার্পিন্স্কি চাতালের পাথরে-বাঁধানো মেঝেটার দিকে খুশিভরা চোখে তাকিয়ে বলে উঠল:

'মোট্টেও শক্ত না। আমাদের ছয়খান গদি আর ছয়খান কম্বল মজুত আছে। দরকার পড়লি — কে জানে — আর ক'খান হয়তো যোগাড় করি নিতি পারি।'

'তা হয়তো পারি,' গুত্ সায় দিল।

তারপর ওখান থেকেই টিলার নিচের পুকুরের দিকে মুখ করে নিচের কথাগুলো ঘোষণা করে দিল:

'সবাই শুনে রাখ্! এই চাতালডা প্রেথম বাহিনী দখল করি নেছে। ব্যাস, ফুইয়্যে গেল! আন্তন সেমিওনভিচ, আপনে কিন্তু আমার কথার সাক্ষী রলেন।'

'ঠিক আছে!'

'তাইলে আমরা এখন কাজ শুরু করতি পারি... দাঁড়া একমিনিট... এখেনে কে-কে আছে তাই আগে দেখা যাক!..'

পকেট থেকে নামের একটা ফর্দ টেনে বের করল গুত্।

'স্লিভা আর খ্লেব্চেঙ্কো — তোদেরে ভালো করে একবার ঠাহর করে দেখি তো!'

দেখা গেল খ্লেব্চেঙ্কো ছেলেটি দেখতে ছোটখাট, রোগা আর ফ্যাকাশে। ওর সোজা-সোজা কালো চুলগুলো কপালের ওপর নেমে এসে তারপর খাড়া হয়ে সামনের দিকে দাঁড়িয়ে আছে আর নাকটা কালো-কালো তিলে ভর্তি। পরনের নোংরা লম্বা শার্টখানা ওর হাঁটু পর্যন্ত ঝুলে ছিল, আর যেখানে-যেখানে শার্টের নিচের সেলাই ছিঁড়ে গিয়েছিল সেখানে-সেখানে সেটা ঝুলে ছিল আরও নিচু পর্যন্ত। অপ্রস্তুতভাবে হাসছিল ছেলেটা আর বারবার ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকাচ্ছিল। খুঁটিয়ে দেখার চোখ দিয়ে ওর দিকে তাকাল গুত্, তারপর ফিরল স্লিভার দিকে। দেখা গেল স্লিভা খ্লেব্চেঙ্কোর মতোই রোগা, ফ্যাকাশে আর ছেঁড়া-নোংরা জামা-পরা, তবে রীতিমতো লম্বা। ওর লম্বাটে, সরু মাথাটা যতদূরসম্ভব সরু গলার ওপর বসানো ছিল, অথচ

ছেলেটার ঠোঁটদুটো ছিল যেমন মোটা-মোটা তেমনি লাল। মাটির দিকে চোখ নামিয়ে হাসিহাসি মুখে ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে ছিল স্লিভা।

'ভগা জানে, তোদেরে এখেনে কী খেতি দেয়া হয়,' গুত্ মন্তব্য করল। 'সবাই তোরা এমন হাড্ডিসার ক্যানে?.. রাস্তার কুত্তার মতনই তোরা দেখি হাড়পাঁজরা বার-করা। বাহিনীটারে ভালো করি খাওয়াতে লাগবে, আস্তন সেমিওনভিচ। এভারে কি বাহিনী নাম দেয়া চলে? এমনধারা এট্টা প্রেথম বাহিনী আমাদের কিছুতি থাকলি চলবে না। কিছুতিই না! তা, খাবারদাবার তো আমাদের যথেষ্ট আছে, তাই না? ঠিক আছে, তাইলে। তা, খাবার কী করি পেটে পুরতি হয় তোরা নিশ্চয়ই তা জানিস, কী বল্?'

বাহিনীতে হাসির হর্‌রা উঠল। ফের একবার গুত্ স্লিভা আর খ্লেব্‌চেঙ্কোর মুখের দিকে সন্দেহভরা চোখে তাকাল। তারপর গলায় মধু ঢেলে বললে:

'স্লিভা আর খ্লেব্‌চেঙ্কো, বাপধনেরা, শোন্ বলি। এই চাতালখান ধুয়ে সাফ করতি হবে — এখ্‌খুনি! তা, কী দিয়ি ধোয়া হয় তা জানিস তো? জল দিয়ি। আর জল আনতি লাগবে কী করে? বালতি করে। কার্‌পিন্‌স্কি — যা, দৌড় দে দেখি! মিত্‌কারে গিয়ি ক' — আমাদেরে ঘরমোছার ন্যাতা আর বালতি দিতি। আর একখান ঝাড়ু আনিস মনে করে!.. মেঝে কী করে পরিষ্কার করতি হয় তা জানিস তো?'

স্লিভা আর খ্লেব্‌চেঙ্কো দু-জনেই ঘাড় নাড়ল। অতঃপর গুত্ আমাদের দিকে ফিরে মাথার টুপি খুলে হাতটা অনেকখানি দোলাল। বলল:

'প্রিয় কমরেডগণ, আমাদেরে কিন্তু মাপ করতি হচ্ছে। প্রেথম বাহিনী এই জমিটার দখল নেছে, এর আর চারা নাই। তা, এই জায়গা জুড়ি এখন বড়রকম ধোয়ামোছার পালা চলবে বলে আমি আপনেদেরে আরেট্টা সোন্দর জায়গা দেখায়ে দেব-নে, সেখেনে গিয়ি বেঞ্চিতে বসতি পর্যন্ত পারবেন আপনেরা। তবে এ-জায়গায় থাকা যাবে না, এয়া প্রেথম বাহিনীর এক্তিয়ারে চলি গেছে।'

গোটা প্রথম বাহিনী দারুণ প্রশংসার দৃষ্টিতে সৌজন্যের এই অনুষ্ঠান তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখল, উপভোগ করল। বেঞ্চিওয়ালা সুন্দর জায়গাটা আমাদের দেখিয়ে দেবে বলায় গুত্‌কে আমি ধন্যবাদ জানালুম, তবে জায়গাটায় আর যেতে চাইলুম না।

বালতি ঝনঝন করতে-করতে কার্পিন্স্কি দৌড়ে ফিরে এল। বারান্দা ধোয়া সম্পর্কে শেষ নির্দেশ জারি করার পর গুত্ খুশির সুরে হাত নেড়ে বললে:

'তাইলি, এখন চুল কাটার পালা!'

গির্জের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে-আসতে ব্রেগেল সারাক্ষণ নিঃশব্দে একমনে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। আমি মনে-মনে কামনা করছিলুম অতিথিরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেন বিদায় নিয়ে চলে যান। যে-চাতালটার সামনে জেভেলি তার 'দোকান' খুলে বসেছিল সেখানে বাহিনীগুলোর প্রতিনিধি ও তাদের সহকারীরা ওই সময়ে লাইন লাগিয়েছিল। আর 'মুটেরা' যে-যার কাঁধে শর্টস আর শার্টের নীল আর শাদারঙের বোঝাগুলো তুলে নিচ্ছিল, ঝনঝন আওয়াজ করে বালতিগুলো তুলছিল আর প্রত্যেকে বগলের নিচে চেপে ধরে ছিল সাবানের বাদামি বাক্সগুলো। ওই জায়গাটাতেই সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে ছিল জেলা কার্যনির্বাহী কমিটির ফিয়াট গাড়িখানা। আর বসে-থেকে-থেকে ক্লান্ত মোটর-ড্রাইভার ঘুমঘুম চোখে ব্রেগেলের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল গাড়িতে।

নিঃশব্দে মঠের সিংদরজার দিকে হেঁটে চললুম আমরা। কোথায় যে যাই কিছুই ভেবে উঠতে পারছিলুম না। যদি আমি একা থাকতুম তাহলে গির্জের পাঁচিলের পাশে ঘাসের ওপর নির্ঘাত শরীরটাকে এলিয়ে দিতুম আর দুনিয়ার হরেকরকম মোহিনী আকর্ষণের স্বপ্নে যেতুম ডুবে। কিন্তু তখনকার চলতি কাজকর্ম চুকতে তখনও ঘণ্টা দুয়েকের মতো বাকি, আর তার পর আমার অনেক কিছু করার ছিল। এক কথায়, বিষণ্ণ মোটর-ড্রাইভারটির প্রতি আমার গভীর সহানুভূতির উদ্রেক হচ্ছিল।

আর ঠিক এমনি সময়ে প্রাণবন্ত, হাসিখুশিতে মাতোয়ারা একদল ছেলেকে কথার ফুলঝুরি ঝরিয়ে সিংদরজা দিয়ে মঠে ঢুকতে দেখে আমার প্রাণটা আবার হালকা হয়ে উঠল। দলটা ছিল আমাদের অষ্টম বাহিনী। বাহিনীটাকে ঠিকই চিনতে পেরেছিলুম, কেননা তার সামনে-সামনে-আসা ফেদরেঙ্কোর চমৎকার সুগঠিত চেহারাখানা অত দূর থেকেও চেনা যাচ্ছিল, আর চেনা যাচ্ছিল দলটার মাঝখানে করিতো, নেচিতাইলো আর অলেগ ওগ্নিয়েভকে। তবে ওদের মধ্যে কয়েকটা অপরিচিত মূর্তির দিকে চোখ পড়াতে কেমন যেন ধাঁধায় পড়ে গেলুম। মূর্তিগুলো ছিল গোর্কিপন্থীর পোশাক-পরা, তবে

আমার কাছে কেমন অস্বাভাবিক ঠেকছিল তাদের। অবশেষে হঠাৎ আমার খেয়াল হল, আরে তাই তো! ওরা তো সব কুরিয়াজের প্রাক্তন বাসিন্দা! আর ওই সাজ-বদলটা হল গিয়ে ওদের সেই ধর্মান্তরণের প্রক্রিয়া, যার জন্যে তার আগের পুরো পনেরোটা দিন আমাদের অত পরিশ্রম করতে হয়েছিল। আহ্, কী সব পরিচ্ছন্ন, স্নানস্নিগ্ধ মুখ, সদ্য-মুড়নো বাচ্চা-বাচ্চা মাথায় তখনও-পর্যন্ত-নতুন ইস্ত্রির ভাঁজের দাগওয়ালা ভেল্‌ভেটের বাটিটুপি! তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবথেকে খুশি হওয়ার মতো ব্যাপার ছিল — টাঁকশালে-তৈরি নতুন টাকার মতো ঝলমলে, হাসিখুশি, আস্থাজ্ঞাপক চোখের দৃষ্টিগুলো আর ছারপোকার উপদ্রবমুক্ত (অনেকের পক্ষে সম্ভবত জীবনে সেই প্রথম!) পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরা মানুষের নতুন-অর্জিত স্নিগ্ধ মাধুর্য।

ফেদরেঙ্কো তার বৈশিষ্ট্যসূচক ধীর-গম্ভীর মর্যাদা নিয়ে এক-পা এগিয়ে এসে অল্প-একটু ভারিক্কি চালে পুরুষালি গলায় বললে:

'আস্তন সেমিওনভিচ, যথাযোগ্য, পুরোপুরি শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ফেদরেঙ্কোর অষ্টম বাহিনীরে আপনে গ্রহণ করতি পারেন।'

ওর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল অলেগ ওগ্নিয়েভ। অল্প-একটু নিচু হয়ে আমাকে অভিবাদন করার সময়ে তার বড় হাঁ-মুখের স্পর্শকাতর ঠোঁটদুটো হাসিতে আরও একটু বিস্তৃত হয়ে উঠল। সে বলল:

'পবিত্র বারিসিঞ্চনে এই লোকগুলোরে দীক্ষা দেয়ার কাজে আমারও সামান্য একটু অংশ আছে। ভবিষ্যতে আমার কোনো কাজ পাছে যথেষ্ট উপযুক্ত না-হয় এই ভয়ে এ-ঘটনাটা আপনার নোটবইয়ে টুকে রাখতে অনুরোধ জানাচ্ছি।'

অলেগের কাঁধদুটোয় প্রাণভরে চাপ দিলুম। এটা করলুম আমি ওকে, ফেদরেঙ্কোকে আর আমার চমৎকার, আমার আশ্চর্য সব বাচ্চাকে আলিঙ্গন করার আর চুমো দেয়ার প্রায়-অপ্রতিরোধ্য এক বাসনার বশবর্তী হয়ে। ওই মুহূর্তটায় নোটবইয়ে কোনো কিছু টুকে রাখা তো দূরস্থান, খেয়াল করে কোনো কিছু মনে করে রাখাও আমার পক্ষে কঠিন হোত। নানা ধরনের ধ্যানধারণায়, বিচার-বিবেচনায়, কল্পিত ছবিতে, গুরুগম্ভীর ধর্মস্তোত্র আওড়ানোয় আর নাচের অস্থির ছন্দে হঠাৎ আমার সমগ্র হৃদয় যেন প্লাবিত হয়ে গেল। আর এই মনোভাবের কোনো একটিকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টামাত্র পেলুম যেই, অমনি সে আমার হাত ছাড়িয়ে এঁকেবেঁকে মিশে গেল ভিড়ে

আর নতুন আরেকটা কিছু চেঁচিয়ে ডাকলে আমাকে — যেন ধৃষ্টভাবে তার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাইল। হেঁটে যেতে-যেতে মনে-মনে আমি বললুম, 'পবিত্র বারিসিঞ্চনে দীক্ষাদান আর ধর্মান্তরণ — এসব তো একেবারে ধর্মীয় বুলি।' কিন্তু কোরত্‌কভের হাসিভরা মুখখানা হঠাৎ চোখে পড়ায় এই চমৎকার তত্ত্বসূত্রটা সঙ্গে সঙ্গে মুছে গেল মন থেকে। আরে, তাই তো! মনে পড়ল, আমি নিজেই তো কোরত্‌কভকে অষ্টম বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে জোর করেছিলুম। আর আমি যে কোরত্‌কভের কথা ভাবছি এক-নজরেই সেটা ঠাহর করে নিয়ে অদ্ভুত কুশলী ফেদরেঙ্কো কোরত্‌কভের কাঁধদুটো হাত দিয়ে জড়িয়ে ধূসর চোখে সামান্য একটু কাঁপুনি তুলে বলল:

'বাহিনীর জন্যি আমাদেরে ভারি চমৎকার এক কলোনি-বাসিন্দা দেছেন আপনে, আন্তন সেমিওনভিচ। ওর সাথে মন খুলে কথা বলেছি আমি। একদিন ও ভালো দলপতি বনবে, দেখবেন।'

আমার চোখের দিকে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে কোরত্‌কভ অমায়িক গলায় বললে:

'আপনের সাথে পরে একসময় এট্টু কথা বলতি চাই — তা, আপনের সময় হব্যে তো?'

'তুমি তো আচ্ছা মজার লোক, ইয়ার!' কিছুটা ব্যঙ্গের ছোঁয়াচ-লাগা দৃষ্টিতে কোরত্‌কভের চোখের দিকে তাকিয়ে ফেদরেঙ্কো বলল। 'কথা বলার আবার আছেটা কী? কথা বলে লাভ নাই কিছু! লোকের যে কেন কথা বলা লাগে তা বুঝি না!'

পাল্‌টা চোখের দৃষ্টি হেনে ফেদরেঙ্কোর ধূর্ত চোখের চাউনিকে সুদে-আসলে ফেরত দিল কোরত্‌কভ। বলল:

'আমার বিশেষ কিছু কথা বলার আছে, বোঝলে না!'

'না, কিস্‌সু বলার থাকতি পারে না! যতসব বাজে কথা!'

'আমিও... গ্রেপ্তার হওয়ার... অধিকার চাই...'

হো-হো করে হেসে উঠল ফেদরেঙ্কো। বলল:

'ও! ওইটাই চায় ও!.. কিন্তু তুমি এট্টু বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠেছ, বেরাদার!.. ওর জন্যি তোমারে প্রেথম 'কলোনি-বাসিন্দা' খেতাব রোজগার করতি লাগবে — এই ব্যাজ দেখতেছ তো? এখনও তুমি গ্রেপ্তার হওয়ার উপযুক্ত হও নাই।

তোমারে এখন যদি বলা হয়: 'নিজিরে গ্রেপ্তার কর', তাইলে তুমি জবাব দেবে, পালটা ফুট কাটবে, বলবে: 'কিসের জন্যি? আমি তো কিছু করি নাই'!'

'আর সত্যই যদি কিছু না-করো থাকি, তাইলে?'

'দেখতেছ তো! ব্যাপারটা তুমি বোঝ নাই! তুমি মনে কর তোমারে অন্যায়ভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হতিছে কিনা এটা ভয়ঙ্কর এট্টা গুরুতর ব্যাপার! কিন্তু যখন 'কলোনি-বাসিন্দা' বনে যাবে তখন সবকিছুরে তুমি অন্য চোখে দেখবে... ইয়ে, কথাটা তোমারে কী করে যে বোঝাই!.. সব থেকে বড় কথা হল গিয়ে শৃঙ্খলা, বোঝলে, আর তুমি কিছু করেছ কি কর নাই সেটা মোট্টে তেমন গুরুতর ব্যাপার না। কথাটা কি আমি ঠিক বললাম, আন্তন সেমিওনভিচ?'

ফেদরেঙ্কোর দিকে চেয়ে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লুম আমি। ব্রেগেল এমনভাবে আমাদের দিকে তাকাতে লাগলেন যেন আমরা নুনজলে-জারানো অদ্ভুত প্রাণীদের নমুনা। দেখতে-দেখতে ওঁর গালদুটো ঝুলে পড়ে গলকম্বলের আকার ধারণ করল। অপ্রীতিকর ব্যাপারের আলোচনা থেকে ওঁর মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে নেয়ার আশায় আমি তাড়াতাড়ি ফেদরেঙ্কোর দিকে ফিরে শুধোলুম:

'আর ওই দলটা — ওই-যে ওদিকে — ওরা কারা? ওই ছেলেটিই-বা কে?'

'ওই তো সেই বাচ্চা ছোঁড়া,' ফেদরেঙ্কো বলল। 'ভারি তেজী ছোঁড়া কিন্তু! শুনতি পাই ওরে নাকি দারুণ পিটানি দেছিল।'

বললুম, 'ঠিক, ঠিক, তাই বটে। ওটা তো জাইচেঙ্কোর বাহিনী, তাই না?'

'কিন্তু ওকে মেরেছিল কে?' ব্রেগেল শুধোলেন।

'একদিন রাত্রে মার খায় ছেলেটা... এখানকারই ছেলেরা মেরেছিল নিশ্চয়।'

'কী জন্যে? খবরটা আমাদের দেন নি কেন? ব্যাপারটা ঘটেছিল কবে?'

কঠিন স্বরে জবাব দিলুম, 'ভার্‌ভারা ভিক্তরভ্‌না, বছরের-পর-বছর বাচ্চারা এখানে দুর্ব্যবহার, অত্যাচার, এসব সহ্য করে এসেছে। কিন্তু আপনারা যেহেতু তখন এ-ব্যাপারে তেমন কোনো আগ্রহ দেখান নি, তাই আমার একথা মনে করার কারণ ঘটেছিল যে এটাও বোধহয় আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণের যোগ্য নয়... বিশেষ করে আমি নিজে এ-ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত

বেশিরকম মনোযোগ দিয়েছিল্‌ম বলে আপনাদের এতে জড়ানোর কথা আমার আর মনে হয় নি।'

আমার এই কঠিন কথাগ্‌লো ব্রেগেল তাঁর বিদায়গ্রহণের ইঙ্গিত হিসেবে গ্রহণ করলেন।

ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'আচ্ছা, বিদায়।'

তারপর গাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। গাড়ি থেকে কমরেড জোইয়া তখন এদিকেই তাকিয়ে ছিলেন।

আমি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল্‌ম। তারপর জাইচেঙ্কো ও তার অষ্টাদশ বাহিনীর সঙ্গে দেখা করতে এগিয়ে গেল্‌ম।

বিজয়ীর ভঙ্গিতে ভানিয়া তার বাহিনীকে চালনা করে আনছিল। অষ্টাদশ বাহিনীটি ইচ্ছে করেই আমরা শ্‌ধ্‌মাত্র কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের নিয়ে তৈরি করেছিল্‌ম, যাতে বাহিনীটি ও তার দলপতি উভয়েই বিশেষ তাৎপর্যের অধিকারী হওয়ার গৌরব অর্জন করতে পারে। আর ভানিয়াও আমাদের এই কাজের মর্ম ঠিক-ঠিক উপলব্ধি করেছিল। বাহিনীটিকে দেখে ফেদরেঙ্কো তো হো-হো করে হেসে উঠল। বলল:

'ওহ্‌, খ্‌দে শয়তানগ্‌লা যা কাণ্ডটা করতেছে-না!..'

চমৎকার ফৌজী কায়দায় অষ্টাদশ বাহিনী জাঁক দেখিয়ে কুচকাওয়াজ করে আসছিল। একেক সারিতে চারজন করে কুড়িটি বাচ্চা একসঙ্গে তালে-তালে পা ফেলে, এমন কি সত্যিকার সৈন্যদের মতো হাতগ্‌লো পর্যন্ত দোলাতে-দোলাতে, এগিয়ে আসছিল। অবাক হয়ে ভাবছিল্‌ম, এত অল্প সময়ের মধ্যে ওই খ্‌দে জাইচেঙ্কো ছোঁড়া এমনধারা ফৌজী কেতা আয়ত্ত করে ফেলল কোন কৌশলে? অষ্টাদশ বাহিনীর ফৌজী মনোভাবকে আরও উৎসাহ যোগাতে আমি স্যাল্‌টের ভঙ্গিতে হাতখানা তুলে টুপিতে ছোঁয়াল্‌ম আর কেতাদ্‌রস্তভাবে বলে উঠল্‌ম:

'অভিনন্দন, কমরেড্‌স!'

কিন্তু দেখা গেল অষ্টাদশ বাহিনী তখনও পর্যন্ত আমার কাছ থেকে এইভাবে সাড়া পাওয়ার জন্যে প্রস্তুত নয়। ছেলেরা এলোমেলো, বিশ্‌ঙ্খলভাবে আমার অভিনন্দনে সাড়া দিল, আর তা-ই দেখে ভান্‌কা বিরক্তিভরে হাত নেড়ে বললে:

'এঃ... অরা এখনও ম্‌জিকই রয়ি গ্যাছে!'

আর ভানিয়ার রকমসকমে একেবারে মুগ্ধ হয়ে ফেদরেঙ্কো নিজের হাঁটুতে চাপড় দিয়ে বললে:

'আরে, এরমধ্যি ও সবকিছু শিখি ফেলেছে! কাণ্ডখান দ্যাখো একবার!'

ছেলেদের উত্তেজনার ভাবটা একটু হালকা করার উদ্দেশ্যে আমি এবার চেঁচিয়ে বললুম:

'অষ্টাদশ বাহিনী, অ্যাট ইজ! আচ্ছা, এবার বল দেখি স্নানটা তোমাদের কেমন লাগল?'

ছেলেদের মধ্যে পিয়ত্‌র মালিকভ ঝলমলে হাসি হেসে জবাব দিল:

'আমাদের ছ্যান? ভারি সোন্দর, ভারি ভালো লাগল্য! তাই না তিম্‌কা?'

অদারিউক মাথাটা ঘুরিয়ে অপর কার যেন কাঁধের আড়াল থেকে চাপা গলায় বলল:

'আবার সাবান দিয়ি...'

জাইচেঙ্কো গর্বের ভঙ্গিতে এবার আমার দিকে তাকিয়ে বললে:

'এখন থ্যেকে প্রেতিদিন আমরা সাবান মেখি ছ্যান করব্য! দ্যাখেন, দ্যাখেন, আমাদের সরবরাহ ম্যানেজার হল্য অদারিউক!'

অদারিউকের হাতে-ধরা বাদামিরঙের একটা বাক্সের দিকে আঙুল দেখিয়ে সে ফের বলল:

'আজ আমরা দু'খান সাবান খরচ করেয়েছি — দু'খান গোটা সাবান! তয় আজ ছিল, যারে কয়, প্রেথম দিন। এয়ার পর অতডা সাবান আর খরচ করব্য না। এখন আমরা আপনের কাছি নিবেদন করতি চাই... অবিশ্যি তাই বল্যে নাকী কান্না জুড়তি যাচ্ছি নে...' এই বলে ভানিয়া তার সঙ্গীদের দিকে ফিরল। 'আমরা নাকী কান্না জুড়তি যাচ্ছি নে, তাই না?'

'আহা রে, কী চোখ-জুড়ানো খুদে শয়তান সব!' উচ্ছ্বসিত হয়ে আবেগভরে বলে উঠল ফেদরেঙ্কো।

ওদিকে বাচ্চাগুলোও সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমরা নাকী কান্না জুড়তি যাচ্ছি নে! আমরা নাকী কান্না জুড়তি যাচ্ছি নে!'

চারিদিকে বারকয়েক ঘুরে-ঘুরে দাঁড়াল ভানিয়া। তারপর বলল:

'তবু আপনের কাছি আমরা কিছু নিবেদন করতি চাই, বোঝলেন।'

'ঠিক আছে! বুঝেছি, বুঝেছি। তোমরা নাকী কান্না জুড়ছ না, শুধু আমার কাছে কিছু চাইছ, এই তো?'

ভানিয়া এবার টানটান হয়ে দাঁড়াল। বলল:

'ঠিক কয়েছেন! আমরা আপনের কাছি কিছু চাচ্ছি — অপর সকল বাহিনীতি পুরানো গোর্কিপন্থীরা আছে — তিনজনা কি চারজনা করো। কিন্তু আমাদের বাহিনীতি একজনাও নাই। বিলকুল নাই!'

'বিলকুল নাই' — এই কথাগুলো বলার সময় ভানিয়ার গলা চড়া নিখাদে রিন্‌রিন করে উঠল। ডান হাতখানা ডান কানের কাছে তুলে একটা আঙুল বাইরের দিকে ছড়িয়ে দিল সে। তারপর হঠাৎ হেসে উঠল হো-হো করে।

'একখানও কম্বল নাই! বিলকুল নাই! একখান গদিও নাই! বিলকুল নাই! বিলকুল নাই!'

বলতে-বলতে আরও খুশি হয়ে খিলখিল করে হাসতে লাগল ভানিয়া। আর তার সঙ্গে সঙ্গে হাসতে লাগল গোটা অষ্টাদশ বাহিনীর সদস্যরা।

আলিওশ্‌কা ভোল্‌কভের নামে অতঃপর অষ্টাদশ বাহিনীর দলপতির হাতে একখানা চিরকুট ধরিয়ে দিলুম। তাতে লেখা ছিল: 'অবিলম্বে এদের ছ'খানা কম্বল আর ছ'খানা গদি দাও।'

ওদিকে নদীতে নামার পথে তখন প্রচন্ড সোরগোল আর লোক-চলাচল চলছিল। কলোনি-বাসিন্দাদের বাহিনীগুলো সেপথে এমনভাবে যাতায়াত করছিল যেন তারা কোনো লড়াইয়ের মাঠে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে চলাচল করছে।

আস্তাবলগুলোর পেছনে ঝোপঝাড়-আগাছার মধ্যে সেদিন অধিষ্ঠিত ছিল চারজন চুলকাটার নাপিত। ওইদিন সকালেই শহর থেকে এসে পৌঁছেছিল তারা। কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের গা থেকে সেখানে কুরিয়াজের ছাতাপড়া মামড়ি দলা-দলা হয়ে খসে পড়ছিল। আর এর ফলে আমি যে-মতটা আগাগোড়া পোষণ করে আসছিলুম সেটাই হুবহু মিলে যাচ্ছিল। মতটা ছিল এই যে আঁশ ছাড়ালেই দেখা যাবে কুরিয়াজ-বাসিন্দারা অন্যদের মতোই নিতান্ত শাদাসিধে ছেলেপিলে; প্রাণবন্ত, বাচাল আর মোটের ওপর 'আনন্দদায়ক ছেলেছোকরা'ই তারা।

আমি দেখছিলুম ছেলেরা কেমন খোলাখুলি খুশির ভাব নিয়ে তাদের নতুন পোশাক পরীক্ষা করে দেখছে, কেমন অপ্রত্যাশিত রকমের বাবুগিরি ফলিয়ে তাদের কামিজের ভাঁজগুলো যথাস্থানে বিন্যস্ত করছে আর টুপিগুলো হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখছে। গির্জের চারধারে মাঠের ওপর স্তূপাকারে জড়-করে-রাখা নানা ধরনের অসংখ্য জিনিসপত্র হাঁটকে নতুন আবিষ্কারের

ব্যাপারে দক্ষ আমাদের আলিওশ্‌কা ভোল্‌কভ কী কৌশলে যেন আমাদের সবেধন নীলমণি একখানা আয়না টেনে বের করেছিল। আয়নাখানা ছিল মানুষপ্রমাণ আর আস্ত। দুটি অপেক্ষাকৃত বাচ্চা ছেলে সঙ্গে সঙ্গে আয়নাখানাকে বয়ে এনে গির্জের প্রার্থনা-মঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। এই আয়নাখানাকে ঘিরে সেদিন জমে উঠেছিল রীতিমতো একটা ভিড়। প্রত্যেকেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল দেখতে যে লোকচক্ষে তাকে দেখাচ্ছে কেমন। নিজেদের ছায়া দেখে মোহিত হবার জন্যে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। বলা বাহুল্য, কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের মধ্যে বেশকিছু সুশ্রী চেহারার ছেলেপিলে ছিল। আর বলতে কী, অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাকিদের চেহারায়ও উন্নতি ঘটার প্রবল সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল, কারণ সৌন্দর্য বস্তুটা পরিশ্রম করা ও ভালো খাওয়াদাওয়া জোটার ফলমাত্র বৈ তো নয়!

বিশেষ করে মেয়েদের পক্ষে এই পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারটা অতীব আনন্দদায়ক হয়ে উঠেছিল। গোর্কিপন্থী মেয়েরা কুরিয়াজের মেয়েদের জন্যে বিশেষভাবে তৈরি ঝলমলে পোশাক বানিয়ে এনেছিল। তাদের প্রত্যেকের জন্যে ওরা নিয়ে এসেছিল নাবিক-নীল রঙের মাঝখানে চওড়া প্লীট-দেয়া সাটিনের একখানা করে স্কার্ট, ভালো শাদা কাপড়ের একটা করে ব্লাউজ, হালকা নীলরঙের একজোড়া করে মোজা আর যাকে বলা হয় ব্যালেনাচের জুতো তা-ই একজোড়া করে। সেলাই-কলগুলোকে মেয়েদের এজমালি ঘরে নিয়ে যেতে কিশোরী-বাহিনীকে অনুমতি দিল কুদ্‌লাতি। ব্যস, এর পরই শুরু হয়ে গেল সেই চিরাচরিত মেয়েলি ঝুট্‌ঝামেলা: অর্থাৎ পোশাকের মাপের অদলবদল, বারবার পোশাক পরা আর খোলা, আর মাপ ঠিক করা। ওই দিনের জন্যে কুরিয়াজের ধোপাখানাটা আমরা মেয়েদের হাতে তুলে দিয়েছিলুম। আর ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ একসময় পিয়েরেত্‌সের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় আমি তাকে কড়াভাবে নির্দেশ দিলুম:

'কাজের পোশাক পরে ধোপাখানায় যাও দেখি, আর সেখানকার বয়লারটা গরম করে মেয়েদের সাহায্য কর গিয়ে। আর গড়িমসি নয়! যাও — কুইক মার্চ!'

শুনে পিয়েরেত্‌স তার আঁচড়ানোর দাগে-ভরা মুখখানা বাড়িয়ে দিয়ে নিজের বুকে একটা চাপড় মারল। তারপর শুধোল:

'কী কইলেন... মেয়্যাদের জন্যি আমি জল গরম করব্য গিয়্যি?'

'হ্যাঁ, তাই তো বললাম!'

এবার নিজের পেটটা ফুলিয়ে তুলল পিয়েরেত্‌স, তারপর গালদ্বটোও ফুলিয়ে ঠিক সৈন্যের মতোই স্যাল্বট ঠুকে মঠের গোটা তল্লাট কাঁপিয়ে সজোরে চিৎকার করে বলল:

'মেয়্যাদের জন্যি জল গরম করতি লাগব্যে — ঠিক হ্যয়!'

সত্যিই ভারি চটপটে ঠেকল ওকে। যদিও এই চটপটে ভাবটুকু দেখাতে গিয়ে ওকে একটু আড়ষ্ট ঠেকছিল, তব্ব। কিন্তু এই জাঁকালো ভঙ্গি জাহির করার পরই হঠাৎ ওর গলা কেমন কর্বণ শোনাল:

'কিন্তু আমি কাজির পোশাক পাব্য কনে? নবম বাহিনীরি তো এখনও কাজির পোশাক বিলি করা হয় নাই...'

বলল্বম, 'কী খোকাবাব্ব, তুমি কি চাও যে হাত ধরে তোমায় নিয়ে গিয়ে কী করে পোশাক বদলাতে হয় আমাকে তা দেখিয়ে দিতে হবে? আর কতক্ষণ তুমি এখানে দাঁড়িয়ে বকবক করে সময় নষ্ট করবে, শ্বনি?'

আমার এই কথা শ্বনে আশপাশের ছেলেরা হো-হো করে হেসে উঠল। আর মাথাটা দ্বলিয়ে কোনোরকম আন্বষ্ঠানিক আদবকায়দার তোয়াক্কা না-রেখে চেঁচিয়ে বলে উঠল পিয়েরেত্‌স:

'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে!.. আমি করব্য! আমি করব্য-নে! আপনে ব্যস্ত হইয়েন না!'

বলেই দৌড়ে চলে গেল ও।

এই সময়ে লাপত ফের একবার দলপতি-পরিষদের সভা ডাকার বিউগ্‌ল-সংকেত জানিয়ে দিল। তবে এবার সভা ডাকল ও গ্বতের বাহিনী যেখানে তাদের রাত্রের ছাউনি ফেলার তোড়জোড় করছিল গির্জের সিঁড়ির সেই চাতাল-টার ওপর।

সভার শ্বর্বতে গির্জের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে লাপত বক্তৃতা শ্বর্ব করল:

'দলপতি-ভাইসব! আমরা এখন বসব না, কেননা মাত্তর দ্ব-এক মিনিটের জন্যি এই সভা ডাকা হয়েছে! দয়া করে তোমাদের দলের ছোঁড়াদেরকে শিখাও কী করে নিজের-নিজের নাক প্বঁছতি হয়। ওরা যেভাবে এখন গোটা উঠানময় সর্দির ছড়া দিয়ি বেড়াচ্ছে ওভাবে বেড়ালি চলবে না। আর এট্টা কথা — আমি পায়খানা ব্যাভার করার কথা বলতেছি। এ-সম্পর্কে যা বলার আগের মিটিঙে জোর্‌কা তোমাদেরকে তা বলেছে। সে-কথাটাও সবারে ফের একবার

শুনায়ে দ্যাও। আরও এট্টা কথা — ময়লা ফেলার জন্যি আলিওশ্কা জাগায়-জাগায় বাস্ক রেখে দেছে, তবু দেখা যাচ্ছে ছোঁড়ারা সব্বত্তর ময়লা ছড়ায়ে ফেলতেছে।'

'আরে, অত ব্যস্ত হতিছিস কেন?' হাসতে-হাসতে চেঁচিয়ে বলল ভেত্কোভ্স্কি। 'আগে উঠানের সকল জঞ্জাল পরিষ্কার হোক তবে তো। আগেভাগে বাস্ক পেতি ফলটা কী?'

'না-না, ওকথা ঠিক না, কোস্তিয়া! জঞ্জাল সাফ করা এক কথা আর নিয়মকানুন মানা অন্য ব্যাপার... তুই ব্যাটা ভবঘুরে, এ-সবের বুঝিস কী! যাই হোক, এট্টা কথা তোমরা ভোলবে না — আমাদের আর-এট্টা কানুনের কথা সব্বাইরে জানায়ে দিতি হবে, তা না হলি ছোঁড়ারা শেষে ঘ্যানঘ্যান করবে-নে: 'এ-নিয়ম তো আমরা জানতাম না! এমন যে নিয়ম আছে সে আমরা জানব কী কর্য়ে?''

'তা, নিয়মডা কী?'

'থুতু ফেলা নিয়ি আমাদের নিয়ম... বল, সব্বাই একসাথে বল দেখি, শুনি...'

সঙ্গীত-পরিচালকের মতো হাত নাড়ল লাপত, আর দলপতিরা সবাই একসঙ্গে সুর করে আওড়াতে লাগল:

'থুতু ফেললি একবার — মেঝে ধোওন তিনবার!'

শুনে যে-জনাকয়েক নিষ্কর্মা ছেলে নবদীক্ষিতের ভয় ও চাঞ্চল্য নিয়ে এতক্ষণ দলপতি-পরিষদের সভার অনুষ্ঠান দেখছিল তাদের মুখ হাঁ হয়ে গেল। পরিষদের সভা এবার ভেঙে দিল লাপত, আর দলপতি ছেলেরা ওপরের এই নতুন স্লোগান মুখে নিয়ে দিগ্বিদিকে বাহিনীগুলোর অস্থায়ী ছাউনির দিকে ছুটল। এমন কি খালাবুদার কানেও তারা পৌঁছে দিল স্লোগানটা। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে খালাবুদা তখনও কলোনিতে রয়ে গিয়েছিলেন। সেই মুহূর্তে সারা গায়ে খড়, ধুলো আর জাবনার টুকরো মাখা-অবস্থায় তাঁকে গোয়ালঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল।

গভীর গম্ভীর গলায় বলতে শোনা গেল তাঁকে, 'নারকী মেয়্যাছেল্যা দুডা আমারে ফেল্যে চলি গ্যাছে। এখন আমারে ইস্টিশনে হাঁট্যে যাতি হবে-নে। ঠিক, ঠিক! 'থুতু ফেললি একবার, মেঝে ধোওন তিনবার'! চমৎকার! অরে অ ভিত্কা — বুড়া মানুষডার প্রেতি এট্টু দয়া কর্ দেখি! তুই তো আস্তাবলের

কত্তা — তা, মরকুট্যে-ছরকুট্যে যা হোক এট্টা ঘোড়া গাড়িতি জ্বতি আমারে ইস্টিশনে পোঁছায়্যে দে-না বাবা!'

শ্বনে ভিত্কা একবার আড়চোখে তার ওস্তাদ আন্তন ব্রাত্চেঙ্কোর দিকে তাকাল। আর গ্বর্বগম্ভীর গলার আরেক অধিকারী আন্তন হেঁকে বলল:

'মরকুটে কেন? ওরে, 'মলদিয়েত্স'রে গাড়িতে জোত্ আর ব্বড়োদাদ্বরে স্টেশনে পোঁছে দে! জানেন, উনি আজ নিজের হাতে 'প্রভাতী'রে সাফস্বত্রো করেছেন।' বলে খালাব্বদার দিকে ফিরে ফের বলল, 'আসেন, এবার আপনারে সাফস্বত্রো করে তোলা যাক!'

এই সময়ে কোথা থেকে যেন তারানেত্স আমার কাছে এল। দেখল্বম ওর হাতে মনিটরের পরিচয়স্বচক পটি লাগানো। স্পষ্ট বোঝা গেল কোনো একটা ব্যাপারে ও বিচলিত হয়ে পড়েছে। বলল:

'ওই জায়গাটায়... ক'জনা কৃষিবিৎ... না কী যেন ঘর দখল করে থাকতেছে... ওরা কিছ্বতি ঘর ছেড়ে দিতি রাজি না। বলতেছে, 'তোমাদের ওসব বাহিনী-টাহিনীতি আমাদের কোনো কাম নাই!''

'ওদের ঘরখানা কি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন?'

'ওখেন থেকেই তো আসতেছি আমি। ওদের বিছানাপত্তর... আর বাকি সবকিছ্ব পরীক্ষে করে দেখেছি — বহ্বৎ ন্যাতা-ন্যাকড়া ঘরের যেখেনে-সেখেনে ঝুলায়ে রেখেছে ওরা। সব্বত্তর থিকথিক করতেছে উকুন আর ছারপোকা।'

'চল তো, দেখা যাক গিয়ে!'

গিয়ে দেখি কৃষিবিদদের ঘরখানা যতদ্বর বিশৃঙ্খল হতে হয় তাই হয়ে আছে। স্পষ্ট বোঝা গেল, বহ্বদিন পর্যন্ত ঘরখানা ঝেড়ে-প্বঁছে সাফ করা হয় নি। কৃষিবিদদের মধ্যে ভস্কবোইনিকভকে এর আগেই গোশালার ভারপ্রাপ্ত বাহিনীর দলপতি নিয্বক্ত করা হয়েছিল। দেখা গেল সে এবং তার দলের আরও দ্ব'জন মাত্র তাদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্র বিশোধনের জন্যে আমাদের নির্দেশ মেনে সে-সব অন্যদের হাতে তুলে দিয়েছে এবং কৃষিবিদদের ঘ্বঘ্বর বাসায় ভাঙন ধরিয়ে ও বাসা ছেড়ে যেতে হলে যে-সব টুকিটাকি জিনিসপত্র সঙ্গে নেয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে সেগ্বলো নিয়ে মানে-মানে সরে পড়েছে। তবে ঘরখানায় তখনও পর্যন্ত অপর কয়েকটি ছেলে থেকে গিয়েছিল। আমি যেতে তারা খোলাখ্বলি গোমড়া ম্বখে তাকিয়ে রইল। কিন্তু জয়লক্ষ্মী যে কার দিকে তা যেমন আমি জানতুম তেমনই তারাও

জানত ভালোরকমই, প্রশ্নটা ছিল শুধু এই যে তাদের আত্মসমর্পণের ধরনটা ঠিক কী রকম হবে সেটা স্থির করা।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'তাহলে তোমরা সাধারণ সভার প্রস্তাব মেনে নিতে রাজি নও?'

আমার কথার কেউ জবাব দিল না।

'তোমরা সে-মিটিঙে ছিলে তো? না কী?'

সবাই চুপ। তারানেত্‌স ওদের হয়ে জবাব দিল:

'না, ওরা ছিল না।'

'আমি তোমাদের মনস্থির করার জন্যে যথেষ্ট সময় দিয়েছি। তোমরা নিজেদের কী ভাবো বল তো — কলোনি-বাসিন্দা, না মেসের ভাড়াটে বাসিন্দা?'

তখনও সবাই চুপ।

'যদি তোমরা মেসের বাসিন্দা হয়ে থাক তাহলে এই ঘরে থাকার জন্যে আমি তোমাদের দশ দিনের বেশি সময় দিতে পারি না। তাছাড়া সেক্ষেত্রে আমি তোমাদের খেতে দিতেও পারব না।'

এবার ওদের মধ্যে থেকে স্‌ভাত্‌কো শুধোল, 'তাইলি আমাদের খাতি দিবে কে?'

শুনে তারানেত্‌স হাসল। বলল:

'আচ্ছা মজাদার ছোঁড়া তো সব!'

আমি বললুম, 'তা আমি জানি না। আমি অন্তত তোমাদের খেতে দিচ্ছি না।'

'আপনে কি আজও আমাদেরে খানা দিবেন না?'

'না।'

'খানা না দিবার অধিকার আপনের আছে কি?'

'নিশ্চয় আছে।'

'আর যদি আমরা কাজ করি?'

'শুধুমাত্র কলোনি-বাসিন্দারাই এখানে কাজ করার অধিকারী।'

'ঠিক আছে, আমরা কলোনি-বাসিন্দাই বন্যে যাব, তয় এই কোঠায় থাকব্য আমরা।'

'না, তা হতে পারে না।'

'তাইলে কী করব্য?'

পকেট-ঘড়িটা বের করে বললুম:

'আমি তোমাদের ভাবনার জন্যে পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। কী ঠিক করলে পাঁচ মিনিট পরে তোমরা তা মনিটরকে জানিও।'

'ঠিক হ্যায়,' তারানেত্স বলল।

এর আধঘণ্টা পরে ফের একবার কৃষিবিদদের ঘরের সামনে এলুম। দেখলুম আলিওশ্কা ভোল্কভ ঘরে তালা লাগাচ্ছে আর পদাধিকার বলে সেখানে হাজির আছে তারানেত্সও।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'কী, ওরা ঘর ছেড়ে দিয়েছে?'

তারানেত্স হাসল। বলল, 'ওহ্, সে যদি দেখতেন!'

'ওদের সবাইকে আলাদা-আলাদা বাহিনীতে ভাগ করে দেয়া হয়েছে তো?'

'হ্যাঁ। সব আলাদা-আলাদা বাহিনীতি — একেক জনা একেকটায়।'

এর দেড় ঘণ্টার মধ্যে খাবারঘরে শাদা টেব্ল-ক্লথে ঢাকা টেবিলগুলোয় জাঁকালো এক ভোজপর্ব শুরু হল। ইতিমধ্যে খাবারঘরে এত পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল যে সেটাকে আর চেনা যাচ্ছিল না। আমাদের অগ্রবর্তী মিশ্র বাহিনী সেদিন রাত থাকতে উঠে মেঝে ধোয়ামোছা করে আর দেয়ালগুলো লতাপাতা আর ডেইজি ফুল দিয়ে সাজিয়ে ঘরখানার হালই বদলে দিয়েছিল। আর যে-মুহূর্তে গোর্কিপন্থীরা স্টেশন থেকে কলোনিতে এসে উপস্থিত হয়েছিল আগেকার সর্বস্বীকৃত নির্দেশ অনুযায়ী সেই মুহূর্তে আলিওশ্কা ভোল্কভ ঘরখানার দেয়ালে লেনিন, স্তালিন, ভরশিলভ ও গোর্কির ছবি টাঙিয়ে দিয়েছিল। এছাড়া শেলাপুতিন ও তোস্কা ঘরের ছাদ থেকে মালার মতো করে ঝুলিয়ে দিয়েছিল নানা স্লোগান আর অভিনন্দন লেখা অনেকগুলো ফেস্টুন। কিছুটা অবাক হয়েই দেখলুম যে এই ফেস্টুনগুলোর মধ্যে 'নাকী কান্না চলবে না'র স্লোগানটাও দর্শকদের মাথার ওপর পতপত করে উড়ছে।

আর ঘরের মধ্যে গোর্কিপন্থীদের সংকীর্ণ সুরুচিপূর্ণ সারিগুলোর ফ্রেমে আটকা পড়ে গিয়েছিল ছোট-করে-ছাঁটা চুল মাথায় নিয়ে, স্নান সেরে, নতুন শাদা শার্ট গায়ে চড়িয়ে দমিত ও সম্পূর্ণরূপে পরাভূত যতসব কুরিয়াজ-বাসিন্দা। সম্ভবত ওই ফ্রেম থেকে তাদের পালাবার আর কোনো পথ ছিল না। তারা বসে ছিল নিজের-নিজের নির্দিষ্ট জায়গায় চুপচাপ করে, হাতদুটো

হাঁটুর ওপর ভাঁজ করে রেখে। ডিশে-ডিশে রাখা পাঁউরুটির স্তূপ আর স্ফটিকস্বচ্ছ জলের বোতলগুলোর দিকে অপরিসীম শ্রদ্ধা নিয়ে তাকিয়ে ছিল তারা।

শাদা এপ্রন-পরা কিছু-কিছু মেয়ে আর শাদা কোট-গায়ে জেভেলি, শেলাপুতিন আর বেলুখিন টেবিলগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে নিঃশব্দে ঘোরাঘুরি করছিল — কখনও-কখনও ফিস্‌ফিসিয়ে কথাবার্তা বলছিল নিজেদের মধ্যে, কখনও-বা সবশেষে-সাজানো সারিতে ছুরিকাঁটাগুলো এখানে-ওখানে সিধে করে রাখছিল, কোথাও-বা যোগ করছিল নতুন একটা-কিছু, আবার কোথাও-বা কারো জন্যে নতুন করে জায়গা করে দিচ্ছিল। কুরিয়াজ-বাসিন্দারা স্যানাটোরিয়ামের রুগীদের মতো ওদের কথা মেনে চলছিল উদাসীনভাবে, আর তারা যেন সত্যিই রুগী এমন ভাব করে বেলুখিন তাদের অনুরোধ-উপরোধ করে এদিক-ওদিক চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল।

দেয়ালের গায়ে দু'খানা ছবির মাঝখানে একটু নিরিবিলি জায়গা খুঁজে নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে গেলুম। ওখানে দাঁড়িয়ে মঠের দুর্গন্ধময় নোংরা মরুভূমির মধ্যে যেন কোন মন্ত্রবলে গজিয়ে-ওঠা এই মরূদ্যানের একেবারে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আমার নজরে পড়ছিল। ঘরের মধ্যে ঝুলে ছিল যেন প্রায় হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় এমন একটা নৈঃশব্দ্য, আর মনে হচ্ছিল ছেলেদের রক্তাভ গাল, চকচকে চোখ আর সলজ্জ সৌষ্ঠবের ছোঁয়ায় সে-নৈঃশব্দ্য রূপান্তরিত হয়ে গেছে ঔচিত্যবোধে আর এক নতুন জন্মের রহস্যমাধুরীতে।

নিঃশব্দে, প্রায় অন্যদের অগোচরেই, বিউগ্‌ল আর ড্রাম-বাজিয়েরা এই সময় একে-একে ঘরে এসে ঢুকল, তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে লাল হয়ে উঠে আর উদ্বেগে-ভরা মুখচোখ নিয়ে সাবধানে দেয়াল-বরাবর লাইন করে দাঁড়াল। আর তখনই সকলের নজর পড়ল ওদের দিকে। এরপর খাওয়ার কথা ভুলে সবার চোখ সেঁটে রইল ওইদিকেই।

আর ঠিক এই সময় তারানেত্‌সের আবির্ভাব ঘটল দোরগোড়ায়। শোনা গেল:

'পতাকার সম্মানে দাঁড়াও!'

গোর্কিপন্থীরা অভ্যাসবশত অনায়াসেই লাফিয়ে উঠে অ্যাটেন্‌শনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু কুরিয়াজের দলবল এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে টেবিলের ধারে হাতের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠার

উদ্যোগ করতে-না-করতেই ফের একবার তারা অবাক হয়ে গেল — তবে এবার আমাদের অর্কেস্ট্রার বজ্রগর্জন শুনে।

তারানেত্স এবার আমাদের প্রতীক পতাকাটিকে ঘরের মধ্যে বয়ে নিয়ে এল। পতাকার ঢাকনা এতক্ষণে খোলা হয়েছিল আর তার টকটকে লাল রেশমী কাপড়ের জমকালো ভাঁজগুলোয় ঢেউ খেলে যাচ্ছিল। দেয়ালে-ঝোলানো ছবিগুলির নিচে এনে দাঁড় করানো হল পতাকাটিকে। পতাকার উপস্থিতিতে ডাইনিং হলে কেমন একটা উৎসবের ভাবের, সোভিয়েত দেশাত্মবোধের ছোঁয়াচ লাগল।

নির্দেশ জারি হল, 'বসে পড় সবাই!'

অতঃপর কলোনি-বাসিন্দাদের সামনে আমি একটা ছোটখাট বক্তৃতা দিলুম। এ-বক্তৃতায় কাজ কিংবা শৃংখলার কথা উল্লেখই করলুম না, এমন কি তাদের কাছে কোনো কিছু মেনে চলার দাবিও জানালুম না, প্রকাশ করলুম না কারো সম্বন্ধে কোনোরকম সন্দেহের কথাও। আমি কেবল নতুন জীবনের সূচনায় তাদের অভিনন্দন জানালুম এবং এই দৃঢ় আস্থা ব্যক্ত করলুম যে মানুষের জীবন যতখানি সুন্দর হতে পারে তাদের এই জীবনও তেমনই মনোরম হবে।

আমি তাদের বললুম, 'আমরা এক চমৎকার, আনন্দময়, যুক্তিসম্মত জীবন যাপন করতে চলেছি — এর কারণ, আমরা হলুম গিয়ে মানুষ, কারণ আমাদের কাঁধের ওপর মস্তিষ্ক বলে একটা পদার্থ আছে এবং আমরা এই রকমই একটা জীবন যাপন করতে চাই, তাই। এ-কাজে কে আমাদের বাধা দিতে পারে? যে-সমস্ত লোক আমাদের কাজ করা ও উপার্জন করা থেকে বঞ্চিত করতে পারত তাদের আজ আর অস্তিত্ব নেই। আমাদের গোটা যুক্তরাষ্ট্রে এমন ধরনের কোনো লোকই নেই আজ। তার বদলে দ্যাখো আমাদের চারপাশে আছেন কী সমস্ত লোক! দ্যাখো — আজ সারা দিন ধরে আমাদের সহকর্মী হিসেবে পাশে-পাশে থেকেছেন একজন অভিজ্ঞ প্রবীণ শ্রমিক ও গ্যেরিলা-যোদ্ধা — কমরেড খালাবুদা। ট্রেনের বগির লাইন বদলাতে, ট্রাক থেকে মাল খালাস করতে আর ঘোড়াগুলোকে সাফসুত্রো করতে তোমাদের সাহায্য করেছেন তিনি। আমাদের চারপাশে এখন কত ভালো লোক, কত মহৎ লোক আছেন, যাঁরা সর্বদাই আমাদের কথা চিন্তা করছেন, আমাদের সাহায্য করতে চাইছেন। আজ যদি আমাদের এইসব নেতা, আমাদের বলশেভিক, ইত্যাদির

সংখ্যার হিসেব নিতে যাই তাহলে গুনে আমরা তাঁদের সীমাসংখ্যা পাব না। এ-প্রসঙ্গে আমি তোমাদের দু'খানা চিঠি পড়ে শোনাচ্ছি। এ থেকে বুঝতে পারবে যে তোমরা মোটেই একা নও, বুঝতে পারবে যে তোমাদের ভালোবাসছেন এবং তোমাদের ভালোমন্দের দিকে নজর রাখছেন এমন বহু লোক আছেন আজ। এখানা হল খারকভের কার্যনির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যানের কাছে লেখা ম্যাক্সিম গোর্কির একখানা চিঠি। এ-চিঠিতে গোর্কি লিখছেন:

'গোর্কি কলোনির প্রতি আপনার সাহায্য ও মনোযোগের জন্যে আমি আপনাকে অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।

'এই কলোনিটির কথা আমি জানি কেবলমাত্র কলোনির ছেলেমেয়েদের ও তাদের ডিরেক্টরের সঙ্গে আমার চিঠিপত্রের আদানপ্রদান মারফত। তবু আমার মনে হয়েছে যে কলোনিটি আমাদের সকলের কাছে গুরুতর মনোযোগ ও সক্রিয় সাহায্যের দাবি রাখে।

'রাস্তার অনাথ ছেলেপিলের মধ্যে অপরাধের মাত্রা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে এবং সুস্থ-সবল চারাগুলোতেও রোগের সংক্রমণ ঘটছে। আশা করা যাচ্ছে, যে-সমস্ত শিশু-উপনিবেশকে আপনি সাহায্য যুগিয়ে চলেছেন সেই সমস্ত কলোনির কাজকর্ম উপরোক্ত রোগ ও রোগগ্রস্ত উপাদানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথ উন্মুক্ত করবে এবং আগেও যেমন করেছে ভবিষ্যতেও তেমনই মন্দ থেকে ভালোর জন্ম দেবে তারা।

'আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই কমরেড, এবং আপনার সু-স্বাস্থ্য, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও কঠিন কর্মে সাফল্য কামনা করি।

'ম. গোর্কি।'

এরপর ম্যাক্সিম গোর্কির কাছে খারকভ কার্যনির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যানের জবাবী চিঠি:

'প্রিয় কমরেড,

'আপনার নামাঙ্কিত শিশু-উপনিবেশের প্রতি আপনি যে-আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তার জন্যে খারকভ আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতিমণ্ডলী আপনাকে তাঁদের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন।

'শিশুদের নিরাশ্রয় অনাথ হয়ে যাওয়া ও শিশুদের মধ্যে অপরাধ-প্রবণতা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে যে-সংগ্রাম চলছে সে-সম্পর্কিত সমস্যাবলীর দিকে আমরা বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছি এবং এই গোটা ব্যাপারটা আমাদের বাধ্য করছে সুস্থ স্বাভাবিক কর্মময় জীবনে রাস্তার অনাথদের খাপ খাওয়ানো ও এ-ব্যাপারে তাদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে।

'বলা বাহুল্য, এ-কাজ অত্যন্ত দুরূহ এবং এই কর্ম যথাযোগ্যভাবে সম্পাদন করতে আরও কিছুটা সময় না-লেগে পারে না, তবু এখনই আমরা সমস্যাটির সঙ্গে পাঞ্জা কষতে লেগে গেছি।

'কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতিমণ্ডলী এ-ব্যাপারে দৃঢ়নিশ্চিত যে বর্তমান নতুন পরিস্থিতিতে কলোনির কাজকর্ম সাফল্যমণ্ডিত হবেই এবং অদূর-ভবিষ্যতে এই কর্মযজ্ঞের সম্প্রসারণ ঘটবে ও আমাদের সকলের মিলিত চেষ্টায় এ-কাজ সাফল্যের এমন এক চূড়া স্পর্শ করবে যা আপনার নামাঙ্কিত এই কলোনিটির যোগ্য বলে গণ্য হবে।

'প্রিয় কমরেড, আমাদের সকলের তরফে আমি আন্তরিকভাবে আপনার সু-স্বাস্থ্য ও শক্তি, প্রয়োজনীয় কাজে আপনার ভবিষ্যৎ কর্মক্ষমতা ও আপনার ভবিষ্যৎ সাহিত্যকর্মের সাফল্য কামনা করি।'

চিঠি দু'খানা পড়তে-পড়তে আমি প্রায়ই কাগজের ওপর দিয়ে কলোনি-বাসিন্দাদের দিকে তাকিয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিলুম। ওরা আমার চিঠিপড়া শুনছিল আর মনে হচ্ছিল সবরকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে ওদের সমস্ত অন্তরাত্মা যেন তাজ্জব-বনে-যাওয়া, আনন্দোৎফুল্ল চোখগুলোয় প্রতিফলিত হচ্ছিল। আবার ওই একই সঙ্গে এই নতুন জগতের সবকিছু রহস্য ও সে-জগতের বিপুল বিস্তার যেন কিছুতে পুরোপুরি আঁচ করতে পারছিল না। অনেকেই ওদের মধ্যে জায়গা ছেড়ে অর্ধেকটা উঠে দাঁড়িয়েছিল আর টেবিলে কনুইয়ের ভর দিয়ে গলাটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে গিলছিল কথাগুলো। 'রাব্‌ফাক'-এর ছাত্রছাত্রীরা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে স্বপ্নাচ্ছন্নভাবে মিটিমিটি হাসছিল, মেয়েরা চোখের জল মুছছিল আর সাহসী বাচ্চা ছেলেরা চোরা-চাউনিতে দেখছিল তাদের দিকে। আমার ডানদিকের একটা টেবিলে বসেছিল কোরত্‌কভ — ওর সুন্দর ভ্রূদুটি চিন্তায় অল্প-একটু কুঁচকে। আর

দুই হাতের মুঠোয় গালদুটো সজোরে কুঁচকে ধরে নিজের জায়গায় বসে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল খোভ্‌রাখ।

আমি চিঠি পড়া শেষ করার সঙ্গেসঙ্গেই টেব্‌লগুলোর ওধার থেকে একটা সম্মিলিত নড়াচড়া আর কথাবার্তার ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠল। কিন্তু কারাবানভ হাত তুলে থামিয়ে দিল সকলকে। বলল:

'আচ্ছা, বেশ! তাহলে আমরা এখন কী বলব? আমরা বলব... না, থাক, চুলোয় যাক কথাবার্তা!.. আমরা কথা বলব না, গান গাইব এখন! এস, শুরু করা যাক, তবে ঠিকঠিক গাইতে হবে কিন্তু... এস, 'আন্তর্জাতিক' গাই আমরা।'

ছেলেরা খুশিতে হৈচৈ করে উঠল। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলুম যে কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের অনেকেই কথাটা শুনে কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেল আর চুপ মেরে গেল। আন্দাজ করলুম, 'আন্তর্জাতিক' গানের কথাগুলো বোধহয় ওদের জানা নেই।

হঠাৎ লাপত একটা বেঞ্চে লাফিয়ে উঠল। বলল:

'শুরু হোক তাইলে! মেয়েরা — তোমরাই শুরু কর। গলা খুলি গান ধরে দাও!'

সঙ্গীত-পরিচালকের মতো হাত নাড়ল ও। আমরা গান ধরলুম।

সম্ভবত 'আন্তর্জাতিক' সঙ্গীতের প্রতিটি পংক্তি ওই সময়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল যে গানটি আমরা প্রাণ খুলে সানন্দে গাইতে লাগলুম। ছেলেরা গাইতে-গাইতে লাপতের দিকে আড়ে-আড়ে তাকাতে লাগল আর অনিচ্ছাকৃতভাবেই তার প্রাণবন্ত উদ্দীপিত ভঙ্গি নকল করে চলল। লাপতের এই ভঙ্গিগুলো ছিল আমাদের ভারি চেনা। মনে হোত প্রতিটি সম্ভাব্য মানবিক ধ্যানধারণা লাপত তার এই অঙ্গভঙ্গির মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারত। আর যখন আমরা গাইছিলুম:

'গাও ইন্টারন্যাশনাল
মিলাতে মানব-জাত...'

তখন ও তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিউগ্‌ল-বাজিয়েদের দিকে আঙুল দেখাচ্ছিল আর আমাদের সম্মিলিত গলার সঙ্গে তখন বিউগ্‌লগুলোর রুপোলি সুর মিলেমিশে এক হয়ে যাচ্ছিল।

গান শেষ হল। অতঃপর মাত্‌ভেই বেল্‌খিন শাদা একখানা র্‌মাল নেড়ে-নেড়ে রান্নাঘরের জানলাটার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল:

'আনো এইবার হংসমাংস, স্‌রা
ভোদ্‌কা, বীয়ার, স্‌খাদ্য আর প্‌রা
আইসক্রীমের প্লেট সকলের তরে!'

মাত্‌ভেইয়ের দিকে সম্মোহিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছেলেরা হেসে উঠল হো-হো করে, আর বেল্‌খিন বন্ধ্‌র মতো একগাল হেসে তাদের চোখে চোখ পাতল। তারপর একটানা চড়া গলায় আগের হেঁয়ালিভরা কথাগ্‌লো ব্যাখ্যা করে বলল:

'প্রিয় কমরেড-সব, ওরা অবশ্য ভোদ্‌কা আর অন্য অনেককিছ্‌ স্‌খাদ্যের ব্যবস্থা করে নাই, তবে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতি পার, আমি কথা দিতেছি যে তোমাদের জন্য আইসক্রীম আছেই! আইসক্রীম না থেকে পারে না! যাই হোক, এখন বর্‌শ্চ খাওয়া শ্‌র্‌ করে দাও!'

বন্ধ্‌ত্বে-ভরা, প্রাণখোলা হাসি ফের ছড়িয়ে পড়ল গোটা খাবারঘর জ্‌ড়ে। সেই হাসির ধারা অন্‌সরণ করতে গিয়ে আমার চোখ হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে গিয়ে পড়ল দ্‌জ্‌রিন্‌স্কায়ার বিস্ময়ে গোল হয়ে-ওঠা চোখের ওপর। দ্‌জ্‌রিন্‌স্কায়া কখন যেন এসে দাঁড়িয়েছিলেন দোরগোড়ায়। তাঁর পেছন থেকে ইউরিয়েভের হাসি-হাসি ম্‌খখানাও নজরে পড়ছিল। আমি তাড়াতাড়ি তাঁদের দিকে এগিয়ে গেল্‌ম।

কী রকম যেন অন্যমনস্কভাবে দ্‌জ্‌রিন্‌স্কায়া আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন। ঘরের ভেতর-বসা সারি-সারি ছাঁটা-চুলো মাথা, ধপধপে শাদা জামায়-ঢাকা কাঁধ আর বন্ধ্‌ভাবাপন্ন হাসিতে-ভরা ম্‌খগ্‌লো থেকে তিনি কিছ্‌তেই চোখ ফেরাতে পারছিলেন না।

'এসব কী দেখছি, আন্তন সেমিওনভিচ?.. দাঁড়ান, দাঁড়ান, একমিনিট!.. এ কী সত্যি?' বলতে-বলতে ওঁর ঠোঁটদ্‌টো কেঁপে উঠল। 'এরা কি সবাই আপনার ছেলেপিলে? কিন্তু ওরা... ওরা গেল কোথায়? দয়া করে বল্‌ন দেখি, কী ব্যাপারটা ঘটছে এখানে?'

'কী ঘটছে? এখানে যে কী ঘটছে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন... আমার মনে হয় আপনারা যাকে বলেন ধর্মান্তরণ, তা-ই ঘটছে এখানে। তবে এখানে যাদের দেখছেন এরা সবাই... আমাদের! আমাদের! ব্‌ঝলেন?'

১০

ওলিম্পাসের পাদদেশে

কুরিয়াজে মে আর জুন এই মাসদুটো ছিল প্রায়-অমানুষিক পরিশ্রমের কাল। এই মুহূর্তে উপরোক্ত ওই কাজের — যাকে বলে — জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা দেয়ার কোনো ইচ্ছে নেই আমার।

কাজ বা পরিশ্রম বস্তুটাকে যদি সংযত মনোভাব নিয়ে বর্ণনা করতে হয় তাহলে স্বীকার করতেই হয় যে তার অনেকখানিই গুরুভার, অপছন্দসই, নীরস, অসম্ভব ধৈর্যের ব্যাপার এবং কষ্ট ও বিরক্তি চাপার অভ্যাস আয়ত্ত করার ওপর নির্ভরশীল। দুনিয়ায় এমন অসংখ্য কাজ আছে যা নিষ্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে শুধুমাত্র এই কারণে যে মানুষ শিখেছে কীভাবে কষ্টস্বীকার ও সবকিছু সহ্য করতে হয়।

বহুকাল থেকেই লোকে পরিশ্রমের গুরুভার বওয়া ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শারীরিক বিকর্ষণের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে শিখেছে, তবে নিজেকে এই মানিয়ে নেয়ার ব্যাপারে মানুষ যে-সব কৈফিয়ত দিয়ে থাকে তা যে সব সময় আমাদের কাছে সন্তোষজনক বলে মনে হয় তা নয়। মনুষ্যপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কথা মেনে নিয়ে আমরা এখনও পর্যন্ত ব্যক্তিগত সুখসুবিধে ও আত্মস্বার্থের কিছু-কিছু মতলবকে সহ্য করে চলি, তবে সর্বদাই চেষ্টা করি ব্যক্তিস্বার্থের উদ্দেশ্যের জায়গায় যৌথ স্বার্থের বৃহত্তর কর্মোদ্দীপনাকে স্থান করে দিতে। তবে এই সূত্রে যে-সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হয়ে থাকে তার অনেকগুলিই হয়ে থাকে অত্যন্ত উলটোপালটা ধরনের। আর কুরিয়াজে আমাদের এই সব সমস্যার সমাধান করতে হচ্ছিল বাইরের প্রায় কোনো সাহায্য ছাড়াই।

সত্যিকার শিক্ষাবিজ্ঞান একদিন এইসব সমস্যার সমাধান সম্ভব করে তুলবে। এ-ব্যাপারে নিয়োজিত মানবিক প্রয়াসের বলবিদ্যাকে বিশ্লেষণ করবে তা, এতে প্রযোজ্য ইচ্ছাশক্তি, গর্ব, লজ্জা, অভিভাবন, অনুকরণ, আশঙ্কা ও প্রতিযোগিতার অনুপাত নির্দিষ্ট করে দেবে এবং বিশুদ্ধ সচেতনা, প্রত্যয় ও যুক্তিবুদ্ধির মতো ব্যাপারগুলির সঙ্গে এই সমস্ত কিছুর কতখানি পরিমাণে মিশ্রণ ঘটবে তাও নির্ধারিত করে দেবে। প্রসঙ্গত বলি, এ-ব্যাপারে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা নিশ্চিতভাবে এই তত্ত্বটির সপক্ষে প্রমাণ দিচ্ছে যে বিশুদ্ধ

সচেতনার উপাদানগুলি ও পেশীর শক্তিক্ষয়ের মধ্যে ফারাক অনেকখানি বেশি, এবং এদের মধ্যে সংযোগ-সূত্র হিসেবে অপেক্ষাকৃত আদিম ও বৈষয়িক কিছু-কিছু উপাদানের উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক।

গোর্কিপন্থীরা যেদিন কুরিয়াজে এসে পেঁছুল সেইদিনই সচেতনার সমস্যাটির খুবই সফল একটা সমাধান ঘটে গেল। একটিমাত্র দিনের মধ্যে কুরিয়াজের জনতা সেদিন এই প্রত্যয়ে পূর্ণ হয়ে উঠল যে নবাগত বাহিনীগুলি তাদের জন্যে অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবনের সূত্রপাত ঘটিয়েছে, অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এসেছে তাদের সাহায্য করতে এবং এইসব নতুন ধরনের মানুষের সঙ্গে এখন তাদের পায়ে পা মিলিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে এমন কি সুযোগসুবিধে লাভের বিবেচনাটাও নির্ধারক উপাদান ছিল না, তবে অবশ্যই যৌথ জীবনের অভিভাব ছিল সেই নির্ধারক শক্তি। না, এ-অভিভাবের অর্থ কোনো হিসেবনিকেশ নয়, কেবল চোখের চাউনি, কান পেতে শোনা, কণ্ঠস্বর আর হাসির ব্যঞ্জনামাত্র এ। অথচ এরই ফলে, ওই প্রথম দিনটি একত্র যাপনের মধ্যে দিয়ে কুরিয়াজ-বাসিন্দারা নির্দ্বিধায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল গোর্কি যৌথ সমাজের সদস্য হবার জন্যে, আর-কিছুর কারণে নয় — নিছক সেটা যৌথ জীবন ছিল বলেই আর সেই যূথবদ্ধতা তাদের কাছে তখনও পর্যন্ত অপরীক্ষিত জীবনের একটা দুর্লভ মনোরম ব্যাপার বলে ঠেকেছিল, তাই।

তবে তখনও পর্যন্ত আমি কেবলমাত্র ছেলেদের সচেতনাকেই আমার সপক্ষে টানতে পেরেছিলুম। আমি জানতুম শুধুমাত্র ওইটুকুই সাংঘাতিকরকম অপ্রতুল ব্যাপার। আর ঠিক এর পরের দিনই এই অপ্রতুলতা তার সবরকম জটিলতা নিয়ে প্রকট হয়ে উঠল। আগের সন্ধেয় কম্‌সমোলের ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত হরেকরকম কাজের জন্যে অনেকগুলো মিশ্র বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। হয় কোনো-না-কোনো শিক্ষক, নয় কিছু-কিছু বয়ঃপ্রাপ্ত গোর্কিপন্থীকে প্রতিটি বাহিনীতে বেঁটে দেয়া হয়েছিল। পরদিন ভোরবেলা থেকে কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের মন-মেজাজও ছিল চমৎকার, অথচ দুপুরবেলা খাওয়ার সময় নাগাদ সেদিন দেখা গেল যে কুরিয়াজ-বাসিন্দারা খুবই সামান্য কাজ করেছে। আর তারপর দুপুরের খাওয়ার পাট চুকলে তাদের অনেকে আর কাজে ফিরে গেল না পর্যন্ত, বরং এখানে-ওখানে গা-ঢাকা দিলে, আবার কেউ-কেউ পুরনো অভ্যাসবশত শহরের দিকে কিংবা রিজোভ স্টেশনে পাড়ি জমালে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি সব ক'টা মিশ্র বাহিনীকে নেড়েচেড়ে দেখল্ম। আর একই দৃশ্য চোখে পড়ল সর্বত্র। প্রতিটি বাহিনীতেই গোর্কিপন্থীর সংখ্যা ছিল নামমাত্র, ছিটেফোঁটা, আর কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের ছিল লক্ষণীয়রকম সংখ্যাধিক্য। ফলে শেষোক্তদের কাজের ধরনটা-যে প্রাধান্য লাভ করবে এমন একটা বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। বিশেষ করে গোর্কিপন্থীদের মধ্যে আদি বাসিন্দাদের পাশাপাশি অনেক নতুন ছেলেপিলে থাকায় এই সম্ভাবনাটা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাছাড়া এমনও ভয় ছিল যে আমাদের কিছু-কিছু ঝান্ গোর্কিপন্থীও-না শেষকালে কুসঙ্গ-দোষে পড়ে কুরিয়াজের স্তরে নেমে যায় আর সক্রিয় শক্তি হিসেবে তাদের ভূমিকার অবসান ঘটে।

অথচ বাইরে থেকে শৃঙ্খলা আর নিয়মকানুন চাপিয়ে দেয়া — যা নাকি পরিণত কোনো যৌথ সংস্থার ক্ষেত্রে খুবই সুসমঞ্জস ও কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়ে থাকে — তা-ও এক্ষেত্রে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারত। কেননা এক্ষেত্রে কাজ করছে না এমন দোষীর সংখ্যা ছিল অনেক, আর তাদেরকে জনে-জনে ধরে সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে গেলে বহু সময় ব্যয় করা ছাড়াও ব্যাপারটা যেমন কঠিন তেমনই অকার্যকর হয়ে পড়ত। তাছাড়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তখনই কার্যকর হয় যখন ওই ব্যবস্থা নেয়ার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিবিশেষকে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয় এবং জনমত দৃঢ়ভাবে সেই ব্যবস্থা অবলম্বনকে সমর্থন জানায়। পরিশেষে, শারীরিক বলপ্রয়োগ বা শ্রম সংগঠনের ক্ষেত্রে বাইরে থেকে ব্যবস্থা অবলম্বন সবচেয়ে কম কার্যকর হয়ে থাকে।

অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞ কেউ নিচের কারণগুলির জন্যে নিজেকে প্রবোধ দিতে পারত। সে-কারণগুলি এইরকম: ছেলেরা এখনও পর্যন্ত কাজের ব্যাপারে শৃঙ্খলা মেনে চলায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে নি, কাজের ব্যাপারটাই তারা রপ্ত করতে পারে নি এখনও, কীভাবে কাজ করতে হয় তা তারা জানে না, তাদের কমরেডদের কাজের সঙ্গে তাল রেখে চলায় ধাতস্থ হয়ে ওঠে নি এখনও, যৌথ সমাজের প্রতিটি সদস্যের অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্য যা কাজ সম্বন্ধে সেই গর্ববোধ তাদের মনে এখনও সঞ্চারিত হয় নি, আর এই সবকিছু একদিনে আয়ত্ত করারও ব্যাপার নয় — এ-সবে অভ্যস্ত হতে সময় লাগে, ইত্যাদি ইত্যাদি। দুঃখের বিষয়, আমি কিন্তু এ-ধরনের সান্ত্বনার আশ্রয় নিতে অপারগ হলুম। এই অদম্য কঠোর ব্যাপারটি আমি পুরোপুরি অবগত ছিলুম যে

শিক্ষাবিজ্ঞান-সংক্রান্ত ব্যাপারস্যাপারের ওপর সহজ নির্ভরশীলতা কোনো কাজের কথা নয়, এক্ষেত্রে ন্যায়শাস্ত্রের সূত্র, কার্য-কারণ সম্পর্কের ব্যাপার আবিষ্কার করে ফেলে দ্রুত সিদ্ধান্তে ঝাঁপিয়ে পড়া মোটেই সমর্থনীয় নয়।

মে মাসে কুরিয়াজে অবস্থাটা যে-রকম দাঁড়িয়েছিল সম্মিলিত শ্রম-প্রয়াসের সেই শ্লথ, বিলম্বিত গতি কাজের সাধারণ ধরনধারণের সর্বনিম্ন ধাঁচকে যদি না হয় তো তার গড়পড়তা ধাঁচকে অন্তত আক্রান্ত করার উদ্যোগে দেখাচ্ছিল এবং আদি গোর্কিপন্থীদের কাজের স্থিতিস্থাপক, দ্রুতগতি ও যথাযথ লয়ের অবসান ঘটানোর উপক্রম করছিল।

শিক্ষাবিজ্ঞানের তত্ত্বকথায় কাজের শৈলী ও তার গুণগত বৈশিষ্ট্যকে সর্বদাই উপেক্ষা করা হয়ে এসেছে, অথচ বাস্তবে যৌথ জীবনগঠনের শিক্ষার ক্ষেত্রে এই গুণগুলিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবধার্য বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত হয়ে দাঁড়ায়। শৈলী বস্তুটি বড়ই সুকুমার ও নশ্বর। এই বস্তুটিকে জীইয়ে রাখতে প্রতিনিয়ত যত্নের ও দৈনিক মনোযোগদানের দরকার করে, ফুলের বাগানের মতোই এর লালনপালন প্রয়োজন। এ বস্তু দ্রুত গড়ে ওঠে না, কেননা ঐতিহ্যের সঞ্চয়ের ভিত্তি ছাড়া এর অস্তিত্ব অচিন্তনীয়। ঐতিহ্য বলতে বোঝাতে চাইছি এমন সব ধ্যানধারণা ও অভ্যাসকে যেগুলি আমাদের সচেতনাই শুধু গ্রহণ করে নি, আমাদের পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতার এবং একটি নির্দিষ্ট যৌথ জীবনের বিপুল কর্তৃত্বের প্রতি সচেতন শ্রদ্ধায়ও যা গৃহীত হয়েছে, তাদের। বহু শিশু-সদনের ব্যর্থতার মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রায়শই এই তথ্যে পৌঁছতে হয় যে তারা জীবনযাপনের না-কোনো শৈলীর উদ্ভব ঘটাতে পেরেছে, না-পেরেছে কোনো অভ্যাসসমষ্টি ও ঐতিহ্যের সৃষ্টি করতে। কিংবা, বলা যেতে পারে যে তারা যেখানে-যেখানে এ-সব জিনিসের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল সেখানে শিক্ষাবিভাগের অনবরত-বদলি-হওয়া ইন্‌স্পেক্টররা নিয়মিতভাবে সেগুলির মূল ধ্বসিয়ে দিয়েছিল — অবশ্য, বলা বাহুল্য, খুবই প্রশংসনীয় উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়েই। এরই দৌলতে সামাজিক শিক্ষাদান-সংক্রান্ত বিভাগের লালিত 'শিশু' সর্বদা যে-কোনো ধরনের ঐতিহ্য — তা সে গোটা একটা যুগের কিংবা মাত্র এক বছরের যাই হোক না কেন — তা থেকে বঞ্চিত হয়েই বেড়ে উঠেছিল।

কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের সচেতনাকে যে আমাদের অনুকূলে জয় করে নেয়া গিয়েছিল তার ফলে আমার পক্ষে ওই ছেলেদের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ, আরও

অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হয়ে উঠল। কিন্তু এ-ব্যাপারটাও যথেষ্ট ছিল না। সত্যিকার জয়লাভের পক্ষে শিক্ষাবিজ্ঞানগত কলাকৌশলে প্‌রোপ্‌রি দক্ষতা অর্জনের দরকার ছিল। অথচ এই কলাকৌশল প্রয়োগ করার ব্যাপারে যেমন ১৯২০ সালে তেমনই তখনও আমি ছিল্‌ম একান্ত একা, অবশ্য তখন আর আগেকার মতো অমন হাস্যকররকমের অজ্ঞ ছিল্‌ম না, এই যা তফাত। আমার এই একাকিত্ব ছিল অবশ্য একটু বিশেষ ধরনের। ওই সময়ের মধ্যে আমার সমর্থকদের একটি বেশ ভালোরকম সংগঠিত দল গড়ে উঠেছিল। আর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ও যৌথ সংস্থার ছেলেমেয়েদের নিয়ে গঠিত এই দলটি আমার আয়ত্তে থাকায় অত্যন্ত জটিল নানা কাজকর্মে হাত দিতে আমি সেদিন সক্ষম হয়েছিল্‌ম। তবে এ-সবই ছিল অপেক্ষাকৃত নিচের স্তরের ব্যাপার।

ওপরমহলগ্‌লিতে এবং ঠিক তাদের নিচের স্তরগ্‌লিতে, অর্থাৎ শিক্ষাবিজ্ঞান-সংক্রান্ত ওলিম্পাস স্বর্গধামের নানা উঁচুনিচু চুড়োয়, অপর কারও নিজস্ব শিক্ষাবিজ্ঞানগত কলাকৌশল থাকাকে তখন অনাচরণীয় বিধর্ম বলে গণ্য করা হোত।

সেই 'ঊর্ধ্বলোকে' 'শিশ্‌' বলতে বোঝাত এমন একটি প্রাণী যে নাকি এক বিশেষ ধরনের বাষ্পে বা ভাপে-ভরা ফান্‌স, আর সেই বাষ্পটির নাম তখনও পর্যন্ত সকলের অগোচরে রয়ে গেছে। ওপরওয়ালাদের কাছে বাস্তবে এই বাষ্প-পদার্থটা ছিল সেই এক চিরকেলে আত্মা, প্রাচীন কালে ঈশ্বরপ্রেরিত অবতাররা যার ওপর ঐশ্বরিক মহিমার ভেল্‌কি প্রয়োগ করতেন। ওই মহলে এটা ধরে নেয়া হয়েছিল (কাজ-চালানোগোছের একটা অন্‌মান আর-কি!) যে এই আত্মা-বস্তুটার ওপর যদি জবরদস্তি হস্তক্ষেপ না-করে একে নিজমনে থাকতে দেয়া হয় তাহলেই এটা আপনা থেকে আত্মবিকাশ ঘটাতে সমর্থ। এই বিষয়টি নিয়ে তখন গাদা-গাদা বই লেখা হচ্ছিল বটে, তবে সব ক'খানা বইয়েরই মোদ্দা কথাগ্‌লো ছিল র্‌সোর এই নীতিবাক্যগ্‌লোর প্রতিধ্ব্‌নিমাত্র। নীতিবাক্যগ্‌লো এই:

'শৈশবকে দেখতে হবে সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমের চোখে...'

'প্রকৃতির ওপর অবৈধ হস্তক্ষেপ সম্পর্কে সাবধান...'

ওপরওয়ালাদের এই ধর্মবিশ্বাসের ম্‌লতত্ত্ব ছিল এই যে প্রকৃতি সম্বন্ধে ওপরের ওই সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা বজায় রাখলে প্‌র্বোক্ত বাষ্পীয় পদার্থটি শেষপর্যন্ত

অবশ্যম্ভাবীরূপে কমিউনিস্ট ব্যক্তিত্বে বিকশিত হয়ে উঠবেই। বাস্তবে কিন্তু এই ধরনের বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশে যা গজিয়ে উঠছিল তা প্রকৃতিকে নিজমনে বেড়ে উঠতে দিলে যা গজায় তাই-ই — অর্থাৎ, অতি-সাধারণ সব আগাছা। তবু এ-নিয়ে কেউ বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাচ্ছিল বলে মনে হচ্ছিল না — আসলে ওলিম্পাসবাসী দেবদেবীদের কাছে যা ছিল প্রাণের চেয়েও প্রিয় তা হল বিমূর্ত সব ধ্যানধারণা ও নীতিকথা। আমি যখন আপনা থেকে গজিয়ে-ওঠা এইসব আগাছা আর আমাদের আদর্শ কমিউনিস্ট ব্যক্তিত্বের মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাকের কথাটা উল্লেখ করলুম তখন সবাই আমাকে নিছক প্রয়োগবাদী কেজো লোক বলে অভিযুক্ত করল। আমার প্রকৃত চরিত্র ফাঁস করে দেয়ার দরকার পড়লে তখন কেউ-না-কেউ ঠোঁট উলটে বলত:

'মাকারেঙ্কো কাজকর্ম অবিশ্যি ভালোই করেন, তবে কিনা তত্ত্বটত্ত্ব ওঁর তেমন আসে না।'

শৃঙ্খলারক্ষার ব্যাপারটা নিয়েও আলোচনা উঠেছিল। লেনিনের রচনাবলীতে প্রায়ই 'সচেতন শৃঙ্খলা' বলে যে-শব্দদুটির সাক্ষাৎ মেলে সেই কথাদুটিকেই তখন আলোচ্য সমস্যাটির তত্ত্বগত ভিত্তি বলে গ্রহণ করা হোত। সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা যার আছে এমন যে-কেউ ধরে নেবে যে এই কথাদুটি যে-কোনো সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলা-সম্পর্কিত ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা, ব্যবহারিক সার্থকতা, বাধ্যতামূলক প্রকৃতি ও শ্রেণীগত তাৎপর্যের ব্যাপারগুলিকে পুরোপুরি স্পষ্ট করে তোলার সহজ, বোধগম্য ও সামগ্রিক বাস্তব ধারণাটিই প্রকাশ করছে মাত্র। কিন্তু শিক্ষাবিজ্ঞানের 'তত্ত্ব' এই কথাদুটিতে সম্পূর্ণ অন্য অর্থ আরোপ করছিল। এই তত্ত্বকথা অনুযায়ী শৃঙ্খলার ব্যাপারটি বিকশিত হয়ে ওঠার কথা যৌথ অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে নয়, যৌথ জীবন-প্রবাহের বন্ধুত্বপূর্ণ চাপসৃষ্টির ফলেও নয়, বরং একেবারে নির্ভেজাল সচেতনা থেকে, বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাজাত প্রত্যয় থেকে, আত্মার উৎসার থেকে, মানসিক ধ্যানধারণা থেকে। এই তত্ত্বকথার প্রচারকরা কিন্তু এখানেই থামলেন না, আরও খানিক এগিয়ে গিয়ে তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে 'সচেতন শৃঙ্খলা'বিধান যদি পরিণতবয়স্কদের প্রভাবের ফল হয় তাহলে তা মোটেই উপযোগী হয় না। তাঁদের মতে, তখন তা মোটেই সচেতন শৃঙ্খলাবিধানের স্তরে থাকে না, তা হয়ে দাঁড়ায় নিছক কুচকাওয়াজের সামিল, আত্মার সূক্ষ্ম সুকুমার উৎসারের ওপর দমনপীড়নমাত্র। তাছাড়া আসলে যা প্রয়োজন তা সচেতন শৃঙ্খলাবিধান নয়, 'আত্ম-

শৃঙ্খলা'বিধান। এই একই যুক্তিতে তাঁদের বক্তব্য ছিল এই যে শিশুদের জন্যে যে-কোনো ধরনের সংগঠনই অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর, তাদের পক্ষে একমাত্র প্রয়োজনীয় হল 'আত্ম-সংগঠন'।

ওপরমহলের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে ফের সেই পাণ্ডববর্জিত আস্তানায় ফিরে এসে আমি ভাবতে শুরু করলুম। নিজেকে এই বলে বোঝাতে চাইলুম যে আমরা সবাই খুবই ভালো করে জানি কী ধরনের মানুষ তৈরি করা আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। যে-কোনো মাত্রায় শিক্ষিত, যে-কোনো শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকও এটা জানেন। প্রতিটি পার্টি-সদস্যও এটা ভালোভাবে জানেন। কাজেই সমস্যাটা এই নয় যে কী করতে হবে, সমস্যা হল এই যে কীভাবে করতে হবে এটা। আর এই বিষয়টা হল শিক্ষাবিজ্ঞানগত কলাকৌশলের অন্তর্ভুক্ত।

কলাকৌশল ও পদ্ধতি সর্বদাই অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত হতে বাধ্য। ধাতু নিয়ে কারুকর্মের আইনকানুন কখনই তৈরি হোত না, মানুষের ইতিহাসে ধাতু নিয়ে তার আগে যদি-না কেউ কাজ করত। একমাত্র কারিগরি অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হলে পর তবেই আরও নতুন-নতুন আবিষ্কার, কাজের উন্নতিবিধান, ভালো-খারাপের বাছাই আর খারাপ জিনিস পরিত্যাগ করা সম্ভব হয়ে ওঠে।

আমাদের শিক্ষাবিজ্ঞান-সংক্রান্ত 'শিল্প' কখনই কারিগরি বিদ্যার যুক্তিশাস্ত্রের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে নি, বিনা ব্যতিক্রমে সর্বদাই তা নির্ভর করেছে নৈতিক দিক থেকে বুঝিয়ে রাজি করানোর ওপর। এটা যতটা না ক্লাসরুমে কাজের মধ্যে লক্ষণীয় তার চেয়ে অনেক বেশি করে ও বিশেষ করে শিক্ষাদান কথাটির ব্যাপক অর্থে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে দৃষ্টিগোচর।

এই কারণেই শ্রমশিল্পের সব ক'টি প্রয়োজনীয় শাখার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় আমাদের কাজে। যথা, কৃৎকৌশলগত প্রক্রিয়া কর্মপরিচালনার পরিকল্পনা, নির্মাণ-সংক্রান্ত কাজ, সঞ্চারক ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং মান, নিয়ন্ত্রণ, বরদাস্ত করা ও বাতিল করার মাপকাঠি নির্ধারণ, ইত্যাদি।

যখনই আমি ভয়ে-ভয়ে এই ধরনের কথাবার্তা 'ওলিম্পাস' পর্বতের পাদদেশে নিবেদন করেছি তখনই দেবদেবীরা আমার মস্তক লক্ষ্য করে ইষ্টকবর্ষণ করেছেন, চিৎকার করে জানিয়ে দিয়েছেন যে আমার এই তত্ত্ব নেহাতই যান্ত্রিক।

কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে আমি নিজে যত বেশি চিন্তা করেছি তত বেশি

করে শিক্ষাগত পদ্ধতি আর সাধারণ শ্রমশিল্পগত পদ্ধতির মধ্যে নানাধরনের সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছি। এ-ধরনের সাদৃশ্য আবিষ্কারের মধ্যে যে ভয়াবহরকম যান্ত্রিক কিছু আছে তা এখনও আমি জোর করে বলতে পারি না। সবরকমের জটিলতা, সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য সহ মানবচরিত্র সম্পর্কে আমার যে ধ্যানধারণা পূর্বাপর বজায় ছিল তখনও পর্যন্ত আমি তা আঁকড়ে ছিলুম, তা সত্ত্বেও মনে হচ্ছিল যে ঠিক ওই সব ধ্যানধারণা আছে বলেই মানবচরিত্র বিশ্লেষণে আমাদের প্রবৃত্ত হওয়া উচিত সবচেয়ে যথাযথ মাপকাঠি দিয়ে, গভীরতম দায়িত্ববোধ নিয়ে — বোঝা উচিত যে এক্ষেত্রে বিশেষ করে যে-হাতিয়ার প্রয়োজনীয় তা হল বিজ্ঞান, পুরনো নানাবিধ কুসংস্কারের জগাখিচুড়ি নয়। শ্রমশিল্পগত ও শিক্ষাদানগত পদ্ধতির মধ্যে গভীর সৌসাদৃশ্য আমার কাছে মানব-ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ধারণার অবমূল্যায়ন ঘটানো দূরে থাক বরং মানুষ সম্পর্কে শ্রদ্ধা বৃদ্ধিরই সহায়ক হয়েছিল, কেননা তুখোড় আর জটিল কোনো যন্ত্রকে শ্রদ্ধার চোখে না-দেখে থাকা যায় না।

সে যাই হোক, এটা অন্তত আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল যে মানব-চরিত্রের অনেক খুঁটিনাটি উপাদানকে, তার যে-কোনো আচরণকে ছাঁচে ঢালাই করে তৈরি করা যেতে পারে, একধার থেকে দল বেঁধে ছাপ দিয়ে দেয়া যায় তাতে, তবে অবশ্য ওই ছাঁচগুলোরই যতদূরসম্ভব সূক্ষ্ম হওয়া দরকার, সেগুলো তৈরি করতে যথাসম্ভব যত্ন ও নির্ভুল বিচার-বিবেচনা থাকা প্রয়োজন। অবশ্য এমন অনেক খুঁটিনাটি উপাদান আছে যা গড়তে নিপুণ হাত আর তীক্ষ্ম চোখওয়ালা ওস্তাদ শিল্পীর ব্যক্তিগত হাতের ছোঁয়া দরকার, আবার অন্য কিছু-কিছু খুঁটিনাটির জন্যে দরকার বিশেষ ও বিশদ বিন্যাস ও সমন্বয়সাধনের। এই শেষোক্ত সব খুঁটিনাটি গড়তে গেলে লাগে অপরিসীম উদ্ভাবনী দক্ষতা ও কিছুপরিমাণে প্রতিভার ছোঁয়াচও। এবং শিক্ষাদাতার পক্ষে এই সবকিছু খুঁটিনাটি গড়া ও এই সবকিছু কাজের জন্যে একটি বিশেষ ধরনের বিজ্ঞানের প্রয়োজন পড়ে। এটা কেমনধারা ব্যাপার যে সকল উচ্চ কারিগরি ইন্‌স্টিটিউটে জড়পদার্থের প্রতিরোধক্ষমতার বিষয়টি পড়ানো হয়, অথচ শিক্ষাদান-সংক্রান্ত ইন্‌স্টিটিউটগুলিতে শিক্ষাদান-সম্পর্কিত ব্যবস্থাদি অবলম্বনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিত্বের প্রতিরোধের বিষয়টি মোটেই শেখানো হয় না? আর যাই হোক এটা তো কোনো গোপন কথা নয় যে এ-ধরনের প্রতিরোধের অস্তিত্ব অবশ্যই আছে! আর কেন, কেন আমাদের এমন কোনো সংগঠন

নেই যা শিক্ষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যারা সবকিছু তালগোল পাকাতে ওস্তাদ তাদের বলার ক্ষমতা রাখে যে —

'তোমাদের তৈরি মালের শতকরা নব্বুই ভাগই হল ভুষি মাল! তোমরা যা তৈরি করছ তা কমিউনিস্ট চরিত্র নয়, তা হল যতসব হতচ্ছাড়া, মাতাল, কাজ-পালানে আর আত্মস্বার্থ-সাধনে তৎপর লোকজন। দয়া করে তোমাদের মাইনে থেকে টাকা কেটে ফেরত দিয়ে এই ঘাটতি পূরণ কর!'

কাঁচামাল-সম্পর্কিত কোনো বিজ্ঞান নেই কেন আমাদের? এমনটা কেন হয় যে কেউই সঠিক বুঝতে পারে না একটা নির্দিষ্ট উপাদান থেকে দেশলাই বাক্স না এরোপ্লেন কোন জিনিসটা তৈরি হতে পারে?

ওলিম্পাসবাসীদের অফিসগুলোয় বসে না-বিভিন্ন খুঁটিনাটি না-কাজের পৃথক-পৃথক স্তর কিছুই নজরে পড়ত না। ওই সুদূর উচ্চতা থেকে বিমূর্ত শিশু-জগতের সীমাহীন সমুদ্র ছাড়া চোখে পড়ত না আর কিছুই, আর ওই অফিস-ঘরগুলোর মধ্যে অদৃশ্য সুতোয় ঝোলানো থাকত নানা মতাদর্শ, ছাপা কাগজ, কল্পিত দিবাস্বপ্ন, ইত্যাকার অত্যন্ত ভঙ্গুর নানা উপাদানে তৈরি এক বিমূর্ত শিশুর একটি আদর্শ নমুনা। ওলিম্পাসবাসীরা মাঝে-মাঝে যখন কলোনিতে নেমে এসে আবির্ভূত হতেন আমার সামনে, তখনও তাঁদের চোখ খুলত না, বাচ্চাদের একটি জীবন্ত যৌথ সংস্থা কিছুই নতুন বলে মনে হোত না তাঁদের কাছে, প্রযুক্তিবিদ্যাগত কোনো দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বনের প্রয়োজন আছে বলেই অনুভব করতেন না তাঁরা। এদিকে আমি তাঁদের কলোনি ঘুরিয়ে দেখাতে-দেখাতে আর তত্ত্বগত বিতর্কের জোয়ালে বাঁধা পড়ে অল্পস্বল্প তুচ্ছ প্রযুক্তিবিদ্যাগত খুঁটিনাটি না-উগরিয়ে কিছুতেই থাকতে পারতুম না।

যেমন, এইরকম একটি বিশেষ দিনে চতুর্থ বাহিনীর এজমালি শোবার ঘরের মেঝে ধোয়া হয় নি, কারণ ওইদিন বালতিটা পাওয়া যাচ্ছিল না। আর আমি বালতিটার বৈষয়িক মূল্য আর তার হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কলাকৌশল এই দুটো ব্যাপার নিয়েই কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলুম। প্রত্যেকটা বাহিনীকে তখন বালতি দেয়া হোত বাহিনীর সহকারী দলপতির ব্যক্তিগত দায়িত্বে। তার কাজ হোত ঘর পরিষ্কারের কাজের জন্যে ছেলের দলের শিফ্‌ট ঠিক করে দেয়া আর তার সঙ্গে বাসনপত্রের জন্যেও ব্যক্তিগত দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেয়া। আর এইরকম একটা তুচ্ছ ব্যাপার — ঘরদোর

পরিষ্কারের আর বালতি আর ঘরমোছা ন্যাতার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব — এ-সবই আমার কাছে ছিল প্রযুক্তিবিদ্যাগত নীতির সামিল।

উপরোক্ত এই তুচ্ছ ব্যাপারটা ছিল কোনো একটা ফ্যাক্টরির এককোণে পড়ে-থাকা, প্রস্তুতকারকের নাম আর যন্ত্রটি তৈরির তারিখ-মোছা, ক্ষয়ে-যাওয়া, প্রাচীন একখানা লেদ-মেশিনের মতো। এই ধরনের লেদ-মেশিনকে বিনা ব্যতিক্রমে সর্বদাই ওয়র্কশপের কালিঝুলিমাখা কোনো একটা সুদূর কোণে গাদা মেরে ফেলে রাখা হয় আর ওদের কথা উঠলেই সবাই বলে ওদের 'ঝুটঝামেলা'। এই যন্ত্রগুলোকে রাখা হয় নানা ধরনের গৌণ প্রয়োজনের খুঁটিনাটি জিনিসপত্র তৈরি করা বা চাঁচাছোলার জন্যে — যেমন, ওয়াশার, খুঁটি, ছোট দড়ি আর অসংখ্য ধরনের স্ক্রু। অথচ যখন এই ধরনের একটা 'ঝুটঝামেলা' কাজে গাফিলতি করতে থাকে তখন গোটা ফ্যাক্টরি জুড়েই অস্বস্তির একটা অস্পষ্ট শিহরণ বয়ে যায়, জোড়-মেলানোর যন্ত্রঘরে শ্রমিকরা তখন তৈরি করতে শুরু করেন 'শর্তাধীন উৎপাদ' আর গুদামঘরের তাকগুলো 'অসম্পূর্ণ' ছাপমারা ছোটখাট জিনিসপত্রের বিরক্তিকর বোঝার চাপে শিগ্‌গিরই মড়মড় করতে থাকে।

বালতি আর ঘরমোছা ন্যাতার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমার কাছে ঠিক এই লেদ-মেশিনের সঙ্গে তুলনীয় বলে ঠেকছিল। গুরুত্বের বিচারে বালতি ইত্যাদি জিনিসপত্র একেবারে পেছনের সারির বস্তু হতে পারে, কিন্তু মানবিক গুণাবলীর মধ্যে যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেই দায়িত্ববোধকে দৃঢ়বদ্ধ করে তোলার জন্যে জোড়-মেলানোর উপযোগী খুঁটিনাটি যন্ত্রাংশ ছিল এগুলো। আর এই বিশেষ মানবিক গুণ বা দায়িত্ববোধ ছাড়া যা গড়ে উঠতে পারত তা ওই 'অসম্পূর্ণ উৎপাদ'মাত্র — কমিউনিস্ট ব্যক্তিত্ব তা মোটেই নয়।

ওলিম্পাসবাসীরা কলাকৌশলকে ঘৃণা করতেন। তাঁদের একচ্ছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকার ফলে শিক্ষাবিজ্ঞানগত কারিগরি চিন্তাভাবনা, বিশেষ করে শিক্ষাদান-সংক্রান্ত প্রয়োগের ক্ষেত্রে, আমাদের শিক্ষা-সংক্রান্ত ইন্‌স্টিটিউটগুলিতে আজ বহুদিন ধরেই অকার্যকর হয়ে আছে। কৃৎকৌশলের বিচারে শিক্ষাদান আমাদের সোভিয়েত জীবনের অন্য যে-কোনো ক্ষেত্রের চেয়ে তখন পিছিয়ে ছিল, শিক্ষাদানের ব্যাপারটি ছিল তখন নিছকই একটি পেশামাত্র এবং অন্য সবরকম পেশার চেয়ে পশ্চাৎপদও। আর ঠিক এই কারণেই গোগলের

'ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল' নাটকে লুকা লুকিচ খ্‌লোপভের নিম্নোক্ত অভিযোগটি তখনও পর্যন্ত সত্যি হয়ে ছিল। লুকা লুকিচের বক্তব্য ছিল এই:

'শিক্ষা-সংক্রান্ত কোনো দপ্তরে কাজ করার চেয়ে খারাপ জিনিস আর কিছু হতে পারে না — কেননা সেখানে সকলে অন্যের কাজে বাধা দেয়, প্রত্যেকেই জাহির করতে চায় যে সে-ও বড় কম যায় না, সে-ও ভারি বুদ্ধিমান লোক।'

আর আমার এই কথাটা ঠাট্টা নয়, রসিকতা করে বাড়িয়ে বলাও নয়, এটা একেবারে খাঁটি সত্যি। শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে 'অতিশয় বুদ্ধিমান হওয়া অনাবশ্যক' নয় কি? ওই সময়টায় আমাদের দেশে একজন মানুষ শিক্ষা-দপ্তরের একটা চেয়ারের দখল পেতে-না-পেতেই সে সবকিছুর ফলাফল মাপজোক করতে, নানা কারণের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে বের করতে আর সংযোগ-সূত্রগুলো ছিন্নভিন্ন করতে শুরু করে দিত। এমন লোকের মাথা ঠান্ডা করতে তার হাতে আমরা কোন বই-ই বা গুঁজে দিতে পারতুম? আর তাছাড়া তার বইয়ের দরকারটাই বা কী ছিল? তার নিজের ঘরেই তো বাচ্চা ছিল, আর সেটাই তার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না কি? অথচ ওই সময়কার শিক্ষাবিজ্ঞানের একজন অধ্যাপক, শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ, তিনিই 'গে.পে.উ'* না 'এন.কা.ভে.দে'** কোন দপ্তরের কাছে যেন নিচের এই চিঠিখানি লিখেছিলেন:

'আমার ছেলে কয়েকবার আমার যথাসর্বস্ব চুরি করেছে। রাত্রে সে বাড়ি ফেরে না... আমি তাই আপনাদের কাছে সনির্বন্ধ মিনতি জানাচ্ছি যে...' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এসব দেখে-শুনে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে যায় যে খোদ শিক্ষাবিজ্ঞানের অধ্যাপকদের চেয়েও আমাদের 'চেকা'-দপ্তরের লোকজন শিক্ষাদান-সংক্রান্ত বিদ্যায় বেশি পারদর্শী হবে এটা আশা করা যায় কীভাবে?

এই কৌতুকাবহ প্রশ্নটির তাৎক্ষণিক কোনো উত্তর আমি সেদিন খুঁজে পাই নি। তাছাড়া ওই সময়ে, ১৯২৬ সালে, কৃৎকৌশল আয়ত্ত করার বিচারে

* 'গে.পে.উ' (জি-পি-ইউ) — প্রধান রাজনৈতিক দপ্তর। — অনুঃ

** 'এন.কা.ভে.দে' (এন-কে-ভি-ডি) — অভ্যন্তরীণ ব্যাপারের ভারপ্রাপ্ত জনকমিশারিয়েত। — অনুঃ

বলতে গেলে আমার অবস্থা টেলিস্কোপ সহ গ্যালিলিওর চেয়ে কোনো অংশে ভালো ছিল না। আমার কাছে তখন প্রশ্ন ছিল দুটি ব্যাপারের মধ্যে একটি বিকল্প বেছে নেয়া — হয় কুরিয়াজে বিপর্যয়, আর নয়তো ওলিম্পাসে বিপর্যয় ঘটানো ও পরে স্বর্গ থেকে বিতাড়ন। বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় বিকল্পটিই বেছে নিয়েছিলুম আমি। হরেকরকম তত্ত্বকথার রামধনুর সাতরঙে ঝলমলে স্বর্গ আমার মাথার ওপর অগ্নিচ্ছটা বিকীর্ণ করে চলেছিল, আমি কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না-করে কুরিয়াজের একটি মিশ্র বাহিনীর কাছে গিয়ে ছেলেদের বললুম:

'ছেলেরা, তোমাদের কাজ যাচ্ছেতাই হয়েছে!.. আজকের মিটিঙে আমি তোমাদের বিচার করতে চাই। তোমরা আর তোমাদের কাজ গোল্লায় যাক!'

শুনে ছেলেরা লাল হয়ে উঠল। আর ওদের মধ্যে অন্যদের চেয়ে মাথায় বড় এমন একজন তার কোদালখানা আমার দিকে দেখিয়ে মেজাজ নিয়ে গাঁক-গাঁক করে বলল:

'কোদালগুলান সব কয়ডা ভোঁতা — দ্যাখেন! দ্যাখেন একবার!'

'মিথ্যা কথা!' ওকে উদ্দেশ করে তোস্কা সলভিয়েভ বলে উঠল। 'কথাটা যে মিথ্যা তা তোরও অজানা নাই!..'

'তাইলি কী এগুলান — খুব ধারওলা, নাকি?'

'কিন্তু তুই গোটা একটা ঘণ্টা বালুর ঢিপিতি বসে ছিলি না? বল্, বসে ছিলি কিনা?'

এবার আমি মিশ্র বাহিনীটিকে বললুম, 'শোন, এই কাজটা আজ রাত্রের খাওয়ার মধ্যে তোমাদের শেষ করতে হবেই! যদি তা না পার তাহলে রাতের খাওয়ার পরও আমরা কাজ করব। আমি নিজে তখন তোমাদের সঙ্গে কাজ করব।'

ভোঁতা কোদালের মালিক তখন তাড়াতাড়ি বলল, 'তার আগি আমরাই শেষ করব্য-নে। এডা এমন এট্টা মস্ত কিছু কাজ না।'

তোস্কা হাসল:

'ছোঁড়াটা ভারি চালাক তো!..'

কলোনিতে অন্তত গুরুতরভাবে মর্মপীড়া ঘটার কোনো ব্যাপার ছিল না। লোকে যখন কাজ না-করে হেলাফেলায় সময় নষ্ট করে আর তারপর নষ্ট সময়ের যুক্তিসম্মত কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করে তখন তাকে ওলিম্পাসের

বাজারে যার চড়া দাম সেই উদ্যম আর সৃষ্টিশীল মনোভাবের প্রকাশ বলে গণ্য করা হয়তো উচিত। কিন্তু আমার শিক্ষাদানগত কলাকৌশল অনুযায়ী সৃষ্টির এই অগ্নিশিখাকে অবিলম্বে নির্বাপিত করারই দরকার ছিল, তার বেশি আর কিছু নয়। তবে আমি দেখে আনন্দ পাচ্ছিলুম যে কাজ করতে অস্বীকার করার ব্যাপারটাকে সজোরে জাহির করার মতো ঘটনা প্রায় ঘটছিলই না বলা চলে। কিছু-কিছু ছেলে অবশ্য কাজের সময় নিঃশব্দে লুকিয়ে পড়ত, আড়ালে-আবডালে সরে পড়ত কোথাও। তবে এ-সমস্ত ঘটনায় আমি খুবই কম বিচলিত হতুম, কেননা এ-ধরনের ছেলেদের শায়েস্তা করার একটা উপায় ছেলেরা নিজেরাই বের করে ফেলেছিল। কাজ-পালানে ছেলেটি যেখানেই পালাক-না কেন খাওয়ার সময় তাকে তার বাহিনীর টেবিলে খেতে আসতেই হোত, তা সে পছন্দ করুক আর না-ই করুক। আর অন্য কুরিয়াজ-বাসিন্দারা তখন খুব-একটা বেশি মেজাজ দেখাত না, কেবল কখনও-কখনও কেউ-কেউ হয়তো নেহাতই ভালোমানুষী ঢঙে ছেলেটিকে শুধোত:

'আরে, ফিরি এস্যেছিস তুই? ভাবলাম বুঝি পলায়্যে গেছিস!'

তবে গোর্কিপন্থীদের জিভগুলো (আর তাদের হাতগুলোও!) এর চেয়ে অনেক বেশি ভাব-প্রকাশক হয়ে উঠত তখন। কাজ-পালানে ছেলেটি হয়তো কিছুই হয় নি এমন একখানা ভাব করে, যেন সে নেহাতই সাধারণ গোবেচারা একটি ছেলে বিশেষ নজর কাড়বার মতো কেউকেটা নয় এই ভাবে, ধীরেসুস্থে হেলেদুলে টেবিলে গিয়ে পৌঁছুত। কিন্তু প্রতিটি বাহিনীর দলপতির কাজ ছিল প্রত্যেককে তার ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দেয়া।

দেখা যেত তার বাহিনীর দলপতি তখন কড়াভাবে অপর কাউকে হেঁকে বলছে, 'কোল্‌কা, হুঁশ নাই তোর? দেখতেছিস-না, ক্রিভরুচ্‌কো এসেছে যে! ওর জন্যি এট্টা জায়গা করে দে, জলদি কর্‌! পোস্কার একখান প্লেট দে ওরে! ওটা কী চামচ দিতেছিস? ভালো দেখে একখান চামচ নিয়্যি আয় দেখি!'

আর সঙ্গে সঙ্গে কোল্‌কার হাতের চামচখানা রান্নাঘরের জানলা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেত।

ফের শোনা যেত সেই হাঁকডাক:

'একপ্লেট সবথেকে ঘন স্যুপ ঢেলে দে ওরে, দেখি!.. সবথেকে ঘন স্যুপ, বুঝলি তো!.. পেত্‌কা, পা চালায়ে যা দেখি, রাঁধুনির কাছে থেকে ভালো

একখান চামচ নিয়ি আয়! যা, যা, জলদি কর্! স্তিওপ্কা, ওরে কয়েকখান রুটির টুকরা কেটে দে... খবরদার, কেমনধারা রুটির টুকরা কাটভৌছিস খেয়াল আছে তা? — আরে, মুজিকরাই অমনধারা পেল্লায় রুটির টুকরা খেয়ি থাকে, ও ছোঁড়া পাতলা টুকরা পছন্দ করে, জানিস না তা?.. আরে, পেত্কা চামচ আনতি সেই যে গেল আর তো আসে না দেখি? গেল কোথায় সে?.. এই পেত্কা, জলদি-জলদি আয়!.. ভান্কা, যা দেখি, চামচ নিয়ি তাড়াতাড়ি আসতি ক' পেত্কারে!..'

এদিকে সত্যিসত্যিই থকথকে ঘন একপ্লেট বর্শচ-স্যুপ সামনে নিয়ে বসে থাকে ক্রিভরুচ্কো, আর তার টক্টকে রাঙা মুখখানা যতদূরসম্ভব ঝুঁকে থাকে প্লেটের ওপর। এমন সময় কাছাকাছি একটা টেব্‌ল থেকে কাকে যেন শান্ত গলায় শুধোতে শোনা যায়:

'হেই, তেরো নম্বর! তোদের টেবিলে অতিথ্ এসেছে নাকি?'

'হ্যাঁরে, হ্যাঁ! মহামান্যি এক অতিথ্ এয়েচেন — তিনি এয়েচেন, আবার দুপারের খানাও খাতি চান... এই-যে, পেত্কা, চামচ এনেছিস? তা, দে দেখি। নষ্ট করার মতন অত সময় নাই আমাদের!..'

মহা ব্যস্তসমস্ত আর বিগলিত বিনীত ভাব দেখিয়ে হুড়ুমদুড়ুম করে পেত্কা এই সময়ে ঘরে ঢোকে তারপর যেন কোনো মূল্যবান সম্পদ দেবতাকে নিবেদন করছে এমনভাবে সাড়ম্বরে দুই হাত বাড়িয়ে কলোনিতে সচরাচর ব্যবহৃত হয় এমন একখানা সাধারণ চামচে এগিয়ে ধরে। আর এ দেখে দলপতি যেন রাগে ফেটে পড়ে। বলে:

'অ্যাঁ? এটারে চামচ কয় নাকি? আমি কী কলাম কানে শুনিস নাই তুই? যা-যা, সবথেকে বড় যা পাস তাই একখান নিয়ি আয় দেখি!..'

আর পেত্কা তখন ফের মহা ব্যস্তসমস্ত ভাব দেখিয়ে পাগলের মতো খাবারঘরের এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াতে থাকে আর জানলাগুলোকে দরজা ঠাউরে বারবার যেখানে-সেখানে ধাক্কা খেতে থাকে। এইভাবে প্রায় একটা পঞ্চাঙ্ক নাটকের অভিনয় চলে আর তাতে রান্নাঘরের কর্মীরাও যোগ দেয়। দর্শকদের মধ্যে কয়েক জন আবার এই সমস্ত ব্যাপারস্যাপার নিশ্বাস বন্ধ করে লক্ষ্য করতে থাকে। নেহাতই দৈবক্রমে নিজেরা এই উদগ্র আতিথেয়তার শিকার হতে-হতে বেঁচে গেছে বলে নিজেদের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেয় তারা। এমন সময় পেত্কা আবার খাবারঘরে ঢোকে হাতে একটা বিশাল ঝাঁঝরি

কিংবা স্যুপের হাতা নিয়ে। আর খাবার-ঘরে হাসির হুল্লোড় পড়ে যায় একেবারে। এই সময়ে হয়তো দেখা যায় লাপত তার নিজস্ব বাহিনীর টেব্‌ল থেকে ধীরেসুস্থে উঠে নাটকের দৃশ্যপটের দিকে এগিয়ে আসছে। নিঃশব্দে এক-নজরে নাটকের সব ক'জনা অভিনেতার মুখ দেখে নিয়ে তার কড়া দৃষ্টি এবার দলপতিটির দিকে নিবদ্ধ করে। আর সবাই দেখতে পায় তার কঠোর মুখখানা একটু-একটু করে কোমল হয়ে উঠছে আর সেখানে ফুটে উঠছে সূক্ষ্ম সুকুমার করুণা আর সমবেদনার ভাব — অথচ এটা সকলেরই জানা ছিল যে ঠিক এই অনুভূতিগুলোই লাপতের স্বভাবের সঙ্গে একেবারে খাপ খায় না। ফলে ঘরটাতে খাওয়ায় ব্যস্ত সবাই দম বন্ধ করে এবার অপেক্ষা করে চমৎকার খানিকটা অভিনয়ের নিদর্শন দেখতে পাবে এই আশায়। ওদিকে লাপত ততক্ষণে এগিয়ে গিয়ে ক্রিভরুচ্‌কোর মাথায় স্নেহভরে হাতখানা রেখেছে আর গলা কাঁপিয়ে যতদূরসম্ভব কোমল কৃত্রিম স্বরে বলে চলেছে:

'খেয়ে নাও, খোকামনি, ভয় পেও নি!.. আচ্ছা, তোরা সবাই মিলে বাচ্চাটারে নিয়ি পড়েছিস কেন বল্‌ তো? অ্যাঁ? খেয়ে নাও, খেয়ে নাও, খোকামনি!.. একি, কেউ তোমারে চামচ পর্যন্ত দেয় নাই? ছি-ছি, কী লজ্জা! দে, দে, বাচ্চাটারে চামচ দে একখান!.. ঠিক আছে, এইটাতেই কাজ চলবে-নে...'

কিন্তু 'খোকামনি'র তখন খাওয়া মাথায় উঠেছে। হঠাৎ সজোরে ফুঁপিয়ে উঠে সে জায়গা ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে। চমৎকার স্বাদু ঘন বর্‌শ্‌চের ভরা-প্লেট যেমনকার তেমনিই পড়ে থাকে টেবিলে। আর লাপত তাকিয়ে থাকে কান্নায় ভেঙে-পড়া ছেলেটির দিকে, আর যতখানি আবেগ ফুটিয়ে তুলতে পারে সে ততখানি ফুটে ওঠে তার মুখে।

প্রায় কান্না-ভেজা গলায় সে বলে, 'কী ব্যাপার? খাবা না তুমি? দ্যাখ্‌ দেখি, বাচ্চাটার কী অবস্থা করেছিস তোরা!'

এই বলে অন্য ছেলেদের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে শরীর কাঁপিয়ে হাসতে থাকে লাপত। তারপর ক্রিভরুচ্‌কোর ফুলে-ফুলে-ওঠা কাঁধদুটো হাত দিয়ে জড়িয়ে সে তাকে সস্নেহে খাবারঘর থেকে বার করে নিয়ে যায়। এদিকে দর্শকমণ্ডলী হাসতে থাকে হৈহৈ করে। কিন্তু এরপরও নাটকটির অপর একটি অঙ্কে অভিনয় চলে, তবে তা খাবারঘরের দর্শকরা দেখতে পায় না। লাপত তখন 'অতিথি'কে নিয়ে যায় রান্নাঘরে। তারপর রান্নাঘরের বড় একটা

টেবিলে তাকে বসিয়ে রাঁধুনিকে হুকুম দেয় 'মনিষ্যি'টিকে পেট ভরে খাওয়াতে, 'কেননা, ওর প্রেতি সবাই খারাপ ব্যাভার করতেছে'। আর ক্রিভরুচ্‌কো ফোঁপাতে-ফোঁপাতে সবেমাত্র যেই তার বর্‌শ্চ খাওয়া শেষ করে নাকের আর চোখের জল মোছার মতো অল্প-একটু শক্তিসঞ্চয় করেছে, অমনই লাপত জুডাসকেও লজ্জা দিয়ে তার সবচেয়ে সূক্ষ্ম মৃত্যুবাণটা হেনে বসে। বলে:

'কিন্তু ওরা সবাই তোমারে নিয়ি অমন টানাহেঁচড়া করতি লেগেছিল কেন, বল দেখি? তুমি বোধকরি কাজে যাও নাই, তাই না?'

ক্রিভরুচ্‌কো নিঃশব্দে মাথা নেড়ে সায় দেয়, তারপর হেঁচকি তোলে আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। কথা বলতে না-পারায় এইসব ভঙ্গি দিয়েই মনোভাব প্রকাশ করে সে।

'সত্যি, ওরা ভারি মজার ছেলেপিলে তো!.. কান্ডখান দ্যাখো একবার!.. তুমি ভাবলে, এই বারটাই শেষবারের মতন ফাঁকি দিতেছ, তাই না? তা, শেষবার জেনেও ছোঁড়ারা তোমার ঘাড়ে কিন্তু লাফায়ে পড়ল! এমনধারা কান্ড তো যে-কারও বেলাতেই ঘটতি পারে! মনে আছে আমি যখন প্রেথম কলোনিতি আসি তখন গোটা হপ্তা ধরি আমি কাজে যাই নাই... আর তুমি তো মাত্তর দিন-দুই ফাঁকি দেছ। তা, তোমার হাতের বাইসেপগুলা দেখি একবার। আরে ব্বাস রে! এমন বাইসেপ নিয়ি তো যে-কোনো ছোকরার কাজে যাওয়া উচিত... তা, কী কও তুমি, তাই না?'

ক্রিভরুচ্‌কো ফের মাথা নাড়ল, তারপর লেগে গেল জাউয়ের মন্ডের সদ্‌ব্যবহারে। খাবারঘরের দরজার দিকে যেতে-যেতে লাপত এবার অপ্রত্যাশিতভাবে ক্রিভরুচ্‌কোর একটু প্রশংসা করে দিল। বলল:

'যখনই তোমারে দেখলাম আমি তখনই বুঝেছি তুমি বিলকুল সাচ্চা ছেলে...'

যাই হোক, এই ধরনের কয়েকটা নাটকীয় ঘটনার পর কাজের সময় বাহিনী ছেড়ে পালানো অসম্ভব হয়ে পড়ল। বস্তুত, কাজ-পালানোর এই অভ্যাসটা পুরোপুরিই দূর হয়ে গেল। আর খোভ্‌রাখের মতো যারা ছিল ফাঁকিবাজ, পরপর দিন-দুই কাজ করতে-না-করতে যাদের সর্দিগর্মি ধরে যেত ও যে-কোনো একটা ঝোপের নিচে ঢুকে পড়ে জোরে-জোরে গোঙাতে থাকত আর সেই ফাঁকে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিত যারা, তাদের পক্ষে ব্যাপারটা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াল। এই সমস্ত ক্ষেত্রে রোগের মোক্ষম দাওয়াই বাত্‌লাতে

তারানেত্‌স ছিল সিদ্ধহস্ত। এরকম কোনো অসুখের খবর পেলেই আন্তন ব্রাত্‌চেঙ্কোর কাছ থেকে খামারবাড়ির একখানা গাড়ি চেয়ে নিয়ে, জোয়ালে 'মলদিয়েত্‌স'কে জুতে আর গোটা গাড়িখানা হরেকরকম নিশান আর রেডক্রসের চিহ্নে সাজিয়ে একদল মেডিক্যাল অর্ডারলি সঙ্গে নিয়ে তারানেত্‌স বেরিয়ে পড়ত খামারের দিকে। এ-ব্যাপারে ওর সবচেয়ে বড় সহকারী ছিল কুজ্‌মা লেশি, সত্যিকার কামারশালের একখানা হাপর নিয়ে সে-ও বেরিয়ে পড়ত সঙ্গে। পাতায়-ছাওয়া কুঞ্জবনে গা এলিয়ে দিয়ে খোভ্‌রাখ হয়তো সবেমাত্র একটু আরাম উপভোগ করতে শুরু করেছে-কি-করে নি, এমন সময় এই 'প্রাথমিক চিকিৎসা বাহিনী' হাজির হয়ে যেত তার কাছে। আর পেঁাছেই লেশি সঙ্গে সঙ্গে হাপরটা খাড়া করে ফেলত রুগীর পাশে আর অপর কয়েক জন সত্যিকার উৎসাহ নিয়েই জোরে-জোরে হাত চালিয়ে হাওয়া করে ধরিয়ে ফেলত হাপরটা। শরীরের কোন অঙ্গে সর্দিগর্মি ঘাপটি মেরে আছে তা আন্দাজ করে নিয়ে খোভ্‌রাখের সারা দেহই সেঁকতে থাকত তারা, তারপর ওকে 'অ্যাম্বুল্যান্স'-গাড়িতে তোলবার উদ্যোগ করত। কিন্তু দেখা যেত ইতিমধ্যে খোভ্‌রাখ দিব্যি সুস্থ হয়ে উঠেছে। ফলে 'অ্যাম্বুল্যান্স'-গাড়ি ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলে চুপচাপ ফিরে যেত কলোনিতে। এই চিকিৎসা মেনে নেয়া খোভ্‌রাখের পক্ষে যেমন কঠিন হোত তেমন কিংবা তার চাইতেও কঠিন হোত তার নিজের মিশ্র বাহিনীতে কাজে ফিরে যাওয়া আর অত্যন্ত নিরীহ সব প্রশ্নের আকারে প্রয়োগ করা নতুন করে ওষুধের মাত্রা নিঃশব্দে হজম করা। যেমন, ছেলেদের কেউ হয়তো তখন শুধোত:

'কী? উব্‌গার হয়েছে খোভ্‌রাখ? চিকিচ্ছেটা চমৎকার, তাই না?'

বলা বাহুল্য, এ-ধরনের ব্যাপারগুলো ছিল গ্যেরিলা-যুদ্ধের রণকৌশলমাত্র। তবে এ-সব ফন্দি-ফিকিরের উৎপত্তির মূলে ছিল ওখানকার চলতি মনোভাবের আবহাওয়া আর কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে যৌথ সমাজের সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষা। আর আমার প্রযুক্তিবিদ্যাগত প্রয়াসের সত্যিকার লক্ষ্যই ছিল এই আবহাওয়া আর এই আকাঙ্ক্ষাটি জাগিয়ে তোলা।

তবে যাবতীয় কৃৎকৌশল কার্যকর করে তোলার মূল ভিত্তি অবশ্য থেকে গিয়েছিল কলোনির বাহিনীগুলি। 'ওলিম্পাস' পর্বতবাসী ওঁরা অবশ্য এই বাহিনীগুলির সত্যিকার তাৎপর্য যে কী তা কোনোদিনই বুঝে উঠতে পারেন নি, যদিও ওঁদের কাছে এগুলির বিশেষত্ব এবং শিক্ষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে

এদের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা বোঝাতে আমি প্রাণপণ প্রয়াস পেয়ে এসেছি, তবু। আমাদের উভয়পক্ষের ভাবপ্রকাশের ভাষা ছিল স্বতন্ত্র, আর তাই ব্যাখ্যার হাজার চেষ্টা করেও কোনো লাভ হয় নি। আমি এখানে কলোনি-পরিদর্শনে-আসা শিক্ষাবিজ্ঞানের জনেক অধ্যাপকের সঙ্গে আমার একটি বাক্যালাপের টুকরো প্রায়-হুবহু তুলে দিচ্ছি। চশমা-চোখে, লাউঞ্জ-স্যুট পরনে ফিটফাট কেতাদুরস্ত এই ব্যক্তিটি — যাঁকে দেখলে স্পষ্টতই চিন্তাভাবনায় অভ্যস্ত, সদ্‌গুণসম্পন্ন মানুষ বলে বোধ হয় — তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন এটা জানতে যে খাবারঘরের টেব্‌লগুলো-যে বাহিনীগুলোর নামে-নামে বন্দোবস্ত করে দেয়া হয় সে-কাজটা কোনো শিক্ষক বা শিক্ষিকা না করে কেন কর্তব্যরত দলপতি করে থাকে। তিনি বলছিলেন:

'না-না, ঠাট্টা নয়, কমরেড! আপনি নিশ্চয়ই রসিকতা করছেন! না-না, সিরিয়সলি বলুন-না, প্লিজ! আপনারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখেন আর বাচ্চা একটা মনিটর ডাইনিং রুমের সবকিছু সাজিয়েগুছিয়ে তোলে — এটা কী করে সম্ভব? আপনি কি নিশ্চয় করে বলতে পারেন যে ছেলেটি সবকিছু ঠিকমতো করবে, কারও প্রতি অবিচার করবে না সে? যতই যাই হোক, বাচ্চা ছেলের পক্ষে... নিছক ভুল করাও তো অসম্ভব নয়!'

'ডাইনিং রুম সাজিয়েগুছিয়ে তোলা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়,' জবাবে অধ্যাপকটিকে আমি বললুম। 'তাছাড়া এ-ব্যাপারে আমাদের মধ্যে একটা পুরনো আর চমৎকার নিয়মও চালু আছে।'

'তাই নাকি? নিয়ম আছে বলছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, নিয়মই। সেটা হল এই: ভালো-মন্দ, সহজ-কঠিন সব কাজই আমাদের বাহিনীগুলো করে থাকে শিফ্‌টে-শিফ্‌টে ভাগ হয়ে তাদের প্রত্যেকের সূচকসংখ্যার ক্রম অনুযায়ী।'

'তার মানে? কী বলতে চান আপনি? কথাটা ঠিক বুঝলুম না...'

'কথাটা খুবই সোজা। যেমন, এখন প্রথম বাহিনী খাবারঘরের সবসেরা জায়গাটা দখল করে আছে, আর একমাস পরে দ্বিতীয় বাহিনী এই জায়গাটা পাবে, তারপর তৃতীয় বাহিনী, এইভাবে ব্যাপারটা চলবে।'

'ও, বুঝলুম। তা 'মন্দ কাজ' বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?'

'প্রায়ই এমন অনেককিছু করার থাকে যাদের আমরা মন্দ বা অপ্রীতিকর কাজ বলে থাকি। যেমন, ধরুন, এখুনি যদি কোনো জরুরি বাড়তি কাজ করতে

হয় তাহলে প্রথম বাহিনীকে তলব করা হবে কাজটা করতে। আবার এর পরের মাসে এমন ধরনের কোনো কাজ এসে পড়লে তখন ডাক পড়বে দ্বিতীয় বাহিনীর। ঘরদোর ধোয়ামোছা-পরিষ্কারের কাজ বাঁটোয়ারা করে দেয়ার সময় প্রথম বাহিনীকে এ-মাসে সর্বপ্রথম পায়খানা পরিষ্কারের ভার নিতে হবে। অবশ্য এ-সবই বাঁধাধরা মামুলি কাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।'

'এই ভয়ঙ্কর নিয়মটা কি আপনিই মাথা খাটিয়ে বের করেছেন?'

'মোটেই না! এ-সবই ছেলেদের মাথা থেকে বেরিয়েছে। এইভাবে কাজ করাটা বেশি সুবিধেজনক বলে ওরা মনে করে। এই ধরনের কাজ ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দেয়াটা খুবই কঠিন, বুঝলেন না? এর ফলে কেউ-না-কেউ অসন্তুষ্ট হয়ই। কিন্তু এখন এসব কাজ একেবারে যান্ত্রিকভাবে নিষ্পন্ন হয়ে চলেছে। এই ধরনের কাজের শিফ্‌ট একমাস করে স্থায়ী হয়।'

'তাহলে, দেখা যাচ্ছে, আপনার বিশ নম্বর বাহিনীর ভাগে পায়খানা পরিষ্কারের ভার পড়বে কুড়ি মাস পরে? তাই তো?'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। তবে কিনা খাবারঘরেও সবচেয়ে ভালো জায়গাটা ওরা কুড়ি মাসের আগে পাচ্ছে না।'

'কী সাংঘাতিক! কিন্তু কুড়ি মাস পরে বিশ নম্বর বাহিনীতে তখন হয়তো নতুন ছেলেপিলে এসে যাবে। তখন কী হবে তাহলে?'

'না, তা হবে না! বাহিনীগুলোর গঠন প্রায় বদলায় না বললেই চলে। আমরা স্থায়ী যৌথ তৈরিতে বিশ্বাসী। তবে হ্যাঁ, কেউ-না-কেউ হয়তো কলোনি ছেড়ে চলে যেতে পারে, আবার জনা-দু'চার নতুন ছেলেপিলেও ভর্তি হতে পারে কলোনিতে। কিন্তু যদি ধরেও নেয়া যায় যে বিশ নম্বর বাহিনীটা তখন প্রধানত নতুন ছেলেমেয়ে নিয়েই তৈরি হয়েছে, তাহলেও কিছু যাবে-আসবে না। আমাদের একেকটা বাহিনী হল গিয়ে একেকটা যৌথ সংস্থা — তার নিজস্ব ঐতিহ্য, ইতিহাস, বিশেষ গুণ আর নামডাক আছে। এটা ঠিক যে এই মুহূর্তে বাহিনীগুলোর গঠনে বেশ কিছুটা পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে, তবে প্রত্যেকটা বাহিনীর প্রাণকেন্দ্র কিন্তু একই থেকে গেছে।'

'কথাটা ঠিক বুঝলুম না। এটা আমার কাছে কেমন চালাকি খেলার মতো ঠেকছে। এটা নিশ্চয়ই আপনি সিরিয়সলি বলছেন না। বাহিনীগুলোতে যদি এত নতুন ছেলেপিলে ঢোকে তাহলে তাদের আর তাদের নামডাকের কী তাৎপর্য বজায় থাকতে পারে? এ তো এক সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার দেখি!'

হাসতে-হাসতে বললুম, 'এটা হল গিয়ে চাপায়েভ-ডিভিশনের মতো ব্যাপার।'

'এই তো, আবার আপনি ফৌজী উপমার ফাঁদ পাতছেন!.. কিন্তু... সে যাই হোক, এর সঙ্গে চাপায়েভ-বাহিনীর কী সম্পর্ক?'

'সম্পর্ক এই যে, ওই বাহিনীতে আগে যারা ছিল সেইসব লোক এখন আর নেই। তাছাড়া স্বয়ং চাপায়েভও আর জীবিত নেই। এখন ওই ডিভিশনে সব নতুন লোক — তবু তাঁরাই চাপায়েভের আর তাঁর রেজিমেন্টগুলোর নামডাক আর মর্যাদার ঐতিহ্য বয়ে নিয়ে চলেছেন। ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না? চাপায়েভের মর্যাদা বজায় রাখার দায়িত্ব তাঁদের ওপরই। আর তাঁরা যদি সে-মর্যাদার অবমাননা ঘটান তাহলে পরের পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তাঁদের সেই মর্যাদাহানি ঘটানোর জন্যে মূল্য দিতে হবে নতুন সব লোকজনকে।'

'কিন্তু এতসব আপনার দরকার করছে কী জন্যে তা-ই আমি বুঝছি না!'

না, অধ্যাপকটি কখনই ব্যাপারটা বোঝেন নি। কিন্তু আমার পক্ষে এর বেশি আর কী করা সম্ভব ছিল?

প্রথম কয়েকটা দিনের মধ্যেই কুরিয়াজের বাহিনীগুলোর মধ্যে কাজ অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল। এর বেশকিছু আগে থেকেই প্রতিটি শিক্ষক বা শিক্ষিকার ওপর দুটি বা তিনটি বাহিনীর ভার অর্পণ করা হয়েছিল। এই সব শিক্ষক-শিক্ষিকার কাজ ছিল ওই বাহিনীগুলোর মধ্যে যৌথ মর্যাদার বোধ এবং কলোনির মধ্যে সবসেরা ও সবথেকে কাম্য স্থান দখলের আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তোলা। অবশ্য, বলা বাহুল্য, যৌথ স্বার্থবোধের এই নতুন ও সমুন্নত ধারণার জন্ম একদিনে হয় নি. তবে এটা মোটামুটি দ্রুতই গড়ে উঠেছিল, অন্তুতপক্ষে নিছক ব্যক্তিবিশেষকে ধরে-ধরে সঠিক পথে চালনা করার চেষ্টা করলে এ-ব্যাপারটা যত দ্রুত নিষ্পন্ন হোত তার চেয়ে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি যে এটা গড়ে উঠেছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এ-ব্যাপারে দ্বিতীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য ছিল নতুন-নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার ঘটানো। সকলেই এটা ভালোভাবে জানেন যে এই উদ্দীপনা সঞ্চারের দুটো পদ্ধতি আছে, এবং ফলত কর্মোদ্যম বাড়িয়ে তোলারও পথ আছে দুটো। এর প্রথম পদ্ধতিটি হল ব্যক্তিবিশেষকে উদ্দীপনা যোগানো, বিশেষ করে তার বৈষয়িক স্বার্থের দিকে কিছুটা নজর রেখে। কিন্তু ওই সময়ের

শিক্ষাবিজ্ঞান-সংক্রান্ত ভাবুকরা এই পদ্ধতির প্রয়োগকে কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ করে রেখেছিলেন। বাচ্চাদের দেয়ার জন্যে নিতান্তই যৎসামান্য কিছু অর্থ কিংবা পুরস্কারের সামান্যতম প্রসঙ্গ তুললেই তখন 'ওলিম্পাস'-এ রীতিমতো সোরগোল পড়ে যেত। শিক্ষাবিজ্ঞানী ভাবুকরা এ-বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত ছিলেন যে অর্থই যত অনর্থের মূল, কেননা শয়তান মেফিস্‌টোফিলীসকে কি তাঁরা গাইতে শোনেন নি যে —

স্বর্ণলালসায় ধ্বংস হবে নরজাতি...

ইত্যাদি? বেতন এবং অর্থ সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব এতদূর খ্যাপাটে ধরনের ছিল যে তাঁদের কাছে এই বিষয়টি উত্থাপন করাই ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। সম্ভবত একমাত্র যিশুর আশীর্বাদপূত বারিসিঞ্চনেই এ-ব্যাপারে কিছুটা শুভ ফল দেখা দিতে পারত। কিন্তু হায়রে, আমার কাছে যে সেই পূতবারিও ছিল না! অতএব, কী করা!

অথচ এক্ষেত্রে বেতনদানের কিন্তু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। বেতনদানের প্রেরণা শিক্ষানবিশকে সাহায্য করে থাকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থের সামঞ্জস্যবিধানে। এরই ফলে সে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে শ্রমশিল্প-অর্থনীতি সংক্রান্ত সোভিয়েত পরিকল্পনার, অর্থনৈতিক হিসেবনিকেশ ও মূল্য-নিরূপণের জটিল আবর্তে, সোভিয়েত ফ্যাক্টরি-অর্থনীতির গোটা ব্যবস্থাটা অনুধাবনের সুযোগ পায় সে এবং, অন্তত পক্ষে তত্ত্বগতভাবেও, সে অন্য শ্রমিকদের সমকক্ষ হয়ে ওঠে। পরিশেষে (এবং এটার মূল্যও কোনো অংশে ন্যূন নয়), সে উপার্জন করার ব্যাপারটাকে মূল্য দিতে শেখে এবং শিশু-সদন ছেড়ে যাবার সময় তার অবস্থাটা বোর্ডিং স্কুল ছেড়ে-যাওয়া সেই কিশোরী মেয়ের মতো হয় না — যে নাকি জীবনব্যাপারের কিছুই শেখে না এবং শুধুমাত্র 'আদর্শ'-এর ফাঁকাবুলি ছাড়া আর কোনো পুঁজি থাকে না যার।

কিন্তু সে যাই হোক, এ-ব্যাপারে কিছুই আমার করার ছিল না। কেননা বিধিনিষেধ ছিল অত্যন্ত কড়া, একেবারে অলঙ্ঘনীয়ই।

ফলে, উদ্দীপনা সঞ্চারের দ্বিতীয় পদ্ধতিটিই খোলা ছিল আমার কাছে — সেটা হল যৌথ জীবনবোধ ক্রমশ বাড়িয়ে তোলা এবং সম্মিলিতভাবে ভবিষ্যতে দৃষ্টিপাত করানোর উপযোগী একটা বিশদ পদ্ধতি সংগঠিত করা। এই

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি অপেক্ষাকৃত কম নারকীয় বলে গণ্য ছিল বোধহয়, ফলে মাঝে-মাঝে সন্দেহবশে ক্রুদ্ধ গর্‌গর আওয়াজ করলেও এটির প্রয়োগ সম্পর্কে ওলিম্পাসবাসীরা কিছুটা সহনশীল ছিলেন।

বেঁচে থাকার জন্যে মানুষের পক্ষে ভবিষ্যতে কিছু-একটা আনন্দের ব্যাপার থাকা দরকার। মানবজীবনে সত্যিকার উদ্দীপক বস্তু হল আগামীদিনে আনন্দের সম্ভাবনা। শিক্ষাবিজ্ঞানগত কৃৎকৌশলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যকর্মগুলির একটি হল এই নাতিদূরবর্তী আনন্দ অর্জনের জন্যে কাজ করে যাওয়া। তার মধ্যে প্রথম কথা হল, আনন্দের এই ব্যাপারটিকেই সংগঠিত করা, তাকে জীবন্ত করে তোলা এবং একটা সত্যিকার লভ্য সম্ভাবনায় পরিণত করা। দ্বিতীয় কথা, সন্তোষের আদিম উৎসগুলিকে অবিচলভাবে আরও জটিল ও মানবিক বিচারে তাৎপর্যপূর্ণ আনন্দধারায় পরিণত করে চলা। এক্ষেত্রে খুবই কৌতূহলোদ্দীপক একটি পথরেখা চিহ্নিত করা যেতে পারে। সেটি হল এই : একখানা মিষ্টি বিস্কুট খাওয়ার সরল আনন্দ থেকে দায়িত্ববোধের ওপর ভিত্তি করে গড়ে-ওঠা মানবিক সুখে উত্তীর্ণ হওয়া।

শক্তি আর সৌন্দর্য হল এমন দুটি মানবিক গুণ যাদের আবেদন সবচেয়ে বেশি বলে সচরাচর দেখা যায়। ভবিষ্যৎ লাভালাভ সম্পর্কে ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই দুটি গুণ পুরোপুরি বিচার্য। যে-ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় সবচেয়ে তাৎক্ষণিক বাসনা চরিতার্থ করা দিয়ে — যেমন, ধরা যাক, আজকের দুপুরের খাওয়া দিয়ে (মনে রাখতে হবে, একেবারে 'আজকেরই') — সে-ই হল সবচেয়ে দুর্বল মানুষ। যদি সে সংকীর্ণ স্বার্থপর লাভালাভের প্রশ্নে — তা সে লাভের ব্যাপার যতই দূরের হোক-না-কেন — নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে, তাহলে তাকে আপাতদৃষ্টিতে সবল-প্রবল মনে হলেও কখনই সে অন্যের মধ্যে সৌন্দর্যের বোধ ও মানবব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সত্যিকার মূল্যবোধ জাগ্রত করতে সমর্থ হবে না। বরং যৌথ সমাজ যত বেশি সর্বব্যাপী হয়ে ওঠে আর তার ভবিষ্যৎ লাভালাভের সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষ স্বীয় স্বার্থকে একাত্ম করে তুলতে সমর্থ হয় যত বেশি করে, ততই সেই ব্যক্তিবিশেষকে সুন্দর আর মহৎ বোধ হতে থাকে।

মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার অর্থই হল তার মধ্যে আগামীদিনের আনন্দের অভিমুখ একটি উদ্দীপনার সঞ্চার করে দেয়া। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পর্কেই গোটা একখানা বই লেখা চলতে পারে। কাজটি

হল — নতুন-নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করা, বর্তমান উৎসাহের ব্যাপারগুলিকে পুরোপুরি কাজে লাগানো এবং ক্রমশ আরও মহৎ উদ্দীপনা গড়ে তোলা। এর সূচনা ভালোরকম একপেট ভোজ, সার্কাস দেখতে যাওয়া, কিংবা পুকুর সাফ করা দিয়ে শুরু করা যেতে পারে বটে, তবে সেইসঙ্গে গোটা যৌথ সমাজের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনার উদ্দিষ্টগুলিও সৃষ্টি করা ও সম্ভাবনাগুলির পথ প্রশস্ত করাও দরকার এবং সেগুলিকে এমন একটা পর্যায়ে উন্নীত করা প্রয়োজন যাতে তা গোটা সোভিয়েত ইউনিয়নেরই ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা হয়ে দাঁড়ায়।

কুরিয়াজ-বিজয়ের পর প্রথম আঁটিবাঁধা ফসলের বা নবান্নের উৎসব উদ্‌যাপন হয়ে দাঁড়াল আমাদের যৌথ সমাজের সবচেয়ে কাছের এই ভবিষ্যৎ উদ্দিষ্ট।

এ-প্রসঙ্গে আমি সে-সময়ের একটি স্মরণীয় সন্ধ্যার কথা উল্লেখ না-করে পারছি না। যে-কোনো কারণেই হোক এই আলোচ্য সন্ধ্যাটি কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের শ্রমের প্রয়াসের ক্ষেত্রে মোড় ফেরার সূচক হয়ে দাঁড়ায়, যদিও সন্ধ্যাটি সংগঠিত করার সময় তার যে অমন ফলাফল দাঁড়াতে পারে তার ওপর আমি মোটেই ভরসা করি নি, বরং ব্যবহারিক উদ্দেশ্যের কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা না-করেই নিছক কর্তব্যকর্ম হিসেবে কাজটা করেছিলুম।

গোর্কি যে কে, নবদীক্ষিত কলোনি-বাসিন্দারা তা জানত না। তাই কুরিয়াজে পেঁছুনোর পর আমরা একটি গোর্কি আলোচনা-সন্ধ্যার অধিবেশনে মিলিত হলুম। ব্যাপারটা খুবই শাদামাটা ধরনের ছিল, কেননা অধিবেশনটিকে আমি সজ্ঞানেই সঙ্গীত বা সাহিত্য-সন্ধ্যার জাঁকালো রূপ দিতে চাই নি। বাইরে থেকে কাউকে আসার জন্যে নেমন্তন্নও জানাই নি আমরা। কেবল শাদাসিধেভাবে-সাজানো মঞ্চের ওপর আলেক্সেই মাক্সিমভিচের একখানি প্রতিকৃতি রাখা হয়েছিল।

সেদিন সন্ধেয় আমি বাচ্চাদের কাছে বেশ একটু বিশদভাবেই গোর্কির জীবন আর সাহিত্যকর্মের গল্প করলুম। তাছাড়া বড় ছেলেদের মধ্যে কেউ-কেউ তাঁর 'শৈশব' বইখানা থেকে কিছু-কিছু অংশ পড়েও শোনাল।

নবদীক্ষিত কলোনি-বাসিন্দারা চোখ বড়-বড় করে শুনতে লাগল সব। এমন একটা জীবন যে সম্ভব — বোঝা গেল তা ওরা কোনোদিন কল্পনাও করে নি। ওরা কোনো প্রশ্ন করল না, বিশেষ কোনো আবেগও প্রকাশ করল

না। একমাত্র লাপত যখন গোর্কির লেখা চিঠির বান্ডিলটা সামনে এনে রাখল হঠাৎ তখন হৈহৈ করে উঠল সবাই:

'এ-সকল পত্তর ওনি লেখ্যেছেন? ওনি নিজি? কলোনি-বাসিন্দাদের কাছে লেখ্যেছেন? তাইলি দেখাও দিকি — পত্তরগুলান দেখাও...'

সাবধানে ভাঁজ খুলে-খুলে লাপত চিঠিগুলো চালান করতে লাগল কলোনি-বাসিন্দাদের সারিগুলোর মধ্যে। আর চিঠি বিলি করার সময় থেকে-থেকেই কেউ-না-কেউ লাপতের হাতখানা চেপে ধরে চিঠিতে কী লেখা আছে তা আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখার চেষ্টা করতে লাগল।

'দেখ্যোছিস, দেখ্যোছিস, লেখা আছে 'প্রিয় কমরেড-সব'। সত্য, ঠিক ওই কথাগুলিন...'

সব ক'খানা চিঠি এরপর পড়া হল সভায়। অবশেষে আমি শুধোলুম:

'কারও কিছু বলার আছে? কেউ এ-বিষয়ে কিছু বলতে চাও?'

মিনিটখানেকের মতো সবাই চুপচাপ। তারপর হঠাৎ, লজ্জায় লাল হয়ে উঠে ছেলেদের মধ্যে পথ করে-করে কোরত্‌কভ সোজা উঠে এল মঞ্চে। তারপর বলল:

'নূতন গোর্কিপন্থীদের কাছি আমার কিছু কওয়ার আছে... যেমন ধরা যাক আমি... কিন্তু আমি তো গুছায়্যে কিছু কতি পারি না... যাই হোক, সাফ কথা হল্য এই! দোস্ত্-সব! আমরা এখেনে বহুদিন যাবৎ বাস করত্যেছি আর আমরা অন্ধও না, তবু কিছুই দেখি নাই আমরা, কিছুই বুঝি নাই... আসলে আমরা অন্ধের মতনই ছেলাম! মাইরি, অন্ধই ছেলাম আমরা! ছি-ছি, কী লজ্জার কথা, কতগুলান বছর-যে নষ্ট হয়্যি গেল আমাদের! আব আজ আমাদেরে দেখান হল্য গোর্কিরে... আর আমার পেরানডা অস্থির হয়্যি উঠ্যেছে... মাইরি, অস্থির হয়্যি উঠ্যেছি আমি... তোদের সবার মনের কথা আমি অবিশ্যি জানি না...'

বলতে-বলতে মঞ্চের সামনের দিকে আরও এক-পা এগিয়ে এল কোরত্‌কভ। তারপর ওর সুন্দর চোখদুটো অল্প-একটু কুঁচকে বলল:

'আমাদেরে কাম করতি লাগব্যে, ইয়ার!.. সম্পূন্ন ভেন্ন কায়দায় কাম করতি লাগব্যে. . বুঝ্যেছিস?'

'বুঝ্যেছি, বুঝ্যেছি!' তারস্বরে চিৎকার করে উঠল ছেলেরা। আর প্রচণ্ড হাততালির মধ্যে মঞ্চ ছেড়ে নেমে গেল কোরত্‌কভ।

এর পরদিন ছেলেদের দেখে আমি তো আর চিনতেই পারি না! দেখলুম, হাঁপাতে-হাঁপাতে, মুখ দিয়ে ফোঁস-ফোঁস করে দম ছাড়তে-ছাড়তে আর মাথা ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে তারা একেবারে আন্তরিকভাবেই প্রচণ্ড প্রয়াসে মেতে উঠেছে মানুষের সবচেয়ে সাবেকি যে-উত্তরাধিকার সেই আলস্যকে কাটিয়ে উঠতে। সবচেয়ে আনন্দদায়ক ভবিষ্যৎ অর্জনের একটা ঝলক বুঝি সেদিন তাদের নজরে পড়ে গিয়েছিল — আর তা হল মানবব্যক্তিত্ব সম্পর্কে যথার্থ মূল্যবোধ।

১১

নবান্ন, বা প্রথম আঁটিবাঁধার উৎসব

মে মাসের শেষ দিনগুলো আমাদের জন্যে পরপর কয়েকটি নতুন সাফল্যের চমক নিয়ে এল। যেমন, উঠোনে বেশ কয়েকটি পরিষ্কার ধোয়ামোছা জায়গা, নতুন-নতুন দরজা-জানলা, ঘরের বাইরে দুর্গন্ধের বদলে নতুন হাওয়ার সুবাস এবং সর্বত্রই নতুন একটা উদ্দীপনার ভাব। আলস্যের শেষ অবশেষটুকু জীর্ণ বস্ত্রের মতো অজান্তে কখন খসে পড়ে গিয়েছিল। আমাদের পূর্ণাঙ্গ বিজয়-উৎসব তখনও দূরে থাকলেও ক্রমশই তা ঝলমলিয়ে কাছে ঘনিয়ে আসছিল। মঠের টিলার গহ্বরগুলো থেকে, অসংখ্য গুহাসদৃশ ঘরের অভ্যন্তর থেকে অতীতের দুর্গন্ধের শেষ রেশটুকু ওপরে ভেসে উঠতে-না-উঠতেই গ্রীষ্মের অক্লান্ত পরিশ্রমী বাতাস সঙ্গে সঙ্গে তার ঝুঁটি ধরে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলছিল দূরে বহুদূরে — হয়তো ইতিহাসের কোনো এক আবর্জনাস্তূপে।

বাতাসের হাত-পা খেলানোর কাজ এ-সময়ে বেশ সহজ হয়ে উঠেছিল, কেননা মঠের সুপ্রাচীন, প্রকাণ্ড চওড়া পাঁচিলটাকে আমাদের মিশ্র বাহিনীগুলো সপ্তাহ দুয়েকের কঠিন পরিশ্রমে একেবারে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল। আর 'বাজপাখি', 'মেরি' আর ক্রমশ-সুস্থ-হয়ে-ওঠা কুরিয়াজের ঘোড়াগুলো (দলপতি-পরিষদ এই সব ঘোড়ার সুন্দর-সুন্দর নাম দিয়েছিল — যেমন, 'ঝুমকোফুল', 'সন্ন্যিসি' আর 'ঈগলছানা') ভাঙা পাঁচিলের ইট-পাটকেল আর পলস্তরার চাঙড়গুলো বয়ে নিয়ে ফেলে এসেছিল সেইসব জায়গায় যেখানে সেগুলোর সবচেয়ে ভালো কাজে লাগার সম্ভাবনা ছিল। যেমন, সবচেয়ে ভালো আর

সবচেয়ে বড় চাঙড়গ্‌লো শ্‌য়োরের খোঁয়াড়-বাড়ি তৈরির জায়গাটায়, আর ছোট টুকরোগ্‌লো পায়ে-চলা পথ তৈরির জায়গায় আর নানারকম গর্ত আর ফাঁকফোকর বোজানোর কাজে। এছাড়া আমাদের অন্যান্য মিশ্র বাহিনী কোদাল, ঠেলাগাড়ি আর তক্তাপাটায় সেজে টিলার উৎরাইয়ের গায়ে থাককাটা জায়গাগ্‌লো আরও চওড়া করে সেগ্‌লোকে পরিষ্কার আর সমান করে তুলেছিল আর টিলার ধার-বরাবর নিচে পর্যন্ত গর্ত কেটে সিঁড়ি বানিয়েছিল। ওদিকে বরভোয়ের অধীন মিস্ত্রির দল খান-বিশেক বেঞ্চি সারিয়েস্‌রিয়ে ছেলেদের ব্যবহারের জন্যে বিশেষ-বিশেষ বারান্দায় আর রাস্তার মোড়ে-মোড়ে সেগ্‌লো বসিয়ে দিয়েছিল। আমাদের উঠোনটা ক্রমেই হয়ে উঠছিল বড়সড় আর আলোহাওয়ায় ভরা, আগের চেয়ে আকাশের অনেকখানি বেশি অংশ নজরে পড়ছিল কলোনি থেকে আর প্রকাণ্ড একটা ছবির ফ্রেমের মতো গাছগাছড়ার সব্‌জ আর দিগন্তের দ্‌রান্ত নীলাভা চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছিল আমাদের।

আমাদের উঠোনটা এবং টিলার চারপাশের উৎরাই ইতিমধ্যে ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল আর গোমড়াম্‌খো, চুপচাপ (স্‌ন্দরী স্ত্রীর শাদাসিধে স্বামীদের প্রায়ই যেমন হতে দেখা যায় তেমনই আর-কি) আমাদের বাগানের মালি মিজিয়াক উঠোন আর পায়ে-চলা পথগ্‌লোর ধারে-ধারে মঠের আমলের রাস্তার ভাঙা প্‌রনো ইটগ্‌লোর কোনা উঁচিয়ে পরিচ্ছন্নভাবে সাজিয়ে স্‌ন্দর করে তুলছিল।

উঠোনের উত্তরদিকে আমাদের শ্‌য়োরের খোঁয়াড়ের ভিত্ গাড়া হয়েছিল। শ্‌য়োরদের থাকার স্‌ন্দর-স্‌ন্দর খোপওয়ালা এই খোঁয়াড়বাড়িটা যে চমৎকার হয়ে উঠতে যাচ্ছিল সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। শেরেকেও এখন আর আগেকার মতো ঘরপোড়া মান্‌ষের বিহ্বল ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছিল না। আর্কিমিডিসশোভন আবিষ্কারের আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছিলেন তিনিও, কেননা তিরিশটিরও বেশি মিশ্র বাহিনী প্রতিদিন কাজে বের্‌চ্ছিল তখন আর আমাদের হেফাজতে যে এক বিপ্‌ল শক্তির সমাবেশ ঘটেছে সে-বিষয়ে প্রত্যেকেই সচেতন হয়ে উঠেছিল্‌ম। শেরের কাজ করার ক্ষ্‌ধা যে কী ভয়ঙ্কর-রকমের মাত্রাহীন, ওই সময়েই তা প্‌রোপ্‌রি উপলব্ধি করল্‌ম আমি। কাজ করার দ্‌র্দম লোভে পড়ে তিনি আরও রোগা হয়ে উঠলেন — কেননা কাজের মাত্রা এবং কর্মীর সংখ্যা যথেষ্ট হলেও তাদের

সঙ্গে তাল রেখে যে-বস্তুটির একই রকম বেড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না তা হল সংগঠকের নিজের শক্তিসামর্থ্যের মাত্রা। এদুয়ার্দ নিকলায়েভিচ ঘুম কমিয়ে দিলেন, পায়ের ওপর চরকি ঘোরার মাত্রা যেন দিলেন বাড়িয়ে এবং তাঁর দৈনিক কর্মসূচি থেকে সকালের জলখাবার আর দুপুর ও রাত্রের খাওয়ার মতো কিছু-কিছু 'অপ্রয়োজনীয়' বিষয় দিলেন বাদ দিয়ে — তবু, তা সত্ত্বেও, যা-যা তিনি করতে চাইছিলেন কিছুতেই তা করার মতো সময় করে উঠতে পারছিলেন না।

আমাদের এক শো হেক্টর আবাদী জমিতে মাত্র ছ'সপ্তাহের মধ্যে শেরে যত কাজ করে উঠতে চাইছিলেন আগের আমল হলে ততখানি কাজ নিষ্পন্ন করতে ছ'বছর লাগার কথা। জমির আগাছা নিড়নো, প্রায়-অদৃশ্য ঘাসপাতা জমি থেকে তোলা, শেরের নিজের নির্দিষ্ট মান-অনুযায়ী চারা না-গজিয়ে উঠলে এতটুকু দৃক্‌পাত না-করে ফসল-বোনা গোটা খেতকে-খেত বাতিল করে দিয়ে সেখানে বেমালুম ফের লাঙল দেয়া আর আগের ফসলের জায়গায় এক বিশেষ ধরনের নাবী ফসল বোনা — এই সবরকম কাজের জন্যে বড়-বড় বাহিনীকে মাঠে নামাতেন শেরে। আগাছামুক্ত, একেবারে সোজা-সোজা জমির টুকরো আর তাতে ছড়ানো-ছিটনো কাঠির ডগায় 'আন্দালুসিয়ার রাজা' আর নানা ধরনের 'রাজকন্যে'দের পরিচয়সূচক কার্ড শোভা পেতে থাকল সারা আবাদ জুড়ে। আবাদ-বরাবর যাতায়াতের রাস্তার ধারে মাঠের মাঝখানকার একটা জমিতে শেরে একটা তরমুজ খেতও তৈরি করিয়েছিলেন। শিক্ষালাভে ছেলেদের উদ্দীপনা যোগানোর জন্যে আমার বিশেষ চাহিদা অনুযায়ী এটা করেছিলেন তিনি। দলপতি-পরিষদও এ-কাজটাকে খুবই প্রয়োজনীয় বলে গণ্য করেছিল। লাপত তো সঙ্গে সঙ্গে যোগ্য বয়স্ক ছেলেদের নামের একটা লিস্টি বানাতেই বসে গেল, যাতে তাদের মধ্যে থেকে ছেলে নিয়ে তরমুজ খেতে কাজ করার একটা বিশেষ বাহিনী গড়া যায়।

শেরের কাঁধে কাজের প্রকাণ্ড বোঝা থাকা সত্ত্বেও দেখা গেল কিছু ছেলেকে নিয়ে পুকুর পরিষ্কারের জন্যে একটা মিশ্র বাহিনী তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। এই বাহিনীর দলপতি করা হল কারাবানভকে। শর্টসের নামরক্ষা হয় এমন যা-কিছু তাদের জন্যে জোগাড় করতে পারল দোনিস কুদ্‌লাতি তা-ই পরে চল্লিশটি প্রায়-উলঙ্গ ছেলে পুকুরের জল সেচতে শুরু করে দিল। জল সেচা শেষ হলে দেখা গেল পুকুরের তলায় বহু অদ্ভুত-অদ্ভুত জিনিসপত্র রয়েছে —

যেমন, রাইফেল, করাতে-কাটা বেঁটে বন্দুক, রিভলবার, ইত্যাদি। কারাবানভ বলল:

'ভালো করে খোঁজ করলে শর্ট্‌সও পাওয়া যাবে। আমার তো তা-ই মনে হয়, কেননা শর্ট্‌স ছেড়ে ফেলে পালানো সোজা...'

আগ্নেয়াস্ত্রগুলো পুকুরের তলাকার পাঁক থেকে তোলা কঠিন হল না, তবে পাঁকটা তোলাই কঠিন হয়ে দাঁড়াল। পুকুরটা ছিল বেশ বড়সড়, ফলে বালতি আর তক্তাপাটার খাটুলিতে করে কাদা তুলে যেন কূল পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে যখন চার-চারটে ঘোড়াকে এই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে মাথা খাটিয়ে-তৈরি কাঠের একটা নৌকোর আকারের বস্তুর সঙ্গে জুতে কাজে লাগানো হল, একমাত্র তখনই পাঁক পরিষ্কার হওয়ার চোখে-পড়ার মতো লক্ষণ দেখা দিল।

কারাবানভের নেতৃত্বে কর্মরত 'বিশেষ দ্বিতীয় মিশ্র বাহিনী' দারুণ মজাদার একটা দ্রষ্টব্য বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাদায় মাখামাখি-অবস্থায় বাহিনীর ছেলেগুলোকে দেখতে লাগত হুবহু আফ্রিকানদের মতো কুচকুচে কালো। আলাদা করে ওদের কাউকে চিনতে পারা তখন কঠিন হয়ে দাঁড়াত, আর একসঙ্গে দল বেঁধে থাকলে মনে হোত না-জানি কোন অজানা দূর দেশ থেকে এসে হাজির হয়েছে সব। ওরা কাজে লাগার তৃতীয় দিন থেকেই এমন একটা দৃশ্যের সন্ধান পেয়ে বর্তে গেলুম আমরা যা আমাদের এই উত্তরাঞ্চলে রীতিমতো অভিনবই বলা চলে। দেখা গেল, ছেলেরা কাজে চলেছে কোমরে অ্যাকেশিয়া, ওক, আরও কী-কী যেন নাম-না-জানা অদ্ভুত গাছের পাতা-দিয়ে-তৈরি দেখ্‌নাই ঘাগরা ঝুলিয়ে। তাদের গলায়, হাতে আর পায়ে তার, লোহার পাত আর টিনের টুকরোয় তৈরি গহনা। অনেকে আবার সরু-সরু লতা পাকিয়ে নোলক বানিয়ে তা-ই দুলিয়েছে নাকে আর কানে ঝুলিয়েছে নাটবল্টু আর ছোট-ছোট পেরেকের দুল।

বলা বাহুল্য, এই আফ্রিকানরা না-জানত রুশ না-জানত ইউক্রেনী ভাষা। নিজেদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান করত তারা আমাদের অজানা কোনো একটা স্থানীয় আফ্রিকান ভাষায়, ভাষাটার বৈশিষ্ট্য ছিল অনবরত সজোরে চিল-চিৎকার করার আর এমন সব গালভরা গমগমে আওয়াজ বের করায় যা ইউরোপীয় সন্তানদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমরা অবাক হয়ে দেখতুম যে বিশেষ দ্বিতীয় মিশ্র বাহিনীর সদস্যরা শুধু-যে পরস্পরের মনের

কথা বুঝত তা-ই নয়, বরং তারা একটু বেশিরকমই বাচাল। ফলে সারাদিন পুকুরের প্রকাণ্ড গর্তটা গমগম করতে থাকত অসহ্য চিৎকার-চেঁচামেচিতে। কোমর পর্যন্ত কাদায় ডুবে আর গলা চিরে চিৎকার করতে-করতে আমাদের আফ্রিকানরা 'গঙ্গাফড়িং' আর 'বাজপাখি' নামের ঘোড়াদুটোকে পিছু হাঁটিয়ে তাড়াতে-তাড়াতে একেবারে থকথকে কাদার মাঝখানটাতে জরদ্‌গব নৌকোটার কাছে নিয়ে আসত।

আর দেখা যেত, অন্যদের মতোই কুচকুচে কালো, চুলের গোছা কপালের ওপর কাদায় বীভৎসভাবে সেঁটে-থাকা কারাবানভ বড়-বড় চোখের শাদা অংশদুটো ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ভয়ঙ্কর দাঁতের পাটি দেখিয়ে চিৎকার করে বলছে:

'কার-আম্‌-বা!'

আর কারাবানভের ব্রেস্‌লেট-পরা অপরূপ হাতখানা যেদিকে ইঙ্গিতে দেখাচ্ছিল কয়েক ডজন বন্য চোখের শাদা অংশকে সেইদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে আর চোখের মালিকদের সমঝদারের মতো মাথা নাড়তে আর তৈরি হয়ে দাঁড়াতে দেখা যেত।

'হে'ইয়ো — !' এবার হাঁক পাড়ত কারাবানভ।

বন্যেরা সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে নৌকোটার পেছনে এলোমেলো ভিড় জমিয়ে দাঁড়িয়ে যেত। তারপর চেঁচামেচি করে আর নিজেরা নৌকোখানা ঠেলে 'গঙ্গাফড়িং'কে উৎসাহ দিতে থাকত নৌকোটাকে টেনে পুকুরের পাড়ে তুলতে। আর দেখা যেত সত্যিই ঘোড়াটা পুরো একটন ওজনের থকথকে ঘন কাদা টেনে পাড়ের ওপর তুলছে।

তবে নৃকুলবিদ্যা নিয়ে এই উত্তেজনা সত্যিসত্যিই চরমে উঠত প্রতিদিন সন্ধেবেলা, যখন গোটা কলোনি আমাদের টিলাটার গড়ানে ধারগুলোয় শুয়ে-বসে বিশ্রাম করত। খালি-পা ছেলেগুলো তখন গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করত কখন সেই রোমাঞ্চকর মুহূর্তটি আসবে যখন কারাবানভ কাজ থেকে ফেরার পথে হাঁক পেড়ে গর্জে উঠবে, 'গলা কাট্‌ ওদের!..' আর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর মুখভঙ্গি করে 'কৃষ্ণাঙ্গ জংলি'রা 'ধলা'দের ওপর রক্তপিপাসুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে। 'ধলা'রা ততক্ষণে অবশ্য আতঙ্কে একদৌড়ে উঠোনে উঠে পগার পার হয়ে যাবে, কেবল ঘরবাড়ির দরজা আর ফাঁকফোকর দিয়ে উঁকিঝুঁকি দিতে থাকবে ভয়বিহ্বল মুখগুলো। তবে, বলা বাহুল্য, 'কালা'রা কখনই 'ধলা'দের নাগাল পেত না আর নরমাংসের ভোজও জমত না তাদের, কেননা

যদিও ওই বন্যেরা রুশভাষা জানত না, তবু এটা তারা ভালো করেই জানত যে ঘর নোংরা করার নির্ভুল পরিণতি হচ্ছে ঘরে অন্তরীণ হয়ে থাকার শাস্তি।

তবে একবার — এবং সেই একবারই মাত্র — ওই বন্যদের সৌভাগ্য হয়েছিল ইউক্রেনের রাজধানী খার্কভের কাছেপিঠে একটা জায়গার ধলা বাসিন্দাদের সত্যি-সত্যিই তাক লাগিয়ে দেবার।

উত্তপ্ত, বৃষ্টিহীন একটা দিনের শেষে এক সন্ধেবেলা পশ্চিম দিগন্তে একখানা বজ্রগর্ভ মেঘ দেখা দিল। দেখতে-দেখতে মেঘখানা ভয়ঙ্করদর্শন পাঁশুটেরঙের কেশর ফুলিয়ে দ্রুত আকাশ ছেয়ে ফেলল, তাবপর গুরুগম্ভীর একটা গর্জন করে ধেয়ে এল আমাদের টিলাটার দিকে। বিশেষ দ্বিতীয় মিশ্র বাহিনী এই মেঘখানাকে অভ্যর্থনা জানাল সানন্দে, পুকুরের তলাটা মুখর হয়ে উঠল উল্লাসধ্বনিতে। মেঘখানা কুরিয়াজের মাথায় দাঁড়িয়ে গর্জাল কিছুক্ষণ, কিছুক্ষণ ভারিক্কি চালে তার সব ক'টা কামান দাগল আমাদের ওপর, তারপর হঠাৎ — যেন অন্তরীক্ষের ঢেঁকিকলে নিজের ভার আর সামলাতে না-পেরেই — হিংস্র ক্রোধ, বৃষ্টি আর বজ্র-বিদ্যুতের ধোঁয়াটে ঘূর্ণ্যাবর্ত তুলে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমাদের বিশেষ দ্বিতীয় মিশ্র বাহিনী এতে সাড়া দিল কানফাটানো চিৎকার জুড়ে, প্রলয়ের একেবারে হৃৎকেন্দ্রে রীতিমতো প্রলয়নাচন জুড়ে দিয়েই।

কিন্তু ঠিক এই মায়াময় মুহূর্তটিতেই টিলার কানায় বৃষ্টির জালের মধ্যে দাঁড়িয়ে গম্ভীরমুখ উদ্বিগ্ন সিনেন্কি তীক্ষ্ণস্বরে বাজিয়ে দিল বিপদসংকেত। এতে বন্য আদিবাসীরা নাচ থামাল, হঠাৎ তাদের রুশভাষাও মনে পড়ে গেল। তারা শুধোল:

'বাঁশিতে ফুঁ দিতি লেগিচিস ক্যানে ছোঁড়া? অ্যাঁ? বলি, হয়েছেটা কী? কোথায়?.. এখেনে?'

জবাবে সিনেন্কি তার বিউগ্লখানা তুলে দেখিয়ে দিল পদভোর্কির দিকে। ইতিমধ্যে অপরাপর কলোনি-বাসিন্দারাও উঠোন থেকে বেরিয়ে এসে পুকুরের অপর পাড়ের দিকে যেতে শুরু করেছিল। দেখা গেল পুকুরপাড় থেকে শ'খানেক মিটার দূরে একখানা কুঁড়েঘর অগ্নিকুণ্ডের মতো দাউদাউ করে জ্বলছে আর তার চারপাশ ঘিরে মানুষের যেন একটা শোভাযাত্রা তাকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। আমাদের চল্লিশ জন কৃষ্ণাঙ্গও তাদের দলপতির নেতৃত্বে সেই জ্বলন্ত কুঁড়েটার দিকে ছুট লাগাল। দেখা গেল, আমাদের যে-সব

কলোনি-বাসিন্দা ইতিমধ্যে ওখানে পেশছে গিয়েছিল জনা-কুড়ি আতঙ্কিত স্ত্রীলোক আর বৃদ্ধ একসার আইকনের বেড়া তুলে তাদের ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। এক দাড়িওয়ালা বৃদ্ধকে চিংকার করে বলতে শ্নলম্:

'ক্ড়্যেতি আগ্ন লেগেছ্যে তাতি তমাদের কী? ভগমান আগ্ন লাগায়্যেছেন, ভগমান নিজিই আগ্ন নিবাব্যেন-নে...'

কিন্তু চারপাশে তাকিয়ে দাড়ির মালিক আর তার সাঙ্গপাঙ্গ ভক্তদের না-ব্ঝে আর উপায় রইল না যে তাদের 'ভগমান'-এর অগ্নি-নির্বাপকের ভূমিকা নেয়ার-যে বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই তা-ই নয়, বরং 'ভগমান'-এর সঙ্গে যোগসাজসেই নির্ধারক ভূমিকাটি হস্তগত হয়ে গেছে 'শয়তান'-এর দলবলের। রোমশ কোমরে-জড়ানো লজ্জা-নিবারক নেঙটিগ্লো লটপট করতে-করতে আর ধাতব গহনাগ্লো ঝন্ঝনিয়ে আমাদের কৃষ্ণাঙ্গদের দলটি বন্য চিংকার তুলে ছ্টে এল এই সময়ে। নাকে কাঠির টুকরোটাকরা বাঁধার ফলে বিকৃত ওদের কাদামাখা ম্খ আর কপালে-লেপটানো বীভংস চুলের গোছা দেখে ভক্তদের আর এমন সন্দেহের বিন্দ্মাত্র অবকাশ রইল না যে এই অদ্ভুতদর্শন জীবগ্লোর পক্ষে শোভাযাত্রাটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের সবাইকে নরকে টেনে নিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে। ফলে দেখতে-দেখতে সেইসব বৃদ্ধ আর স্ত্রীলোক মর্মভেদী আর্ত চিংকার তুলে ছ্টে রাস্তায় নেমে ছিটকে পড়ল দিগ্বিদিকে। আইকনগ্লো অবশ্য তখন তাদের বগলের নিচেই আশ্রয় নিয়েছিল। এদিকে ছেলেরা ততক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে জ্বলন্ত আস্তাবল আর গোয়ালের ওপর। কিন্তু দেখা গেল তখনই বেশ দেরি হয়ে গেছে — অবোলা প্রাণী সব ক'টা গেছে মরে, জীবন্ত দগ্ধ হয়ে। ক্ষিপ্ত সেমিওনা হাতের কাছে প্রথম যে চেলাকাঠখানা পেল তাই দিয়েই জ্বলন্ত ক্ড়ের একটা জানলা ভেঙে ভেতরে ঢুকল। এর মিনিটখানেক পরে একটা পাকা মাথা আর দাড়িওয়ালা ম্খ দেখা গেল জানলার ধারে আর শোনা গেল সেমিওন ক্ড়ের ভেতর থেকে চিংকার করে বলছে:

'লোকটারে বাইরে নিয়ে যা — শিগ্গিরি...'

অন্য ছেলেরা লোকটিকে জানলা দিয়ে বের করে আনল আর সেমিওন আগ্নের হলকা এড়িয়ে অপর একটা জানলা দিয়ে লাফিয়ে বাইরের ভিজে, সব্জ ঘাসের উঠোনে এসে পড়ল। একজন কৃষ্ণাঙ্গ কলোনিতে ছ্টল একখানা গাড়ি যোগাড় করে আনতে।

ইতিমধ্যে আকাশের মেঘখানা পূর্বদিগন্তে সরে গিয়েছিল, আকাশ জুড়ে ছিল কেবল চওড়া কালো ফিতের মতো তার লেজখানা। আন্তন ব্রাত্‌চেঙ্কো এই সময় 'মলদিয়েত্‌স'কে হাঁকিয়ে কলোনি থেকে এসে উপস্থিত হল। বলল:

'গাড়িখানা মিনিটখানেকের মধ্যে আসছে... তা, মুজিকগুলো গা ঢাকা দিল কোথায়? ছেলেরা ছাড়া আর কোনো জনমনিষ্যির নামগন্ধ নেই কেন এখানে?'

গাড়ি এলে তাতে বুড়োকে তুলে গাড়ির পিছুপিছু ক্লান্তভাবে কলোনির দিকে হেঁটে চললুম আমরা। আর বাড়ির গেট আর ডালপালার বেড়ার ওধার থেকে ভয়বিকৃত মুখগুলো তাকিয়ে থাকল আমাদের দিকে, কে জানে হয়তো-বা শুধু চাউনি দিয়েই ভস্ম করে ফেলতে চাইল আমাদের।

পদভোর্‌কি গ্রামখানা আমাদের সম্পর্কে মোটের ওপর বিরূপ হয়েই ছিল। তবে মাঝে-মাঝে আমরা এমন কানাঘুষো শুনতে পেতুম যে কলোনিতে নিয়মশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ওখানকার লোকেরা নাকি খুশিই হচ্ছে।

প্রতি শনি-রবিবার আমাদের উঠোনে এসে ভিড় জমাত গাঁয়ের ভক্তবৃন্দ। তবে সাধারণত বুড়োবুড়িদেরই গির্জের ভেতর ঢুকতে দেখা যেত, অপেক্ষাকৃত কমবয়সীরা গির্জের দেয়ালের চারপাশে বেড়িয়ে বেড়ানোই পছন্দ করত বেশি। আমাদের পাহারাদার মিশ্র বাহিনী অবশ্য অল্পদিনের মধ্যেই এই ধরনের গায়ে পড়ার চেষ্টা বন্ধ করে দিল। কেননা, ঠিক বুঝে ওঠা যাচ্ছিল না যে গির্জের বাইরে বেড়িয়ে ওই লোকগুলো কাদের সঙ্গে সংযোগসাধন করতে চাইছিল — ঈশ্বরের, না আমাদের সঙ্গে! হাতে নীল পটি-জড়ানো পাহারাদাররা গির্জের এইসব প্রার্থনা চলার সময় ভ্রমণবিলাসী ভক্তদের গিয়ে বলত:

'হয় আপনেরা গির্জার ভিত্‌রি যান, আর তা না হলি উঠান ছাড়্যে চলি যান। এটা বেড়াবার জায়গা না।'

ফলে ভক্তদের বেশির ভাগই উঠোন ছেড়ে চলে যেতে মনস্থ করল। তখনও আমরা অবশ্য ধর্মবিরোধী কোনো প্রচারে মাথা গলাই নি। বরং উলটো, ভাববাদী আর বস্তুবাদী মতাদর্শের প্রতিনিধিদের মধ্যে তখন এমন কি কিছু-কিছু যোগাযোগও ঘটে চলছিল।

গির্জা-পরিষদের সদস্যরা মাঝেমধ্যে আমার কাছে আসত আমাদের

উভয়পক্ষের এক্তিয়ার-সংক্রান্ত ছোটখাট মামলার ফয়সলা করতে। একবার এইরকম দেখাসাক্ষাতের সময় ওই সদস্যদের কাছে আমার মনোভাব আমি লুকোতে পারি নি। বলে ফেলেছিলুম:

'আচ্ছা দেখুন, মোড়লমশাইরা! আপনারা এ-গির্জেটা বাদ দিয়ে ওইটে ব্যবহার করুন-না কেন, ওই যে কী বলে — অলৌকিক ঝর্না না কী — তার পাশের গির্জেটা? কী বলেন, অ্যাঁ? ওটা তো এখন বেশ সাফসুতরো করা হয়েছে, ওখানে আপনাদের দিব্যি কাজ চলে যাবে'খন...'

এতে প্রধান মোড়ল বললেন, 'কী যে বলেন ডিরেক্টার-সায়েব! ওইডা আমরা ব্যাভার করব্য কী প্রেকারে? ওয়া তো বড় গির্জা নয়, ছোট্ট একখান উপাসনার ঘর! ওখেনে তো পাদ্রির বেদী নাই... আচ্ছা, আমরা কি আপনেদের কাজে ব্যাঘাত ঘটাত্যেছি?'

বললুম, 'বুঝলেন না, উঠোনটা আমার বিশেষ দরকার! আমাদের একটু হাত-পা খেলাবার জায়গা পর্যন্ত নেই। তাছাড়া, দেখুন দেখি! আমরা সব ক'খানা বাড়ি চুনকাম আর রঙ করে কেমন সাজিয়েগুছিয়ে ফেলেছি, এর মধ্যে আপনাদের ওই ভাঙাচোরা নোংরা গির্জেটা কি চক্ষুপীড়া ঘটাচ্ছে না?.. আপনারা যদি ওটা খালি করে দিতেন তাহলে আমি চক্ষের নিমেষে ওটাকে ভেঙেচুরে ধুলিসাৎ করে দিতুম আর সপ্তা-দুয়েকের মধ্যে জায়গাটায় বানিয়ে ফেলতুম ফুলবাগান।'

শুনে দাড়িওয়ালা মোড়লরা হাসল — কে জানে, আমার এই পরিকল্পনাটা ওদের পছন্দ হল বলেই কি?..

তবু বলল, 'তা, বোঝলেন কিনা, ভাঙ্যে ফেলা তো সোজাই। কিছু বানানোই হল্য গে শক্ত কাজ। হি-হি! এই যে দেখতিছেন গির্জাডা, এডা তৈয়ের হয়্যেল তিন শত বৎসর আগি। এডারে বানাতি কত-যে মাথার-ঘাম-পায়ে-ফেলি রোজগার-করা কোপেক খরচা হয়্যেল কেডা তার হিসাব রাখে! আর আপনে কিনা অম্লানবদনি কতিছেন, 'আমি এডারে ভাঙ্যে ধুলিসাৎ কর্যে দিব!' এয়ার অথ্থ, আপনি মনে ভাবতিছেন যে ধম্মোকম্মো বুঝি সব গোল্লায় যাতি বস্যেছে। কিন্তু সবুর করেন কিছুকাল, আপনে দ্যাখবেন — যা মরতি চল্যেছে তা ধম্মো নয়... লোকি সব জানে, সব বোঝে...'

গির্জের মোড়ল এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন সে ঈশ্বরপ্রেরিত ধর্মপ্রচারক হয়ে এসেছে। যেন খ্রিস্টিয়ানধর্ম প্রচারের সেই আদিযুগে আমরা ফিরে

গেছি এমনভাবে তার গলাটা রনরনিয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু অপর এক বুড়ো অবস্থা বুঝে তার বক্তৃতায় বাধা দিয়ে বলল:

'অমন কথা কয়েন না, ইভান আকিমভিচ! ডিরেক্টার-সায়েব তাঁর নিজির কাজির স্বার্থ দ্যাখতিছেন মাত্তর। ওনি সোভিয়েত সরকারের প্রেতিনিধি। তাই এ-গির্জাডায় তাঁর... কী বলব্য... কোনো দরকার নাই। তবে, বোঝলেন কিনা, আপনে আমাদেরে যেখেনে যাতি কতিছেন হেয়া গির্জা না, হেয়া উপাসনা-ঘর! হ্যাঁ, উপাসনা-ঘর মাত্তর! তাছাড়া, আমি আপনেরে কতি পারি, জায়গাডা অপবিত্র হয়ি আছে...'

'তা, আপনেরা তো মন্ত্রঃপূত জলছড়া দিয়ি জায়গাটা পবিত্র করে নিতি পারেন,' প্রস্তাব করে বসল লাপত।

শুনে বৃদ্ধ যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল।

দাড়ি চুলকিয়ে বলল, 'মন্ত্রঃপূত জলে সব্বদা কাজ হয় না, বোঝলে খোকা!'

'হায়-হায়, কী যে বলেন! কাজ হবে না কেন?..'

'না, খোকা, সব্বত্তর কাজ হয় না ওতি! যেমন, তমার গায়ি জলের ছিটা দিলি কি কিছু কাজ হব্যে, কও দেখি?'

'কাজ হবে বলে তো মনে হয় না,' মানতে হল লাপতকে।

'তাইলি? কিস্যুটি কাজ হব্যে না! মন্ত্রঃপূত জল যে কনে ব্যাভার করতি লাগব্যে তা জানতি হয়।'

'কিন্তু পাদ্রি-সায়েবরা কি তা জানেন?'

'তা জানে বৈকি! অবিশ্যি জানে। বোঝলে, খোকা!'

'ওনারা শুধু নিজের ভালোটাই বোঝেন,' লাপত বলল। 'আপনেরা কিন্তু কিচ্ছুটি বোঝেন না! গতকাল গাঁয়ে আগুন লেগেছিল... ছেলেরা না-থাকলি একটা বুড়া মানুষ জ্যান্ত পুড়ি মারা যেত। পুড়ি একদম ছাই হয়ে যেত।'

'প্রেভুর মনোবাসনা পুরণ হোত্য তাইলি। কে জানে, প্রেভু হয়তো চায়্যেছেলেন যে ওয়ার মতন বুড়ার পুড়িই মরা উচিত।'

'কিন্তু ছেলেরা তাঁর সে-ইচ্ছায় বাদ সাধল...'

বুড়ো এবার গলাখাঁকারি দিল। বলল:

'চুপ মার‍্যে যাও, খোকা। চাপ্যে যাও। এ-সকল বিষয় নিয়ি তক্ক করার বয়েস হয় নাই তমার।'

'তাই নাকি? বয়স হয় নাই?'

'বোঝলেন, টিলার নাবালে ওই-যে একখান উপাসনা-ঘর আছে না? ওয়া গির্জা না, ওয়ার মধ্যি পুজোর বেদী নাই।'

খ্রিস্টিয়ানসুলভ বিনয়াবনত ভাবে বৃদ্ধ ক'জন আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। তবে তার পরদিনই দেখা গেল গির্জার দেয়াল থেকে দড়ি আর ফাঁস ঝুলছে আর রাজমিস্ত্রিরা বালতি নিয়ে ওইসব ফাঁসে দেহ গলিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করে কাজ করছে। গির্জের দেয়ালের বিশ্রী অবস্থা সম্পর্কে আমার মন্তব্যে লজ্জা পেয়ে, নাকি ধর্ম যে এখনও মরে নি এটা প্রমাণ করতে তা ঠিক বলতে পারব না — গির্জা-পরিষদ গির্জের দেয়াল চুনকাম করার জন্যে চার শো রুব্‌ল খরচ মঞ্জুর করেছিল। এই হল গিয়ে গির্জা-পরিষদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের ফলাফল!

গির্জের ব্যাপারে তখনও পর্যন্ত কলোনি-বাসিন্দাদের মনে কোনো বৈরীভাব ছিল না, বরং গির্জের ভেতরে কী হয় না-হয় তা নিয়ে তাদের কৌতূহলের অন্ত ছিল না। বিশেষ করে ছোট বাচ্চারা এমন অস্থির করে মারছিল যে শেষপর্যন্ত আমাকে অনুমতি দিতেই হল 'গির্জার ভেতরে কী ঘটছে না-ঘটছে তা ভেতরে গিয়েই দেখতে'।

'তবে খেয়াল রাখিস কিন্তু — ভিতরে গিয়ি হুজ্জতি করা চলবে না!' জোর্‌কা ওদের সাবধান করে দিল। 'ওদেরকে আমাদেরে বুঝায়েসুঝায়ে, নতুন জীবনগঠনের নমুনা দেখায়ে বশে আনতি হবে, গুণ্ডামি করে নয়।'

শুনে ছেলেরা রীতিমতো অপমানিত বোধ করল। বলল:

'আমরা তো রাস্তার গুণ্ডা না, গুণ্ডা কী?'

'আর ওখেনে কারো মনে আঘাত দেয়া চলবে না, বুঝলি!.. খুব সাবধানে, কায়দা করি... চলতে-ফিরতে হবে। বুঝলি তো... ঠিক এমনধারা করে...'

যদিও জোর্‌কা এই সমস্ত নির্দেশ দিচ্ছিল প্রধানত মুখের ভাবভঙ্গি দিয়ে আর হাত-পা নেড়ে, তবু ও-যে কী বোঝাতে চাইছিল ছেলেরা বুঝল তা। ওরা বলল:

'বুঝ্যেছি, বুঝ্যেছি... সব ঠিক হব্যে, দ্যাখবা-নে।'

কিন্তু এর এক সপ্তাহ পরে গির্জের জরাজীর্ণ বৃদ্ধ পুরুত আমার কাছে এলেন নালিশ নিয়ে। কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস করে বললেন:

'এট্টা কথা ছেল, ডিরেক্টার-সায়েব! আমার অবিশ্যি নালিশ-ফৈরেদের কিছু

নাই, আপনের ছেল্যারা অনেয্য কিছুই করে নাই, তবু, বোঝলেন-না... ওয়ারা যজমানদের অমর্যেদা ঘটাত্যেছে, ব্যাপারডা কিছুডা অসোয়াস্তির কারণ হতিছে এই আর-কি। আমি জানি ওয়ারা সভ্যভব্য হয়ি থাকতি চেষ্টা পাতিছে, তবু। ভগমানের দোহাই, আমি কিন্তু ওয়াদেরে কোনো ব্যাপারে দোষী সাব্যস্ত করত্যেছি না, তবু ভালো হয় যদি আপনে গির্জার ভিত্‌রি সেঁধোতি নিষেধ করেন ওয়াদেরে।'

বললুম, 'তাহলে, বলতে চান, ওরা গির্জেয় ঢুকে খারাপ আচার-ব্যবহার দেখিয়েছে?'

'না-না! ঈশ্বরের দোহাই! ওয়ারা মোট্টেও খারাপ ব্যাভার করে নাই, মোট্টেও না! তবে কী জানেন, ওয়ারা খাটো পেন্টুল পরি আর ওইসব টুপিটাপি মাথায় দিয়ি গির্জায় ঢোকে... আবার ওয়াদের মধ্যি কেউ-কেউ গায়ি ক্রুশচিহ্নও আঁকে, তবে চিহ্ন আঁকে বাম হাতে আর কাজডা করতিও পারে না ঠিকমতন, বোঝলেন-না! তাছাড়া ইদিক-উদিক তাকাতি থাকে হরদম, কী-যে দ্যাখবে আর কী না-দ্যাখবে ভাব্যে পায় না ওয়ারা। তারপর যখন ঘুরি দাঁড়ায় তখন কোনোসময় বেদীর দিকি পাশ ফিরি দাঁড়ায় আবার কোনোসময় দাঁড়ায় পাছু ফিরি। ওয়াদের কাছি অবিশ্যি সবকিছু মজার ব্যাপার, তবু বোঝলেন-না, এয়া হল্য গিয়ি উপাসনা-নিকেতন, আর ছেল্যা বেচারিরা না-জানে উপাসনার অথ, না-বোঝে ঈশ্বরের মহিমে, না-পায় ঈশ্বররে ভয়। ওয়ারা পুজাবেদীর কাছি ভালোমান্‌ষির মতন চুপেচাপে আসে বটে, তবে সবকিছুর দিকি হাঁ-কর্যে তাকায়্যে দেখতি থাকে, আইকনগুলিন হাত দিয়ি পরখ কর্যে, দেখে, আর সিংহাসনডারে চোখ দিয়ি গিলতি থাকে য্যান। ওয়াদের মধ্যি একজনা তো পবিত্র দরজার মধ্যি গিয়ে দাঁড়ায়্যেল পর্যন্ত, তারপর উপাসনায় ব্যস্ত লোকজনের দিকি তাকাত্যে লাগল্য। ব্যাপারডা অসোয়াস্তির কারণ ঘটাত্যেছে, বোঝলেন না!'

পাঁচকে চেহারার পুরুতঠাকুরকে শান্ত করে আমি কথা দিলুম যে আমরা আর তাঁর কাজে বাধার সৃষ্টি করব না। তারপর কলোনি-বাসিন্দাদের সভায় ঘোষণা করে দিলুম:

'ছেলেরা, আর তোমাদের গির্জেয় ঢোকা চলবে না। পুরুতমশাই তোমাদের নামে নালিশ জানাচ্ছিলেন।'

শুনে ছেলেরা চটে উঠল। বলল:

'ক্যানে ঢোকব্য না আমরা? ভিতরে গিয়ি আমরা তো কিস্‌স্যুটি করি নাই! আমাদের মধ্যি যে-ই ভিতরে গ্যাছে সে-ই চারদিক দেখিশুনি চল্যে আসছে। লোকডা মিথ্যাকথা কয়েছে!'

'কিন্তু তোমরা নিজেদের গায়ে ক্রুশচিহ্ন আঁকতে গেলে কেন? ক্রুশচিহ্ন আঁকার দরকারটা কী ছিল? তোমরা তো ভগবানে বিশ্বাস কর না, তাই না?.. তবে?'

'আমাদেরকে কওয়া হইছিল ওয়াদের আঁতে ঘা না দিতি। তাছাড়া কীভাবে চলতি-ফিরতি হয় তাই-বা আমরা জানব্য কী করি? ওখেনে তো সব্বাই দেখি মাথার ব্যামোয় ভোগত্যেছে! খাড়ায়্যে থাকতি-থাকতি ওয়ারা হঠাৎ কথা নাই-বাত্তা নাই ধুপ করে্য হাঁটু গাড়্যে বস্যে পড়ে আর গায়ি ক্রুশচিহ্ন আঁকে। তা, আমাদের ছোঁড়ারা ভাব্যেল যাতে কেউ দোষ ধরতি না-পারে তার জন্যি তাদেরকেও অমনধারা করা দরকার।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। তবে, যাই হোক, আর গির্জেয় যেয়ো না, বুঝলে?'

'ঠিক আছে, যাব্য না তাইলি... কিন্তু ভারি মজাদার কথাবাত্তা বলে ওয়ারা ওখেনে! আর সব্বদা খাড়ায়্যে আছে তো আছেই — কিসির জন্যি তা ভগা জানে! আর সেই খুপরিডার মধ্যি... ওডারে কী য্যান কয়, বেদী না কী... ভারি পোষ্কার জায়গা সেডা, মেঝেতি গালচে পাতা, কী সোন্দর গন্ধে ভরভর করত্যেছে জায়গাটা, আর পুরোত্যে যা বক্তিমে ঝাড়তেছে-না ওখেনে খাড়ায়্যে... হাত দু'খান উপরদিকি ছুঁড়্যে-ছুঁড়্যে যে কী বলি!.. আপনের একবার কান্ডখান দেখা উচিত ছিল!'

'তোমাদের মধ্যে কেউ একেবারে বেদীর দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলে বুঝি?'

'আমি সবে দরজার দিকি যেতেছিলাম এমন সময় পুরোত্য হাত দু'খান ছুড়্যে কী য্যান বল্যে ওঠল। তা, আমি সেখানেই খাড়ায়্যে গেলাম, কিছুই আর করলাম না। আর পুরোত্য কয় কী আমারে, 'চল্যে যাও, চল্যে যাও, খোকা। আমার কাজি বাধা দিয়ো না!' শুন্যে আমি চলি আলাম, কী আর করি...'

গির্জের ব্যাপারে গুস্তোইভানের ধারণা কী তা জানতে ছেলেরা ভারি আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। গুস্তোইভানও একদিন গির্জের ঢুকেছিল, তবে তাড়াতাড়ি বেরিয়েও এসেছিল নিতান্ত হতাশ হয়ে। লাপত তাকে শুধিয়েছিল:

'কি রে, পুরোত হবি নাকি শিগ্‌গিরি?'

'ন্‌নাঃ,' হেসে জবাব দিয়েছিল গুস্তোইভান।

'কেন? কেন?'

'ছেল্যারা-যে কতিছে ওয়ারা বিলকুল বিপ্লববিরোধী... তা বাদে গির্জার মধ্যি তো কিচ্ছুটি নাই... খালি সার-সার ছবি...'

জুন মাসের মাঝামাঝি লাগাদ কলোনিটাকে পুরোপুরি সুশৃঙ্খল করে তুলে সবকিছু চালু করা সম্ভব হল। ওই মাসের দশ তারিখে কলোনির বিদ্যুৎ-সরবরাহ কেন্দ্র কাজ করতে শুরু করল, ফলে সেকেলে তেলের বাতিগুলোকে দেয়া হল গুদামঘরে পাঠিয়ে। এর অল্প কিছু পরেই আমাদের জলের পাইপগুলোয় জল আসতে শুরু করল।

ওই সময়ের মধ্যে কলোনি-বাসিন্দারা রাত কাটাতে ফের তাদের এজমালি শোবার ঘরগুলোয় ফিরে গিয়েছিল। ওদের শোবার খাটগুলো আমাদের কামারশালে ফিরেফিরতি প্রায় নতুন করেই বানানো হয়েছিল, নতুন গদি আর বালিশও তৈরি হয়ে গিয়েছিল, কেবল তখনও পর্যন্ত নতুন কম্বল কেনার সংস্থান ছিল না আমাদের। অথচ পুরনো কম্বলগুলো ব্যবহার করতেও মন উঠছিল না। এদিকে অতগুলো নতুন কম্বল কিনতে গেলে আমাদের খরচ পড়ত দশ হাজার রুব্‌লের মতো। দলপতি-পরিষদ এই প্রশ্নটা নিয়ে ফিরে-ফিরে বারে-বারে আলোচনা করছিল, কিন্তু কখনোই লাপতের এই নিচের বক্তব্যটা এড়িয়ে বা তার অতিরিক্ত কোনো উপায় মাথা খাটিয়ে বের করতে পারছিল না। লাপতের বক্তব্য ছিল এই:

'আমরা যদি এত খরচা করে কম্বল কিনতি যাই তাইলে শুয়োরের খোঁয়াড়-বাড়িটা শেষ করতি পারব না। তাইলে করা কী?.. তাইলে কম্বলগুলা শুয়োরে খাক!'

গ্রীষ্মকালে বিছানায় কম্বল থাকাটা অবশ্য নেহাতই দেখ্‌নাই ব্যাপার ছিল। তবে একটা ব্যাপারে সকলেই খুব উদ্‌গ্রীব ছিল যে প্রথম আঁটিবাঁধা ফসলের উৎসব ও খানাপিনার সময় বাইরের লোকে যেন আমাদের বিছানাপত্র বেশ কেতাদুরস্ত আছে এটা দেখতে পায়। আমাদের তখনকার নিখুঁত জীবনযাত্রায় এই কম্বলের অভাবটাই একমাত্র কাঁটা হয়ে মনে খচখচ করছিল।

আর, তারপর, হঠাৎই একদিন আমাদের ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন হলেন।

ওই সময়ে খালাবুদা প্রায়ই কলোনিতে আসতেন। ঘুরে-ঘুরে এজমালি

ঘরগ্লো আর মেরামতি কাজের দেখাশ্নো করতেন তিনি, গম্ভীর গলায় ছেলেদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন আর যথাসময়ে তাঁর প্রিয় জোয়ার-ফসল সাড়ম্বরে কেটে ঘরে তোলা হবে জেনে দার্ণ আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। কলোনির ছেলেরা সত্যিই খালাব্দার অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিল।

প্রায়ই তিনি আমাদের বলতেন, 'আমাদের দপ্তরের মেয়্যারা এই বল্যে ওজর-আপত্তি তোলতিছে যে এয়া ঠিক নয়, যেমন হ্ওয়া উচিত এয়া তেমনডা হতিছে না, হ্যানো-ত্যানো, সাত্ত-সতেরো! তা, আমি বলি কী, ওয়ারা-যে কী চায় তা কেউ আমাদেরে যদি ব্ঝায়্যে দিতি পারত! ছেল্যারা তো দেখি দিব্যি কাজকম্মো করতিছে, পেরান পণ কর্যেই খাটতিছে। খাশা ছেল্যা এয়ারা, কত বড় কথা — কম্‌সমোলের সদস্য সব! আমার মনে লয় কী, আপনেই মেয়্যাদেরে ঘাবড়ায়্যে দেছেন, তাই না?'

তব্, সবরকম চলতি সমস্যার আলোচনায় তড়িঘড়ি সাগ্রহে সাড়া দিলেও, কম্বলের কথাটা উঠলেই খালাব্দা কেমন যেন মিইয়ে যেতেন। লাপত অবশ্য ঘ্রিয়েফিরিয়ে নানা দিক থেকে কথাটা পেড়ে সিদর কার্‌পভিচের মন গলাবার চেষ্টা পেতে কস্র করত না।

যেমন, কখনও হয়তো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলত, 'হায় রে, একমাত্তর আমাদের ছাড়া দ্নিয়ায় আর সবারই গায়ে দিবার কম্বল আছে। তবে একমাত্তর আশা এই যে সিদর কার্‌পভিচ আমাদের পক্ষি আছেন। দেখবি-নে, উনিই আমাদের কম্বল যোগাড় কার দিবেন...'

শ্নে খালাব্দা ম্খখানা ঘ্রিয়ে নিতেন আর অসন্তুষ্টভাবে বিড়বিড় করে বলতেন:

'আ মোলো যা, আচ্ছা তুখোড় ছেল্যাপিলা দেখি সব! আবার কয় কী, 'সিদর কার্‌পভিচ আমাদেরে যোগাড় করি দিবেন...''

আবার কখনও হয়তো লাপত স্র ধরত একটু খাদের গলায়। বলত:

'হায়-হায়, এমন কি সিদর কার্‌পভিচও দেখি আমাদের জন্যি কিছ্ করতি লারেন! এমনই হতভাগা আমরা — গোর্কিপন্থীরা!'

তব্ খাদের স্রের এই কর্ণ বিলাপেও কোনো ফল হতে দেখা গেল না। তবে বোঝা গেল, সিদর কার্‌পভিচ একটু বিচলিত বোধ করছেন।

এরপর একদিন সন্ধেবেলা তিনি এসে হাজির হলেন বেশ-একটু খ্শি-

খুশি ভাব নিয়ে। আর এসেই ফসলভরা মাঠগুলোর উন্মুক্ত দিগন্তের, শুয়োরের খোঁয়াড়-বাড়ির আর শুয়োরগুলোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। তারপর শোবার ঘরগুলোয় ঢুকে পরিচ্ছন্নভাবে পাতা বিছানা, নতুন-ধোয়া জানলাগুলোর ঝকঝকে স্বচ্ছ কাচ, পরিষ্কার মেঝে আর ফুলিয়ে-রাখা মাথার বালিশগুলোর আরামদায়ক নরম চেহারা দেখেও খুশি হলেন খুব। তবে এটাও সত্যি যে ঝকঝকে শাদা বিছানার চাদরগুলোর কম্বলে আঢাকা নগ্ন চেহারা চক্ষুপীড়ার কারণ ঘটাচ্ছিল। কিন্তু ফের একবার কম্বলের কথা তুলে বেচারি বৃদ্ধ মানুষটিকে উদ্ব্যস্ত করতে আমার আর মন চাইল না। শোবার ঘরগুলো ছেড়ে যাবার সময় কিন্তু আপনা থেকেই খালাবুদাকে কেমন একটু মনমরা ঠেকল। নিজের মনে তিনি বলতে-বলতে চললেন:

'ধুত্তেরি... ওয়াদের সত্যই কম্বলের দরকার!.. কিন্তু কী করা, করা যায়ডা কী?'

খালাবুদা আর আমি উঠোনে বেরিয়ে আসতেই দেখি, প্রায় চার শো জন কলোনি-বাসিন্দা ছেলেমেয়েই লাইন করে দাঁড়িয়ে গেছে। এটা ছিল ওদের শরীরচর্চার সময়। আমরা কাছে এগিয়ে আসতেই কলোনির ড্রিলচর্চার নিয়ম অনুযায়ী পিয়ত্র ইভানভিচ গরোভিচ নির্দেশ জারি করলেন:

'কমরেড কলোনি-বাসিন্দা সব, অ্যাটেন্শন! স্যালুট!'

সঙ্গে সঙ্গে কয়েক শো হাত লাফিয়ে উঠল শূন্যে, তারপর আমাদের-দিকে-ফেরানো সারি-সারি গম্ভীর মুখের কপালের কাছে স্থির হয়ে দাঁড়াল। ড্রাম-বাজিয়ের দলটিও কাটা-কাটা চার সুরের একটা স্যালুটের বাজনা ছুড়ে দিল দিগন্তের দিকে। এবার গরোভিচ এগিয়ে এলেন রিপোর্ট পেশ করতে। খালাবুদার সামনে আড়ষ্টভাবে টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে জোরগলায় শুরু করলেন:

'শিশু-সহায়তা কমিটির কমরেড চেয়ারম্যান! গোর্কি কলোনির তিন শো উননব্বই জন সদস্য শরীরচর্চার জন্য এখানে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া তিনজন ডিউটিতে বহাল, ছ'জন পাহারাদার মিশ্র বাহিনীর কাজে ব্যস্ত, দু-জন অসুস্থ।'

প্রাক্তন ঘোড়সওয়ার সৈনিক পিয়ত্র ইভানভিচ এবার কায়দাদুরস্ত ভঙ্গিতে পাশে সরে দাঁড়ালেন আর সিদর কার্পভিচের চোখের সামনে এক ভারি মনমাতানো দৃশ্য উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ল। তিনি দেখতে পেলেন, ব্যায়ামের

জন্যে একটু-বেশি ফাঁক-ফাঁক হয়ে দাঁড়ানো সারি-সারি গোর্কিপন্থী ছেলেমেয়ে স্যালন্ট তুলে নিঃস্পন্দ স্থির হয়ে আছে।

আবেগভরে গোঁফে তা দিয়ে সিদর কার্পভিচ এবার স্বাভাবিকের চেয়ে দশগন্ণ বেশি গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর গাঁটওয়ালা লাঠিখানা মাটিতে ঠুকে গন্রন্গম্ভীর গলায় চেঁচিয়ে বললেন:

'শন্ভসন্ধ্যা, ছেলেরা!'

আর প্রায় চার শো'র মতো উৎফুল্ল কিশোর-গলায় একসঙ্গে ঝমঝম করে যখন তার জবাব পাওয়া গেল 'শন্ভসন্ধ্যা কমরেড' বলে, তখন উৎসাহভরে চোখ-পিটপিট করে উঠলেন খালাবন্দা।

তারপর নিজেকে আর সামলাতে না-পেরে হেসে, আড়চোখে একবার এদিক-ওদিক দেখে, কিছন্টা অপ্রস্তুতভাবে বলে উঠলেন:

'খন্দে শয়তানগন্লান... যা কায়দাকানন্ন শিখ্যেছে-না, কী বলি! আমি... আমি ওয়াদেরে দন্-এট্টা কথা বলতি চাই!'

'সহজভাবে দাঁড়াও!'

কলোনি-বাসিন্দারা তাদের ডান পা-টা ফাঁক করে নিল একটুখানি, হাত দন্'খানা পেছনে মন্ড়ল, অল্প একটুখানি গা দোলাল, তারপর সিদর কার্পভিচের দিকে তাকিয়ে হাসল।

ফের একবার সিদর কার্পভিচ হাতের লাঠিখানা মাটিতে ঠুকলেন, গোঁফ চুমরোলেন আরেকবার। তারপর বললেন:

'বক্তিমে-টক্তিমে আমার আসে না, বোঝলে ছেল্যারা। তবন্ আমি তমাদেরকে দন্ই-এট্টা কথা বলব্য। তমরা সোনার চান্দ ছেল্যা সব! আমি পষ্ট কথাই বলত্যেছি, সোনার চান্দ ছেল্যা তমরা! আর তমরা সবকিছন্ই করত্যেছ আমাদের, মজন্রদের মতন কর্যে, আর সবকিছন্ই ভারি চমৎকারভাবে উৎরায়্যে যেত্যেছে। আমি তমাদের এই পষ্ট কথা বলত্যেছি — আমার যদি এট্টা ছেল্যা থাকত, আমি চাইতাম সে তমাদের মতন হোক। আর ইস্তিরিলোকে তমাদের নিন্দ্যি কী বলে না-বলে সিদিকে কান দিয়্যো নি! আমি পষ্ট কথাই বলত্যেছি — তমরা তমাদের মতন চলতি থাক। আমি একজনা পন্রান বলশেভিক, বন্ড়া মজন্র একজনা, কারে যে কী কয় তা আমি জানি! এখেনে সবকিছন্ আমাদের মতন কর্রি করা হতিছে। কেউ যদি বলে যে না, তা হতিছে না, তয় কান দিয়্যো নি তার বকরবকরে, তমরা সোজা নিজিদির মতন কর্যে আগায়্যে

যাও! সামনের দিকি আগায়্যে যাও — বোঝলে তো? এই হল্য গে কথা! আর আমার যে-কথা সেই কাজ এডা তমাদেরে বুঝ দিতি — আমি পষ্ট কথাই বলব — আমি তমাদেরে কম্বল দিব, গায়ে দিবার কম্বল তমাদেরে দিবই!'

দৃঢ়বদ্ধ সারিগুলোর জমাট-বাঁধা স্ফটিকটা নিমেষে খানখান হয়ে ভেঙে গেল। ছেলেরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল আমাদের দিকে। লাপত তো সামনে লাফিয়ে পড়ে কুঁজো হয়েই হাত নাড়তে লাগল তারপর চিৎকার করে বলল:

'কী? কী?.. ও আচ্ছা... সিদর কার্‌পভিচের নামে হুর্‌রে! হুর্‌রে!'

গরোভিচ আর আমি কোনোক্রমে পাশ কাটিয়ে সরে দাঁড়ালুম। ওদিকে অনেকগুলো হাত মিলে খালাবুদাকে মাটি থেকে তুলে ফেলল, ওপরে ছুড়ে-ছুড়ে লোফালুফি করল কয়েকবার, তারপর ওপরে তুলেই বয়ে নিয়ে গেল ক্লাবঘরের দিকে। তাঁর গাঁটওয়ালা লাঠিগাছখানা খালি মাথা জাগিয়ে রইল ভিড়ের মাথার ওপর।

ক্লাবঘরের দরজার কাছে খালাবুদাকে মাটিতে নামিয়ে দিল ছেলেরা। আলুথালু, লালচে মুখ নিয়ে উত্তেজিত অবস্থায় তিনি কেবল আনাড়ির মতো পরনের কোটখানা টেনেটুনে ঠিক করতে লাগলেন। তারপর কোটের কোনো একটা পকেটে চাপড় দিয়ে তাজ্জব বনে গেছেন যেই অমনি দেখা গেল তারানেত্‌স তাঁর কাছে এসে বিনীতভাবে বলছে:

'এই-যে আপনের হাতঘড়ি, এই মানিব্যাগ আর এই চাবির রিঙ্‌।'

'ওগুলান পড়্যে গেছিল নাকি?' অবাক হয়ে শুধোলেন খালাবুদা।

তারানেত্‌স বলল, 'আজ্ঞে না, পড়ে যায় নাই। তবে যদি পড়ে গিয়ি হারায়্যে যায় এই ভয়ে আমি ওগুলার ভার নিছিলাম... এমন তো হতিই পারে, বোঝলেন-না...'

তারানেত্‌সের হাত থেকে নিজের দামি জিনিসগুলো নিলেন খালাবুদা। আর তারানেত্‌স দেখতে-দেখতে মিশে গেল ভিড়ে।

'উঃ, কী সকল ছেল্যাপিলা!.. মাইরি!' বললেন খালাবুদা।

তারপর হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠলেন।

'আরে, আরে, বাচ্চা শয়তানগুলান!.. কাণ্ডখান দেখ্যেছ-নি একবার!.. তা, সেই ছোঁড়া গেল কনে... সেই-যে যে 'ওগুলার ভার' নিছিল?'

পুরোপুরি বিচলিত অবস্থায় আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শহরের দিকে যাত্রা করলেন তিনি। আর এতসব কাণ্ড ঘটার পরে সে-ই এক সিদর

কার্পভিচ পরদিন যখন তাঁর জমকালো সাজানো-গোছানো অফিসঘরে নিস্পৃহ নিরুত্তাপভাবে আমাকে দর্শন দিলেন আর একবারও সরাসরি আমাকে উদ্দেশ করে কথা না-বলে টেবিলের ড্রয়ারগুলো হাঁটকে, নোটবইয়ের পাতাগুলো ফরফরিয়ে উলটেপালটে আর নাক ঝেড়ে বলে বসলেন, 'আমাদের গুদামে কোনো কম্বল নাই, সত্যই নাই', তখন আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলুম।

তবু বললুম, 'তাহলে টাকা দিন আমাদের। আমরাই কম্বল কিনে নেব।'

'না, ট্যাকাকড়িও নাই... বিলকুল নাই। তাছাড়া আপনেদের ভরতুকির খাতে এ-ট্যাকার কোনো বন্দোবস্তও নাই।'

'তাহলে গতকাল অমন কথা বললেন-যে?'

'বল্যেছি তো হয়্যেছেডা কী? ও তো... এমনে কথার কথা। কোথাও কিছু দিবার মতন বেবস্তা না-থাকল্যে আমি কী করব্য, বলেন...'

যে-পরিবেশে খালাবুদাকে চলাফেরা করতে হয় তা মনে করে এবং ডারউইনের কথা স্মরণ করে স্যালুটের ভঙ্গিতে হাতের আঙুল দিয়ে টুপি ছুঁয়ে চলে এলুম আমি।

সিদর কার্পভিচের এই ডিগবাজি খাওয়ার খবরটা কলোনির সবাই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে শুনল। এমন কি গালাতেঙ্কো যে গালাতেঙ্কো সে-ও চটে উঠল। বলল:

'আচ্ছা মজার লোক তো দেখি! তাইলে ওনারে আর কলোনিতি আসতি হচ্ছে না। অথচ উনি বল্যেছিলেন: তরমুজ পাকলি আমি ফের আসব্য-নে। খেত পাহারা দিবার কাজে সাহায্য করব্য...'

পরদিন সালিশ-সংক্রান্ত কমিশনের কাছে শিশু-সহায়তা কমিটির চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আমি একটা নালিশ ঠুকে দিলুম। ব্যাপারটার আইনগত দিক নিয়ে আমার অভিযোগ ছিল না, ছিল রাজনৈতিক দিক নিয়ে। একজন বলশেভিক কথা দিয়ে কথা রাখবেন না, এটা সহ্য করা চলে না — এ-ই ছিল আমার বক্তব্য।

মাত্র দিন-দুয়েকের মধ্যে সালিশ-সংক্রান্ত কমিশনের সামনে লাপতের আর আমার হাজির হওয়ার সমন এসে যাওয়ায় আমরা তো অবাক! কমিশনের অধিবেশনে হাজির হয়ে দেখি লাল কাপড়ে-ঢাকা জজ-সায়েবের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে খালাবুদা কী যেন প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন। আর ওঁর

পেছনদিকে 'পরিবেশ'-এর কয়েকজন প্রতিনিধি তাঁদের চশমা, থাককাটা গর্দান আর পরিচ্ছন্ন-করে-ছাঁটা গোঁফ নিয়ে এক-জায়গায় জড় হয়ে নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফিস করে কী বলাবলি করছেন। শ্রমিকদের পরার কালো কামিজ গায়ে, হালকা বাদামি চোখ আর ঝাঁপালো ভুরুওয়ালা চেয়ারম্যান-সায়েব হঠাৎ টেবিলের-ওপর-রাখা তাঁর সামনের একখানা কাগজে পাঁচ আঙুল সহ হাতখানা ঠেকিয়ে বলে উঠলেন:

'দাঁড়াও-দাঁড়াও, একমিনিট, সিদর! আচ্ছা, আমাকে খোলাখুলি বল দেখি — তুমি ওদের কম্বল দেবে বলে কথা দিয়েছিলে কিনা?'

লাল হয়ে উঠে হাত দু'খানা দুদিকে ছড়িয়ে দিলেন খালাবুদা। বললেন:

'তা... ওইরকম কিছু কথা হয়্যেছেল বটে... কিন্তু তাতি হয়্যেছেডা কী?'

'সার-বেঁধে-দাঁড়ানো কলোনি-বাসিন্দাদের সামনেই কথা দিয়েছিলে তো?'

'তা বটে... ছেল্যারা সার বান্ধ্যে দাঁড়ায়্যে ছেল বটে...'

'ওরা তোমাকে নিয়ে লোফালুফি করেছিল তো?'

'ওয়ারা নেহাত বাচ্চাকাচ্চা!.. আমারে নিয়ে লোফালুফি কর্য়েল বটে... তা, আমি কী করতি পারতাম?'

'টাকাটা দিয়ে দাও।'

'কী?'

'বলছি, টাকাটা দিয়ে দাও! যেমন সিদ্ধান্ত করেছিলে সেই অনুযায়ী কম্বল ওদের দিতে হবেই।'

জজ-সায়েবরা মুখ টিপে হাসলেন। আর খালাবুদা তাঁর 'পরিবেশ'-এর দিকে ফিরে বিড়বিড় করে কিসের যেন ভয় দেখালেন বলে মনে হল।

এরপর কয়েক দিন অপেক্ষা করলুম আমরা। তারপর জাদোরভ খালাবুদার কাছে গেল হয় কম্বল নয় টাকা আদায় করতে। কিন্তু সিদর কার্‌পভিচ জাদোরভের সঙ্গে দেখাই করলেন না। তাঁর হয়ে তাঁর সরবরাহ-ম্যানেজার জবাব দিল:

'আমি বুঝতে পারছি না তোমাদেরকে কি ভুতে পেয়েছিল? আদালতের কাঠগড়ায় আমাদের হাজির করলে-যে বড়? এই কি তোমাদের কাজকর্মের ধরন নাকি? ঠিক আছে, তোমরাও আছ আর সালিশি কমিশনের রায়ও আছে। এই তো রায়ের কাগজখান পড়ে আছে এখেনে — দেখতে পাচ্ছ?'

'তাহলে?'

'তাহলে আর কী, ফুরিয়ে গেল, ব্যস! দয়া করে আমাদের আপিসের দিক আর মাড়িও না কখনও, বুঝলে! কে জানে, আমরা হয়তো এর বিরুদ্ধে আপীলও করতে পারি। বড় জোর পরের বছরের ব্যয়বরাদ্দের মধ্যে ওই টাকার হিসাবটা ধরতে পারি। ভাবো কি তোমরা বল দেখি, আমরা হুট করে বাজারে গিয়ে চার-চার শো খান কম্বল কিনে ফেলতে পারি? অ্যাঁ? এটা একটা হেঁজিপেঁজি দপ্তর নয়, বুঝছ...'

দারুণরকম বিচলিত হয়ে শহর থেকে সেদিন ফিরল জাদোরভ। তারপর সারা সন্ধে কাটল দলপতি-পরিষদের সভায় তুমুল, উত্তেজিত, উত্তপ্ত আলোচনার মধ্যে। অবশেষে স্থির হল যে একেবারে ইউক্রেনীয় গভর্নমেন্টের প্রধান গ্রিগোরি ইভানভিচ পেত্রোভ্স্কির কাছেই এ-নিয়ে লিখিত আবেদন জানানো হবে। কিন্তু এর পরদিন আরেকটা জবর উপায় খুঁজে পাওয়া গেল। এই উপায়টা একই সঙ্গে এত সহজ আর স্বাভাবিক, এত মজাদার আর অভাবিত ছিল যে গোটা কলোনি খুশিতে নেচে-গেয়ে আর হেসে খুন হল। কারো যেন আর ধৈর্য ধরছিল না, সবাই ভাবছিল কবে-যে সেই মজাদার দিনটা আসবে যেদিন খালাবুদা স্বয়ং কলোনিতে এসে উপস্থিত হবেন আর কলোনি-বাসিন্দা ছেলেরা নিজেরাই তাঁর সঙ্গে ব্যাপারটার ফয়সলা করবে। এই উপায়টা ছিল আর কিছুই নয় শুধু দেয় টাকা না-দেয়ার দায়ে শিশু-সহায়তা কমিটির ব্যাঙ্কের চলতি আমানত আটক করার পরোয়ানা জারি করা। অতঃপর দিন দুয়েক চুপচাপ কাটল। তারপর ফের আমার ডাক পড়ল বড়কর্তার সেই একই অফিসঘরখানায় যেখানে চওড়া একখানা আরামকেদারায় বসে ছিলেন পরিষ্কার-কামানো মুখ নিয়ে সেই কমরেডটি — যিনি একবার আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে কেন আমি চল্লিশ রুবল মাস-মাইনে দিয়ে শিক্ষক নিযুক্ত করতে নারাজ। ঘরখানায় ঢুকতেই আমার নজরে পড়ল যে দু'গালে খুশির আভা ছড়িয়ে খালাবুদাকে লক্ষ্য করছেন তিনি আর খালাবুদাও রক্তছোটা (তবে খুশিভরা নয়) মুখ নিয়ে অফিসের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন।

দোরগোড়ায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়লুম আমি। আর পরিষ্কার-কামানো কমরেডটি কষ্টে হাসির বেগ সামলে আমাকে কাছে আসতে ইঙ্গিত করলেন। বললেন:

'আরে এসো, এসো! বলি, ব্যাপারখানা কী? এমন কাজ কী করে করতে পারলে, ভাই? না-না, এ চলবে না! ক্রোকের পরোয়ানা তুলে নিতেই হবে,

তা না হলে... দেখছ তো ওঁর অবস্থা! ব্যাঙ্ক ওঁকে নিজের পকেটের টাকাই খরচ করতে দিচ্ছে না! উনি তোমার নামে নালিশ করতে এসেছেন আমার কাছে। বলছেন, আমি কাজে ইস্তফা দিতে চাই — গোর্কি কলোনির ডিরেক্টর আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন!'

আমি চুপ করে রইল্‌ম। পরিষ্কার-কামানো কমরেডের আসল মতলবখানা যে কী তা বোঝার জন্যে আরেকটু অপেক্ষা করা দরকার ছিল।

কমরেডটি এবার গম্ভীরভাবে বললেন, 'না-না, ক্রোকের পরোয়ানা তুলে নিতেই হবে। এমন ক্রোকের কথা আমি জীবনে কখনও শ্‌নি নি!'

বলেই হঠাৎ আত্মসংযম ভুলে হাসির দমকে চেয়ারে ল্‌টিয়ে পড়লেন উনি। আর খালাব্‌দা দ্‌ই পকেটে দ্‌'হাত প্‌রে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

জিজ্ঞাসা করল্‌ম, 'আটকের পরোয়ানা তুলে নেবার কি নির্দেশ দিচ্ছেন আপনি?'

'ব্যাপারটা কী, ব্‌ঝলে না? আমার কোনো অধিকার নেই অমন নির্দেশ দেবার। শ্‌নছ, সিদর কার্‌পভিচ, সত্যিই আমার অমন কোনো অধিকার নেই! আমি যেমন ওকে পরোয়ানা তুলে নিতে বলতে পারি, তেমনই ও-ও বলতে পারে 'তুলব না!' তা, সিদর কার্‌পভিচ, আমি তো তোমার পকেটে চেকবই দেখতে পাচ্ছি। তাহলে তুমি ওই টাকার একখানা চেক লিখে দাও... কত যেন? দশ হাজার র্‌ব্‌ল, তাই না? তাহলেই ব্যাপারটা মিটে যায় আর-কি...'

জানলার কাছ থেকে এবার সরে এলেন খালাব্‌দা। তারপর পকেট থেকে হাতদ্‌টো বের করে লালচে-হলদে গোঁফে হাত ব্‌লোলেন একবার। অবশেষে হেসে ফেললেন।

বললেন, 'ওঃ, আচ্ছা কুত্তির বাচ্চাগ্‌লান যত্তোসব, তাই না?'

তারপর আমার কাছে এসে কাঁধে চাপড় দিয়ে বললেন:

'ভালোমান্‌ষির পো, উচিত কাজ করেছ! আমাদের সাথে এমনেই আচরণ করা লাগে! একদল আমলা বন্যে গেছি আমরা! আমাদের পক্ষি উচিত শাস্তি হয়েছে!'

শ্‌নে পরিষ্কার-কামানো কমরেডটি ফের একবার হো-হো করে হেসে উঠলেন। এমন কি হাসির দমকে গড়িয়ে-পড়া চোখের জলও র্‌মাল বের

করে মুছতে হল তাঁকে। খালাবুদাও হাসতে-হাসতে পকেট থেকে চেকবই বের করে একখানা চেক লিখে দিলেন।

৫ জুলাই তারিখে প্রথম আঁটিবাঁধার ভোজ-উৎসব উদ্‌যাপন করা হল।

এই উৎসবটা ছিল আমাদের সবচেয়ে পুরনো পরবগুলোর একটা — আমাদের ক্যালেন্ডারের লাল মার্কামারা একটা ছুটির তারিখ। কীভাবে এই উৎসব উদ্‌যাপন করা হবে আমাদের মধ্যে তারও একটা বহুদিনের ঐতিহ্য দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ওইবার অবশ্য সবচেয়ে বড়-যে মতলবটা আমাদের মাথায় ঘুরছিল তা হল, সবরকম 'ফৌজী' কার্যকলাপের পালা চুকে যাওয়ায় অতঃপর বাইরের লোকের কাছে কলোনিটাকে জাহির করে দেখানো। একেবারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব ক'জন কলোনি-বাসিন্দাকে এই ইচ্ছেটা পেয়ে বসায় উৎসবের দিনের প্রস্তুতির জন্যে বিশেষ কোনো নির্দেশ দেয়ার দরকারই করছিল না। প্রস্তুতির কাজ চলেছিল তীব্র উৎসাহ আর স্থির সংকল্পের বন্যার টানে — সবকিছুই একেবারে প্রথম শ্রেণীর হতে হবে, এই ছিল প্রতিজ্ঞা। এই সময়ে কলোনিতে কোথাও কোনো রাশ-আল্‌গা কাজের নমুনা ছিল কিনা সন্দেহ — বিছানাগুলো ঢাকা পড়েছিল নতুন-কেনা লাল কম্বলে, পুকুরটা স্বচ্ছ জলে আয়নার মতো ঝক্‌ঝক করছিল আর টিলার ঢালুতে ভবিষ্যৎ ফলবাগানের জন্যে কেটে তৈরি করা হয়েছিল সাত-সাতটা নতুন থাক। প্রত্যেকটি কাজের দিকে সজাগ নজর রাখা হচ্ছিল। সিলান্তির ওপর ভার ছিল শুয়োর জবাই করার, বুত্‌সাইয়ের অধীনে মিশ্র বাহিনী মালা গেঁথে আর স্লোগান লিখে জায়গায়-জায়গায় তা ঝোলাচ্ছিল আর কোস্তিয়া ভেত্‌কোভ্‌স্কি সদর দেউড়ির ধনুকাকার খিলানের শাদা জমিটাতে সাবধানে রঙ দিয়ে লিখেছিল:

'দুনিয়ার দেশে-দেশে উড়াও শ্রমের লাল নিশান'

আর খিলানের ভেতরদিকে সংক্ষেপে শুধু লিখে দিয়েছিল:

'ঠিক হ্যয়!'

মাসের দুই তারিখে জেভেলির নেতৃত্বে আমাদের ত্রয়োদশ মিশ্র বাহিনী সবচেয়ে ভালো পোশাকে সেজে নিমন্ত্রণপত্র বিলি করতে শহরে যাত্রা করল।

উৎসবের দিন যে-আধ হেক্টর জমির জোয়ার-ফসল কাটার কথা সেই জমিটাকে সারি-সারি লাল নিশান পুঁতে ঘিরে দেয়া হল আর জমিটাতে

যাওয়ার রাস্তার দু'ধার সাজানো হল নিশান আর মালা দিয়ে। দেউড়ির মধ্যে রাখা হল একখানা ছোট টেবিল, অভ্যর্থনা সমিতির ব্যবহারের জন্যে। ছ'শো জনের খাওয়ার উপযোগী বেশ কয়েকখানা ভোজের টেবিল পাতা হল পুকুরের ওপরকার টিলার ঝুলন্ত খাড়াই পাড়ে। আর আমাদের অনুরাগী বাতাস শাদা টেব্‌লক্লথের কোণ, ফুলদানির ফুল আর খাবারঘরের ভারপ্রাপ্ত বাহিনীর ছেলেদের শাদা আলখাল্লার কানাগুলো ওড়াতে আর দোলাতে লাগল মনোরম ভঙ্গিতে।

লাল শর্ট্‌স আর শাদা শার্ট পরনে, চওড়া কানাওয়ালা ককেশীয় টুপি মাথায় সিনেন্‌কি আর জাইচেঙ্কো 'মলদিয়েত্‌স' আর 'মেরি'র পিঠে চেপে সদর দেউড়ির বাইরে নিচের রাস্তায় পাহারায় বহাল রইল। দু-জনেরই কাঁধ ঢেকে পিঠের ওপর দিয়ে ঝোলানো ছিল লাল তারার উল্‌কি-দেয়া শাদা হাতাবিহীন কোটের মতো কেপ আর কেপের ধারগুলোয় লাগানো ছিল সত্যিকার খরগোসের লোম। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই ভানিয়া জাইচেঙ্কো আমাদের বিউগ্‌লের মোট উনিশটা সংকেতের সব ক'টাই শিখে ফেলেছিল। বিউগ্‌ল-বাদক বাহিনীর দলপতি গোর্‌কভ্‌স্কি বেশ বুঝেসুঝেই রায় দিয়েছিল যে উৎসবের সময় ভানিয়াকে বিউগ্‌ল-বাদক হিসেবে কাজে বহাল করার মর্যাদা দেয়া চলে, কাজটার পক্ষে ও যথেষ্ট উপযুক্ত। সিনেন্‌কি আর জাইচেঙ্কো তাদের বিউগ্‌লদুটো সাটিনের ফিতেয় বেঁধে কাঁধ থেকে আড়াআড়িভাবে ঝুলিয়ে নিয়েছিল।

সকাল দশটার সময় আমাদের প্রথমদল অতিথি পায়ে হেঁটে এসে উপস্থিত হল রিজোভ স্টেশন থেকে। এরা ছিল খার্‌কভ কম্‌সমোল সংগঠনের প্রতিনিধি। ওরা এসে পেঁছুতেই আমাদের দুই খুদে অশ্বারোহী তাদের বিউগ্‌লদুটো মুখের কাছে তুলে ধরল, ফলে সাটিনের ফিতেদুটো কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলে পড়ল নিচের দিকে। তারপর জিনের রেকাবের ওপর ভালো করে পায়ের ভর দিয়ে তিনবার তারা অভ্যর্থনাসূচক বাজনা বাজিয়ে দিল।

এইভাবে উৎসবের দিন গেল শুরু হয়ে। অতিথিরা দেউড়িতে পেঁছুতে তাদের স্বাগত জানাল হাতে নীল পটিবাঁধা অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যরা। অতিথিদের বুকে তারা পিন দিয়ে লাগিয়ে দিল লাল রিবনে-বাঁধা জোয়ারের তিনটে করে শিষ। সেইসঙ্গে প্রত্যেকের হাতে ধরিয়ে দিল একখানা করে টিকিট যাতে সেই বিশেষ অতিথিটিকে অত্যন্ত সৌজন্যসহকারে আমন্ত্রণ

জানানো হচ্ছিল বিশেষ নম্বরের একটি বাহিনীর টেবিলে ভোজে যোগ দিতে আর বাহিনীর দলপতিটির স্বাক্ষর থাকছিল আমন্ত্রণপত্রের নিচে।

এই প্রথমদলের অতিথিদের যতক্ষণে কলোনি ঘুরিয়ে দেখানো হচ্ছিল তার মধ্যে নিচের রাস্তা থেকে আমাদের চমৎকার ঘোড়সওয়ার-দুটি ফের একবার অভ্যর্থনাসূচক বিউগ্‌ল-সংকেত বাজিয়ে দিল।

উঠোন আর কলোনির এলাকা ক্রমে-ক্রমে অতিথি-অভ্যাগতয় ভরে উঠতে লাগল। খার্‌কভের কারখানাগুলির প্রতিনিধিরা, আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী কমিটি আর জনশিক্ষা-দপ্তরের কর্মীরা, আশপাশের গ্রাম-সোভিয়েতের লোকজন আর খবরের কাগজের সাংবাদিকরা আসতে লাগলেন পায়ে-হেঁটে, ওদিকে মোটরে করে সোজা আমাদের দেউড়িতে এসে নামলেন দ্‌জুরিন্‌স্কায়া, ইউরিয়েভ, খ্‌লিয়ামের, ব্রেগেল, কমরেড জোইয়া, পার্টি-সংগঠনগুলির সদস্যরা এবং আমাদের পরিষ্কার-কামানো-মুখ কমরেডটি। খালাবুদাও এলেন তাঁর নিজস্ব ফোর্ডগাড়িতে চেপে। বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে দেউড়িতে সমবেত গোটা দলপতি-পরিষদ অভ্যর্থনা জানাল খালাবুদাকে, তারপর গাড়ি থেকে তাঁকে প্রায় হিঁচড়ে বের করে শূন্যে লোফালুফি জুড়ে দিল। পরিষ্কার-কামানো-মুখ কমরেডটি গাড়ির উলটোদিকে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে দেখছিলেন ছেলেদের কাণ্ডকারখানা। খালাবুদাকে যখন তাঁর নিজের পায়ে নামিয়ে দেয়া হল পরিষ্কার-কামানো-মুখ তাঁকে শুধোলেন:

'এবার ওরা তোমার কাছ থেকে কী আদায় করল?'

কথাটা খালাবুদার পছন্দ হল না। বললেন:

'ভাবেন কী, ওয়ারা কিছু আদায় না-করিই মাথায় তোল্‌ত্যেছে আমারে? সব্বদাই কত জিনিস আদায় করত্যেছে তার ঠিক কী!'

'বল কী? এবার কী আদায় করল?'

'এবারি আদায় কর্যেছে ট্রাক্টর... আমি অদেরে এট্টা ট্রাক্টর দিত্যেছি — ফোর্ডসন ট্রাক্টর... কিন্তু যতই লোফালুফি কর্‌-না ক্যানে, আমি আর কিচ্ছুটি দিত্যেছি না!'

ফের একবার খালাবুদাকে নিয়ে শূন্যে লোফালুফি করল ছেলেরা, তারপর পাকড়ে নিয়ে কোথায় কোন কাজে যেন চলে গেল।

দেখতে-দেখতে কলোনির উঠোন মফস্বল শহরের সদর রাস্তার মতো ভিড়ে ভরে উঠল। কোটের বাট্‌ন্‌হোলে ফুল গুঁজে কলোনি-বাসিন্দা ছেলেরা

একেক সঙ্গে কয়েকজন মিলে নতুন অভ্যাগতদের সঙ্গে নিয়ে এটা-ওটা দেখিয়ে বেড়াচ্ছিল আর এদিক-ওদিক ঘুরছিল। আর সারাক্ষণই গোলাপি ঠোঁট বিস্ফারিত করে হাসছিল অতিথিদের এটা-সেটা প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে, আবার কখনও লাজুক কখনও-বা উজ্জ্বল ঝলমলে চোখে তাকাচ্ছিল তাঁদের দিকে।

দুপুর ঠিক বারোটার সময় সিনেন্‌কি আর জাইচেঙ্কো ঘোড়ায় চড়ে উঠে এল আমাদের উঠোনে। তারপর জিনের ওপর থেকে নুয়ে পড়ে ভারপ্রাপ্ত দলপতি নাতাশা পেত্রিয়েঙ্কোর সঙ্গে ফিস্‌ফিস করে কী নিয়ে যেন একটা আলোচনা চালাল। সিনেন্‌কি এরপর ঘোড়ায়-চড়া অবস্থাতেই হাসিতে-আলাপে মুখর অতিথি আর কলোনি-বাসিন্দাদের ছোট-ছোট দলের ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল, তারপর ঘোড়া ছোটাল খামারের দিকে। এর মিনিটখানেক পরেই খামারখোলা থেকে কলোনির সাধারণ সভা ডাকার প্রাণবন্ত বিউগ্‌ল-সংকেত বেজে উঠল। এই বিশেষ সংকেতটি সর্বদাই অন্য সব সংকেতের চেয়ে একপরদা চড়া সুরে বাজানো হোত। যাই হোক, সঙ্গে সঙ্গে সংকেতটির প্রতিধ্বনি তুলল ভানিয়া জাইচেঙ্কো। ফলে কলোনি-বাসিন্দা ছেলেমেয়েরা অতিথিদের ছেড়ে ছুট লাগাল কেন্দ্রীয় চত্বরটার দিকে আর বিউগ্‌ল-সংকেতের সুরের রেশ রিজোভ স্টেশনে পেঁাছনোর আগেই এক-সারিতে লাইন করে তারা দাঁড়িয়ে গেল। আর দেখা গেল মিতিয়া নিসিনভ পেছন দিকে পায়ের গোড়ালি উঁচু করে ছুড়তে-ছুড়তে আর সবুজ একখানা নিশান হাতে নিয়ে উপস্থিত সকলের মনোহরণ করে ছুটে চলেছে লাইনটার বাঁয়ের দিকে। দেখতে-দেখতে আমিও আমার প্রতিটি স্নায়ুতে জয়ের উল্লাস অনুভব করতে শুরু করলুম। নীলে-শাদায় মেশানো রিবনের একটা গুটি খুলে যাওয়ার মতো আনন্দোৎফুল্ল তারুণ্যে-চঞ্চল ছেলেমেয়েদের এই লাইনটা আমাদের বাগানের ফুলগাছের সারির ঠিক পেছনেই এভাবে আচমকা গজিয়ে ওঠায় সমবেত দর্শকদের চিরাভ্যস্ত চোখ, রুচি আর অভ্যাসে এমন একটা ধাক্কা লাগল যে তাঁদেরও কল্পনা যেন পাখা মেলে দিল, ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠলেন তাঁরা। বাচ্চাদের কার্যকলাপের প্রতি প্রশ্রয়ের যে-ভাবটা দেখানো বড়োরা নিজেদের সহৃদয়তার লক্ষণ বলে বিবেচনা করে থাকে এতক্ষণ পর্যন্ত দর্শকদের মুখগুলো সেই ভঙ্গিতে মিষ্টি-মিষ্টি হাসিতে ভরে থাকছিল। এবার হঠাৎ সেই মুখগুলোকে কেমন চিন্তাগ্রস্ত আর মনোযোগী হয়ে উঠতে

দেখা গেল। আমার ঠিক পেছনটাতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ইউরিয়েভ। তিনি হঠাৎ গলা তুলে বলে উঠলেন:

'বাঃ-বাঃ, আন্তন সেমিওনভিচ! এ-ই তো চাই!..'

কলোনি-বাসিন্দা ছেলেমেয়েরা সচেতনভাবে তাদের লাইনটা নিখুঁত সোজা করে তুলল আর ক্ষণে-ক্ষণে চোরাচোখে তাকাতে লাগল আমার দিকে। সমস্ত ব্যাপারে সবকিছু নিখুঁতভাবে তৈরি এ-বিষয়ে নিশ্চিত বোধ করায় আমিও পরবর্তী নির্দেশ জারি করতে দেরি করলুম না:

'পতাকার সম্মানে! অ্যাটেন্ — শন!'

সঙ্গে সঙ্গে মঠের দেয়ালটার ওধার থেকে মোড় ঘুরে স্যালুটের বাজনার তালে-তালে কড়াকড়ি নিখুঁতভাবে পা মিলিয়ে পতাকা-বাহিনীকে চালনা করে নিয়ে এল নাতাশা। তারপর ছেলেমেয়েদের সারির ডানদিকে গিয়ে

কলোনি-বাসিন্দাদের উদ্দেশ করে আমি দু-একটা কথা বললুম। উৎসব উপলক্ষে ওদের অভিনন্দন জানালুম, অভিনন্দিত করলুম সাফল্য অর্জনের জন্যে। তারপর বললুম:

'এখন আমরা আমাদের সেরা কর্মীদলকে, বুরুনের নেতৃত্বে প্রথম আঁটিবাঁধার ভারপ্রাপ্ত অষ্টম মিশ্র বাহিনীকে অভ্যর্থনা জানাব।'

ফের একবার বিউগ্‌লগুলো অভ্যর্থনার বাজনা বাজিয়ে দিল। আর দূরে, খামারখোলার হাট-করে-খোলা গেট দিয়ে ঢুকল অষ্টম মিশ্র বাহিনী। আমি তখন মনে-মনে ভাবছি — ওহ্! প্রিয় অতিথিরা, আমি স — ব বুঝতে পারছি। আপনাদের আবেগ-অনুভূতি, আপনাদের স্থির মুগ্ধদৃষ্টি, এ-সবের তাৎপর্য বেশ বুঝতে পারছি আমি। কেননা আমি নিজেও — এবং এটা যে প্রথমবার তা-ও নয় — আমি নিজেও অষ্টম মিশ্র বাহিনীর দীর্ঘদেহী জয়োদ্ধত ভঙ্গির সৌন্দর্যে বিস্ময়ে প্রশংসায় হতচকিত! আর এর সবকিছু দেখা আর অনুভব করার ব্যাপারে আমার সুযোগসুবিধেও-যে বেশি ঘটেছে সেটাও এর কারণ হতে পারে।

বাহিনীটাকে নেতৃত্ব দিচ্ছিল বুরুন। পোড়-খাওয়া, অভিজ্ঞ, পুরনো কলোনি-বাসিন্দা বুরুন। ওইবারই-যে সে প্রথম কলোনির শ্রম-বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল তা-ও নয়। একই সঙ্গে কাস্তে আর আঁকশির মিশ্রণ এমন ঝকঝকে ধারালো একখানা ফসলকাটার হাতিয়ার মেঠো ডেইজিফুলে সাজিয়ে নিয়ে

হার্‌কিউলিস-সদৃশ কাঁধের অনেকখানি ওপরে তুলে ধরে হাঁটছিল বুরুন। ওর সৌন্দর্যে কেমন একটা রাজকীয় মহিমা প্রকাশ পাচ্ছিল সেদিন, আর সে-সৌন্দর্য পুরোপুরি উপভোগ করতে সমর্থ ছিলুম একমাত্র আমিই। কারণ একা আমিই জানতুম যে সাজানো নাটকের বিশিষ্ট কুশীলবমাত্র ছিল না বুরুন, বলিষ্ঠ সুপুরুষ একজন কলোনি-বাসিন্দামাত্রও ছিল না সে, বরং প্রথমত এবং প্রধানত সে ছিল একজন কর্মঠ দলপতি যে নাকি ভালোরকমই জানত কাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে সে ও কী উদ্দেশ্যে অন্যদের পরিচালিত করছে। আসন্ন করণীয় সম্পর্কে ওর চিন্তার আভাস টের পাচ্ছিলুম বুরুনের কঠোর শান্ত মুখাবয়বে: ওইদিন মাত্র আধঘণ্টা সময়ের মধ্যে আধ-হেক্টর জমির জোয়ার-ফসল কেটে আঁটিবাঁধার কাজ শেষ করার কথা ওর। কিন্তু অতিথিরা ওর মুখভাবের এই সূক্ষ্ম রকমফের লক্ষ্য করছিলেন না। এছাড়া আরও একটা ব্যাপার ওঁরা আদপে খেয়াল করেন নি। সেটা হল এই যে ওইদিনকার ফসলকাটাই দলের নেতা আসলে ছিল একজন মেডিক্যাল ছাত্র আর আমাদের কাজের নতুন সোভিয়েত পদ্ধতি বিভিন্ন পেশার এই সমন্বয়সাধনের মধ্যে দিয়েই সেদিন প্রকট হয়ে উঠেছিল। সত্যি, আরও অনেককিছুই সমাগত অতিথিরা দেখতে পান নি, আরও অনেককিছুই তাঁদের পক্ষে দেখা সম্ভব ছিল না সেদিন। এর কারণ হয়তো এই হতে পারে যে তাঁরা শুধু বুরুনকেই লক্ষ্য করেন নি। বুরুনের পেছনে-পেছনে একেক সারিতে চারজন করে কুচকাওয়াজ করে আসছিল ষোলজন ফসলকাটিয়ে — তাদের পরনে ছিল একই রকম শাদা শার্ট, একই রকম ফুল-দিয়ে-সাজানো কাস্তে কাঁধের ওপর তুলে আসছিল তারা। ভাবুন একবার, মাত্র ষোলজন ফসলকাটিয়ে! ওদের সংখ্যা গুনে ফেলা ছিল কতই-না সহজ! তবু ওই ষোলজনের মধ্যে ছিল কী-সব মহিমাদীপ্ত ছেলেপিলে: কারাবানভ, জাদোরভ, বেলুখিন, শনাইদের, গেওর্গিয়েভ্‌স্কি! ওই ষোলজনের মধ্যে একমাত্র শেষের সারিতে ছিল চারজন নতুন গোর্কিপন্থী: যথা, ভস্কবোইনিকভ, সুভাত্‌কো, পিয়েরেত্‌স আর কোরত্‌কভ।

ফসলকাটিয়েদের পিছু-পিছু আসছিল ষোলটি মেয়ে। তাদের প্রত্যেকের মাথায় ছিল ফুলের মুকুট আর প্রত্যেকের হৃদয়ে আমাদের মনোরম সোভিয়েত দিনগুলো দিয়ে গাঁথা একটি করে মালা। এরা ছিল ফসলের আঁটিবাঁধিয়ে।

অষ্টম মিশ্র বাহিনী যখন আমাদের কাছাকাছি এসে পড়েছে এমন সময়

দ্‌'জোড়া ঘোড়ায়-টানা দ্‌'খানা ফসলকাটাই-যন্ত্র ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে গেট দিয়ে ঢুকল। ঘোড়া চারটে এগিয়ে আসছিল বেশ চনমনে দ্‌লকি চালে। ঘোড়াগ্‌লোর কেশর, তাদের লাগাম, আর যন্ত্রদ্‌টোর ব্লেডগ্‌লো সাজানো হয়েছিল ফুল দিয়ে। প্রতিটা জোড়ার ডানদিকের ঘোড়ার পিঠে জিনের ওপর বসে ছিল একজন করে সওয়ারি। স্বয়ং ব্রাত্‌চেঙ্কো প্রথম যন্ত্রখানায় চালক হিসেবে চেপেছিল, গোর্‌কভ্‌স্কি চেপেছিল দ্বিতীয় যন্ত্রখানার চালকের আসনে। ফসলকাটাই-যন্ত্রদ্‌টোর পিছ্‌-পিছ্‌ এল ঘোড়ায়-টানা কয়েকখানা আঁকশি-যন্ত্র আর তাদেরও পরে এল জলের পিপেবওয়া গাড়ি। জলের পিপের এই গাড়িখানা চালিয়ে নিয়ে এল গালাতেঙ্কো, কলোনির সবচেয়ে অলস ছেলেটি। দলপতি-পরিষদ কিন্তু এতটুকু সঙ্কোচ না-করে গালাতেঙ্কোকে অষ্টম মিশ্র বাহিনীতে জায়গা করে দিয়েছিল। আর দেখা গেল পরিষদের এই সদ্‌দেশ্য বিফল হয় নি, এতটুকু আলস্য না-দেখিয়ে প্রাণপাত পরিশ্রম করে গালাতেঙ্কো জলের পিপেটা স্‌ন্দর করে ফুল দিয়ে সাজিয়েছে। ফলে পিপেটাকে আর পিপে বলেই মনে হচ্ছিল না, ঠেকছিল যেন স্‌গন্ধি ফুলের বাগান। এমন কি পিপেবওয়া গাড়ির চাকার অরগ্‌লো পর্যন্ত ফুলে ম্‌ড়ে দিয়েছিল গালাতেঙ্কো! গালাতেঙ্কোরও পেছনে একেবারে শেষের সারিতে ছিল রেডক্রসের 'অ্যাম্ব্‌ল্যান্স'-গাড়ি, আর সেই গাড়িতে স্মেনাকে সঙ্গে নিয়ে বসে ছিলেন ব্‌দ্ধা ফেল্‌ড্‌শার ইয়েলেনা মিখাইলভ্‌না। কাজের সময় বলা তো যায় না — সবরকম দ্‌র্ঘটনা-দ্‌র্বিপাকের জন্যে তৈরি থাকা দরকার!

কলোনি-বাসিন্দাদের সারির ম্‌খোম্‌খি এসে দাঁড়িয়ে গেল অষ্টম মিশ্র বাহিনী। তখন লাইন ছেড়ে এগিয়ে এসে লাপত মিশ্র বাহিনীকে উদ্দেশ করে বললে:

'অষ্টম মিশ্র বাহিনী, তোমরা নিজিদেয় ভালো কম্‌সমোল-সদস্য, ভালো কলোনি-বাসিন্দা আর সৎ কমরেড হিসাবে পরিচয় দেছ বলে কলোনি তোমাদেরকে প্রথম ফসলকাটার অধিকার দেছে। এটা একটা মস্ত বড় প্‌রস্কার জানবে। তা, কাজটা কিন্তু ঠিকমতন করা চাই। ফের একবার আমাদের বাচ্চা কলোনি-বাসিন্দাদের কাছে প্রমাণ দেয়া চাই — কেমনভাবে কাজ করতি হয়, বাঁচতি হয় কী প্রকারে। দলপতি-পরিষদ তোমাদেরকে অভিনন্দন জানাতেছে আর তোমাদের দলপতি কমরেড ব্‌র্‌নরে অন্‌রোধ জানাতেছে আমাদের সকলরে পরিচালনা করার জন্যি।'

ওইদিনকার অন্য সব বক্তৃতার মতো এই বক্তৃতাটাও যে কার রচনা তা কেউ জানত না। এই ধরনের বক্তৃতা বছরের-পর-বছর উৎসবের দিনগুলিতে দিয়ে আসা হচ্ছিল কলোনিতে, বক্তৃতার ভাষাও ছিল হুবহু এক। কবে যেন একবার দলপতি-পরিষদের সভায় এগুলো বানানো হয়েছিল। আর ঠিক এই কারণেই বক্তৃতাগুলো শুনত সবাই বিশেষরকম সাবেগ আগ্রহ নিয়ে। সকল কলোনি-বাসিন্দাই উৎসুক হয়ে দম বন্ধ করে থাকত যখন বুরুন কাছে এগিয়ে এসে আমার করমর্দন করত, তারপর ওর বলার পালা এলে পুনরাবৃত্তি করত নিচের এই প্রয়োজনীয় ও প্রথাসিদ্ধ কথাগুলির:

'কমরেড ডিরেক্টার, অষ্টম মিশ্র বাহিনীকে কাজের ব্যাপারে পরিচালনা করতে আর আমাদের সাহায্য করার জন্য বাকি এইসব ছেলেকে সাথে করে নিয়ে যেতে আমায় অনুমতি দিন।'

আর আমি এ-কথার যথাযোগ্য উত্তর দিতুম এইভাবে:

'কমরেড বুরুন, অষ্টম মিশ্র বাহিনীকে কাজে পরিচালনা করে নিয়ে যাও আর তোমাদের সাহায্য করার জন্যে বাকি ছেলেদেরও সঙ্গে নাও।'

আর সেই মুহূর্তে বুরুন গোটা কলোনিরই দলপতি বনে যেত। সারিতে কারা কাদের পরে যাবে, কারা কোথায় দাঁড়াবে, এইসব অদলবদল সম্পর্কে গোটাকয় নির্দেশ দেবার পর মিনিটখানেকের মধ্যে গোটা কলোনিকে কুচকাওয়াজ করিয়ে মাঠের দিকে নিয়ে যেত বুরুন।

এবারও ড্রাম-বাজিয়ের দল আর পতাকা-বাহিকার পিছু-পিছু ফসলকাটিয়ের দল আর ফসলকাটাই-যন্ত্রগুলো এগিয়ে চলল সামনে আর তাদের পেছনে চলল গোটা কলোনি। সবার পেছনে আসতে লাগলেন অভ্যাগতরা। তাঁরাও প্রচলিত শৃঙ্খলা মেনে নিয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে বাজনার তালে-তালে পা মিলিয়ে এগোতে লাগলেন। খালাবুদা হাঁটছিলেন আমার পাশে-পাশে। শুনলুম পরিষ্কার-কামানো কমরেডটিকে তিনি বলছেন:

'ধুত্তোর ছাই!.. যত নষ্টের গোড়া হেই লক্ষ্মীছাড়া কম্বলগুলান!.. নইলি আমি এতক্ষণে ঘাড়ের উপর কাস্তেখান তুলি... ছোঁড়াদের সাথিই হাঁটা জোড়তাম!'

শুনে সিলান্তির দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করে ঘাড় নাড়লুম। আর সঙ্গে সঙ্গে সিলান্তি ছুটল খামারখোলার দিকে। পূর্বনির্ধারিত আধ-হেক্টর জোয়ারের জমিতে পেঁছুলে পর বুরুন গোটা মিছিলটাকে থামিয়ে দিল। তারপর

আমাদের প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে হঠাৎ কলোনি-বাসিন্দাদের উদ্দেশ করে বললে:

'একটা প্রস্তাব এসেছে যে সিদর কার্পভিচ খালাবুদাকে অষ্টম মিশ্র বাহিনীর মধ্যে জাদোরভের ব্রিগেডে পাঁচ নম্বর ফসলকাটিয়ে হিসাবে নিযুক্ত করা হোক। এতে কারও আপত্তি আছে?'

কলোনি-বাসিন্দারা হেসে উঠে সম্মতিসূচক হাততালি দিল। অতঃপর বুরুন সিলান্তির হাত থেকে ফুল-দিয়ে-সাজানো কাস্তেখানা নিয়ে সেখানা তুলে দিল খালাবুদার হাতে। সিদর কার্পভিচও গা থেকে এক-ঝটকায় জ্যাকেটটা খুলে খেতের পাশের সরু ঘাসের জমিটায় ছুড়ে ফেলে দিলেন, তারপর হাতের কাস্তেখানা নাচিয়ে বললেন:

'ধন্যবাদ!'

জাদোরভের ব্রিগেডে পঞ্চম ফসলকাটিয়ের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন খালাবুদা। জাদোরভ তাঁর দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলল:

'দেখবেন, ফসল কাটতে গিয়ে মাটিতে কাস্তে বেধে যায় না যেন। তাহলে কিন্তু আমাদের ব্রিগেডের বদনাম হবে!'

'মোট্টেও না!' খালাবুদা জবাব দিলেন। 'বরং আমিই তোমাদেরে দেখাব্য-নে কেমন কর্যে ফসল কাটতি হয়!..'

খেতের একধারে কলোনি-বাসিন্দাদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে দেয়া হল। ফসল কেটে প্রথম আঁটিটা বাঁধা হবে যেখানে খেতের সেই জায়গাটায় জোয়ার-ফসলের মাথা ছাড়িয়ে আমাদের পতাকা উড়তে থাকল পত্‌পত করে। বুরুন আর নাতাশা এবার এগিয়ে গেল পতাকার কাছে, ওদিকে আমাদের সবচেয়ে বাচ্চা কলোনি-বাসিন্দা জোরেন প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল।

'অ্যাটেন্ — শন!'

ফসলকাটা শুরু করল বুরুন। কাস্তের কয়েক ঘায়ে লম্বা ডাঁটাওয়ালা বেশ বড় একগোছা জোয়ার কেটে নাতাশার পায়ের কাছে রাখল সে। নাতাশা প্রথম-কাটা কয়েকটা গোছা জোয়ারের শিষ এক-জায়গায় জড় করল, তারপর দ্রুত হাত চালিয়ে একটা আঁটি বেঁধে ফেলল। অপর দুটি মেয়ে রঙিন একটা কাগজের মালা ঝুলিয়ে দিল আঁটিটার ওপর। পরিশ্রমে আর সাফল্যের উত্তেজনায় লাল-হয়ে-ওঠা নাতাশা এবার জোয়ারের আঁটিটা তুলে দিল বুরুনের হাতে। আঁটিটা কাঁধের ওপর তুলে বুরুন তখন গম্ভীরমুখ, বোঁচা-নাকী জোরেনকে

কাছে ডাকল আর জোরেন মাথাটা পেছনে হেলিয়ে ব্রুনের প্রতিটি কথা যেন গিলতে লাগল। ব্রুন বলছিল:

'আমার হাতের এই ফসলের আঁটি তোরে দিলাম। তুই এমনভাবে কাজকর্ম আর পড়াশোনা কর্ যাতে বড় হয়ে তুই-ও কম্‌সমোল-সদস্য হতে পারিস আর আমি যে-সম্মান পেয়েছি তুই-ও যাতে প্রথম ফসলকাটার সেই সম্মান পেতে পারিস।'

এবার জোরেনের পালা। উইলোকুঞ্জে ভরতপাখির গানের সুরে রিন্‌রিনে গলায় ব্রুনের কথার জবাবে সে বলে উঠল:

'ধন্যবাদ, গ্রিশা! আমি পড়াশোনাও করব্য, কাজও করব্য। আর যখন বড় হয়ি ওঠব্য আর কম্‌সমোল-সদস্য হব্য, তখন আমি এই সম্মান — প্রেথম ফসলকাটার এই সম্মানডা — পাতি চেস্টা করব্য আর সবথেকে বাচ্চা কলোনি-বাসিন্দার হাতে ফসলের আঁটি তুল্যে দেব।'

আঁটিবাঁধা জোয়ারের শিষ হাতে নিল জোরেন, মস্ত ঝাঁপালো আঁটির নিচে যেন চাপা পড়ে গেল প্রায়। কিন্তু ইতিমধ্যে অন্য বাচ্চা ছেলেরা ফুল-দিয়ে-সাজানো তক্তাপাটাখানা নিয়ে ওর কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। জোরেন তাড়াতাড়ি তার এই অনন্য উপহারটা সেই ফুলের বিছানায় শুইয়ে দিল।

স্যালুটের বাজনার বজ্রধ্বনির তালে-তালে আমাদের পতাকা আর প্রথম ফসলের এই আঁটিটাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হল কলোনি-বাসিন্দাদের সারির একেবারে ডানদিকে।

অতঃপর ব্রুন নির্দেশ জারি করল:

'ফসলকাটিয়ে আর বাঁধিয়েরা — নিজের-নিজের জায়গায় দাঁড়াও!'

একদৌড়ে কলোনি-বাসিন্দারা আগে-থেকে-নির্দিষ্ট তাদের নিজ-নিজ জায়গায় পৌঁছে গেল। এইভাবে খেতটার চারপাশ ঘিরে দাঁড়াল তারা। এবার ঘোড়ার জিনের রেকাবে পায়ের ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে কাজ শুরু করার বিউগ্‌ল-সংকেত বাজিয়ে দিল সিনেন্‌কি। সংকেত পাওয়ামাত্র সতেরো জন ফসলকাটিয়ে খেতের চারধারে হাঁটতে-হাঁটতে টানা চওড়ামতো অনেকখানি জায়গার ফসল কেটে ফেলল। এরপর ফসলকাটা শুরু করার কথা কাটাই-যন্ত্রদুটোর।

হাতঘড়ির দিকে তাকালুম। ফসলকাটা শুরু করার পর পাঁচ মিনিট সময় পার হয়েছিল। ফসলকাটিয়েরা ততক্ষণে তাদের হাতের কাস্তেগুলো উঁচু

করে তুলে ধরেছে, শেষ আঁটিগুলো বাঁধার কাজ শেষ করে ফসলবাঁধিয়েরা সেগুলো সরিয়ে রাখছে একধারে।

এর পরই গোটা ব্যাপারটার মধ্যে সবচেয়ে সংকটজনক যে-মুহূর্ত সেটি এসে উপস্থিত হল। আর এর জন্যে প্রস্তুত হয়ে ছিল আন্তন আর ভিত্‌কা আর ভূরিভোজনে তৃপ্ত, দীর্ঘবিশ্রামে বলীয়ান আমাদের চারটে ঘোড়া।

'হেট্-হেট্, এগিয়ে চল্!'

ফসলকাটাই-যন্ত্রদুটোকে কাটা-ফসলের ফাঁকা জমিটাতে নিয়ে আসা হল। আর এর দু-এক সেকেন্ডের মধ্যেই ক্লিক-ক্লিক আওয়াজ তুলে পাশাপাশি থাককাটা পথে জোয়ারখেত ভেদ করে চলতে শুরু করল যন্ত্রদুটো। উদ্বিগ্নভাবে, চোখ-কান সজাগ রেখে বরুন তাদের এগিয়ে যাওয়া লক্ষ্য করতে লাগল। এর আগের কয়েকটা দিন সে এই যন্ত্রদুটোর ব্যবহার নিয়ে আন্তন আর শেরের সঙ্গে কতবার-যে কত খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনা করেছে তার ঠিক নেই, যন্ত্রদুটো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটিও করেছে বহুবার, এমন কি বার-দুই ওদুটো মাঠে চালিয়ে পরীক্ষাও করা হয়েছে। আর এখন যদি ঘোড়া-চারটে ছুটতে রাজি না-হয়ে বেঁকে বসে, যদি তাদের ছোটার জন্যে সাধাসাধি করতে হয়, কিংবা যদি ফসলকাটাই-যন্ত্রের কোনো একটার কলকব্জা জ্যাম হয়ে গিয়ে যন্ত্রটা বিকল হয়ে পড়ে তাহলে কী হবে? না-না, লজ্জা রাখার জায়গা থাকবে না তাহলে!

কিন্তু বরুনের মুখ থেকে উদ্বেগের মেঘ ধীরে-ধীরে কেটে গেল। দেখা গেল, ফসলকাটাই-যন্ত্রদুটো এগিয়ে চলেছে একটানা যান্ত্রিক আওয়াজ তুলে, ঘোড়া-চারটে নিজে থেকেই দুলকি চালে ছুটে চলেছে অব্যাহত গতিতে, এমন কি মোড় ফেরার সময়ও দৌড়ের গতি কমিয়ে দিচ্ছে না, আব ছেলেদুটো ঘোড়ার পিঠে জিনের ওপর বসে আছে নিঃস্পন্দভাবে। প্রথম আর দ্বিতীয় দফার ফসল কাটা চুকল। তৃতীয় দফায়ও ফসল কাটার সময়ে যন্ত্রদুটো আমাদের সামনে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল আগের মতোই সুঠাম মসৃণ গতিতে। পাশ দিয়ে যাবার সময়ে আন্তন চেঁচিয়ে বলে গেল বরুনকে:

'সব ঠিক আছে, কমরেড দলপতি!'

এতক্ষণে সারবাঁধা কলোনি-বাসিন্দাদের দিকে ফিবে বরুন তার হাতের কাস্তেখানা তুলল:

'অ্যাটেন্ — শন!'

কলোনি-বাসিন্দারা প্রত্যেকে হাত দু'খানা শরীরের দু'পাশে ঝুলিয়ে দিল। তবে তাদের মধ্যে সবকিছু টানটান হয়ে প্রস্তুত হয়ে রইল এগিয়ে যাওয়ার জন্যে, দেহের মাংসপেশীগুলো তাদের এই উত্তেজনাকে যেন আর ধরে রাখতে পারছিল না।

'মাঠের দিকে... দৌড় লাগাও!'

বলে হাতের কাস্তে নামিয়ে নিল বুরুন। আর সঙ্গে সঙ্গে তিন শো পঞ্চাশটি ছেলে একদৌড়ে নেমে পড়ল মাঠে। কাটা-ফসলের গোছা-গোছা সারির ওপর তাদের হাত-পাগুলো লাফালাফি জুড়ে দিল। হাসাহাসি আর পরস্পর ধাক্কাধাক্কি করতে-করতে, রবারের বলের মতো এদিক-ওদিক ছিটকে লাফিয়ে উঠে তারা কাটা-জোয়ারের শিষগুলোকে আঁটিতে বেঁধে ফেলল। তারপর ফসলকাটাই-যন্ত্রদুটোর পিছুপিছু ছুটে ওদের তিন-চার জনের একেকটা দল একেকটা ফসলের স্তূপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেগুলো তাদের নিজ-নিজ বাহিনীর এক্তিয়ারভুক্ত বলে দাবি জানাতে লাগল:

'এইটা পনেরো নম্বর বাহিনীর!.. আরে, এইটা নয় নম্বরের...'

ওদের রকমসকম দেখে অতিথি-অভ্যাগতরা তো হেসেই খুন! খালাবুদা ইতিমধ্যে আমাদের কাছে ফিরে এসেছিলেন। তিনি এখন কড়াচোখে ব্রেগেলের দিকে তাকিয়ে বললেন:

'আর তুমি বলতিছিলে কিনা... তা, দ্যাখো দেখি একবার!..'

ব্রেগেল মুখ টিপে হাসলেন। বললেন:

'ঠিক আছে... দেখছি: ওরা চমৎকার কাজ করছে, খুশিমনে কাজ করছে। কিন্তু যতই যাই হোক, এ তো নিছক কাজ করাই...'

শুনে খালাবুদা মুখ দিয়ে অস্পষ্ট একটা আওয়াজ করলেন, তবে ব্রেগেলকে আর কিছু বললেন না। তার বদলে এবার জ্বলন্ত চোখে পরিষ্কার-কামানো কমরেডের দিকে তাকিয়ে বললেন:

'মেয়্যাছেল্যার সাথে কথা কয়ি লাভ কী?..'

আনন্দিত, উত্তেজিত ইউরিয়েভ আমার হাতখানা চেপে ধরলেন। তারপর দ্‌জুরিন্‌স্কায়াকে লক্ষ্য করে বললেন:

'না-না, সত্যি!.. ব্যাপারখানা ভাবুন একবার!.. বুঝলেন, আমি কেমন বিচলিত বোধ করছি, অথচ কেন-যে বিচলিত হচ্ছি তা বুঝছি না। জানি, অবশ্যই আজ এটা ওদের ছুটির দিন, উৎসবের দিন, কাজের দিন নয়...

আসলে ব্যাপারটা কী জানেন — এ হল গিয়ে, যাকে বলে... শ্রমের রহস্য। কী বলতে চাইছি বুঝলেন তো!'

পরিষ্কার-কামানো-মুখ কমরেড এবার স্থিরদৃষ্টিতে ইউরিয়েভের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বললেন:

'কী বললেন? শ্রমের রহস্য? হুঃ! মানে কী তার? আমার যেটা ভালো লেগেছে তা বলি — এরা দিব্যি সুখে আছে, সংগঠিত হয়ে আছে আর কেমন করে কাজ করতে হয় তা জানে। সূচনা হিসেবে এটা যথেষ্ট, সত্যিই যথেষ্ট! কমরেড ব্রেগেল কী বলেন এ-বিষয়ে?'

কিন্তু ব্রেগেল এ-নিয়ে আর চিন্তা করার সময় পেলেন না। কেননা ঠিক তখনই রাশ টেনে 'মলদিয়েত্‌স'কে আমাদের সামনে দাঁড় করিয়ে সিনেন্‌কি তড়বড় করে বললে:

'বুরুন আমারে পাঠায়েল... ওরা ফসলের গাদাগুলা এক-জায়গায় জড় করতেছে। সকলেরে গাদার কাছে যেতে কয়েল!'

ফসলের গাদার পাশে উঁচু-করে-তুলে-ধরা পতাকার চারপাশে দাঁড়িয়ে আমরা 'আন্তর্জাতিক' সঙ্গীত গাইলুম। তারপর কয়েকটা বক্তৃতা হল, তার কিছু ভালো কিছু-বা মন্দ। তবে সব ক'টি বক্তৃতাই ছিল একই রকম আন্তরিক। আর বক্তৃতাগুলি দিলেন এমন সব লোক যাঁরা ছিলেন মেহনতি মানুষের দেশের নাগরিক, সূক্ষ্ম অনুভবক্ষম আর চমৎকার মানুষ — আর আমাদের উৎসব, আমাদের ছেলেপিলে, আকাশের নৈকট্য, মাঠে গঙ্গাফড়িংয়ের ঝিঁঝিঁ-ডাক এইসবে যাঁদের হৃদয়ে সাড়া জেগেছিল তাঁরা।

মাঠ থেকে ফিরে আমরা সবাই একসঙ্গে — কে বয়সে বড় কে ছোট, মানুষ হিসেবে কে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কে কম এসব বিচার-বিবেচনা ভুলে — দুপুরের খানা খেতে বসলুম। খেতে-খেতে এমন কি কমরেড জোইয়া পর্যন্ত হাসিঠাট্টায় যোগ দিলেন।

উৎসবের হৈ-হুল্লোড় চলল দীর্ঘসময় ধরে। ব্যাটবল, লুকোচুরি সবরকম খেলাই হল। খালাবুদার চোখ বেঁধে হাতে একটুকরো পাকানো দড়ি ধরিয়ে দেয়া হল, তারপর ঘণ্টার সংকেত দিয়ে দৌড়ে-বেড়ানো একটি বাচ্চাকে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করে হয়রান হলেন তিনি। এরপর অতিথিদের নিয়ে যাওয়া হল পুকুরে স্নান করাতে। স্নানের পর কলোনির কেন্দ্রীয় চত্বরে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ছেলেরা সমবেত অতিথিদের আপ্যায়িত

করল। অনুষ্ঠানটি শুরু হল ভাগে-ভাগে বিন্যস্ত নানাকণ্ঠের আবৃত্তি দিয়ে। বাধো-বাধো ছন্দোবদ্ধ পদে ছেলেরা জানাল পরের পাঁচ বছরে তারা নিজেদের জন্যে কী-কী করতে চায়। যথা, গড়তে চায় তাদের নিজস্ব একটি শহর-সোভিয়েত, উঠোনে তৈরি করতে চায় নতুন একটা ওয়র্কশপ, টিলার গোটা অঙ্গ জুড়ে নতুন ফলবাগান তৈরি করে তাতে ফুল ধরাতে চায় তারা, আর... যদি সম্ভব হয় তবে — বিদ্যুৎচালিত নৌকো-দোলনা তৈরি করতে চায়।

'কবিতা'টি এই আশার বাণী শুনিয়ে শেষ হল:

পাঁচ বছরে মোদেব পেশী কবে নেবেই জয়
ইস্পাতেরই শক্তি, ও সে রবারচাকার নয়।

পুকুরপাড়ে কিছুক্ষণ বাজিপোড়ানোর কারদানি দেখিয়ে অতিথিদের অবশেষে আমরা রিজোভ স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বিদায় দিলুম। মোটরকারের যাত্রীরা অবশ্য এর আগেই দেউড়ি থেকে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। বিদায় নেবার সময় পরিষ্কার-কামানো-মুখ কমরেডটি আমায় বললেন:

'ঠিক আছে, কমরেড মাকারেঙ্কো! চালিয়ে যাও!'

স্যালুট ঠুকে বললুম, 'ঠিক হ্যয় — চালিয়ে যাব!'

১২

বহতা জীবন

ফের এগিয়ে চলল অপ্রতিহত গতিতে অথচ আনন্দময় পারম্পর্য রক্ষা করে — দিনের-পর-দিন। উৎকণ্ঠায়-ভরা দিনগুলো নিয়ে এল এমন সব ছোটখাট সাফল্য আর ঘনিয়ে তুলল এমন অকিঞ্চিৎকর সব বিপর্যয় — বহুকাল আগে থেকেই আমাদের জীবন যে-সমস্ত বড়-বড় পদক্ষেপ আর বড়-বড় আবিষ্কারে চিহ্নিত হয়ে আছে সেগুলিকে ভালোরকম লক্ষ্য করার ব্যাপারে যা নাকি প্রায়ই বাধার সৃষ্টি করে থাকে। এবং আগের মতোই পরিশ্রমে পরিপূর্ণ এই দিনগুলিতে আর আরও বেশি করে শান্ত

দিবাবসানগুলিতে আমাদের চিন্তাভাবনা দানা বেঁধে উঠতে লাগল। দিনের বেলায় যে-সমস্ত চিন্তা আমাদের মাথায় চমকে যেত সে-সবের সতর্ক পর্যালোচনা চলত পরে, আর ভবিষ্যতের নাগাল-এড়ানো ভঙ্গুর রূপরেখা ক্রমে-ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠত।

অথচ তারপর সেই ভবিষ্যৎই একদিন হয়ে উঠত বর্তমান, আর তখন দেখা যেত যে সেটা মোটেই অত ভঙ্গুর নয়, তাকে নিয়ে দিব্যি ময়দা-ঠাসা করা চলে। হাতে-পেয়ে-হারানো সুযোগসুবিধের জন্যে হা-হুতাশে সময় নষ্ট না-করে আর ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন-নতুন অভিজ্ঞতায় ভরপুর এক জীবন যাপন করে চললুম আমরা। অবশ্য তাই বলে আরও নতুন-নতুন ভুলের হাত থেকে অব্যাহতি পেলুম না, আর সেগুলো আবার শুধরেও নিতে লাগলুম যথাসময়ে।

আর আগের মতোই আমাদের ওপর কড়া সমালোচনার নজর রাখা হতে লাগল। অনবরত ধমকধামক দেয়া হতে লাগল আমাদের, অনবরতই বলা হতে লাগল যে ভুল করা উচিত হচ্ছে না, আমাদের আচরণ যথাযথ হওয়া দরকার, তত্ত্বকথা শেখা একান্ত প্রয়োজন, আমাদের এটা করা উচিত ওটা করা উচিত নয়... ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এদিকে কলোনিতে ততদিনে রীতিমতো একটা শিল্প-সমাহার গড়ে উঠেছে। নানা ফন্দিফিকির খাটিয়ে আমরা একটা ছুতোরশাল বানিয়ে ফেললুম আর তাতে জায়গা পেল কাঠচাঁছা যন্ত্র, কাঠজোড়ার লেদ-মেশিন, যন্ত্রচালিত করাত, এইসব চমৎকার যন্ত্রপাতি। আরও সূক্ষ্ম কাজের জন্যে আমরা নিজেরাই একটা লেদ-মেশিন তৈরি করলুম। ছুতোরশালে বাইরের ফরমায়েশ তামিল করার জন্যে নানারকম চুক্তিতে আবদ্ধ হলুম, অগ্রিম দাদন নিতে লাগলুম, এমন কি ব্যাঙ্কে একটা চলতি আমানত খোলার স্পর্ধা পর্যন্ত দেখা গেল আমাদের মধ্যে।

মৌমাছি-পালনের জন্যে মৌচাক পর্যন্ত তৈরিতে আমরা হাত লাগালুম। এ-কাজটা মোটে সহজ তো ছিল না-ই, বরং এর জন্যে একেবারে নিপুণ হাত ও যথাযথ মাপজোকের দরকার হচ্ছিল। কিন্তু দেখা গেল এ-কাজেও আমাদের কেমন একটা হাত এসে গেছে। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই শ'য়ে-শ'য়ে মৌচাক বানাতে শুরু করে দিলুম। আমরা তৈরি করতে লাগলুম গৃহস্থালির আসবাবপত্র, গোলাবারুদ রাখার বাক্স আর আরও হরেকরকম জিনিস।

কামারশালও একটা খুলে ফেললুম আমরা, কিন্তু সেখানে কাজ শুরু করার আগেই একটা ঝামেলায় পড়ে গেলুম।

মাসের-পর-মাস কাটতে লাগল। চারিদিক-থেকে-আসা আক্রমণ ঠেকিয়ে, অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়ে, কখনও বশ্যতাস্বীকারের ভাব দেখিয়ে, কখনও গর্জন আর দন্তবিকাশ করে, কখনও বিষাক্ত ছোবল মারার ভয় দেখিয়ে আর যারা আমাদের পথের প্রতিবন্ধক প্রায়ই তাদের মুখঝামটা দিয়ে আমরা জীবন কাটাতে আর দিব্যি আত্মোন্নতি ঘটিয়ে যেতে লাগলুম।

আমাদের বন্ধুর সংখ্যাও বাড়তে লাগল ক্রমশ। খোদ শিক্ষা-সংক্রান্ত জনকমিশারিয়েতেই দ্‌জুরিন্‌স্কায়া আর ইউরিয়েভের মতো এমন আরও অনেকে ছিলেন যাঁদের ছিল বাস্তব বুদ্ধি, ন্যায়বিচারের দিকে একটা সহজপ্রবৃত্তি আর আমাদের ওপর ন্যস্ত গুরুভার কাজের নানা দিক নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার সত্যিকার একটা বাসনা। তবে শিক্ষা-দপ্তরের বাইরের সমাজে আমাদের বন্ধুর সংখ্যা ছিল আরও বেশি — তাঁরা ছড়িয়ে ছিলেন পার্টি আর জেলা-সংগঠনগুলোয়, সংবাদপত্রগুলির অফিসে আর শিল্পশ্রমিকদের মধ্যে। এইসব বন্ধুই আমাদের সহজে নিশ্বাস নেয়ার উপযুক্ত আবহমণ্ডল গড়ে তুলোছলেন।

সাংস্কৃতিক কাজকর্মের নেশা গভীরভাবে পেয়ে বসেছিল আমাদের। স্কুলে তখন ছ'টা ক্লাস চলছিল। ওইসময়ে ভাসিলি নিকলায়েভিচ পের্‌স্কি নামে এক আশ্চর্য ব্যক্তি কলোনিতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। ইনি ছিলেন একজন সাক্ষাৎ ডন কিয়োটে — কয়েক শতাব্দীর পুঞ্জীভূত কৃৎকৌশলগত আবিষ্কারে এবং সাহিত্য ও শিল্পের সম্পদে অলঙ্কৃত ছিল এ'র মন। সের্‌ভান্তেসের সৃষ্ট চরিত্র হওয়ার উপযোগী যথেষ্ট রোগা আর যথেষ্ট লম্বা ছিলেন লোকটি, আর এর ফলে ক্লাব সংগঠনের কাজটা 'তেজীয়ান' করে তোলায় তাঁর সুবিধেও হয়েছিল যথেষ্ট। লোকটি ছিলেন অনলস আবিষ্কারক আর স্বপ্নদর্শী, তাঁর কল্পনার জগৎ যে ডন কিয়োটের মতোই নিছক ভালো আর নিছক মন্দ এই দুই শ্রেণীর মানুষ দিয়ে শুধু তৈরি ছিল না এমন কথা আমিও হলফ করে বলতে পারি না। যাঁরা ক্লাব বা সংস্কৃতি-সমিতির কাজ সংগঠিত করতে চান তাঁদের সবাইকে আমি পরামর্শ দেব যে তাঁরা যেন ডন কিয়োটে ছাড়া আর কাউকে সংগঠক না নিযুক্ত করেন। ডন কিয়োটেদেরই

একমাত্র ক্ষমতা আছে সবকিছুর যে ভবিষ্যৎ আছে এটা বুঝতে পারার এবং সামান্য কার্ডবোর্ড আর রঙ দিয়ে অলৌকিক মনোহারি জিনিসপত্র তৈরি করার। তাদের পরিচালনায় ছেলেরা চল্লিশ মিটার লম্বা দেয়ালপত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করে, কার্ডবোর্ড মডেল দেখে বোমারু বিমান আর সন্ধানী বিমানের মধ্যে পার্থক্য চিনতে শেখে আর শেখে সর্বশক্তি নিয়োগ করে কাঠের চেয়ে ধাতুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করতে। এই ধরনের ডন কিয়োটেরা সংস্কৃতি-সমিতির কাজে উদ্দীপনা, সদা-অশান্ত প্রতিভা আর সৃষ্টিশীল শিল্পীরা যে-উপাদানে তৈরি তাই যুগিয়ে থাকে। পেরস্কি যে-সমস্ত কীর্তিকলাপের নমুনা দেখালেন এখানে তার সবকিছুর বর্ণনা আমি দিতে বসব না, কেবল এইটুকুই বলব যে তিনি আমাদের সন্ধেগুলোয় নতুন প্রাণসঞ্চার করলেন, সেগুলোকে ভরে তুললেন কাঠের চোকলা, আঠা, স্পিরিটল্যাম্প, করাত চালানোর আওয়াজ, প্রপেলারের গুন্‌গুন, সমবেত কণ্ঠের আবৃত্তি আর মূক-অভিনয়ের অনুষ্ঠান দিয়ে।

বইকেনার পেছনে মোটা টাকা খরচ করতে শুরু করলুম আমরা। গির্জের বেদীতে আমাদের বইয়ের আলমারি রাখার আর স্থানসংকুলান হচ্ছিল না, পড়ার ঘরে পাঠকও ধরছিল না আর।

এছাড়া আরও অনেক নতুন জিনিসের আমদানি ঘটেছিল।

তাদের মধ্যে প্রথম হল — ব্যান্ডপার্টি গঠন। গোটা ইউক্রেনে, সম্ভবত গোটা যুক্তরাষ্ট্রেই, আমাদের কলোনি ছিল পথিকৃৎ যারা এই চমৎকার ব্যাপারটি প্রথম সংগঠিত করেছিল। এর ফলে অবশ্য কমরেড জোইয়ার পুরনো ধারণাটাই আরও জোরদার হল যে আমি একজন প্রাক্তন ফৌজী কর্নেল না-হয়ে যাই না, তবে দলপতি-পরিষদ এতে খুশি হয়ে উঠল খুব। অবশ্য এ-ও সত্যি যে কলোনিতে ব্যান্ডপার্টি গড়ে তোলার ব্যাপারটা সকলের স্নায়ুর পক্ষে একটা মারাত্মক পরীক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেননা চার-চারটে মাস ধরে আমাদের ট্রম্‌বোন, ক্লারিনেট আর করনিট-বাজিয়ে ছেলেরা ঘরের মধ্যে চেয়ার, টেবিল, জানলার তাক দখল করে অকথ্য অসহ্য আওয়াজ তুলে চারপাশের সকলের কান আর মনের দফারফা করে চলল অথচ তা এড়িয়ে যাওয়ার মতো একটা যুতসই জায়গা খুঁজে পাওয়া গেল না। কিন্তু তা হলে হবে কী, পয়লা মে তারিখে আমরা নিজস্ব ব্যান্ডপার্টির পেছন-পেছন কুচকাওয়াজ করে শহরে ঢুকলুম। আর তা দেখে খারকভের বুদ্ধিজীবী-

সম্প্রদায়, বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, খবরের কাগজের কর্মী আর রাস্তার ছেলেদের চোখেমুখে সেদিন কী-যে তীব্র আবেগ, আনন্দের চোখের জল আর বিস্ময়ভরা মুগ্ধতা লক্ষ্য করেছিলুম কী বলব! ওহ্!

আমাদের দ্বিতীয় কীর্তি ছিল কলোনিতে ফিল্ম শো'র প্রবর্তনা। আমাদের উঠোনের মাঝমধ্যিখানে তোফা আরামে প্রতিষ্ঠিত পবিত্র গির্জের সঙ্গে এর ফলে সমানে-সমানে পাঞ্জা কষতে সমর্থ হলুম। গির্জা-পরিষদের সদস্যরা পবিত্র শোকে হাত কচলালে আর শাপশাপান্ত করলে কী হবে, বেছে-বেছে গির্জেয় সন্ধেবেলাকার প্রার্থনা শুরু হওয়ার সংকেতসূচক ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ফিল্ম শো দিতুম শুরু করে। আর ঘণ্টাধ্বনির এই সুপ্রাচীন আহ্বান মান্য করে তখন এত লোকের সমাবেশ ঘটতে লাগল যেমনটা তার আগে আর কখনও দেখা যায় নি। আর সাড়াও মিলতে লাগল কতই-না দ্রুত! গির্জের ঘণ্টামিনার থেকে ঘণ্টাবাজিয়ের নিচে নেমে আসা আর পুরুতঠাকুরের দেউড়িতে ঢোকার তর সইত না তখন, তারই মধ্যে দেখা যেত দুই থেকে তিন শো লোক লাইন লাগিয়েছে আমাদের ক্লাবঘরের দরজায়। তারপর পুরুতঠাকুর যতক্ষণে তাঁর আনুষ্ঠানিক পোশাক পরতেন, ফিল্ম-মেকানিক ততক্ষণে প্রোজেক্টর-যন্ত্রে ফিল্মের রোল পরিয়ে ফেলত, আর পুরুতঠাকুর যেই শুরু করতেন 'ধন্য সেই স্বর্গরাজ্য...' বলে স্তোত্রপাঠ, মেকানিকও অমনি দিত তার ফিল্ম দেখানো শুরু করে। ব্যস, আর কী — ঘটে যেত যাকে বলে পূর্ণ সংযোগসাধন!

এই সংযোগের অবশ্য করুণ পরিণতি ঘটল ভেরা বেরেজোভ্স্কায়ার ক্ষেত্রে। ভেরা ছিল রক্ষণাধীন ছেলেমেয়েদের মধ্যে সেই দলের আমার কারখানার কাঁচামাল হিসেবে যাদের গড়েপিটে নেয়ার উৎপাদনী পড়তা পড়ছিল অত্যন্ত বেশি। কেননা সে আমাদের কোনো উৎপাদন-যন্ত্রের হিসেবের সঙ্গেই খাপ খাচ্ছিল না!

'কিড্নির গোলমাল' চুকে যাওয়ার পর কিছুদিন ভেরা চুপচাপ রইল। মনে হল বুঝি কাজে ডুবে সে নিজের কথা ভুলে আছে। কিন্তু যে-মুহূর্তে তার স্বাস্থ্য সামান্য ফিরল, সামান্য একটু গোলাপি আর একটুখানি মোটা হয়ে উঠল সে, অমনই গালের গোলাপি ছটা, কাঁধ, চোখের চাউনি, চলার ভঙ্গি আর গলার আওয়াজের রঙ্গভঙ্গি ঠাটঠমক দেখিয়ে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল। প্রায়ই অন্ধকার ঘুপচিঘাপচিতে অস্পষ্ট কোনো-না-

কোনো মূর্তির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতুম তাকে। লক্ষ্য করতে লাগলুম তার ঝকঝকে শাদা চোখদুটো কীরকম চঞ্চল আর ছলনাময় হয়ে উঠছে, আমার অনুযোগ-অভিযোগের জবাবে আত্মসমর্থনে তার গলার স্বরে কীরকম বিরক্তিকর কপটতার ছোঁয়া লাগছে। এসব সময়ে সে বলত:

'ক্যানে? হল্য কী আপনের, আন্তন সেমিওনভিচ? লোকে কি কাউব সাথে কথা পের্যন্ত বলতি পারব্যে না, নাকি?'

ছেলেমেয়েদের পুনঃশিক্ষাদানের ব্যাপারে আর কেউই এতখানি অসুবিধের সৃষ্টি করে না যতখানি করে তথাকথিত 'পূর্ব-অভিজ্ঞতা' আছে এমন মেয়ে। একটা ছেলে যতদিন খুশি রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াক, যতই জটিল আর অবৈধ নানা অ্যাড্‌ভেঞ্চারের সরিক হোক-না সে, শিক্ষাদান-সংক্রান্ত হস্তক্ষেপকে যতই সে প্রাণপণে বাধা দিক, যদি তার মগজে বুদ্ধির ছিটেফোঁটাও থেকে থাকে তাহলে কোনো সুস্থ যৌথ জীবনে যুক্ত হলে সে-যে একদিন সত্যিকার মানুষ হয়ে উঠবে এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর কারণ হল এই যে এমন একটি ছেলে আসলে নিছক পশ্চাৎপদ ছাড়া কিছু নয়, আর স্বাভাবিকের চেয়ে তার এই পিছিয়ে-পড়ার মাত্রাটা-যে কতখানি তা মাপা আর সেই অভাবটুকু পূরণ করা সর্বদাই সম্ভব। কিন্তু একটি মেয়ে — যার যৌনজীবন অকালে, প্রায় শিশুবয়সেই, শুরু হয়ে গেছে — সে-যে কেবল শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ তা-ই নয়, সে এক গভীর, জটিল ও সাংঘাতিক বেদনাদায়ক মানসিক অভিঘাতের রুগীও বটে। সে হয়ে দাঁড়ায় কখনও ভিতু-ভিতু অশ্লীল, কখনও দুর্বিনীত, কখনও সহানুভূতিতে-ভরা আবার কখনও-বা ছিঁচকাদুনে চতুর চোখের লক্ষ্য। আর এই সব ক'রকম চাউনিই অপরাধের ইঙ্গিতে-সংকেতে হয়ে থাকে তাৎপর্যপূর্ণ। এইসব চাউনি মেয়েটাকে তার দুঃখ ভুলতে দেয় না, তার মধ্যে জীইয়ে রেখে দেয় নিজের হীনতা সম্পর্কে স্থায়ী ধারণাটাকে। আর এই হীনতাবোধের পাশাপাশি লালন করে মেয়েটি একধরনের স্থূলবুদ্ধিপ্রসূত আদিম একটা অহঙ্কারও। সে ভাবে, তার তুলনায় অন্য সব মেয়ে কত কাঁচা, কত কচি, অথচ সে হয়ে উঠেছে রীতিমতো পরিণত একটি মেয়ে, অন্যদের কাছে যা রহস্যময় সেই অভিজ্ঞতার স্বাদ পেয়েছে সে ইতিমধ্যেই, ইতিমধ্যেই পুরুষকে বশ করার বিশেষ ক্ষমতা রাখে সে আর সেই ক্ষমতাটা তার কতই-না পরিচিত, কত-না সহজে সেটা সে প্রয়োগ করতে পারে। বেদনা ও অহঙ্কার, দীনতা ও ঐশ্বর্য, রাত্রে চোখের জলে

বালিশ ভিজনো আর দিনের বেলায় ছেনালিপনায় মেতে ওঠার এই জটিল জাল ছিন্ন করে নিজের চলার পথ খুঁজে পেতে ও সেই পথে সংলগ্ন হয়ে থাকতে গেলে, টাটকা অভিজ্ঞতা, নতুন অভ্যাস, সতর্কতার ও অবস্থা বুঝে চলতে শেখার নতুন-নতুন ধরন আয়ত্ত করতে হলে মেয়েটির পক্ষে ইস্পাতের মতো দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি থাকার দরকার করে।

ভেরা বেরেজোভ্স্কায়ার চরিত্রের সম্মুখীন হয়ে উপরোক্ত সবরকম ঝুট্‌ঝামেলার মুখোমুখি হলুম আমি। কুরিয়াজে চলে আসার পর সে আমার বহু যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি সন্দেহ করছিলুম, এমন কি তখনও সে তার জীবনের সুতোয় নানারকম জট পাকিয়ে আর পাক খাইয়ে চলেছিল। অথচ এ-নিয়ে তার সঙ্গে কোনোরকম আলাপের সূত্রপাত করতে গেলেও অত্যন্ত বুঝেসুঝে সাবধানে কথা পাড়তে হোত। ভীষণ অভিমানী আর খামখেয়ালি ছিল মেয়েটা, কথা শুরু করলেই সর্বদা আমার হাত এড়িয়ে সে ছুটে পালাবার চেষ্টা করত, হয়তো-বা কোনো খড়ের গাদার মাথায় চেপে কিংবা আর কোথাও গিয়ে আকুলভাবে কান্না জুড়ে দিত। অথচ প্রায়ই এখানে-ওখানে তার নিভৃত আলাপের আসরে দৈবক্রমে কেউ-না-কেউ গিয়ে পড়ত আর দেখত অনবরতই তাকে নতুন-নতুন সঙ্গী জোটাতে। ভেরার এইসব সঙ্গীকে একের-পর-এক ভাগানো অবশ্য তেমন সমস্যার ব্যাপার ছিল না, কারণ এই পুরুষসঙ্গীরা দলপতি-পরিষদের সভার সামনে দাঁড়াতে হবে আর লাপতের 'খাড়া হয়ি দাঁড়া, সকল কথা খুলে বল্ দেখি'র জবাব দিতে হবে ভেবে আগেই ভয়ে আধমরা হয়ে থাকত।

অবশেষে ভেরা বুঝল যে কলোনি-বাসিন্দারা যেমনটি হলে তার মনঃপূত হোত তারা তেমন নয়, মন-দেয়া-নেয়ার ব্যাপারে তাই সে আরও শক্ত ভিত খুঁজে পেতে সচেষ্ট হল। এই সময়ে রিজোভ স্টেশনের টেলিগ্রাফ-অপারেটর, মুখে-ব্রণওয়ালা গোমড়ামুখো এক অল্পবয়সী ছোকরা ভেরার প্রতি মনোযোগ দেখাতে শুরু করে। ছোকরাটি মনে করত, সভ্যতা আজ পর্যন্ত যতটা উন্নত হয়েছে তার জ্যাকেটের হলুদ পাইপিঙ তার সবসেরা একটি অভিব্যক্তির নমুনা। প্রথম-প্রথম ভেরা এই ছোকরার সঙ্গে দেখা করত ঝোপেঝাড়ে সেঁধিয়ে। ছেলেরা নানা কাজে সেখানে গিয়ে ওদের আবিষ্কার করত, আপত্তিও জানাত তারা। কিন্তু ভেরার পেছনে এইভাবে তাড়া করে বেড়াতে আমরা ক্লান্তিবোধ করছিলুম। এর মধ্যে একমাত্র লাপতই এক্ষেত্রে যা করা উচিত ছিল

তাই করল একদিন। একটা নির্জন জায়গায় টেলিগ্রাফ-অপারেটর সিল্‌ভেস্ত্রভকে চেপে ধরে একদিন সে বলল:

'তুই ভেরারে সোজা পথে যেতে বাধা দিতেছিস। সাবধান কিন্তু — আমরা তোরে বাধ্য করব ভেরারে বিয়া করতে!'

এতে থলথলে ব্রণওয়ালা মুখখানা ঘুরিয়ে নিয়ে টেলিগ্রাফ-অপারেটর বিড়বিড় করে জবাব দিল:

'তা ক্যানে করতি যাব্য আমি?'

'শোন্, সিল্‌ভেস্ত্রভ, তুই যদি ভেরারে বিয়া না করিস তাইলে তোর থোতাখান ভোঁতা করে থোব কিন্তু — তুই চিনিস তো আমাদেরে!.. টেলিগ্রাফের কলকব্জার আড়ালি তুই লুকায়ে থাকতি পারবি না। যদি অন্য শহরেও পলায়ে যাস তাহলিও তোরে ঢুঁড়ে বার করব্য-নে!'

এর পরও ফাঁক পেলেই ভেরা সকল সামাজিক রীতিনীতি ফুঃ-ফুঃ করে উড়িয়ে দিয়ে অভিসারে বেরিয়ে পড়ত। আর অভিসারে যাওয়ার পথে দৈবক্রমে আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে হঠাৎ লাল হয়ে উঠে সে নিজের চুল ঠিক করতে লেগে যেত, তারপর দৌড় দিত চোঁ-চা।

কিন্তু অবশেষে তাকেও ভবিতব্যের কাছে নতিস্বীকার করতে হল।

একদিন একটু রাত করে ভেরা আমার অফিসে এল। তারপর যেন সমকক্ষ কারও ঘরে এসেছে এমন ভাব দেখিয়ে ঝুপ করে একখানা চেয়ারে বসে পড়ে পায়ের ওপর পা তুলে দিল। টকটকে লাল হয়ে উঠে চোখের পাতাদুটো নামিয়ে অথচ মাথাটা উঁচু করে রেখেই সজোরে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল:

'আপনেরে কিছু বলার ছেল।'

'বলে ফেল!' ওর কঠিন কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি করলুম।

'আমারে গভ্‌ভপাত করতি দিতি লাগব্যে।'

'লাগবে নাকি?'

'হ্যাঁ, লাগব্যে। দয়া করি হাসপাতালের জন্যি আমারে একখান চিরকুট লেখ্যে দ্যান।'

কিছু না-বলে নিঃশব্দে ওর দিকে তাকিয়ে রইলুম। মাথাটা নামিয়ে ফেলল ও।

বলল, 'এই... বলতি চেয়্যেলাম আর-কি!'

আরও কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইলুম। আধবোজা চোখের নিচে

থেকে আমার হাবভাব লক্ষ্য করার চেষ্টা করছিল ভেরা। ওই চাউনিটাই আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল কতখানি নির্লজ্জ হয়ে উঠেছে ও। ওর চাউনি, ওর গালের রঙ, ওর কথাবলার ঢঙ — সবই এই নির্লজ্জতার সাক্ষ্য দিচ্ছিল।

নিরুত্তাপ গলায় বললুম, 'এবার তোমায় বাচ্চা প্রসব করতে হবে।'

আদুরে-আদুরে ভাব করে আমার দিকে তেরছা চোখে তাকাল ভেরা। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল:

'না, বাচ্চা বিয়োব্য না!'

এ-কথার কোনো জবাব না-দিয়ে টেবিলের ড্রয়ারে চাবি লাগালুম আমি। তারপর মাথায় টুপি চড়ালুম। ও-ও উঠে দাঁড়াল আর একই রকম অস্বস্তিকর লাজুক-লাজুক ভাব করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

বললুম, 'চল! এখন তোমার শুতে যাবার সময়!'

'কিন্তু... চিরকুটের কী হব্যে? আমি তো আর দেরি করতি পারি নে। আপনের তো বোঝা উচিত।'

দলপতি-পরিষদের অন্ধকার সভা-ঘরটায় এসে পড়লুম আমরা। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললুম:

'ঠাট্টা নয়, আমি তোমাকে সত্যিসত্যিই বলছি. যা ঠিক করেছি তার আর রদবদল হবে না — আর তোমার অপারেশন করা চলবে না! তোমাকে বাচ্চা প্রসব করতেই হবে।'

'উঃ!' বলে চিৎকার করে ভেরা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

এর তিনদিন পরে কলোনির সিংদরজার কাছে সে আবার আমায় ধরল। একটু বেশি রাতে আমি তখন গ্রাম থেকে ফিরছিলুম। পাশে-পাশে হাঁটতে-হাঁটতে আপস করার ভঙ্গিতে সে বেড়ালছানার মতো মিন্‌মিন করে শুরু করল:

'আন্তন সেমিওনভিচ, আপনে রঙ্গ করতিছেন। কিন্তু আমার কাছে এয়া রঙ্গ-রসিকতার ব্যাপার না।'

'কী চাও তুমি?'

'আহা, য্যানে জানেন না!.. আমি একখান চিরকুট চাই — য্যানে কিছু বুঝতিছেন না এমনধারা ভান করতিছেন-যে বড়?'

হাতখানা ধরে ওকে আমাদের আবাদের পথে নিয়ে এলুম। বললুম:

'এস, কথা বলা যাক।'

'কথা কওনের আবার আছে কী!.. কথা কয়ি লাভ কী, বলেন? আমারে শুধা চিরকুট একখান দিয়ি দ্যান!'

বললুম, 'শোন ভেরা, আমি কিছু ভানও করছি না, তোমার সঙ্গে ঠাট্টাও করছি না। আসলে জীবনটা একটা গুরুতর ব্যাপার আর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলাটা যেমন অন্যায় তেমনই বিপজ্জনকও। তোমার জীবনে একটা খুব গুরুতর ব্যাপার ঘটেছে — তুমি কাউকে ভালোবেসেছ... তা, ঠিক আছে, ছেলেটিকে বিয়ে করে ফেল।'

'আপনের ওই 'ছেল্যা'রে নিয়ি কামডা কী আমার, শুনি? বিয়া করব্য? আমি?.. মাইরি! রসের নাগর আমার! আর তারপর কবেন, আমি গিয়ি বাচ্চাকাচ্চা মানুষ করি! না-না, ওসব কিছু হব্যে না! দ্যান, আমারে একখান চিরকুট দ্যান দেখি!.. তা, কেডা আপনেরে কয়্যেল যে আমি পিরিত করতিছেলাম?'

'ওঃ, ভালোবাস নি? তাহলে এমনি ফুর্তি করছিলে?'

'তা করতিছেলাম তো হয়্যেছেডা কী? অবিশ্যি এখন আমি ফাঁদে পড়্যেছি তো, এখন আপনের যা খুশি তা কবেন বৈকি।'

'হ্যাঁ, আমি এই কথাটাই বলতে চাই। আমি আর তোমাকে ফুর্তি করে বেড়াতে দেব না। কারণ তুমি এখন একজন পুরুষের সঙ্গে থাকছ আর মা হতে চলেছ।'

'আমি বলত্যেছি, আমারে একখান চিরকুট দ্যান!' তীব্র খনখনে গলায় চিৎকার করে উঠল ভেরা। চোখে ওর জল এসে গেল প্রায়। 'আমারে নিয়ি রঙ্গ করতিছেন ক্যানে?'

'আমি তোমাকে চিরকুট দেব না। তবু তুমি যদি এ-নিয়ে ঘ্যানরঘ্যানর কর তাহলে গোটা ব্যাপারটা আমি দলপতি-পরিষদের সামনে পেশ করব।'

'হায় ভগমান!' বলে চিৎকার করে উঠে খেতের পাশের ঘাসের জমিতে বসে পড়ল ভেরা। তারপর কাঁদতে শুরু করল। কাঁধদুটো ওঠানামা করতে লাগল ওর, খাবি খাওয়ার মতো করে জোরে-জোরে ও নিশ্বাস ফেলতে লাগল।

আমি ওর পাশে দাঁড়িয়ে রইলুম নিঃশব্দে। এমন সময় তরমুজ-খেত থেকে গালাতেঙ্কোকে আমাদের দিকে আসতে দেখলুম। ও এসে ঘাসের

ওপর পড়ে-থাকা ভেরার দিকে তাকিয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর ধীরেসুস্থে বলল:

'আমি ভাবতেছিলাম এখেনে আবার ঘোঁত্‌ঘোঁত করে কেডা? তা, দেখত্যেছি ভেরা কানত্যেছে!.. এমনিতি ও তো কান্দে না, হাসে... আর এখন কিনা ও-ই কানত্যেছে...'

এতক্ষণে ভেরা কান্না থামাল। তারপর ঘাসের শয্যা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সযত্নে নিজের পোশাকটা ঝাড়ল। শেষবারের মতো ছোট্ট করে ওঁক-শব্দে ফুঁপিয়ে উঠল একবার, শেষে হাতদুটো দোলাতে-দোলাতে আর ওপরমুখো হয়ে তারাদের দিকে তাকাতে-তাকাতে কলোনির দিকে রওনা দিল।

গালাতেঙ্কো বলল, 'কুঁড়্যের ভিত্‌রি একবার আসেন দেখি, আস্তন সেমিওনভিচ। আপনেরে আমি অ্যায়স্যা বড় একখান তরমুজ খাওয়াব্য-নে! রাম-তরমুজ একবারে! ছোঁড়ারাও কয়জনা ওখেনে আছে।'

এরও পর মাস-দুই কেটে গেল। আমাদের জীবন গড়িয়ে চলল এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো। কখনও পুরো দমে, নড়বড়ে পুল পার হবার সময় একটু আস্তে, উৎরাইয়ে নামবার সময় ব্রেক চেপে আবার চড়াই ভাঙার সময় হাঁসফাঁস করতে-করতে। আর আমাদের জীবনের সঙ্গে ভেরা বেরেজোভ্‌স্কায়ার জীবনও এগিয়ে চলল সামনের দিকে, তবে আমাদের ট্রেনে সে ছিল বিনা মাসুলের গা-ঢাকা-দেয়া যাত্রী।

ভেরা-যে অন্তঃসত্ত্বা কলোনি-বাসিন্দাদের কাছ থেকে তা লুকনো অসম্ভব হয়ে পড়ল — সন্দেহ নেই, ভেরা তার গোপন কথা মেয়ে-বন্ধুদের জানিয়েছিল, আর মেয়েরা গোপন কথা যে কতখানি পেটে রাখে সে তো সবারই জানা। তবে আমার একটা সুযোগ ঘটল কলোনি-বাসিন্দাদের মহানুভবতা (যাতে আগেও আমার কোনো সন্দেহ ছিল না — তা) তারিফ করার। দেখলুম ব্যাপারটা নিয়ে ভেরাকে কেউ জ্বালাতনও করছে না, যন্ত্রণাও দিচ্ছে না। আমাদের ছেলেদের চোখে অন্তঃসত্ত্বা হওয়া কিংবা সন্তানের জন্ম দেয়া লজ্জা পাওয়ার বা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার বলে ঠেকে নি। একজনও কলোনি-বাসিন্দা কোনোদিন একটা অপমানকর কথা ভেরাকে বলে নি, কিংবা এমন কি তাচ্ছিল্যের চোখে পর্যন্ত তাকায় নি ওর দিকে। তবে টেলিগ্রাফ-অপারেটর সিল্‌ভেস্ত্রভ সম্পর্কে তাদের মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে ব্যাপারটার সকল দিক নিয়ে চুলচেরা আলোচনা চলেছে যেমন

এজমালি শোবার ঘরগুলোতে তেমনই মিশ্র বাহিনীগুলো যেখানে-যেখানে কাজে ব্যস্ত থাকত সেখানেও। ওদের আলোচনা চলত ক্লাবঘরে, ফসলঝাড়াইয়ের আটচালায়, ওয়র্কশপগুলোয় এবং অন্যান্য যে-সব জায়গায় ছেলেরা মিলিত হোত সেই সমস্ত জায়গাতেও। এটা স্পষ্ট জানা গেল এই কারণে যে লাপত একদিন এমনভাবে আমার কাছে কথাটা তুলল যেন ওদের মধ্যে আগে থেকে সব স্থির হয়ে আছে। ও বলল:

'আমরা আজ পরিষদে সিল্‌ভেস্ত্রভের সাথে কথা বলতি চাই। আপনের আপত্তি নাই তো?'

'আমার আপত্তি নেই, তবে সিল্‌ভেস্ত্রভের হয়তো আপত্তি থাকতে পারে।'

'ওরে পাকড়াও করি আনা হবে। আমরা দেখতি চাই কেমনধারা কম্‌সমোল-সদস্য সে।'

ওইদিন সন্ধেয় জোর্‌কা আর ভোলখভ সিল্‌ভেস্ত্রভকে ধরে নিয়ে এল। গোটা পরিস্থিতিটা শোকাবহ হলেও ছেলেরা যখন সিল্‌ভেস্ত্রভকে ঘরের মাঝখানে মেঝের ওপর দাঁড় করাল আর লাপত 'অ্যাটেন্‌ — শন'-এর নির্দেশ দিয়ে স্ক্রুয়ে শেষ মোচড় লাগাল তখন আমিও হাসি চাপতে পারলুম না।

দলপতি-পরিষদকে যমের মতো ডরাত সিল্‌ভেস্ত্রভ। সে-যে শুধু ঘরের মাঝখানটিতে এসে অ্যাটেন্‌শনের ভঙ্গিতে দাঁড়াল তা-ই নয়, মনে হচ্ছিল রূপকথার গল্পের নায়কের মতো সে বুঝি যে-কোনোরকম শারীরিক কসরত দেখাতে, যে-কোনো ধাঁধার উত্তর খুঁজে বের করতেও প্রস্তুত — যদি তার ফলে ওই ভয়ঙ্কর সভার হাত থেকে কোনোরকমে আস্ত চামড়া নিয়ে সে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পারে। কিন্তু ঘটনার মোড় এমন অপ্রত্যাশিতভাবে অন্যদিকে ঘুরে গেল যে পরিষদই শেষে ব্যস্ত হয়ে পড়ল এক জটিল ধাঁধার সমাধান খুঁজে বের করতে। এর কারণ আর কিছুই নয়, কেবল সিল্‌ভেস্ত্রভ ঘরের মধ্যে তার কেন্দ্রীয় অবস্থান থেকে বিড়বিড় করে বললে:

'কমরেড কলোনি-বাসিন্দা সব, তমরা কী কর্‍্যে ভাবতি পারল্যে যে আমি এমন হারামজাদা... এমনধারা গুণ্ডা?.. তমরা বলত্যেছ — ভেরারে বিয়া কর! তা, আমি তো বিয়া করতি একপায়ে খাড়া। কিন্তু হেয় যদি বিয়া করতি না-চায় তো আমি কী করতি পারি কও?'

‘সে বিয়া করতি চায় না, বলতি চাস?’ লাপত একেবারে তিড়িঙ করে লাফিয়ে উঠল। ‘কে তোরে একথা কয়েছে?’

‘হেয় নিজিই আমারে কয়েছে… ভেরা নিজি কয়েছে, আবার কে কবে?’

‘ঠিক আছে, তাইলে ভেরারে পরিষদের সামনে হাজির করা হোক। জোরেন!’

‘ঠিক হ্যায়!’

মুহূর্তের মধ্যে দরজা দিয়ে বিদ্যুতের মতো ছুটে বেরিয়ে গেল জোরেন। তারপর মিনিট-দুয়েক পরে ফের ফিরে এল অফিসে। লাপতের দিকে ঘাড় ঝুঁকিয়ে পরে ভেরা ওই সময়ে যেখানে ছিল সেই অনির্দেশ্য জায়গাটার দিকে উদ্দেশ করে মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিতে বলল:

‘সে আসব্যে না!.. আমি তারে বললাম আসতি… তা সে শুধু বলল: দূর হয়ি যা!’

শুনে লাপত পরিষদের সভার ওপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। অবশেষে ওর চোখ এসে থামল ফেদরেঙ্কোর ওপর। সঙ্গে সঙ্গে ফেদরেঙ্কো ভারি দেহখানা তুলে উঠে দাঁড়াল, হেলাফেলায় একটা স্যালুট ঠুকল, নিচু গম্ভীর গলায় বলল ‘ঠিক হ্যায়’, তারপর হেলেদুলে রওনা দিল দরজার দিকে। দরজার কাছে পেঁছিুতে জোরেন ওর বগলের ফাঁক দিয়ে গলে আগেই বেরিয়ে গেল, তারপর বন্দুকের গুলির মতো বেগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছুটল। এদিকে সিল্‌ভেস্ত্রভ ফ্যাকাশে মেরে গিয়ে ঘরের মধ্যিখানে যেন পাথরের মূর্তির মতো জমে গেল — ভাবল, কলোনি-বাসিন্দারা ওর প্রেমাস্পদার বুঝি ছাল ছাড়িয়ে নিতে চলেছে।

ফেদরেঙ্কোর পেছনে আমিও ছুটলুম। ওকে ধরলুম একেবারে উঠোনের মধ্যে। বললুম:

‘সভায় ফিরে যাও, ফেদরেঙ্কো। আমিই ভেরাকে নিয়ে আসছি।’

কোনো কথা না-বলে ফেদরেঙ্কো চুপচাপ আমায় যেতে দিল।

ভেরার ঘরে গিয়ে দেখলুম, লাঞ্ছনাভোগ আর শাস্তি পাওয়ার অপেক্ষায় বোধকরি শান্তভাবে সে বসে আছে নিজের বিছানায় আর কয়েকটা বড়-বড় শাদা বোতাম হাতে নিয়ে তা-ই ঘুরিয়ে চলেছে অনবরত। আর শিকার কোণঠাসা করে শিকারী কুকুর যেমন ঘেউঘেউ করে তেমনই জোরেন তার সামনে দাঁড়িয়ে রিন্‌রিনে তীক্ষ্ম গলায় বলে চলেছে:

'যাও! ভেরা! যাও!.. নইলি ফেদরেঙ্কো... যাও শিগ্‌গিরি!.. গেলি ভালো করত্যে কিন্তু!' তারপর গলা নামিয়ে ফিস্‌ফিস করে বলল, 'যদি না-যাও তাইলি ফেদরেঙ্কো কিন্তু... তোমারে ধর্যেবান্ধ্যে নিয়ি যাবে।'

আমাকে আসতে দেখে চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল জোরেন। যেখানে ও দাঁড়িয়ে ছিল সে-জায়গাটায় একটা ছোট্ট নীল বাতাসের ঘূর্ণি যেন পাক খেয়ে উবে গেল মুহূর্তে।

ভেরার বিছানায় গিয়ে বসলুম। তারপর যে দু-তিনটি মেয়ে কাছেপিঠে ঘুরঘুর করছিল মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে তাদের চলে যেতে বললুম। শেষে শুধোলুম:

'তুমি কি সিল্‌ভেস্ত্রভকে বিয়ে করতে চাও না?'

'না।'

'ঠিক আছে, তাহলে কোরো না। তুমি যা ঠিক করেছ তাই-ই ভালো।'

বোতামগুলো তখনও হাতে নিয়ে ঘোরাতে-ঘোরাতে ভেরা — আমাকে নয়, যেন বোতামগুলোকেই — উদ্দেশ করে বলল:

'সকলেই চায় আমি বিয়া করি। কিন্তু আমি যদি বিয়া করতি না চাই তাইলে কী?.. আপনে আমারে অপারেশন করার একখান ছাড়পত্র দ্যান দেখি!'

'না, তা দেব না!'

'দ্যান, বলত্যেছি! আমি আইন জানি — আমি যদি অপারেশন করাতি চাই আপনের কোনো এক্তিয়ার নাই আমারে বাধা দিবার।'

'অপারেশন করানোর পক্ষে এখন যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে।'

'দেরি হয়্যেছে তো হয়্যেছেডা কী?'

'অনেক দেরি হয়ে গেছে। কোনো ডাক্তারই এখন অপারেশন করতে রাজি হবে না।'

'রাজি হব্যে না আবার! ওসব আমার খুব জানা আছে! কেবল এড়ারে ওয়ারা কয় সিজেয়্যারিয়ান অপারেশন।'

'অপারেশনটা যে কী তা কি তুমি জানো?'

'জানি বৈকি! ওয়ারা আমার প্যাট কাটব্যে, আবার কী।'

'অপারেশনটা খুবই বিপজ্জনক। তুমি মারা পর্যন্ত যেতে পার।'

'তো তাতে কী যায়-আসে? বাচ্চা বিয়োনোর থেক্যে বরং মরব্য সে-ও ভালো। কিছুতি বাচ্চা বিয়োব্য না আমি!'

ওর হাতের বোতামগ্লোর ওপর হাত রাখল্ম। বালিশের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল ও।

বলল্ম, 'শোন ভেরা, ডাক্তারদেরও আইন মেনে চলতে হয়। ব্ঝলে? কোনো মা যদি বাচ্চা প্রসব করতে না-পারে একমাত্র তাহলেই সিজেয়্যারিয়ান অপারেশন করা চলে।'

'তা, আমিও তো বাচ্চা বিয়োতি পারি না!'

'নিশ্চয়, তুমি পার বৈকি! আর তোমার বাচ্চা হবেও!'

আমার হাতখানা ঝট্‌কা মেরে সরিয়ে দিয়ে ও বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বোতামগ্লো ছরছর করে ছড়িয়ে পড়ল বিছানার চাদরে। ও বলল:

'না, বাচ্চা দিতি পারি নে! বাচ্চা আমার কখ্‌খনো হব্যে না! আপনে এগ্না ভালোমতেই জানেন! আমি গলায় দড়ি দিব, নয়তো জলে ঝাঁপ দিব, তব্ কিছ্তি বাচ্চা বিয়োব্য না!'

এই বলে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে কান্না শ্র্ করল ভেরা।

এই সময়ে জোরেন ফের ছ্টে এল শোবার ঘরখানায়। এসে বলল:

'আন্তন সেমিওনভিচ, লাপত জানতি চায় ভেরার জন্যি তারা অপেক্ষা করব্যে কি করব্যে না। আর সিল্‌ভেস্ত্রভরে নিয়ি কী করব্যে?'

'লাপতকে বল, ভেরা বিয়ে করবে না।'

'আর সিল্‌ভেস্ত্রভ?'

'ওকে ভাগিয়ে দাও!'

জোরেন ওর অদৃশ্য লেজখানা নাড়ল। তারপর বিদ্যুতের মতোই ম্হূর্তে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আর আমি? আমার কী করার ছিল? কত হাজার-হাজার বছর ধরে মান্ষ পৃথিবীতে বাস করে আসছে, অথচ এখনও পর্যন্ত প্রেমের ব্যাপারে কী বিশৃঙ্খলাই-না ঘটে চলেছে! রোমিও আর জ্লিয়েট, ওথেলো আর ডেস্‌ডিমোনা, ওনেগিন আর তাতিয়ানা, ভেরা আর সিল্‌ভেস্ত্রভ-ঘটিত এই জটিলতা! এর অবসান ঘটবে কবে? কবে এমন দিন আসবে যখন প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়ের সঙ্গে ম্যানোমিটর, অ্যাম্‌পিয়ারমিটর, ভোল্টমিটর আর দ্রুত আগ্ন নিবনোর যন্ত্র লাগিয়ে দেয়া চলবে? এমন দিন আসবে কবে যেদিন প্রেমিক-প্রেমিকার ওপর পাহারা বসিয়ে আকাশপাতাল ভাবতে হবে না যে ছেলেটি (অথবা মেয়েটি) গলায় দড়ি দেবে কি দেবে না?

নিরুপায় ক্রোধে ছটফট করতে-করতে ঘর ছেড়ে চলে এলুম। পরিষদের সভা ইতিমধ্যেই প্রেমিকপুঙ্গবটিকে ভাগিয়ে দিয়েছিল। ভেরা সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যে মেয়ে-দলপতিদের আমি একটু অপেক্ষা করতে বললুম। গোলগাল চেহারার, গোলাপি-গাল ওলিয়া লানভা গম্ভীরভাবে সহানুভূতি নিয়ে আমার বক্তব্য শুনল।

পরে বলল, 'আপনে ঠিকই বল্যেছেন। আমরা যদি ওরে অপারেশন করতি দিই তাইলে ওর সব্বোনাশ হয়ি যাবে-নে।'

নাতাশা পেত্রিয়েঙ্কো এতক্ষণ ওলিয়ার কথা শুনছিল শান্ত বিজ্ঞ চোখ মেলে। কিন্তু সে কোনো মন্তব্য কবল না।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'এ-বিষয়ে তোমার কী মত, নাতাশা?'

নাতাশা বলল, 'আন্তন সেমিওনভিচ, কেউ যদি গলায় দড়ি দিতি চায়, আপনে তারে ঠেকাবেন কী প্রেকারে? ঠেকাবার কোনো উপায়ই নাই। মেয়্যারা বলত্যেছে, আমরা ওরে পাহারা দিয়ি রাখব্য। পাহারা দিব ঠিকই, তবু ইচ্ছা করলি আমাদের আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ি ও অক্লেশে গলি যেতি পারে...'

আমাদের আলোচনার পাট চুকল। মেয়েরা শুতে চলে গেল, আর আমি ঘরে এলুম ব্যাপারটা নিয়ে মনে-মনে আরও ভালোভাবে তোলাপাড়া করতে আর রাত্রে অবশ্যম্ভাবী দুর্ঘটনার কারণে আমার জানলায় টোকা শোনার অপেক্ষায় থাকতে।

পরপর কয়েকটা রাত এইরকম 'দরকারি কাজে' কাটল। কখনও-কখনও এমন একটা রাত শুরু হোত আমার অফিসঘরে ভেরার আগমন দিয়ে। আলুথালু বেশভূষা, রাঙা-রাঙা চোখ আর দুঃখে-ভারাক্রান্ত ভেঙে-পড়া চেহারা নিয়ে টেবিলের উল্‌টোদিকে আমার সামনে বসে ও অনর্গল অর্থহীন আবোলতাবোল বকে যেত, বলত ওর জীবনটা নয়ছয় হয়ে যাওয়ার কথা, আমার নিষ্ঠুরতার কথা আর সিজেয়্যারিয়ান অপারেশন যে কত-কত ক্ষেত্রে সফল হয়েছে তার নানা নজিরের কথা।

এই সুযোগে আমিও ভেরাকে অতি-প্রয়োজনীয় জীবনদর্শনের গুটিকয় কথা শোনাতে চেষ্টা করতুম। দেখতুম, ভেরার মধ্যে এই জীবনবোধের ঘাটতি অবিশ্বাস্যরকমের বেশি।

আমি ওকে বলতুম, 'এই-যে তুমি এত কষ্ট পাচ্ছ এর কারণ কিন্তু তোমারই অতিলোভ। তুমি মনে করেছিলে, আনন্দ, উপভোগ, ফুর্তি, মজা, এ-সব

তোমার চাই-ই চাই। ভেবেছিলে, জীবনটা বুঝি একটানা একটা উৎসব, এর জন্যে কোনো মাসুল দিতে হবে না তোমাকে। তোমার বুঝি এই উৎসবে যোগ দিয়ে ফুর্তি করে নেচে-গেয়ে নিজে খুশিমতো আনন্দ কুড়িয়ে গেলেই চলবে।'

'তাইলি আপনে মনে করেন যে লোকেরে সারাক্ষণই খালি কষ্ট পায়্যে যাতি হবে, নাকি?'

'আমি শুধু মনে করি যে জীবনটা একটানা একটা উৎসব নয়। জীবনে উৎসবের দিন আসে খুবই কম, বেশির ভাগ সময়টাই হল কাজকর্ম, নানা ধরনের মানবিক দায়দায়িত্ব আর কর্তব্যপালনের দিন। সকল কর্মীই এইভাবে জীবন কাটায়। আর এই ধরনের জীবনে তোমার ওই উৎসবে-ভরা জীবনের চেয়ে বেশি আনন্দ আর অনেক বেশি তাৎপর্য আছে। আগে আমাদের দেশে এমন কিছু লোক ছিল যারা কাজকর্ম করত না, খালি সুখ ভোগ করত আর নানারকম ফুর্তি করে জীবন কাটাত। তা, তুমি জানো তো আমরা তাদের কী দশা করেছি? দেশ থেকে তাদের একেবারে উৎখাত করে ছেড়েছি।'

'জানি, জানি,' ফুঁপিয়ে উঠল ভেরা। 'কেউ যদি মজুর হয় তাইলি আপনে মনে করেন তারে সব্বদা কষ্ট পেতি হব্যে!'

'কেন, কষ্ট পাবে কেন সে? কাজ আর পরিশ্রমের জীবনও আনন্দে ভরে উঠতে পারে। ভাবো একবার — ছেলে হবে তোমার, তুমি তাকে ভালোবাসতে শিখবে, তোমার সংসার হবে আর ছেলে থাকবে আর তোমাকে দেখাশুনো করতে হবে তাদের। তুমি তখন আর-পাঁচজনের মতো হবে, কাজ করবে আর মাঝে-মাঝে বিশ্রাম করবে। আসলে এই-ই তো জীবন। আর পরে যখন তোমার ছেলে বড় হয়ে উঠবে তখন তাকে নষ্ট করে ফেলতে দিই নি এই কথা ভেবে তুমি আমাকে মনে করবে কৃতজ্ঞ হয়ে।'

ধীরে, অতি ধীরে, একটু-একটু করে আমার কথাগুলো মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে লাগল ভেরার। আতঙ্ক ও নিদারুণ বিরাগ নিয়ে নিজের ভবিষ্যৎকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিতে ওর পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল। কলোনির গোটা নারী-বাহিনীকে সংগঠিত করে ফেললুম আমি, আর তারা বিশেষ যত্ন নিয়ে ভেরাকে ঘিরে রইল সর্বক্ষণ, জীবনটাকে আরও বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করে ভেরার চোখ খুলে দিতে লাগল তারা। দলপতি-পরিষদ ভেরার জন্যে একখানা আলাদা ঘরের বন্দোবস্ত করলে। কুদ্‌লাতির নেতৃত্বে তিনজনের একটা দলও

নিযুক্ত হল। তারা ওই ঘরখানাকে আসবাব, বাসনকোসন আর নানা খুঁটিনাটি সাংসারিক জিনিস দিয়ে সাজিয়ে দিলে। এমন কি অপেক্ষাকৃত বাচ্চা ছেলেরাও এই সমস্ত ব্যাপারে আগ্রহ দেখাতে শুরু করল, তবে অবশ্যই তারা হালকা ছেলেমানুষি ভাব আর জীবনকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে পারার অভাবটা ঝেড়ে ফেলতে সমর্থ হল না। একদিন সিনেন্‌কিকে নতুন বাচ্চার একটা সদ্য-বানানো টুপি মাথায় দিয়ে যেতে দেখলুম-যে, তার একমাত্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যা ছিল ওটাই। ওকে সেদিন পাকড়াও করে শুধোলুম:

'কী ব্যাপার? অমন টুপি মাথায় দিয়েছ-যে?'

শুনে তাড়াতাড়ি মাথা থেকে টুপিটা খুলে ফেলল সিনেন্‌কি। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

'কোথায় পেলে অমন টুপি?'

'এয়া... ভেরার বাচ্চার জন্যি... টুপি... মেয়্যারা বানায়েল...'

'বাচ্চার টুপি? তাহলে তুমি এটা পরেছ-যে?'

'আমি পাশ দিয়ি যেতেছিলাম...'

'তারপর?'

'যেতে-যেতে দেখলাম টুপিটা ওখেনে পড়ে আছে...'

'তুমি কি দর্জিখানার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলে?'

কথা বলা নিরর্থক বুঝে সিনেন্‌কি শুধু নিঃশব্দে মাথা নাড়ল আর তাকিয়ে রইল অন্যদিকে।

বললুম, 'মেয়েরা একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে এটা বানিয়েছে। আর তুমি? তুমি কী করবে এটা নিয়ে? না, এটাকে ছিঁড়বে, নোংরা করবে, তারপর দেবে টান মেরে ফেলে, এই তো?.. এ-সবের মানে কী?'

কিন্তু এতবড় একটা দোষারোপের বোঝা সিনেন্‌কির স্বল্প সামর্থ্যের পক্ষে বওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াল। সে বলল:

'না, আন্তন সেমিওনভিচ, ব্যাপারখান হল্য গে এই: টুপিখান আমি হাতে নিতিই নাতাশা বলল, 'ওটারে নিয়ি এবার কী করবি তাই ভাবতেছি!' তা আমি বললাম, 'আমি এটা ভেরারে পোঁছায়্যে দিব।' শুন্যে নাতাশা বলল, 'ঠিক আছে, তাইলি নিয়ি যা!' তা ভেরার ঘরে গেলাম। গিয়ি দেখি কী, সে ডাক্তারখানায় গেছে। আর আপনে কিনা এখন বলতেছেন আমি এটারে ছেঁড়ব্য..

আরও একটা মাস কাটল। তার মধ্যে ভেরা শ্বধ্ব-যে আমাদের সঙ্গে সন্ধি করে ফেলল তা-ই নয়, যতখানি প্রবল আবেগ নিয়ে সে নিজের দেহে সিজেয়্যারিয়ান অপারেশন করানোর জন্যে খেপে উঠেছিল ততখানি আবেগ নিয়েই পোয়াতি হিসেবে নিজের যত্নে মেতে উঠল আর কলোনিতে ফের সিল্‌ভেস্ত্রভের আনাগোনা দেখা যেতে লাগল। ব্যাপারস্যাপার লক্ষ্য করে এমন কি আমাদের 'সূক্ষ্মবুঝি' যে-গালাতেঙ্কো সে-ও কিনা একদিন অবাক হয়ে দু'হাত ওপরে ছুড়ে বলে উঠল:

'নাঃ, আর পারা যায় না! ওয়ারা দেখি এখন বিয়াও করতি চায়!'

এদিকে জীবন বয়ে চলল অব্যাহত গতিতে। আমাদের জীবনের ট্রেনখানা আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠল আর তার আনন্দময় সুগন্ধি ধোঁয়া আমাদের খুশির সোভিয়েত দিনগুলোর উদার মাঠপ্রান্তরকে ঢেকে ছুটে চলল পূর্ণবেগে। সোভিয়েত-মনোভাবাপন্ন মানুষজন আমাদের জীবনের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করে খুশি হয়ে উঠলেন। দর্শনার্থী অভ্যাগতরা আমাদের কাছে আসতেন রবিবার-রবিবার — এঁদের মধ্যে থাকতেন ছাত্রছাত্রী, শ্রমিকদের দল, শিক্ষাবিৎ আর সাংবাদিকরা। খবরের কাগজ আর পত্রিকাগুলো আমাদের জীবনযাত্রার সরল, সহানুভূতিপূর্ণ বিবরণ ছাপত, আর তার সঙ্গে ছাপত ছেলেদের ফোটোগ্রাফ আর শুয়োরের খোঁয়াড় ও ছুতোরশালের ছবি। অতিথিরা আমাদের জীবনযাত্রার সরল, পরিমিত চাকচিক্যে যে প্রভাবিত হতেন না এমন নয়, বরং বিদায় নেবার সময়ে তাঁদের নতুন-পাতানো বন্ধুদের সঙ্গে সাবেগ করমর্দন করতেন আর আবার আসবার নেমন্তন্নের জবাবে রীতিমতো স্যালুট ঠুকে 'ঠিক হ্যয়' পর্যন্ত বলতেন।

আমাদের কলোনি দেখানোর জন্যে ক্রমশ বেশি-বেশি সংখ্যায় বিদেশীদেরও আনা হতে লাগল। এইসব সুবেশ ভদ্রলোক সৌজন্য দেখিয়ে চোখ সরু-সরু করে আমাদের আদিম ধরনের ঐশ্বর্য, মঠের প্রাচীন গম্বুজ আর ছেলেদের পরনের পাতলা সুতীর আঙরাখাগুলো লক্ষ্য করতেন। এমন কি আমাদের গোয়ালঘরগুলো দেখিয়েও তাঁদের মনে কোনো বিকারের ভাব লক্ষ্য করা গেল না। তবে ছেলেদের প্রাণবন্ত কচি মুখ, কর্মব্যস্ত দিনের চাপা গুনগুনানি, অতিথিদের রঙবেরঙের মোজা আর খাটো জ্যাকেটগুলোর, তাঁদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিপাটি মুখ আর হাতে-হাতে খুদে-খুদে নোটবইয়ের দিকে তাদের তাকানোর মধ্যে প্রায়-বোঝা-যায়-না এমন একটা সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের ভাব — এসব

জিনিস যেন আমাদের এই বিদেশী অতিথিদের মনে এক-আধটুকু দাগ কাটত বলে মনে হোত।

দোভাষীদের তাঁরা অস্থির করে তুলতেন অনবরত নানারকম প্যাঁচালো প্রশ্ন করে — কেন যেন তাঁদের কিছুতেই বিশ্বাস হোত না যে আমরা নিজেরা মঠের পাঁচিলটা ভেঙে উড়িয়ে দিয়েছি, যদিও চারপাশে পাঁচিলের অস্তিত্বের চিহ্নমাত্র ছিল না, তবু। তাঁরা অনুমতি চাইতেন সরাসরি ছেলেদের সঙ্গে কথা বলার। আমি অনুমতি দিতুম বটে, তবে কড়াকড়িভাবে এই শর্ত করিয়ে নিতুম যে ছেলেদের অতীত জীবন সম্বন্ধে তাদের কোনো প্রশ্ন করা যাবে না। এতে বিদেশী অতিথিরা কেমন সন্দেহাতুর হয়ে উঠতেন, কেন ওই প্রশ্ন করা যাবে না তা-ই নিয়ে তর্ক দিতেন জুড়ে। এতে কোনো দোভাষী হয়তো একটু অস্বস্তি বোধ করে আমাকে বলতেন:

'ওঁরা জানতে চাইছেন, আপনি রক্ষণাধীন ছেলেদের অতীতের কথা গোপন করতে চাইছেন কেন। ওদের অতীত যত খারাপ হবে ততই তো ওদের এই পরিণতিতে আপনার গৌরব বৃদ্ধি পাবে, তাই না?'

দোভাষী অতঃপর ভারি খুশি হয়ে আমার জবাবটা ওঁদের তর্জমা করে শোনাতেন। আমি জানাতুম:

আমরা গৌরবটৌরব চাই না। আমি শুধু চাই যে ওঁরা নিতান্তই সাধারণ একটা সৌজন্য রক্ষা করে চলবেন। ওঁদের বলুন যে আমরা তো আমাদের অতিথিদের অতীত নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইছি না।'

শুনে অতিথিদের মুখেও হাসি ফুটে উঠত। তাঁরা খুশি হয়ে মাথা নেড়ে বলতেন:

'তা বটে, ইয়েস, ইয়েস!'

অতঃপর তাঁরা দামি মোটরে চেপে চলে যেতেন, আর আমাদের জীবনযাত্রা গড়িয়ে চলত যথাপূর্বং।

ওই বছর শরৎকালে আরও একদল কলোনি-বাসিন্দা 'রাব্‌ফাক'-এ ভর্তি হয়ে চলে গেল। আর তারপর শীতকালে আরও একবাব ক্লাসরুমগুলোয় আমরা ধৈর্য ধরে ইটের পরে ইট সাজিয়ে শিক্ষা-সংক্রান্ত সংস্কৃতির অনাড়ম্বর, তবু কল্পনার রঙে রাঙানো প্রাসাদখানি গড়ে তুলতে শুরু করলুম।

আর কালক্রমে ফের একবার বসন্ত এসে হাজির হল! যাকে বলা যায় একেবারে অকালবসন্ত! আর মাত্র তিনদিনে সবকিছু ধুয়েমুছে সাফ। শুকনো,

গ‍ুঁড়ো-গ‍ুঁড়ো বরফের চাপড়া তখনও অবশ্য রয়ে গেল পরিষ্কার-নিকনো খামারের পথে-পথে। কে যেন চলে গেল বড়রাস্তা দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি হাঁকিয়ে আর তার গাড়ির ওপর বসানো খালি বালতিগ‍ুলো পরস্পর ঠোকাঠুকি করে খ‍ুশির বাজনা বাজাতে-বাজাতে চলল। আকাশ হয়ে উঠল ঘননীল, অনেক উ‍ঁচু আর খ‍ুশিতে ঝলমলে। বসন্তের উষ্ণ বাতাসে কলোনির ওপর রক্তপতাকাটা সজোরে পত্‌পত আওয়াজ তুলে উড়তে লাগল। সামনের ক্লাবঘরের সদর দরজাটা ছিল হাট-করে-খোলা, আর তার ঢোকার পথের ম‍ুখটায় পরিষ্কার ধোয়ামোছা মেঝের ওপর সযত্নে-বিছনো কার্পেটের কয়েকটা ফালি, সবই সেই অনভ্যস্ত ঠাণ্ডায় আরও যেন পরিচ্ছন্ন ঠেকছিল।

বীজতলার কাচঘরগ‍ুলোয় এর অনেক আগে থেকেই প‍ুরোদমে কাজ শ‍ুর‍ু হয়ে গিয়েছিল। বীজতলা ঢাকা দেয়ার খড়ের চাটাইগ‍ুলো এখন দিনের বেলায় ভাঁজ করে একপাশে সরিয়ে রাখা হচ্ছিল আর ওপরকার কাচের ছাউনিগ‍ুলো রাখা হচ্ছিল খোঁটার ঠেকো দিয়ে কাত করে আর উ‍ঁচু করে। গজিয়ে-ওঠা চারাগ‍ুলোকে বাছাই করার জন্যে ছ‍ুঁচলো লম্বা কাঠি-হাতে ছেলেমেয়েরা বীজতলার চারপাশে বসে অনবরত গল্পগ‍ুজবে জায়গাটা ম‍ুখর করে রাখছিল। জ‍ুর্‌বিনের মেয়ে জেনিয়া প্রথম প‍ৃথিবীর ম‍ুখ দেখেছিল ১৯২৪ সালে আর যে সময়ের কথা বলছি তখন সে প্রথম মাটির ব‍ুকে নিজের ইচ্ছেমতো হে‍ঁটে বেড়াতে শ‍ুর‍ু করেছিল। সে এখন একবার বিশাল বীজতলায়, একবার 'মলদিয়েত্‌স'-এর আস্তাবলে ভয়ে-ভয়ে উ‍ঁকিঝ‍ুঁকি দিয়ে বেড়াতে লাগল আর প্রশ্ন করে-করে সবাইকে অস্থির করে তুলল:

'আথা, লাঙল তালাবে কে? থেলেরা? আর 'মলদিয়েত্‌স'ও দমি তষবে? থেলেদের সাথে? আথা, কী কলে দমিতে তাষ দিতে হয়? বল-না!'

...ইস্টারের পর আমরা একটা গ‍ুজব শ‍ুনল‍ুম যে খার্‌কভে আমাদের উল্‌টো দিকের শহরতলিতে একখানা নতুন বাড়ি বানাচ্ছে 'গে.পে.উ' আর বাড়িটায় নাকি বাচ্চাদের একটা কলোনি বসানো হবে। তবে কলোনিটা জনশিক্ষা-দপ্তরের অধীনে থাকবে না, কলোনি চালাবে 'গে.পে.উ'ই। কলোনির ছেলেরা এই খবরটাকে নিল নতুন একটা য‍ুগের স‍ূচনা হিসেবে। তারা বলাবলি করতে লাগল:

'ভাবো একবার কাণ্ডখান, নতুন একখান বাড়ি বানাতেছে! আনকোরা নতুন বাড়ি একখান!'

আর গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে একদিন একখানা মোটর এসে আমাদের কলোনির সামনে থামল। আর কাঁধে লাল ফিতে-লাগানো একব্যক্তি এসে আমার সঙ্গে দেখা করে বললেন:

'আপনার যদি সময় থাকে তাহলে দয়া করে একবার আমার সঙ্গে একটু চলুন। দ্জের্জিন্স্কি কমিউনের জন্যে আমরা একখানা বাড়ি তৈরির কাজ শেষ করতে যাচ্ছি। আমাদের ইচ্ছে যে আপনি গিয়ে একবার বাড়িখানা দেখুন... শিক্ষা-বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।'

সঙ্গে গেলুম।

কিন্তু বাড়ি দেখে আমি তো তাজ্জব। এ-বাড়ি রাস্তার অনাথ ছেলেপিলের জন্যে? এ তো এক বিশাল আলো-হাওয়ায় ভরা প্রাসাদ! বাড়িখানার কাঠের মেঝে নকশা-কাটা আর ছাদ রঙ্ করা!

তাহলে বৃথাই আমি সাত বছর ধরে স্বপ্ন দেখে কাটাই নি! শিক্ষাদানের জন্যে ভবিষ্যতে বড়-বড় প্রাসাদ গড়ে উঠবে আমার এমন কল্পনা তাহলে মিথ্যে ছিল না! রীতিমতো একটা ঈর্ষার অনুভূতি নিয়ে 'চেকা'র লোকটিকে আমি 'শিক্ষা-বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি' ব্যাখ্যা করে বোঝালুম, আর লোকটিও দিব্যি আমার কথাগুলো গিললেন সেগুলোকে আমার শিক্ষাবিজ্ঞানগত অভিজ্ঞতার ফসল হিসেবে বিশ্বাস করে। তারপর ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দিলেন।

ঈর্ষায় পুড়তে-পুড়তে কলোনিতে ফিরলুম আমি। ভাবতে লাগলুম, কে সে ভাগ্যবান ব্যক্তি যে ওই প্রাসাদে কাজের ভার নেবে? প্রাসাদ বানানো তো সোজা, কিন্তু তারপর? তার পরের কাজটা তো অত সোজা নয়। তবে যাই হোক আমার এই মনপোড়ানি বেশিদিন রইল না। মনে হল, আমার হাতেগড়া যৌথ সমাজ কি যে-কোনো প্রাসাদের চেয়ে বেশি মনোরম নয়?

সেপ্টেম্বর মাসে ভেরা একটি ছেলে প্রসব করল। আর তারপর একদিন কমরেড জোইয়া কলোনিতে এলেন। এসে আমার অফিসঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে আমার ওপর জ্বলন্ত ক্রোধের অগ্নিবর্ষণ শুরু করে দিলেন।

'বাঃ, আপনার মেয়েরা তাহলে বাচ্চা প্রসবও করছে!'

'আহা, বহুবচন কেন? তা, এতে এত আতঙ্কিত হবার কী পেলেন আপনি?'

'আতঙ্কিত হবার কিছু নেই? মেয়েরা বাচ্চা প্রসব করে চলবে তাহলে?'

'স্বভাবতই বাচ্চা প্রসব করবে... বাচ্চা ছাড়া আর কী প্রসব করবে তারা?'

'এটা ঠাট্টার ব্যাপার নয়, কমরেড!'

'কই, আমি তো ঠাট্টা করছি না।'

'এখুনি একটা জবানবন্দী লিখে ফেলতে হবে।'

'ওসব যা-কিছু দরকার সবই তো রেজিস্ট্রি অফিস সেরে ফেলেছে।'

'রেজিস্ট্রি অফিস এক জিনিস, আর আমাদের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন।'

'আপনাকে কেউই 'বার্থ সার্টিফিকেট' লেখার ক্ষমতা তো দেয় নি।'

'এটা 'বার্থ' নয়, এটা আরও... জঘন্য কিছু!'

'জন্মের চেয়েও জঘন্য? আমার তো ধারণা ছিল এর চেয়ে জঘন্য আর কিছু নেই... শোপেনহাউয়ের না কে যেন একজন বলেছেন...'

'দয়া করে আপনার ওই কথার ঢঙটা পালটাবেন কি কমরেড?'

'না, পালটাতে চাই না।'

'পালটাতে চান না? এ-কথার মানে কী?'

'আপনি কী চান যে আমি সিরিয়স হই?.. বেশ। কিন্তু বুঝছেন না যে সবকিছুতে আমার ঘেন্না ধরে গেছে — ঘেন্না ধরে গেছে সবকিছুতে! এই হল আমার কথা! যান, চলে যান, জবানবন্দী আপনার লেখা চলবে না!'

'ঠিক আছে, দেখা যাবে!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, দেখুন গিয়ে! আমি আপনার সেবক!'

উনি চলে গেলেন, তবে ওঁর 'দেখা যাবে'র ফল হিসেবে কিন্তু কিছুই দেখা গেল না।

নতুন মা হিসেবে অসামান্য দক্ষতা দেখাল ভেরা। সত্যিকার সতর্ক, স্নেহশীল আর যুক্তিবাদী মা হিসেবে প্রমাণ দিল নিজের। এর বেশি আর কী আমি ওর কাছ থেকে চাইতে পারতুম! ওকে আমাদের হিসেবরক্ষকের অফিসে কাজ দেয়া হল।

এর অনেক আগেই মাঠের ফসল কাটা হয়ে গিয়েছিল, ফসল ঝাড়াইমাড়াইয়ের কাজও গিয়েছিল চুকে, শীতের জন্যে মাটির নিচে যা কিছু সঞ্চয় করে রাখার দরকার ছিল তা রাখার কাজও মিটে গিয়েছিল, ওয়র্কশপগুলোতে কাঁচামাল সরবরাহের পালাও শেষ আর নতুন কিছু কলোনি-বাসিন্দাকে ভর্তি করেও নেয়া হয়েছিল।

প্রথম বার তুষার পড়ল খ্বই তাড়াতাড়ি। তার আগের দিনটাও ছিল গরম। আর তারপর রাতের বেলায় হালকা তুষারফলক কুরিয়াজের মাথার ওপর নিঃশব্দ পায়ে, সতর্কভাবে ঘ্রে-ঘ্রে নাচতে শ্র্ করল। পরদিন সকালে জেনিয়া জ্র্বিনা বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এসে উঠোনের শাদা চৌকোনাটার দিকে তাকিয়ে চোখ পিট্পিট করতে লাগল।

তারপর ভারি অবাক হয়ে শ্ধোল, 'মাথে এমন ন্ন থড়াল কে?.. ও মা! তাই তো! ব্ধেথি-ব্ধেথি, এ থেলেদের কম্মো! আমি থিক জানি!'

১৩

'আহা, বেচারা বাচ্চাটাকে একটু সাহায্য কর!'

দ্জের্জিন্স্কি কমিউনের বসবাসের বাড়িখানা ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বাচ্চা ওকগাছের একটা বনের প্রান্তে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল পাঁশ্টেরঙের স্ন্দর বাড়িখানা, আর তার সামনের ঝকঝকে ম্খটা ফেরানো ছিল খার্কভ শহরের দিকে। বাড়িটায় ছিল উ'চু-উ'চু এজমালি সব শোবার ঘর, চমৎকার বড়-বড় হলঘর, চওড়া-চওড়া সি'ড়ি, আর আগাগোড়া সাজানো ছিল বাড়িটা পরদা আর নানারকম ছবি দিয়ে। কমিউনের জন্যে সবকিছ্ই র্চিসম্মতভাবে আর ভবিষ্যদ্দৃষ্টি নিয়ে করা হয়েছিল, শিক্ষাবিজ্ঞানী পণ্ডিতদের ফতোয়া অন্যায়ী একেবারেই নয়।

ওয়র্কশপ তৈরির জন্যে বাড়িটায় ছেড়ে দেয়া হয়েছিল দ্'খানা হলঘর। তার একটার এককোণে আবার একটা জ্তো-মেরামতি কারখানা দেখে আমি তো তাজ্জব!

কমিউনের ছ্তোরশালে চমৎকার লেদ-মেশিনও বসানো হয়েছিল। তবে অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে কমিউনের সংগঠকরা নিজেদের ব্যবস্থাদি সম্পর্কে যথেষ্ট নিশ্চিত ছিলেন বলে মনে হল না। তাঁরা আমায় এবং গোর্কি কলোনিকে অন্রোধ জানালেন নতুন প্রতিষ্ঠানটিকে দ্বারোদ্ঘাটনের দিনটির জন্যে সাজিয়েগ্ছিয়ে তৈরি করে তুলতে। ফলে কাজটির জন্যে কির্গিজভের নেতৃত্বে একটি ছোট বাহিনীকে আমি নিয্ক্ত করল্ম আর ছেলেরাও প্রচণ্ড উদ্যম নিয়ে এই নতুন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দ্জের্জিন্স্কি কমিউনে এক শোটির বেশি ছেলেপিলেকে নেয়ার কথা ভাবেন নি সংগঠকরা। তবে কমিউনটি ছিল ফেলিক্স দ্জের্জিন্স্কির স্মরণে উৎসর্গীকৃত আর ইউক্রেনের 'চেকা'-দপ্তরের লোকজন সেটি গড়ার জন্যে শুধু-যে তাঁদের নিজস্ব পয়সাকড়ি দান করেছিলেন তা-ই নয়, তাঁদের অবসরের সবটুকু সময়, হৃদয়মনের সবটুকু শক্তি পর্যন্ত বিনিয়োগ করেছিলেন এই কাজে। কেবল একটাই ব্যাপার ছিল যা নতুন কমিউনকে দেয়া তাঁদের সাধ্যের মধ্যে ছিল না, আর তা হল শিক্ষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব। এই তত্ত্বে তাঁরা তেমন পারদর্শী ছিলেন না। কিন্তু তাতে কী, সব সত্ত্বেও হাতে-কলমে শিক্ষাদানের প্রয়োগের ব্যাপারে পিছ্-পা হবার পাত্র ছিলেন না তাঁরা।

'চেকা'র কমরেডরা এই কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন কীভাবে তা দেখার আমার প্রচন্ড কৌতূহল ছিল। ধরেই নিলুম তাঁরা না-হয় শিক্ষাবিজ্ঞানের তত্ত্বকে উপেক্ষা করলেন, কিন্তু তাই বলে তত্ত্ব কি তাঁদের পিছু ছাড়বে? তাঁদের কাছে এ-ধরনের সম্পূর্ণ নতুন আর মূলগত একটা ব্যাপারে শিক্ষাবিজ্ঞানের একেবারে নবতন একটা আবিষ্কার — যেমন, ধরা যাক, ছেলেপিলেদের মধ্যে নিচুতলার স্বায়ত্তশাসনের অধিকারঘটিত ব্যাপারটি — হাতে-কলমে প্রয়োগ করলেই কি ভালো হোত না? আবার এ-ও মনে হল, 'চেকা'র লোকজন কি শিক্ষাবিজ্ঞানের স্বার্থে তাঁদের এত কষ্টের রঙকরা ঘরের ছাদ আর সুন্দর-সুন্দর আসবাব জলাঞ্জলি দিতে রাজি হবেন? যাই হোক, শিগ্গিরই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে তাঁরা মোটেই এরকম ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত নন। 'চেকা'র সেই লোকটি একদিন তাঁর অফিসে আমায় একটা নরম আরামকেদারায় খাতির করে বসিয়ে যা বললেন তা হল গিয়ে এই:

'আপনার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে। কমিউনের এই সবকিছু ভেঙেচুরে ছেলেরা তছনছ করে ফেলুক এটা আমরা হতে দিতে পারি না। অবশ্য তা বলে কমিউন বাদ দেয়া চলে না, কমিউন গড়তেই হবে, এখনও বহুদিন এদেশে কমিউন টিকিয়ে রাখা দরকার। আমরা জানি আপনার একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ যৌথ সংস্থা আছে। আমি বলি কী, ব্যাপারটা শুরু করার জন্যে আপনি আমাদের পঞ্চাশটি ছেলে দিন, তাহলে বাকিটা আমরা রাস্তা-থেকে-কুড়নো ছেলে দিয়ে পুরিয়ে দেব। এতে ছেলেরা তাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকারভোগী সমিতি আর নিয়মশৃঙ্খলাও পেয়ে যাবে। কথাটা বুঝলেন তো?'

বুঝলুম না আবার, খুবই বুঝলুম। আমি পরিষ্কার বুঝে গেলুম যে ওই বুদ্ধিমান ব্যক্তিটির শিক্ষাবিজ্ঞান-যে কী বস্তু সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র কোনো ধারণা নেই। সত্যি কথা বলতে কী, ওই মুহূর্তে আমি একটা অন্যায় কাজই বুঝি করে বসলুম। কেননা শিক্ষাবিজ্ঞান বলে-যে একটা বস্তু আছে কমরেড ভে.'র কাছ থেকে আমি তা গোপন করলুম এবং 'নিচুতলার স্বায়ত্তশাসন'-এর ব্যাপারে একেবারে টুঁ-শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করলুম না। উলটে বলে বসলুম: 'ঠিক হ্যয়!' তারপর ইতিউতি তাকাতে-তাকাতে আর মনে-মনে খুব একচোট হেসে নিয়ে পা-টিপে-টিপে চুপিসারে সরে পড়লুম।

নতুন যৌথটি গড়ার ব্যাপারে গোর্কিপন্থী ছেলেদের ওপর-যে ভার দেয়া হল এতে আমি খুশিই হলুম। তবে ব্যাপারটার মধ্যে একটা করুণ বিয়োগান্ত দিকও ছিল। ভাবছিলুম, আমার সবসেরা ছেলেপিলেকে আমি দিয়ে দিই কী করে? গোর্কি যৌথ সংস্থার কাছে তার প্রতিটি সেরা সদস্যের অত্যন্ত বেশি প্রয়োজন নেই কি?

কির্‌গিজভের বাহিনীর কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে আসছিল। কমিউনের জন্যে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র আমাদের ওয়র্কশপগুলোয় তৈরি হচ্ছিল আর আমাদের দর্জির কারখানায় মেয়েরা ভবিষ্যৎ 'কমিউনার্ড'দের পোশাক তৈরির কাজ দিয়েছিল শুরু করে। আর এই বানানো পোশাকগুলো যাতে গায়ে ঠিক হয় তার জন্যে আমাদের দেয় পঞ্চাশজন 'দ্‌জের্‌জিন্‌স্কি-পন্থী'কে তখনই মনোনীত করা দরকার হয়ে পড়েছিল। ফলে দলপতি-পরিষদ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপারটার আলোচনা শুরু করল।

লাপত বলল, 'ভালো ছেলেদেরই অবিশ্যি কমিউনে পাঠাতি হবে। তবে বড় ছেলেদের মধ্যি থেকে কাউরে পাঠানো চলবে না। বড় ছেলেরা শেষ অবধি গোর্কিপন্থী থেকে যাক। কারণ, তাদের আর কয়টা দিন? শিগ্‌গিরই তো তাদেরকে দুনিয়ায় বার হয়ি পড়তি লাগবে।'

লাপতের এ-কথায় দলপতিরা সবাই রাজি হল। কিন্তু যখন ফর্দ ধরে-ধরে নামবাছাই শুরু হল, তখন তুমুল তর্কবিতর্ক বেধে গেল। প্রত্যেক দলপতিই তখন চাইল তার নিজের বাহিনীটিকে বাঁচিয়ে অন্যের বাহিনী থেকে ভবিষ্যৎ কমিউনার্ডদের বাছতে। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে সেদিন মিটিঙ চালিয়ে যেতে হল আমাদের। অবশেষে চল্লিশটি ছেলে আর দশটি মেয়ের নামের একটা ফর্দ তৈরি করা গেল। ফর্দের মধ্যে ধরা হল জেভেলিদের দুই ভাইকে,

তাছাড়া গোর্‌কভ্‌স্কি, ভানিয়া জাইচেঙ্কো, মালিকভ, অদারিউক, জোরেন, নিসিনভ, সিনেন্‌কি, শারোভ্‌স্কি, গার্দিনভ, ওলিয়া লানভা, স্মেনা, ভাস্‌কা আলেক্সেয়েভ ও মার্ক শেইন্‌হাউসকে। আর একমাত্র ফর্দটাকে আর-একটুকু জাঁকালো করে তোলার উদ্দেশ্যেই তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হল মিশা অভ্‌চারেঙ্কোর নাম। ফিরেফিরতি আরেকবার গোটা ফর্দটা পড়ে দেখে আমি খুশিই হলুম। ভাবলুম, বয়সে বাচ্চা হলে হবে কী, ছেলেরা সব ক'জনই ভারি ভালো, ভারি শক্তপোক্ত ছেলে।

কমিউনে স্থানান্তরণের জন্যে নির্বাচিত কলোনি-বাসিন্দারা বদ্‌লির প্রস্তুতি হিসেবে নিজেদের সবকিছু গুছিয়েগাছিয়ে নিতে শুরু করল। এর আগে তাদের নতুন বাড়ি দেখে নি তারা আর তাই সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদ তাদের কাছে বেশি করে করুণ ঠেকছিল। এমন কি তাদের মধ্যে কাউকে-কাউকে এমন কথাও বলতে শোনা গেল:

'কে জানে ওখেনে অবস্তাডা কেমন দাঁড়াব্যে! ঘরদোর ভালো হতি পারে, কিন্তু তাতে কী, আসল কথা তো হল গিয়ি মানুষজন।'

নভেম্বরের শেষাশেষি লাগাদ স্থানান্তরণের সমস্ত ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল। নতুন কমিউনের জন্যে কর্মীর একটা দল সংগ্রহ করতে লেগে গেলুম আমি। বিদায়ী ছেলেমেয়েদের উৎসাহ যোগানোর জন্যে এই দলে কির্‌গিজভের নামটাও যোগ করে দিলুম।

আর এই সবকিছু ব্যবস্থাই করতে লাগলুম আমি ইউক্রেনের তদানীন্তন শিক্ষা-সংক্রান্ত জনকমিশারিয়েতে যাঁরা 'চিন্তাভাবনা করে থাকেন' এমন সমস্ত 'শিক্ষাবিজ্ঞানী চক্রের' সঙ্গে প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছেদের একটা পরিস্থিতিতে। ওই সময়ে কিছুদিন ধরে আমার সম্পর্কে এই সমস্ত চক্রের মনোভাব নেতিবাচক তো বটেই, এমন কি ছিল অবজ্ঞায়-ভরা। চক্রগুলো এমনিতে অবশ্য তেমন বড় ছিল না আর ওইসব চক্রের মানুষজনের মনোভাব বোঝাও ছিল জলের মতো সরল, কিন্তু তবু যে-কোনো কারণেই হোক একথা মনে হচ্ছিল যে আমার আর বিশেষ আশা-ভরসা নেই।

এমন একটা দিনও যাচ্ছিল না তখন যখন তুচ্ছ বা গুরুত্বপূর্ণ যে-কোনো কাজের ব্যাপারেই কেউ-না-কেউ আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল যে কত অধঃপতন ঘটেছে আমার। ফলে নিজের শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধেই আমার কেমন একটা সন্দেহ দেখা দিতে লাগল। সবচেয়ে সুন্দর আর মনোরম ঘটনাগুলোও

হঠাৎ কেমন মন-কষাকষি আর সংঘর্ষের কারণ হয়ে দাঁড়াল। নিজেরই হঠাৎ-হঠাৎ মনে হতে লাগল, ব্যাপারটা কী? তবে কি আমি আগাগোড়াই ভুল করে চলেছি?

ওই সময়ে খার্কভে 'শিশুসখা'দের এক সম্মেলন ডাকা হয়েছিল। ঠিক হল যে আমাদের কলোনি খার্কভে গিয়ে এই সম্মেলনকে অভ্যর্থনা জানাবে। আরও কথা হল, আমরা কাঁটায়-কাঁটায় বেলা তিনটেয় সম্মেলনের জায়গায় গিয়ে হাজিরা দেব।

আমাদের হেঁটে যেতে হচ্ছিল দশ কিলোমিটার পথ। ফলে হাতঘড়ি দেখে সময় হিসেব করে ধীরেসুস্থে ছেলেমেয়েদের নিয়ে চললুম। বিশ্রাম করা, জল খাওয়া আর শহরটা এক-আধটুকু তাকিয়ে দেখার জন্যে মাঝে-মাঝে থামছিলুম আমরা। এই ধরনের পদযাত্রা কলোনি-বাসিন্দাদেরও ভারি পছন্দসই ছিল। কারণ এতে পথ-চলতে আমাদের ওপর লোকের নজর পড়ত, আমরা বিশ্রাম নেবার সময় লোকে ঘিরে ধরত আমাদের, নানা প্রশ্ন শুধোত, আমাদের বন্ধু বনে যেত। আর খুশিতে ডগমগ, ফিটফাট কেতাদুরস্ত কলোনি-বাসিন্দারাও নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে-করতে আর থেমে-থেমে বিশ্রাম নিতে-নিতে এগিয়ে চলত। এতে তারা নিজেদের যৌথ জীবনের মাধুর্যটা মর্মে-মর্মে অনুভব করতে পারত। অন্যান্য বারের মতো সেবারও সবকিছুই চমৎকারভাবে চলছিল, কেবলমাত্র পদযাত্রার চরম উদ্দেশ্যটাই যা-কিছু দুশ্চিন্তার খোরাক যোগাচ্ছিল। অবশেষে আমাদের বাহিনী সার বেঁধে, পতাকা উড়িয়ে আর বাজনার তালে-তালে যখন সম্মেলনের জায়গায় এসে উপস্থিত হল, আমার হাতঘড়িতে তখন কাঁটায়-কাঁটায় তিনটে বাজছে। কিন্তু এমনই আমার কপাল যে আমরা এসে পেঁছিতেই মহা চটেমটে এক বুদ্ধিজীবী মহিলা ছুটে এসে আমাদের দিকে ঘেউঘেউ শুরু করে দিলেন। বললেন:

'এত সাত-তাড়াতাড়ি আসার কী দরকার ছিল? এখন বাচ্চাগুলোকে রাস্তায় অপেক্ষা করতে হবে তো!'

শুনে আমি হাতঘড়িটা ভালো করে দেখিয়ে দিলুম তাঁকে। কিন্তু জবাবে শুনলুম:

'তা, তাতে হয়েছেটা কী?.. এখনও অনেককিছু যোগাড়যন্ত্র করা বাকি।'

'কিন্তু আগেই তো কথা হয়েছিল, ঠিক তিনটের সময় আসতে হবে।'

'ওহ্, কমরেড, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না! সব সময়ই একটা-না-একটা গোঁ আপনাকে পেয়ে বসবেই!'

কলোনি-বাসিন্দারাও ভেবে পেল না তাদের অপরাধটা কিসে ঘটল। কেনই-বা তাদের এমন গাল খেতে হচ্ছে।

'একেবারে দুধের বাচ্চাদেরও নিয়ে এসেছেন কেন?'

'গোটা কলোনিই এসেছে-যে।'

'দুধের বাচ্চাদের দশ কিলোমিটার হাঁটিয়ে কেউ-যে আনতে পারে এ তো ভাবাই যায় না। নাঃ, এ একেবারে ক্ষমার অযোগ্য! লোকদেখানি বাহবা নেবার জন্যে এতখানি নিষ্ঠুর হওয়া! কে আপনাকে এ অধিকার দিয়েছে?'

'বাচ্চারা এই বেড়ানোটা কিন্তু ভারি উপভোগ করেছে... তাছাড়া এখানে অভ্যর্থনা-পালটা অভ্যর্থনার পালা চুকলে পর আমাদের সার্কাস দেখতে যাওয়ার কথা। কাজেই বাচ্চাদের আমি ফেলে আসি কী করে?'

'আবার সার্কাসও দেখা হবে! তা, সার্কাস দেখে আপনারা ঘরে ফিরবেন কখন, শুনি?'

'গভীর রাত্রে!'

'কমরেড — কচি বাচ্চাদের এখুনি ফেরত পাঠিয়ে দিন!'

শুনে 'দুধের বাচ্চারা', অর্থাৎ জাইচেঙ্কো, মালিকভ, জোরেন, সিনেন্‌কি — এরা উদ্বেগে ফ্যাকাশে মেরে গেল আর আমার দিকে করুণ মিনতিভরা চোখে তাকিয়ে রইল।

বললুম, 'তাহলে ওদের মত নেয়া যাক।'

'মত নেয়াটেয়ার কোনো দরকার নেই — সবই জলের মতো পরিষ্কার। এখুনি ওদের ঘরে পাঠিয়ে দিন!'

'কিছু মনে করবেন না, আমি আপনার অধীন নই, তাই আপনার হুকুম মানতে পারছি না।'

'তাহলে আমাকেই ওদের ফিরে যাওয়ার হুকুম দিতে হবে।'

শুনে হাসি চাপতে পারলুম না।

বললুম, 'তা-ই দিন তাহলে!'

কর্তাব্যক্তি মহিলাটি এবার আমাদের সারির একেবারে বাঁ-দিকে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন:

'বাচ্চারা!.. তোমরা যারা সবচেয়ে অল্পবয়সী... লক্ষ্মী-সোনারা, সোজা ঘরে ফিরে দেখি! এখ্খুনি! তোমরা নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ...'

কিন্তু ওঁর স্নেহমাখা মিষ্টি কথায় কেউ ভুলল না। ওদের মধ্যে থেকে কে যেন একজন চে'চিয়ে বলে উঠল:

'ঘরে ফিরি যাব, না আর কিছু! মোট্টেও না!..'

'তাছাড়া তোমাদের সার্কাসেও যাওয়া চলবে না। তাহলে অনেক রাত হয়ে যাবে...'

শুনে 'দুধের বাচ্চারা' হেসে উঠল। দুষ্টুমি করে চোখ নাচিয়ে জোরেন বলল:

'ওনার দিকি দ্যাখ্, দ্যাখ্... মস্ত চালাক লোক এয়িছেন!.. আস্তন সেমিওনভিচ, দ্যাখেন একবার — ভারি চালাক ওনি, তাই না?'

আর ভানিয়া জাইচেঙ্কো ধীর-গম্ভীরভাবে পতাকার দিকে ওর নিজস্ব ধরনে হাতখানা ছড়িয়ে দিয়ে বলে উঠল:

'অমনভাবে কথা বলতি হয় না, বোঝলেন!.. আমরা যখন কুচকাওয়াজের ভঙ্গীতি লাইন দিয়ি খাড়ায়্যে আছি তখন আপনে আমাদের সাথে অমনভাবে কথা বলতি পারেন না... আমরা প্রতীক-পতাকার নিচি খাড়ায়্যে আছি — দেখতি পাতিছেন না?'

শোচনীয়রকম ফৌজী শিক্ষা-পাওয়া, গোল্লায়-যাওয়া ছেলেদের দিকে করুণ সমবেদনার চোখে তাকিয়ে ভদ্রমহিলা এবার সুড়সুড় করে সরে গেলেন।

এই ধরনের মতান্তর-মনান্তরের অবশ্য মনখারাপ করার মতো তাৎক্ষণিক কোনো ফলাফল দেখা যেত না, তবে এইসব ঘটনা আমার মধ্যে পরিপার্শ্ব থেকে বিচ্ছিন্নতার একটা অসহনীয় বোধ জাগিয়ে তুলত। তবে এতেও আমি ক্রমে-ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে উঠছিলুম। ক্রমশ আমি শিখলুম কীভাবে এ-ধরনের প্রতিটি নতুন উৎপাতের মুখোমুখি হতে হয়, অপরিসীম বিরক্তি মনের মধ্যে চেপে উৎপাতটা সহ্য করতে হয়, তারপর যেনতেনপ্রকারে জয় করতে হয় নিজের বিরক্তিকে। প্রাণপণে আমি চেষ্টা করতুম তর্ক এড়িয়ে যেতে, যদি-বা কখনও পালটা খ্যাঁক করে উঠতুম তবে তা নিছক সৌজন্যবশেই! সত্যি, নিছক সৌজন্যবশেই! ওপরওয়ালা কর্তাব্যক্তিদের কথার জবাবে ভালোমন্দ কিছু তো একটা বলা দরকার, তাই!

অক্টোবর মাসে আর্‌কাদি উজিকভের ব্যাপারে না-হক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লুম আমরা। আর এর ফলে আমার আর 'ওঁদের' মধ্যে শেষপর্যন্ত এক চরম, দুর্লঙ্ঘ্য ফারাক সৃষ্টি হয়ে গেল।

ব্যাপারটা ঘটেছিল এই। 'রাব্‌ফাক'-এর ছাত্রছাত্রীরা সপ্তাহান্তিক ছুটি কাটাতে আমাদের কাছে এসেছিল। রাত্রে ওদের ঘুমনোর জন্যে একটা ক্লাসরুম ছেড়ে দিলুম আমরা, আর দিনটা কাটালুম সবাই মিলে বনে-বনে ঘুরে বেরিয়ে। আর সবাই যখন বনে হৈ-হুল্লোড় করছিল সেই ফাঁকে উজিকভ ওই ছাত্রদের ঘরে ঢুকে সদ্য-পাওয়া বৃত্তির টাকা ছাত্ররা যে-ব্রিফকেসে একত্র করে রেখেছিল সেটা চুরি করে সরে পড়ল।

কলোনি-বাসিন্দারা আমাদের 'রাব্‌ফাক' ছাত্রদের যত ভালোবাসত, বিখ্যাত বিয়োগান্ত নাটকের '...চল্লিশ হাজার ভাই মিলেও অত ভালোবাসতে পারত না'*। ফলে, স্বভাবতই লজ্জায় ঘেন্নায় সকলের যেন মাথা কাটা গেল। কে-যে চুরি করেছে তা প্রথমটা — দু-একটা দিন — ধরা পড়ল না, আর ঠিক এই ব্যাপারটাই আমার কাছে ঘটনাটার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে ঠেকল। দৃঢ়বিন্যস্ত একটা যৌথ সংস্থায় চুরি-ছ্যাঁচড়ামির ব্যাপারটা এমনিতেই সাংঘাতিক, তা সে সম্পত্তি খোয়া গেছে আর সেজন্যে কেউ মনোকষ্ট ভোগ করছে বলেই নয়, এমন কি অপরাধী গা-ঢাকা দিয়ে ধরা পড়ার হাত এড়িয়ে চলছে বলেও নয়, বরং সাধারণভাবে সকলে-যে নিরাপদে সুখেস্বাচ্ছন্দ্যে আছে চুরিটা এই মনোভাবের হানি ঘটায় বলে, কমরেডদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থার ভাবটা নষ্ট করে বলে এবং মানুষের মধ্যে সবচেয়ে যেগুলো খারাপ প্রবৃত্তি — অর্থাৎ, সন্দেহবাতিক, ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তা সম্পর্কে দুশ্চিন্তা ও একধরনের চোরা সজাগ স্বার্থপরতা — সেগুলোকে জাগিয়ে তোলে বলেই। চুরি করল যে সে যদি ধরা না-পড়ে তাহলে যৌথ সমাজের সব ক'টা জোড়ের মুখ খুলে পড়তে থাকে: এজমালি ঘরগুলোয় চলতে থাকে কানাঘুষো, কাকে-কাকে ছেলেরা সন্দেহ করছে গোপন আলাপ-আলোচনায় তাদের নাম করা হতে থাকে, এমন কি কাউকে-কাউকে এর জন্যে অযথা পীড়ন পর্যন্ত সহ্য করতে হয়। আর প্রায়শ এই সব পীড়নের শিকার হয় তারাই, এ-সবের হাত থেকে

* শেক্সপিয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের পঞ্চম অঙ্কের প্রথম (ওফেলিয়াকে সমাধিস্থ করার) দৃশ্যে লায়েরতেস-প্রসঙ্গে রানীর কাছে হ্যামলেটের উক্তি দ্রষ্টব্য। — অনুঃ

যাদের রেহাই দেয়ার দরকার থাকে খুবই — তাদের স্বভাবচরিত্র সবেমাত্র সঠিক পথে গড়ে উঠতে শুরু করেছে বলে। এমন কি আসল চোর যদি কয়েক দিনের মধ্যে ধরাও পড়ে, তার যথাযোগ্য শাস্তি যদি সে পায়ও, তবু যতটা যা ক্ষতি হবার তা হয়েই যায়। কেননা চোরের ধরা পড়া ও তার শাস্তি পাওয়া সত্ত্বেও কিছুতেই মনের ঘা শুকিয়েও শুকোয় না, আঘাত পাওয়ার অনুভূতিটা যেতে চায় না কিছুতেই, যৌথ জীবনে আগেকার শান্তি ও স্বস্তি আর ফেরে না। একটামাত্র চুরির মধ্যে নিহিত থাকে অন্তহীন শত্রুতা, মন-কষাকষি, একা-হয়ে-যাওয়া আর মানুষ সম্বন্ধে খাঁটি বিদ্বেষের রোগবীজাণু। চুরির ব্যাপারটা যৌথ সংস্থায় সেই অসংখ্য সম্ভাব্য ঘটনাগুলোর একটা, যা নাকি কোনো বিশেষ ধরনের প্রভাবের আওতায় পড়ে না এবং তা ঘটে থাকে আগে-থেকে-ভাবা দুরভিসন্ধির চেয়ে হয়তো-বা কোনো একধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার কারণেই। চুরি একমাত্র সেই ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর নয় যেখানে যৌথ জীবনের ও তার ফলে জনমতের অস্তিত্ব নেই, যেখানে শুধু যে চুরি করে ও যার খোয়া যায় সেই দুই পক্ষমাত্র জড়িত, আর বাকি সবাই দর্শক হয়ে আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু একটি যৌথ সমাজজীবনে চুরির ব্যাপারটা সেই যৌথ জীবনের পক্ষে অপরিহার্য মার্জিত রুচি ও সহনক্ষমতাকে নষ্ট করে এমন সব ভাবনাচিন্তাকে প্রকট করে তোলে যাদের মনের গহনে চাপা দিয়ে রাখতে পারলেই শোভন হয়। বিশেষ করে তথাকথিত ‘কিশোর অপরাধীদের’ সমাজে চুরির ব্যাপার ঘটলে তা মারাত্মক ক্ষতিকর হয়ে ওঠে।

তিনদিন পরে ধরা পড়ল যে উজিকভই দোষী। সঙ্গেসঙ্গেই তাকে আমার অফিসঘরে আটক করে দরজায় একজন শান্ত্রী বসিয়ে দিলুম, যাতে চোরাগোপ্তা মারধরের হাত থেকে তাকে বাঁচানো যায়। দলপতি-পরিষদ সিদ্ধান্ত নিলে যে এ-চুরির বিচার হবে কমরেডদের আদালতে। এ-ধরনের আদালতে বিচারের আশ্রয় অবশ্য আমরা নিতুম খুবই কম, কেননা পরিষদের সিদ্ধান্তের ওপর ছেলেপিলেরা সচরাচর আস্থা রাখতে অভ্যস্ত ছিল। কমরেডদের বিচারসভায় উজিকভের অব্যাহতি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল আরও কম। কলোনির সাধারণ সভা থেকে সর্বসম্মতিক্রমে পাঁচজনকে জজ হিসেবে নির্বাচন করা হল। এরা হল — কুদ্‌লাতি, গোর্‌কভ্‌স্কি, জাইচেঙ্কো, স্তুপিত্‌সিন আর পিয়েরেত্‌স। এদের মধ্যে পিয়েরেত্‌সকে বাছা হল আদি কুরিয়াজ-বাসিন্দাদের মর্যাদা রাখতে, স্তুপিত্‌সিন ছিল ন্যায়বিচারের জন্যে সর্বজনপরিচিত আর

এই বিচারে-যে ভাবালুতা কিংবা অযথা আনুকূল্য প্রশ্রয় পাবে না তার গ্যারান্টি ছিল প্রথম তিনজন।

বিচারের অধিবেশন বসল সন্ধেবেলা, ভিড়ে-থৈথৈ হলের মধ্যে। এ-উদ্দেশ্যে বিশেষ করে সেদিন কলোনিতে এসেছিলেন ব্রেগেল আর দ্জুরিন্স্কায়া। তাঁরাও উপস্থিত রইলেন সভায়।

একখানা বেঞ্চে উজিকভকে বসানো হল একা। এর আগের কয়েকটা দিন ওর আচরণে ঔদ্ধত্য প্রকাশ পাচ্ছিল, আমার আর কলোনি-বাসিন্দাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল ও অভদ্রভাবে আর সকলের মনে বিতৃষ্ণা জাগিয়ে কখনও ভান করে বোকার মতো হাসছিল কখনও-বা হাসছিল ধূর্তের চাপা হাসি।

তার আগে কলোনিতে আর্কাদির কেটেছিল এক বছরের একটু বেশি সময়। আর ওই সময়ের মধ্যে ভালো হওয়া দূরে থাক, তার চরিত্রের সবচেয়ে খারাপ দিকগুলোই-যে আরও প্রকট হয়ে উঠেছিল এ-বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ ছিল না। অবশ্য এও ঠিক যে ওর মধ্যে সাজপোশাকে সে আগের চেয়ে আরেকটু পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল, ধরনধারণেও হয়ে উঠেছিল আগের চেয়ে কেতাদুরস্ত, তার নাকটাকে আর আগের মতো মুখের অপর সব অংশের চেয়ে বেশি লক্ষণীয় ঠেকছিল না, এমন কি হাসতে পর্যন্ত শিখেছিল সে। কিন্তু সব সত্ত্বেও মূলত সে রয়ে গিয়েছিল সেই পুরনো আর্কাদি উজিকভই, যৌথ সংস্থা তো দূরস্থান, দুনিয়ায় কারও প্রতিই যার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বা সম্ভ্রমবোধ ছিল না। সে জীবন কাটাচ্ছিল আর কিছুর জন্যে নয়, কেবল মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে লালসার তাড়নায়।

আমাদের কাছে আসার আগে উজিকভ ভয় করত কেবল তার বাবাকে আর মিলিশিয়াকে। আর কলোনিতে থাকার সময়ে দলপতি-পরিষদ কিংবা কলোনির সাধারণ সভা ছাড়া কিছুকেই কেয়ার করত না সে। তবে ওই দুটো ব্যাপারের তাৎপর্যও তার কাছে একেবারেই স্পষ্ট ছিল না। তার দায়িত্বজ্ঞানও ক্রমশ আরও বেশি ভোঁতা হয়ে এসেছিল। সদ্যআহৃত তার হাসি আর ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভাবভঙ্গির উৎস ছিল এটাই।

তবে ওইদিন উজিকভকে কেমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিল কমরেডদের আদালত তার মনে রেখাপাত করতে সমর্থ হয়েছে।

জজেরা হলে ঢোকার সময় কলোনির ওইদিনকার ভারপ্রাপ্ত দলপতি উপস্থিত সকলকে উঠে দাঁড়াতে অনুরোধ জানাল। কুদ্লাতি অতঃপর

সাক্ষীদের আর ফরিয়াদী পক্ষকে জেরা করতে শুরু করল। সাক্ষীদের কথাবার্তায় কেমন একটা ব্যঙ্গবিদ্রূপের ছোঁয়ালাগা কড়া অ-সমর্থনের সুর ধরা পড়ছিল। যেমন, মিশা অভ্চারেঙ্কো বলল:

'আমাদের ছেলেরা বলতেছে, বোঝলে, যে আর্কাদি কলোনির মর্যেদা নষ্ট করেছে। তবে, দোস্ত-সব, আমি বলি কী, এয়া হতিই পারে না, কলোনির মর্যেদা সে নষ্ট করবে এত সাধ্যি কী তার! সে তো কলোনি-বাসিন্দাই নয়। কী কর্যে সে কলোনি-বাসিন্দা হতি পারে? তারে তো মনুষ্যপদবাচ্যিই বলা চলে না, তোমরাই কও — বলা চলে কী? তোমরাই বিচার কর-না — ওটা কি এট্টা মানুষ? ওর থেকে কুকুর-বিড়ালও তো পদে আছে, মাইরি, তাই না কি? কিন্তু কথা হল, ওরে নিয়ি কী করা যায়? আমরা ওরে ঘেটি ধর্যে কলোনি থেকে বার কর্যে দিতি পারি না। সেইটা ওর কোন উবগারে আসবে? আমি বরঞ্চ প্রস্তাব দিতেছি যে ওর জন্যি একখান কুত্তার খাঁচা তৈয়ের কর্যে দেয়া হোক আর ওরে কুত্তার ডাক ডাকতি শিখান হোক। শুধু তিনটা দিন ওরে খাতি না-দিয়ি উপাস কর্যে রাখা হোক — তাইলিই ও সবকিছু শেখবে-নে! যাই হোক ওরে কিন্তু সবার সাথে এক-ঘরে থাকতি দেয়া চলে না।'

এটা ছিল উজিকভের পক্ষে অপমানকর, একেবারে ওকে ধসিয়ে দেয়ার মতো বক্তৃতা। বক্তৃতাটা শুনতে-শুনতে জজেদের সারিতে বসে প্রাণ খুলে হাসছিল ভানিয়া জাইচেঙ্কো। এর মধ্যে আর্কাদি খালি একবার গম্ভীরভাবে মিশার দিকে তাকাল, তারপর লাল হয়ে উঠে চোখটা ফিরিয়ে নিল।

ব্রেগেল এবার কিছু বলার অনুমতি চাইলেন।

কুদ্লাতি বললে, 'ছেলেদের বলা শেষ হওয়া পর্যন্ত একটুক অপেক্ষা করলি ভালো হয় না?'

কিন্তু ব্রেগেল পেড়াপীড়ি করতে লাগলেন। কুদ্লাতি অবশেষে রাজি হয়ে গেল। মঞ্চে উঠে ব্রেগেল এবার প্রচন্ড আবেগভরে বক্তৃতা দিলেন। সে-বক্তৃতার কিছু-কিছু অংশ এখনও আমার মনে আছে। যেমন, তিনি বলছিলেন:

'তোমরা এই ছেলেটির চুরির বিচার করতে বসেছ। তোমাদের প্রত্যেকেই বলছে যে ও দোষী, ওর গুরুতর শাস্তি হওয়া দরকার, কেউ-কেউ ওকে কলোনি থেকে বের করে দিতেও বলছ। এটা ঠিকই যে ও দোষী, তবে আর সব কলোনি-বাসিন্দা কিন্তু ওর চেয়েও দোষী।'

শুনে গোটা হলের কলোনি-বাসিন্দারা কেমন থমকে গেল। নিস্তব্ধ ঘরখানায় সবাই গলা বাড়িয়ে সেই আজব মানুষটিকে এক-নজর দেখার চেষ্টা করতে লাগল যিনি নাকি অতখানি জোর দিয়ে দাবি করলেন যে উজিকভের চুরির জন্যে তারাই আসলে দায়ী!

ব্রেগেল বলে চললেন, 'ছেলেটি তোমাদের সঙ্গে এক বছরেরও বেশিদিন আছে, অথচ দ্যাখো, এখনও ও চুরি করছে। এর অর্থ, তোমরা ওকে ভালোভাবে মানুষ করে তুলতে পার নি, কীভাবে যে ওকে চালাতে হবে তার ঠিকঠিক উপায়টি — অর্থাৎ কমরেডসুলভ উপায়টিই — খুঁজে বের করতে পার নি তোমরা, জীবনযাপনের সঠিক পথটি বাত্‌লাতে পার নি ওকে। এ-সভায় বলা হয়েছে যে কর্মী হিসেবে ভালো নয় ও, কমরেডদের জিনিসপত্র এর আগেও ও চুরি করেছে। এই সবকিছুই কিন্তু প্রমাণ করছে যে আর্‌কাদির দিকে যেভাবে ও যতখানি মনোযোগ দেয়া উচিত ছিল তোমাদের তা তোমরা দাও নি।'

অপেক্ষাকৃত বাচ্চা ছেলেদের ধারালো চোখে অবশেষে ধরা পড়ল যে বিপদটা কোথায়। তারা অস্বস্তিভরা চাউনি নিয়ে কমরেডদের মুখের দিকে তাকাতাকি করতে লাগল। আর এটা আমায় স্বীকার করতেই হবে যে সেদিন তাদের উদ্বেগ ভিত্তিহীন ছিল না, কারণ ওই মুহূর্তে তাদের যৌথ জীবন এক গুরুতর দুর্বিপাকের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। ব্রেগেলের চোখে সভার ছেলেমেয়েদের মুখচোখের আতঙ্কের ভাবটা ধরা পড়ল না, তিনি খাঁটি নাটকীয় করুণ সুরে বক্তৃতা শেষ করলেন এই বলে:

'আর্‌কাদিকে শাস্তি দেয়ার অর্থ হবে ওর ওপর প্রতিশোধ নেয়া, আর প্রতিশোধ নেয়ার মতো নিজেদের খেলো করা তোমাদের উচিত হবে না। তোমাদের বোঝা উচিত যে এই মুহূর্তে তোমাদের সাহায্যই আর্‌কাদির একান্ত দরকার — ও একটা সংকটজনক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, অথচ তোমরা সবাই মিলে কিনা ওর বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছ, এইমাত্র কে একটি ছেলে ওকে এমন কি জানোয়ারের সঙ্গে তুলনা করল। আমার কিন্তু মনে হয়, আর্‌কাদিকে রক্ষণাধীনে নেয়া ও তাকে সাহায্য করার জন্যে বেছে-বেছে কিছু ভালো ছেলের ওপর ভার দেয়া উচিত।'

ব্রেগেল যখন মঞ্চ থেকে নেমে এলেন হলে তখন বেশ একটা সোরগোল পড়ে গেছে। ছেলেরা উত্তেজিতভাবে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে আর

হাসাহাসি করতে লাগল। কে একজন যেন গম্ভীর গমগমে গলায় হঠাৎ বলে উঠল:

'উনি কী বলতিছিলেন — অ্যাঁ?'

সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন এর জবাব দিল রীতিমতো ধীরস্থির গলায়, তবে কথাগুলোয় যেন বিদ্রূপ ঝরে পড়তে লাগল:

'এই ছেলেমেয়েরা — বেচারা উজিকভকে তোমরা সাহায্য কর-না কেন?'

সঙ্গে সঙ্গে ঘরে হাসির আওয়াজ উঠল। স্বয়ং জজ ভানিয়া জাইচেঙ্কোই এমনভাবে হেসে লুটিয়ে পড়ল চেয়ারে যে তার পাদুটো সজোরে টেবলের ড্রয়ারে গুঁতো খেল। কুদ্‌লাতি অমনি কড়াসুরে ধমক লাগাল তাকে:

'তুই কেমনধারা জজ রে, ভানিয়া?'

এমন কি উজিকভ-যে-উজিকভ, যে এতক্ষণ দুই হাঁটুর মধ্যে প্রায় মুখখানা গুঁজে নুয়ে পড়ে বসে ছিল, সে পর্যন্ত হঠাৎ দমকা হাসিতে ফেটে পড়ল। তবে সঙ্গেসঙ্গেই অবশ্য নিজেকে সামলে নিল সে, তারপর মাথাটা আরও খানিকটা হেঁট করে বসে রইল। মনে হল কুদ্‌লাতি ওকেও যেন কী বলতে যাচ্ছে, কিন্তু দেখলুম শেষপর্যন্ত কিছু না-বলে হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে মাথাটা নেড়ে উজিকভের দিকে শুধু একবার মর্মভেদী দৃষ্টিতে তাকাল।

ব্রেগেলের কিন্তু মনে হল এই সব ছোটখাট তুচ্ছ ব্যাপারের দিকে লক্ষ্য নেই। দেখলুম, তিনি আর দ্‌জুরিন্‌স্কায়া উত্তেজিতভাবে কী একটা নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত।

কুদ্‌লাতি ঘোষণা করল যে জজেরা এবার অন্যত্র বসে নিজেদের মধ্যে একটু আলোচনা করে নেবে। আমরা জানতুম যে আইনগত খুঁটিনাটি নিয়ে তাদের তর্ক মিটতে আর মামলার রায় লিখতে ঘণ্টা-খানেকের কম সময় নেবে না তারা। অতএব আমি সম্মানিত অতিথিদের অফিসঘরে ডেকে নিয়ে গেলুম।

অফিসঘরে সোফাটার এককোণে গুটিসুটি মেরে বসলেন দ্‌জুরিন্‌স্কায়া। তারপর গুলিয়ায়েভার কাঁধের আড়ালে মুখ লুকিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে প্রত্যেকের মুখের ভাব লক্ষ্য করতে লাগলেন, কোন পথটা ঠিক কোনটা বেঠিক তা বোঝার জন্যে সম্ভবত। ওদিকে ব্রেগেলকে দেখে মনে হচ্ছিল এ-ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত যে 'সত্যিকার শিক্ষাদানের কাজ' কাকে বলে

তার একটা জলজ্যান্ত উদাহরণ ওইদিন তিনি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন। আর আমার ভেতরে জেগে উঠছিল একটা অদ্ভুতরকম একগুঁয়েমির ভাব। তবে আমি-যে ঠিক কাজ করছি কিংবা প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দিয়ে জিতছি এই বোধ থেকে কিন্তু ওই ভাবটার জন্ম হয় নি, বরং আমার কাজটার যে-কোনো ভবিষ্যৎ নেই এইরকম একটা অস্পষ্ট অনুভব থেকে জন্মানো বিরক্তিবোধই ছিল ওই একগুঁয়েমিপনার মূলে।

ব্রেগেল বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত নন?'

জবাব দিলুম, 'চা খাবেন?'

এই সমস্ত লোক ভুগছিলেন ন্যায়শাস্ত্রে অনড় বিশ্বাসের অতিবৃদ্ধি রোগে। ওঁদের চিন্তাধারা ছিল এইরকম: প্রতিকারের এই উপায়টা ভালো, ওটা মন্দ, অতএব সবসময়েই প্রথম উপায়ের আশ্রয় নিতে হবে। হায় রে, কবে-যে ওঁরা ডায়ালেকটিক যুক্তিধারা আয়ত্ত করবেন কে জানে! কী করে-যে ওঁদের বোঝানো যেত জানি না যে আমার কাজ যে-জাতীয় ছিল তাতে একধরনের অবিচ্ছিন্ন ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে চলা ছিল অনিবার্য। আর সেই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কিছু-কিছু ঘটত অপেক্ষাকৃত বেশি, কিছু-বা আবার অপেক্ষাকৃত কম সময় নিয়ে, কিছু-কিছু ঘটতে থাকত কয়েক বছর ধরে, আর সর্বদাই সেগুলি চিহ্নিত থাকত প্রবল সংঘর্ষের লক্ষণ দিয়ে — যে-সংঘর্ষে যৌথ সমাজ ও তার সদস্যদের ব্যক্তিগত স্বার্থ জট-ছাড়ানোর-প্রায়-অসাধ্য অবস্থায় বিজড়িত থাকত। বুঝে পাই না কী করে-যে ওঁদের বোঝানো যেত যে কলোনিতে সাত বছরের কাজের জীবনে এমন একটি ঝামেলারও আমি সাক্ষাৎ পাই নি যা নাকি ছিল হুবহু অপর একটির মতো। কী করেই-বা ওঁদের ব্যাখ্যা করে বোঝানো যেত যে আমাদের যৌথ সংস্থাটিকে সমাধান না-করে ফেলে-রাখা ঘটনাজনিত অবস্থার চাপ সইতে দেয়া, যৌথ সমাজের অসহায়তা বুঝতে দেয়া উচিত হবে না, বোঝানো যেত কী করে যে ওই দিনকার বিচারের মধ্যে দিয়ে শিক্ষাদানের আসল উদ্দিষ্ট উজিকভও ছিল না, ব্যক্তি হিসেবে চার শো জন কলোনি-বাসিন্দাও ছিল না, ছিল অখণ্ড যৌথ সংস্থাটা স্বয়ং!

একসময় মনিটর এসে হলে ফের ফিরে যাওয়ার অনুরোধ জানাল আমাদের।

কলোনি-বাসিন্দারা সবাই দাঁড়িয়ে উঠে পরম নিঃশব্দে জজেদের রায় শুনল।

'শ্রমজীবীগণের শত্রু হিসাবে গণ্য করিয়া এবং চোর বলিয়া উজিকভকে কলোনি হইতে কলঙ্কের কালিমা লেপন করিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দেয়াই উচিত কর্ম, তবে শিক্ষা-সংক্রান্ত জনকমিশারিয়েতের তরফে হস্তক্ষেপের বিষয়টি বিবেচনার মধ্যে ধরিয়া কমরেডগণের আদালত এইমর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে যে —

'১। উজিকভকে কলোনিতে থাকিতে দেয়া হইবে।

'২। তবে একমাস ধরিয়া উহাকে কলোনির সদস্য হিসাবে গণ্য করা হইবে না, উহার নির্দিষ্ট বাহিনী হইতে উহাকে বহিষ্কৃত করিয়া রাখা হইবে, কোনো মিশ্র বাহিনীতে উহাকে কাজে নিযুক্ত করা হইবে না, এবং সকল কলোনি-বাসিন্দাকে নিষেধ করা যাইতেছে যে ওই সময়ের মধ্যে উহার সহিত বাক্যালাপ করা, উহাকে সাহায্য করা, টেবিলে উহার পার্শ্বে উপবেশন করা, একই এজমালি শয়নগৃহে উহার সহিত শয়ন করা এবং উহার সহিত খেলাধুলা করা, কিংবা ওঠাবসা করা কিংবা চলাফিরা করা কিছুই চলিবে না।

'৩। উহাকে উহার প্রাক্তন দলপতি দ্মিত্রি জেভেলির নির্দেশাধীন বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং কেবলমাত্র কাজকর্মের ব্যাপারেই উহাকে দলপতির সহিত কথা বলার অধিকার দেয়া হইবে, অথবা অসুস্থ হইয়া পড়িলে শুধুমাত্র চিকিৎসকের সহিত উহাকে বাক্যালাপের অধিকার দেয়া হইবে।

'৪। উজিকভ এজমালি শয়নগৃহের বারান্দায় ঘুমাইবে, দলপতি-পরিষদের নির্দিষ্ট পৃথক একটি টেবিলে ভোজন করিবে এবং যদি সে কাজ করিতে ইচ্ছুক থাকে তাহা হইলে উহার দলপতির নির্দেশ অনুযায়ী বিশেষ কোনো কাজ সে এককভাবে নিষ্পন্ন করিতে পারিবে।

'৫। আদালতের এই সিদ্ধান্ত কেহ লঙ্ঘন করিলে দলপতি-পরিষদের নির্দেশ অনুযায়ী তাহাকে অবিলম্বে কলোনি হইতে বহিষ্কার করিয়া দেয়া হইবে।

'৬। কলোনির ডিরেক্টরের অনুমোদন প্রাপ্তিমাত্রই এই দণ্ডাদেশ কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।'

গোটা সভা হাততালি দিয়ে আদালতের এই রায়কে গ্রহণ করল।

আমাদের দিকে ফিরে কুজ্‌মা লেশি চেঁচিয়ে বলল, 'চমৎকার রায়! সত্যই এয়াতে ওর উবগার হবে! আর আপনেরা কিনা বলতিছিলেন — 'আহা, বেচারা বাচ্চাটাকে সাহায্য কর একটু!' কয়টা সবখোল চাবি বানায়ে দিও হে!'

স্বয়ং ব্রেগেলের মুখের ওপর কথাগুলো বলে দিল ছেলেটা। আচরণটা-যে রূঢ় হয়ে যাচ্ছে এ-সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না ওর। লেশির রোমশ মুখখানার দিকে অসন্তুষ্টভাবে এক-নজর তাকিয়ে ব্রেগেল গলায় কর্তৃত্বের সুর ফুটিয়ে আমায় বললেন:

'নিশ্চয়ই আপনি এই প্রস্তাবকে অনুমোদন দিচ্ছেন না!'

বললুম, 'অনুমোদন না-দিয়ে উপায় নেই।'

পাশের দলপতি-পরিষদের ফাঁকা ঘরখানায় আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে দ্‌জুরিন্‌স্কায়া একান্তে বললেন:

'আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই... এটা কী ধরনের প্রস্তাব হল? আপনি কী মনে করেন এর সম্বন্ধে?'

বললুম, 'এ তো বেশ ভালো প্রস্তাব। বয়কটের ব্যাপারটা অবশ্য হাতিয়ার হিসেবে বিপজ্জনক, সাধারণভাবে সর্বত্র এটাকে ব্যবহার করা চলে না, তবে এক্ষেত্রে এটা কার্যকর হবে।'

'কার্যকর-যে হবেই এ-বিষয়ে আপনি পুরোপুরি নিশ্চিত?'

'পুরোপুরি। আপনি জানেন না, এই উজিকভ ছেলেটিকে কলোনিতে একেবারেই কেউ পছন্দ করে না — সবাই ঘেন্না করে ওকে। এই বয়কটের ব্যবস্থা, প্রথমত আর প্রধানত, গোটা একটা মাস ধরে ওর আর কলোনির মধ্যে একটা নতুন ধরনের খাঁটি যথাযথ সম্পর্ক গড়ে তুলবে। উজিকভ যদি এটা মেনে নিতে আর সহ্য করতে পারে, তাহলে অন্যরা ওকে মর্যাদা দিতে শিখবে। আর উজিকভের পক্ষেও এটা একটা ফলপ্রসূ কাজ হয়ে দাঁড়াবে।'

'কিন্তু ও যদি এটা সহ্য করতে না-পারে?'

'তাহলে ছেলেরা ওকে তাড়িয়ে দেবে।'

'আর আপনি ওদের এ-কাজে সমর্থন করবেন?'

'তা করব।'

'কিন্তু... না-না, এ অসম্ভব!'

'এ ছাড়া আর সবকিছুই আসলে অসম্ভব। একটা যৌথ সংস্থার তো আত্মরক্ষার অধিকার আছে, নাকি?'

'আত্মরক্ষা — উজিকভকে বলি দিয়ে?'

'উজিকভ তখন অন্য সঙ্গী খুঁজে নেবে। আর সেটা ওর পক্ষেও ভালো হবে।'

শুনে দজুরিনস্কায়া করুণভাবে হাসলেন। বললেন:

'একে কোন ধরনের শিক্ষাবিজ্ঞান বলেন আপনি?'

আমি জবাব দিলুম না। হঠাৎ তিনি নিজেই এর একটা সংজ্ঞা নির্ণয় করে বসলেন। বললেন:

'কে জানে, হয়তো এটা সংঘর্ষ ঘটানোর শিক্ষাবিজ্ঞান?'

'হয়তো তা-ই।'

অফিসঘরে ব্রেগেল তখন যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন, এমন সময় লাপত রায়ের কাগজখানা নিয়ে ঢুকল। বলল:

'আন্তন সেমিওনভিচ, আমরা কি এতে অনুমোদন দেব?'

'নিশ্চয়ই। এ তো চমৎকার রায়।'

ব্রেগেল মন্তব্য করলেন, 'আপনারা ছেলেটিকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিচ্ছেন দেখছি!'

শুনে লাপত সত্যিই ভারি তাজ্জব বনে গেল। বলল:

'কে আত্মহত্যা করবে? উজিকভ? আত্মহত্যা করবে ও? তা, গলায় ও ফাঁস পরালে ব্যাপারটা কিন্তু মন্দ হোত না... তবে, যাই বলেন, ও আত্মহত্যা করার পাত্তরই নয়!'

'কী সাংঘাতিক!' চলে যেতে-যেতে দাঁত চেপে হিস্‌হিসিয়ে বলে গেলেন ব্রেগেল।

এই সব মহিলা না-চিনতেন উজিকভকে না-কলোনিটাকে। কারণ, দেখা গেল, কি কলোনি কি উজিকভ স্বয়ং — উভয়পক্ষই উৎসাহের সঙ্গে বয়কট অভিযান শুরু করে দিল। কলোনি-বাসিন্দারা সত্যিসত্যিই আর্‌কাদির সঙ্গে সবরকম যোগাযোগ এড়িয়ে চলতে লাগল, কিন্তু তাদের আচরণে মানব-সমাজের এই জঘন্য নমুনাটির প্রতি আগেকার ক্রোধ, বিদ্বেষ কিংবা ঘৃণার ছিটেফোঁটাও আর অবশিষ্ট ছিল না। যেন আদালতের দণ্ডাদেশের সঙ্গে সঙ্গে এই সবকিছুই লোপ পেয়ে গিয়েছিল। কলোনি-বাসিন্দারা এ-সময়ে

দূর থেকে প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে উজিকভের ধরনধারণ লক্ষ্য করছিল আর নিজেদের মধ্যে গোটা ব্যাপারটা আর উজিকভের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ নিয়েও অনবরত আলাপ-আলোচনা করে যাচ্ছিল। অনেকে এমন কথাও বলছিল যে আদালত উজিকভকে যে-শাস্তি দিয়েছে তা মোটেই উপযুক্ত হয় নি। কোস্তিয়া ভেত্‌কোভ্‌স্কিরও মত ছিল তা-ই। সে বলছিল:

'এরে আবার সাজা কয় নাকি? উজিকভ তো বীরের মতন বুক ফুলায়ে ঘুরি বেড়াতেছে! কাণ্ডখান দ্যাখেন একবার — গোটা কলোনি ওর দিকি তাকায়ে-তাকায়ে দেখতিছে! ও কি এয়ার যুগ্যি?'

সত্যিই, উজিকভ প্রথমটায় বীরের মতো বুক ফুলিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অহঙ্কার আর হামবড়া একটা ভাব বেশ স্পষ্ট হয়েই ফুটে উঠেছিল ওর মুখেচোখে। কলোনি-বাসিন্দাদের মধ্যে ও ঘুরে বেড়াচ্ছিল রাজার মতো, যাকে নাকি কেউ প্রশ্ন শুধোতে কিংবা যার সঙ্গে কথা বলতে সাহস পায় না। খাবারঘরেও একটা ছোট, আলাদা টেবিলে এমনভাবে বসছিল ও যেন কোন-না-কোন সিংহাসনে গদিয়ান হয়ে বসেছে।

কিন্তু এই মজাদার বীর-বীর ভাবটা শিগ্‌গিরই পুরনো হয়ে গেল। কমরেডদের আদালতের হুকুমে ওর মাথায় পরানো কাঁটার মুকুট অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আর্‌কাদির মাথায় ফুটতে শুরু করল। কলোনি-বাসিন্দারাও শিগ্‌গিরই ওর অবস্থার এই অস্বাভাবিকতায় অভ্যস্ত হয়ে উঠল, কিন্তু যা রয়ে গেল তা হল ওর বিচ্ছিন্নতা। পুরোপুরি নিঃসঙ্গভাবে একাকী একঘেয়ে দিনগুলো কাটাতে লাগল আর্‌কাদি, দিনের-পর-দিন কাটতে লাগল ওর একইরকম বৈচিত্র্যহীনতায়, অন্তহীন মুহূর্তগুলো কেটে যেতে লাগল মানবসংসর্গের বিন্দুমাত্র উষ্ণ সঞ্জীবন ছাড়াই। অথচ ওই একই সময়ে উজিকভের চারপাশে যৌথ জীবন বয়ে চলল তার উচ্ছল প্রাণৈশ্বর্য নিয়ে, চারপাশে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠতে লাগল হাসি আর রসিকতা, ব্যক্তিগত চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য স্ফূর্তি পেতে লাগল, বন্ধুত্ব আর সহানুভূতির দ্যুতি বিকীর্ণ হতে থাকল থেকে-থেকে। আর এ-সবই তো একদিন উজিকভেরও জীবনে অভ্যস্ত আনন্দের অংশস্বরূপ ছিল, তা সে নিজে আনন্দ-উপভোগে যতই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার অধিকারী হোক।

এক সপ্তাহ বয়কট চলবার পর ওর দলপতি জেভেলি একদিন আমায় বলল:

'উজিকভ আপনের সাথে কথা বলার অনুমতি চাচ্ছে।'

আমি বললুম, 'না। ও যখন মর্যাদার সঙ্গে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তখনই আমি ওর সঙ্গে কথা বলব। এটা ওকে জানিয়ে দাও।'

কিন্তু শিগ্‌গিরই আমি সানন্দে লক্ষ্য করলুম যে আর্‌কাদির এতদিনের অভিব্যক্তিহীন নিথর ভুরুদুটোয় হঠাৎ কেমন নজরে পড়ে-কি-পড়ে না এমন সূক্ষ্ম তবু তাৎপর্যপূর্ণ ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে। দেখলুম অন্যদের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাতে শুরু করেছে ও, কী যেন একটা ভাবনা ঢুকেছে ওর মাথায়, চোখে লেগেছে কিসের যেন একটা স্বপ্নের ছোঁয়া। আর সকলেরই নজরে পড়ছিল কাজ সম্পর্কে ওর মনোভঙ্গিতে একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন। বেশির ভাগ সময়ে জেভেলি উজিকভকে উঠোন পরিষ্কারের কাজ দিচ্ছিল। আর ও একেবারে নিখুঁত সময়ানুবর্তিতা মেনে কাজ করে যাচ্ছিল, আমাদের বিশাল উঠোনটা ঝাঁট দিচ্ছিল, ডাস্টবিনগুলো নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করছিল আর ফুলবাগানের কেয়ারির ধারগুলো সোজা করে রাখছিল। এমন কি প্রায়ই সন্ধেবেলাতেও নিড়ানি-হাতে উঠোনে ঘুরে-ঘুরে ও বাজে কাগজ আর সিগারেটের পোড়া টুকরো কুড়িয়ে বেড়াত, ফুলের কেয়ারিগুলোয় নিড়েন দিত। একদিন সারা সন্ধে ক্লাসরুমে বসে মস্ত বড় একটুকরো কাগজে ও কী যেন সব লিখল। পরদিন সকালে দেখি, চোখে-পড়ার-মতো একটা জায়গায় কাগজখানা সেঁটে রেখেছে ও। তাতে লেখা:

> কলোনি-বাসিন্দা ভাইসব!
> তোমাদের কমরেডের কাজকে সম্মান জানাও,
> কাগজের টুকরা এদিক-ওদিক ছড়ানো বন্ধ কর!

'আরে, দ্যাখো কাণ্ড,' গোর্‌কভ্‌স্কি বলল। 'ও নিজিরে আমাদের কমরেড বলি মনে করে...'

উজিকভের এই শাস্তিভোগের মাঝামাঝি সময়ে কমরেড জোইয়া একদিন কলোনিতে এসে হাজির। তখন দুপুরের খাওয়া চলছে। জোইয়া খাবারঘরে ঢুকে সোজা উজিকভের টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। গোটা ঘরখানায় নৈঃশব্দ্য নেমে এল সঙ্গে সঙ্গে। সেই অখণ্ড নিস্তব্ধতার মধ্যে দুঃখ-ভারাক্রান্ত গলায় জোইয়া শুধোলেন:

'তুমিই উজিকভ, তাই না? আচ্ছা আমায় বল তো, তোমার কী কষ্ট?'

শুনে বেঞ্চি ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল উজিকভ, জোইয়ার চোখের দিকে গম্ভীরভাবে একবার তাকাল, তারপর বেশ বিনীতভাবেই বলল:

'দলপাতির অনুমতি ছাড়া আমি আপনের সাথে কথা বলতি পারি নে।'

কমরেড জোইয়া মিত্কার খোঁজে দৌড়োদৌড়ি শুরু করলেন। মিত্কা এল — চটপটে, প্রাণবন্ত, কালোচোখো মিত্কা। বললে:

'কী ব্যাপার?'

'আমাকে উজিকভের সঙ্গে কথা বলতে দাও।'

'না,' বলল জেভেলি।

''না' মানে? কী বলতে চাও তুমি?'

'আমি আপনেরে অনুমতি দিব না — এই বলতি চাই।'

কমরেড জোইয়া এরপর আমার অফিসঘরে এসে আবোলতাবোল চিৎকার-চেঁচামেচির বন্যা বইয়ে দিলেন।

চিৎকার করে তিনি বলতে লাগলেন, 'এ-সমস্ত কিছুতেই চলতে পারে না! যদি ওর নালিশ করার কিছু থেকে থাকে তাহলেও ওকে বলতে দেয়া হবে না? কে বলতে পারে ও একটা অতল খাদের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে কিনা! এ তো অত্যোচার!'

'কিন্তু, কমরেড জোইয়া, আমি কিছুই করতে পারি না।'

এর পরদিন কলোনি-বাসিন্দাদের সাধারণ সভায় নাতাশা পেত্রিয়েঙ্কো বলতে উঠল:

'ছেলেরা! আর্কাদিকে মাপ করে দেয়া যাক! ও ভালোরকম কাজ করতেছে, আর শাস্তি সহ্য করতেছে কলোনি-বাসিন্দার যেমন করা উচিত তেমনভাবে, মর্যেদার সাথে। আমি প্রস্তাব করি যে ওর সাজার সময় কমায়ে দেয়া হোক।'

সঙ্গে সঙ্গে সভা থেকে সহানুভূতিসূচক নানারকম কথাবার্তা শোনা যেতে লাগল:

'কমায়্যে দেয়া হোক-না ক্যানে?..'

'উজিকভ কিন্তু চমৎকার আচরণ দেখায়েছে...'

'বটেই তো!'

'তাইলে মাপ করি দেয়ার সময় হয়ে গেছে!..'

'বাচ্চাডারে তাইলে সাহায্য করা উচিত!'

সভা থেকে এ-বিষয়ে উজিকভের দলপতির কাছে রিপোর্ট চাওয়া হল।

জেভেলি বলল, 'আমি সাফ কথা বলতেছি। ও বিলকুল ভেন্ন লোক হয়ি গেছে। গতকাল যখন ওই-যে — জানিস তো কার কথা বলতেছি — ওই-যে — '

'আরে, জানি-জানি!'

'তা, মেয়েছেলেটি যখন ওর কাছে এসি বলল, 'আহা, বাছা রে, বাছা', তখন ও কেমনধারা ইটপানা শক্ত হয়ি রইল দেখলি তো! একটু নরম হল না পর্যন্ত! আমি নিজিই আগে ভাবতিছিলাম যে উজিকভের দ্বারা কিস্‌স্যু হবার নয়, কিন্তু এখন আমি বলতি পারি — ওর মধ্যি আছে, পদাত্থ আছে বৈকি... ও এখন আমাদের একজনা বনে গেছে...'

এবার একগাল হাসল লাপত। বলল:

'ঠিক আছে তাইলে — আমরা ওরে মাপ করে দিলাম!'

'ভোট! ভোট নেয়া হোক!' সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল কলোনি-বাসিন্দারা।

আর তখনও পর্যন্ত বসে ছিল উজিকভ, চুল্লীর আড়ালে, জড়সড় হয়ে, ঘাড় হেঁট করে। ভোট দিতে উঁচু-করে-তোলা হাতগুলোর দিকে এক-নজর তাকিয়ে লাপত এবার খুশির সুরে বললে:

'মনে হতেছে... সবাই এ-ব্যাপারে একমত। হেই আর্‌কাদি, হেই! অভিনন্দন! তুই ছাড়া পেয়েছিস!'

উজিকভ উঠে এসে মঞ্চের ওপর দাঁড়াল। সভার দিকে তাকাল একবার। কিছু বলবে বলে মুখ খুলল... তারপর কাঁদল শুধু।

এর ফলে হলের সবাই ভারি বিচলিত হয়ে পড়ল। কে যেন বলে উঠল:

'থাক, থাক, ও আমাদেরে কালকে বলবে-নে!..'

কিন্তু উজিকভ তবু মঞ্চে দাঁড়িয়ে রইল আর শার্টের হাতায় চোখ মুছতে লাগল। ওর দিকে তাকিয়ে ছিলুম আমি, স্পষ্ট বুঝতে পারছিলুম ও কষ্ট পাচ্ছে। অবশেষে কোনোক্রমে ও দু'একটা কথা বলল:

'ধন্যবাদ, দোস্ত-সব!.. আর মেয়েরা... আর নাতাশা... আমি... আমি সবই বুঝতি পারতেছি, ভাব্যো না যে আমি... দয়া কর্যো...'

'আরে ইয়ার, ছাড়ান দে ওসব!' কড়াসুরে এবার বলে উঠল লাপত।

শুনে বিনীতভাবে মাথা নিচু করল উজিকভ। লাপত সভা শেষ হল

বলে ঘোষণা করল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা মঞ্চের ওপর উঠে উজিকভের দিকে ছুটে গেল। আর ওইদিন যে-সহানুভূতি দেখিয়েছিল তারা পরে তা ফেরতও পেয়েছিল সুদে-আসলে। আর রুগীর মাথায় সফল অস্ত্রচিকিৎসার পর ডাক্তার যেমন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন আমিও তেমনি স্বস্তিবোধ করেছিলুম সেদিন।

ডিসেম্বর মাসে দ্জের্জিন্স্কি কমিউনের দ্বারোদ্ঘাটন হল। ঘটনাটি উদ্‌যাপিত হল উপযুক্ত গাম্ভীর্য ও আবেগের স্পর্শ সহ।

ওই দিনটির অল্প কিছু আগে এক নরম হালকা তুষারপাতের দিনে কমিউনের জন্যে নির্দিষ্ট প্রথম পঞ্চাশটি সদস্য নতুন পোশাক আর নরম ফাঁপানো ওভারকোটে সেজে কলোনির কমরেডদের কাছ থেকে বিদায় নিল তারপর শহরের পথ ভেঙে তাদের নতুন বাড়িতে চলল। একত্র জড় হওয়ার পর ভারি বাচ্চা আর ছোট্ট একটা দল বলে ঠেকছিল তাদের, মনে হচ্ছিল অনেকটা মিষ্টি কালো-কালো মুরগির ছানার মতো। ওরা কমিউনে গিয়ে পৌঁছুল ঝরা-তুষারে মাখামাখি হয়ে, হাসিখুশি আর লালচে মুখ নিয়ে। তারপর ঠিক মুরগির ছানার মতোই কমিউনের বাড়িটার এদিক-ওদিক দৌড়োদৌড়ি করে বেড়াতে লাগল আর এলোমেলোভাবে ঠুকরিয়ে ফিরতে লাগল সংগঠন-সংক্রান্ত নানারকম প্রশ্ন করে। আর মিনিট পনেরোর কম সময়ের মধ্যেই তারা তৈরি করে ফেলল একটা দলপতি-পরিষদ আর তাদের তৃতীয় মিশ্র বাহিনী খাটবিছানা টানাটানি করে সাজাতে লেগে গেল।

কমিউনের দ্বারোদ্ঘাটনের দিনে গোর্কিপন্থীরা পতাকা উড়িয়ে ব্যান্ড বাজিয়ে কুচকাওয়াজ করে গিয়ে হাজির হল কমিউনে। সেখানে হয়ে দাঁড়াল ওরা নিজেদের কমরেডদেরই অতিথি আর ওইদিন থেকে সেই কমরেডরা একটা অদ্ভুত আর গালভরা নাম পেল — তা হল, কমিউনার্ড। 'চেকা'র লোকেদের যে-দলটি ওখানে উপস্থিত ছিল সেইসব কর্মব্যস্ত, বিশিষ্ট, মাননীয় কর্মচারীকে উপস্থিত চার শো প্রাক্তন অনাথ ছেলেমেয়ের মধ্যে মোটেই লোকহিতৈষী বদান্য মুরুব্বি বলে ঠেকছিল না। বরং ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অল্প একটুক্ষণের মধ্যেই তাঁদের বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধুতার সম্পর্ক গড়ে উঠল — যদিও দুই পুরুষের মধ্যে বয়সের ফারাক এবং সোভিয়েতের অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা তাদের গুরুজনদের যে-শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকে আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে সেই বিশেষ সম্ভ্রমের ভাবটি রীতিমতো স্পষ্ট হয়ে

উঠেছিল, তবু। আবার সেইসঙ্গে ওই ছেলেপিলের চালচলনের মধ্যে এমন একটা ভাবও ফুটে উঠেছিল যাতে বোঝা যাচ্ছিল যে তারা নেহাত 'রক্ষণাধীন' নাবালক নয়, তাদের আছে নিজস্ব সংগঠন, নিজস্ব নিয়মকানুন, কাজকর্মের নিজস্ব বিশেষ ক্ষেত্র আর সে-সবই মর্যাদা, দায়িত্ব আর কর্তব্যবোধে অনুরঞ্জিত।

কমিউনটির পরিচালনা-ভার আমার ওপর ন্যস্ত হওয়ার ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিকভাবে ঘটল, যদিও এ-ব্যাপারে আগে থেকে কিছুই ঠিক ছিল না বা কোনোরকম ঘোষণাও ছিল না।

কমিউন চালানোর তুলনায় গোর্কি কলোনি পরিচালনার ব্যাপারটাই আমার কাছে বহুগুণে জটিল আর কঠিন কাজ বলে ঠেকতে লাগল। পঞ্চাশজন পুরনো কমরেডকে ছেড়ে দেবার পর গোর্কিপন্থীরা পঞ্চাশটি নতুন সদস্য পেয়েছিল আর এই নবাগতরা সবাই ছিল শহুরে ছেলেমেয়ে, পাকাপোক্ত আর অভিজ্ঞ। আর যদিও এই নবাগতরা দ্রুত কলোনির নিয়মশৃঙ্খলা ও ঐতিহ্য আত্মসাৎ করে নিচ্ছিল, তবু আগের মতোই সত্যিকার যৌথ জীবনের সংস্কৃতি ও যৌথ সমাজের খাঁটি আদলটি স্পষ্ট হয়ে উঠছিল অনেক বেশি ধীরগতিতে। তবে আমরাও আবার এসবে অভ্যস্ত ছিলুম।

আমাদের সামনে তখন খুলে যাচ্ছিল চমৎকার দূরপ্রসারী দৃশ্যপট — আমরা স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলুম নিজেদেরই 'রাব্ফাক' গড়ার, নতুন গোটা একখানা কারখানা-বাড়ি তৈরির, বৃহত্তর জীবনে নতুন-নতুন প্রবেশপথ খুঁজে পাওয়ার। আর এমন সময় একদিন কাগজে পড়লুম যে আমাদের আপন গোর্কি — গোর্কি স্বয়ং সোভিয়েত ইউনিয়নে আসছেন।

১৪

আমার পুরস্কার

ওই সময়টা — সেবারের ডিসেম্বর থেকে জুলাই মাস — কাটল আশ্চর্য চমৎকারভাবে। ওই দিনগুলোয় আমার নিজস্ব পানসি নৌকো ঝড়ে প্রচণ্ড আথালপাথাল জুড়ে দিল বটে, তবে আমার আশ্রয় ছিল দু-দুটো যৌথ সংস্থা, আর তাদের প্রত্যেকটিই নিজস্ব ধরনে ছিল চমৎকার।

দ্জের্জিন্স্কি-পন্থীদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে প্রায় দেড় শো'য় দাঁড়াল। নতুন ছেলেমেয়েরা এল তিনবারে তিনটে দলে ভাগ হয়ে, প্রত্যেক দলে তিরিশজন করে। তারা ছিল রাস্তার অনাথ ছেলেমেয়েদের মধ্যে সবসেরা, একেবারে বাছাই-করা সব নমুনা। কমিউনার্ডদের জীবন কাটছিল পরিচ্ছন্ন সভ্যভব্যভাবে, বাইরে থেকে দেখলে মনে হোত তাদের ঈর্ষা করা ছাড়া গতি নেই। আর সত্যিই বহু লোক তাদের ঈর্ষাই করত, অথচ এসব লোক কিন্তু মোটেই রাস্তার অনাথ ছেলেপিলে ছিল না।

দ্জের্জিন্স্কি-পন্থীরা যখন লোকসমক্ষে বের হোত তখন তাদের পরনে থাকত ভালো সুতীকাপড়ের সু্যট আর গলার কাছে ঝলমল করত শাদা শার্টের চওড়া-চওড়া কলার। তাদের 'ব্রাস ব্যান্ড'-এর বাজনার যন্ত্রগুলো ছিল সবচেয়ে ভালো পেতল দিয়ে তৈরি আর বিউগ্লগুলোর ওপর ছাপমারা ছিল প্রাগের একটা নামকরা ফ্যাক্টরির। শ্রমিকদের আর 'চেকা'র কর্মীদের ক্লাবগুলোয় কমিউনার্ডদের ছিল অবারিতদ্বার, আর গোলাপি গাল আর বন্ধুর হাসি নিয়ে, ভদ্র রুচিসম্মত সাজপোশাক করে ওইসব ক্লাবে তারা যেতও প্রায়ই। কমিউনার্ডদের যৌথ সংস্থাটিকে সর্বদাই এত কেতাদুরস্ত মনে হোত যে মস্তিষ্কের অতিবৃদ্ধিতে ভারাক্রান্ত নয় এমন কিছু-কিছু ব্যক্তি সত্যিসত্যিই বিরক্তিপ্রকাশ করে বলত:

'এঃ, ভারি তো! ভব্যসভ্য মিষ্টি কতগুলি ছেলেপিলেকে পোশাক-আশাক পরিয়ে ওরা লোকজনকে দেখিয়ে-দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। সত্যিসত্যি রাস্তার ছেলেপিলে মানুষ করুক তো, তবে বুঝি!'

কিন্তু আমার তখন এসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় ছিল না একেবারে। সবচেয়ে জরুরি কাজগুলোও দিনের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেরে উঠতে পারছিলুম না যেন। রোজই আমাকে দৌড়তে হচ্ছিল দুই-ঘোড়ার গাড়িতে সওয়ার হয়ে এক যৌথ থেকে আরেক যৌথ সংস্থায় আর যে-ঘণ্টাখানেক সময় রাস্তায় এই যাতায়াতে কাটছিল আমার নির্দিষ্ট বরাদ্দ সময়ের খাতে সেই সময়টুকুই অযথা অপচয় বলে ঠেকছিল। আমাদের রক্ষণাধীন ছেলেপিলেদের মধ্যে যদিও দুর্বলতার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না এবং সমৃদ্ধির পালাও চলেছিল একটানাভাবে, তবু আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের খাটতে-খাটতে জান বেরিয়ে যাচ্ছিল। ওই সময়েই সেই তত্ত্বটা আমার মাথায় উদয় হয় যে-তত্ত্বকথাটা এখনও আমি প্রচার করে চলেছি। তত্ত্বটা

আপাতদৃষ্টিতে প্রচলিত ধারণার বিরোধী বলে মনে হলেও সেটা খাঁটি সত্যি। তত্ত্বটা এই: স্বাভাবিক ছেলেপিলেকে কিংবা স্বাভাবিকভাবে মানুষ-করে-তোলা ছেলেপিলেকে শিক্ষাদান করা সবচেয়ে কঠিন। এইসব ছেলেপিলের প্রকৃতি হয় অন্যদের চেয়ে বেশি গূঢ়, তাদের চাহিদা বেশি জটিল, শিক্ষাদীক্ষা গভীরতর ও তাদের সামাজিক সম্পর্কের জালও বহুবিচিত্র। আমাদের যে-ধরনধারণ তাদের ক্ষেত্রে কার্যকর তা আমাদের ইচ্ছাশক্তির ব্যাপ্ত প্রবল বহিঃপ্রকাশ নয় বা লক্ষণীয় সাবেগ আচরণও নয়, তা হল একমাত্র সূক্ষ্ম জটিল ছলাকলা বা কৌশল প্রয়োগ।

বহুদিন থেকেই কলোনি-বাসিন্দারা আর কমিউনার্ডরা সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবিশেষদের স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে আর থাকছিল না। প্রতিটি যৌথ সংস্থাই অন্যান্য সংগঠন — যথা, কম্‌সমোল, পাইওনিয়র, খেলাধূলোর আর ফৌজের নানা সংগঠন এবং ক্লাবগুলির সঙ্গে নানা ধরনের জটিল সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। আমাদের কলোনি আর শহরের মধ্যে অসংখ্য পাকা রাস্তা আর পায়েচলা পথে চলাচল চলেছিল, আসা-যাওয়া করছিল বহু ভাবনাচিন্তা, ধ্যানধারণা আর দুমুখো প্রভাব, আর সেই সঙ্গে মানুষও।

এই সবকিছুর দৌলতে আমাদের শিক্ষা-সংক্রান্ত কাজকর্মে নতুন রঙের ছোঁয়াচ লাগছিল। এর বেশকিছু আগে থেকেই শৃঙ্খলা আর দৈনন্দিন জীবনের বাঁধা পারিপাট্য বজায় রাখা একা আমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। যৌথ জীবনেরই ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল এ-সমস্ত ব্যাপার, আর এই ঐতিহ্যের অনুশাসনই এসব আমার চেয়ে আরও ভালোভাবে তত্ত্বাবধান করতে সমর্থ ছিল। কেবল-যে নিয়মশৃঙ্খলা লঙ্ঘনের ব্যাপার ঘটলে, একটা ঝগড়াঝাটি বাধলে কিংবা কান্নাকাটি চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হলেই ঐতিহ্যের এই অনুশাসন সবকিছুর খবরদারি করত তা নয়, বরং তা ছিল সর্বক্ষণেরই জাগ্রত প্রহরী আর তাকে চালাত — যাকে বলতে পারি — যৌথ জীবনের সহজাত প্রবৃত্তি।

আমার পক্ষে কাজ করা শক্ত হয়ে পড়লেও ওই সময়ে আমার জীবনটা ছিল ভারি সুখের। যে-বাচ্চারা কোনো এক প্রাপ্তবয়স্ক লোকের চোখের সামনে ক্রমে-ক্রমে বেড়ে উঠেছে আর আন্তর আস্থার বশে তার সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে চলেছে সেই বাচ্চাদের সাহচর্য ওই বয়স্ক লোকটির পক্ষে এক

অপার্থিব সুখের ব্যাপার। এমন মনোরম সাহচর্যে এমন কি ব্যর্থতাও মনোকষ্ট ঘটায় না, বিরক্তি আর যন্ত্রণারও মনে হয় নিজস্ব মহৎ মূল্য আছে।

কমিউনার্ডদের চেয়ে গোর্কি যৌথটি আমার বেশি কাছাকাছি ছিল। এই যৌথে বন্ধুত্বের বন্ধন ছিল আরও শক্ত, আরও গভীর, এর মধ্যেকার মানব-উপাদানগুলিকে গড়েপিটে তৈরি করে নিতে মূল্য দিতে হয়েছিল অনেক বেশি, এখানে লড়াইও চলেছিল অনেক বেশি তীব্রভাবে। তাছাড়া গোর্কিপন্থীদের আমাকে দরকারও ছিল বেশি। দ্জের্জিন্স্কি-পন্থীদের ভাগ্যটা ভালো ছিল এই কারণে যে একেবারে শুরু থেকেই 'চেকা'র লোকজনকে তারা রক্ষক হিসেবে পেয়েছিল, অথচ গোর্কিপন্থীদের বেলায় একমাত্র আমাকে আর আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ছোট্ট দলটিকে বাদ দিলে আপন লোক বলতে তাদের আর কেউ ছিল না। আর তাই কখনই এটা আমার মাথায় ঢোকে নি যে এমনও দিন আসতে পারে যখন আমায় গোর্কিপন্থীদের ছেড়ে যেতে হবে। এমন একটা সম্ভাবনার কথা কল্পনা করতেও আমি সম্পূর্ণ অপারগ ছিলুম, মনে হোত এমনটা যদি ঘটে তবে তা আমার জীবনে সবচেয়ে মারাত্মক দুর্ভাগ্য হিসেবেই দেখা দেবে।

কলোনিতে প্রতিবার ফিরে-যাওয়া আমার কাছে নিজের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার সামিল ছিল। এমন কি কলোনি-বাসিন্দাদের সাধারণ সভায় আর দলপতি-পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেয়ার সময়, সবচেয়ে জটিল সংঘাত ঘটার আর কঠিন সমস্ত সিদ্ধান্ত নেবার সময়ও আমি খানিকটা বিশ্রাম সেরে নিতে পারতুম। ওই সময় থেকেই সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী, দুর্মর একটা অভ্যাসের সূত্রপাত ঘটে আমার, আর তা হল নির্জন নিস্তব্ধ ঘরে কাজ করতে পারার ক্ষমতালোপ। তার পর থেকে কাজ করার সময় আমি সত্যিসত্যিই স্বচ্ছন্দ বোধ করতুম একমাত্র তখন, যখন আমার কাছাকাছি, একেবারে টেবিলের ধারেই, আমি শুনতে পেতুম কচি-কচি গলার মিষ্টি বকবকানি। আর একমাত্র তখনই আমার ভাবনা পাখা মেলে দিত, আমার কল্পনা শুরু করত কাজ। বিশেষ করে এইজন্যেই গোর্কিপন্থীদের কাছে আমি ঋণী।

কিন্তু দ্জের্জিন্স্কি কমিউন ক্রমশ বেশি-বেশি করে আমার সময় আর মনোযোগে ভাগ বসাতে শুরু করল। আর এইসব দায়দায়িত্বের ধরনও ছিল সম্পূর্ণ নতুন, যেমন নতুন ছিল কমিউনার্ডদের শিক্ষা-সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনাও।

বিশেষ করে আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন আর অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ছিল 'চেকা'র লোকজনের সংসর্গ। এই লোকজনেরা ছিলেন মূলত একটি যৌথের অন্তর্ভুক্ত, যে-সংজ্ঞাটা অন্তত ওই সময়ে জনশিক্ষা-দপ্তরের কর্মীদের সম্পর্কে আরোপ করলে একটু বাড়িয়ে বলাই হোত। আর যতই ঘনিষ্ঠভাবে উপরোক্ত ওই যৌথ জীবন আমি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলুম, কাজের মধ্যে দিয়ে যতই ওই জীবনের কাছাকাছি আসতে লাগলুম, ততই জোরালোভাবে আমি সচেতন হয়ে উঠলুম যে ওঁদের জীবনযাত্রায় এমন কিছু একটা আছে যা একেবারে নতুন ব্যাপার। কী করে-যে এটা সম্ভব হল তা জানি না, তবে দেখলুম তার আগের আট বছর ধরে কলোনির যৌথ জীবনে তিলে-তিলে যে-গুণগুলির অনুপ্রবেশ ঘটাতে আমি সচেষ্ট ছিলুম 'চেকা'র যৌথ জীবন সেইসব বিশেষ গুণেই সমৃদ্ধ। সত্যিই, কথাটা এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না! বলা-নেই-কওয়া-নেই একেবারেই হঠাৎ আমি বাস্তবে এমন একটি ভাবমূর্তির সম্মুখীন হলুম যা নাকি শুধুমাত্র আমারই মনগড়া — বলা যায়, একান্ত আমারই মানসপ্রতিমা — বলে তখনও পর্যন্ত আমার দৃঢ় ধারণা ছিল। এই মানসপ্রতিমাটিকে আমি গড়ে তুলেছিলুম যুক্তিশাস্ত্র ও সাহিত্যের সহায়তায়, নানা ধরনের ঘটনা আর বিপ্লবের গোটা জীবনদর্শন বিশ্লেষণ করে — অথচ যার প্রতিরূপ বাস্তবজীবনে কোথাও খুঁজে পাই নি, খুঁজে পাব-যে এমন আশা-ভরসাও ত্যাগ করেছিলুম।

আমার এই অভিনব আবিষ্কার নিজের কাছেই এত মূল্যবান আর তাৎপর্যপূর্ণ ছিল যে তখন একটিমাত্র ভয়ই পেয়ে বসেছিল আমাকে — ভগবান, যেন মোহভঙ্গ না-ঘটে। আর তাই গোটা ব্যাপারটাকেই মনের কন্দরে আমি গোপন করে রাখলুম, এই লোকগুলির সঙ্গে আমার সম্পর্কে যাতে কৃত্রিমতার বিন্দুমাত্র ছোঁয়াচ না-লাগে তারই জন্যে।

এই আবিষ্কার আমার নতুন শিক্ষাদান-সংক্রান্ত দর্শনের ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তনের সূচনা করল। সেদিন যা আমার বিশেষরকম আনন্দের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা হল এই যে যে-বিমূর্ত মানসপ্রতিমা তখনও পর্যন্ত আমার কাজের দিশারী হয়ে ছিল তার মধ্যে অনেক কিছু অস্পষ্টতা ও অনির্দিষ্টতার ভাবের ভারি সহজ-সরল সব ব্যাখ্যা 'চেকা'র যৌথ জীবনে নিহিত এই গুণাবলী থেকে পেয়ে গিয়েছিলুম আমি। একদা রহস্যময় ঠেকত এমন অনেক ব্যাপার সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভের সুযোগ আমার ওই সময়ে

জুটে গেল। 'চেকা'র লোকজনের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতির বোধের সঙ্গে উঁচুদরের বুদ্ধিবৃত্তির মান যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তার এমন ধরনের বহিঃপ্রকাশ ছিল না প্রাক্তন রুশ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যার নগ্ন প্রকাশ আমার দারুণ বিতৃষ্ণার কারণ ঘটাত। এরকমটাই-যে হওয়া উচিত তা অবশ্য আমি বুঝতুম, তবে জ্যান্ত মানুষের কাজেকর্মে এই সমস্ত গুণের প্রকাশ-যে কেমনতরো ঘটবে সে-সম্বন্ধে কোনো স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। আর ওই সময়ে আমার সুযোগ ঘটল কথাবার্তা, মনের গতিবিধি, বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পরিশীলিত আবেগ প্রকাশের নতুন-নতুন ধরন, রুচির নতুন ধরনের সব বিন্যাস, সাহস ও উদ্দীপনার নতুন যতসব ধাঁচ এবং সবচেয়ে বেশি করে আদর্শ ও ধ্যানধারণাকে নতুন পদ্ধতিতে কাজে লাগানোর ব্যাপারগুলো ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করার। মেকি বুদ্ধিজীবীরা কুখ্যাত এইজন্যে যে মস্তিষ্কের খোপে বসতকারী আদর্শের বোধকে তারা এমন এক পাজি ভাড়াটে বাসিন্দা বলে গণ্য করে — যে নাকি অন্যের ঘর জবরদস্তি দখল করে থাকে, কখনও ভাড়া দেয় না, অন্যের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করে আর আশপাশের সবাইকে জ্বালাতন করে মারে। অপরদিকে অন্যরাও এই ভাড়াটে সম্পর্কে অনবরত নালিশ-ফরিয়াদ করে আর যতটা সম্ভব এই 'আদর্শ'-এর হাত এড়িয়ে দূরে থাকতে চেষ্টা করে। কিন্তু 'চেকা'র লোকজনের মধ্যে আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস লক্ষ্য করলুম: দেখলুম এখানে আদর্শবোধ কোনো ভাড়াটে বাসিন্দা নয়, বরং চমৎকার একজন পরিচালক কর্মকর্তা। সে তার প্রতিবেশীর কাজকে মর্যাদা দেয়, মেরামতি আর ঘর-গরমের কাজের দেখাশোনা করে আর প্রত্যেকেই তাকে মনোমতো আর অমায়িক কর্মকর্তা বলে মনে করে। বিশেষ করে নীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে 'চেকা'র লোকজনের মনোভঙ্গিটা ঠিক কী তা বোঝার ব্যাপারে আমার কৌতূহল ছিল। দেখলুম, নীতির প্রতি ওঁরা বিশ্বস্ত ঠিকই, তবে আমার কিছু-কিছু 'বন্ধু'র বেলায় যেমন ছিল ওঁদের কাছে নীতি তেমন চোখের-ওপর-বাঁধা ব্যান্ডেজের সামিল ছিল না। 'চেকা'র লোকজন নীতিকে মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করতেন আর লোকে যেভাবে হাতঘড়িকে কাজে লাগায় সেইভাবে কাজে লাগাতেন নীতিবোধকে — অর্থাৎ যাকে বলে, লালফিতের দীর্ঘসূত্রতা কিংবা খ্যাপা বেড়ালের অযথা ব্যস্তসমস্ত ভাব বাদ দিয়েই। ফলে, অবশেষে আমার সাক্ষাৎ মিলল নীতিনিষ্ঠ স্বাভাবিক জীবনের, এবং নীতির ব্যাপারে মেকি বুদ্ধিজীবীদের অনড় মনোভাব সম্পর্কে আমার বরাবরের বিতৃষ্ণা-যে

ভিত্তিহীন নয় সেই বিশ্বাসের সপক্ষে শেষপর্যন্ত সমর্থনও জুটে গেল। কেননা এটা কারো অজানা নয় যে এক বিশেষ ধরনের বুদ্ধিজীবী যখন নীতির ভিত্তিতে অবিচল থাকার চেষ্টায় কোনো কাজ করেন তখন তার আধঘণ্টাটাক পরেই তাঁকে আর আশপাশের সবাইকে বুক-ধড়ফড়ানি কমানোর জন্যে ওষুধ খেতে হয়।

'চেকা'র যৌথে আরও বহু নতুন চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য আমার চোখে পড়ল। যথা, সর্বব্যাপী প্রসন্নতা, বাহুল্যবর্জিত সংক্ষিপ্ত ভাষণ, আগে-থেকে-তৈরি ছকবাঁধা সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিরাগ, সোফায় বা টেবিলের ওপর শরীর এলিয়ে দেয়ায় অক্ষমতা, এবং পরিশেষে, খুশিতে প্রাণ ঢেলে কাজ করার অসীম ক্ষমতা — আর তা শহীদ-শহীদ ভাব বা ভানের আশ্রয় না-নিয়েই, গা-বমির উদ্রেককর 'মহিমান্বিত শহীদ'-এর ভঙ্গির আভাস-ইঙ্গিত ছাড়াই। অবশেষে আমি নিজে চোখে দেখলুম আর নিজে থেকেই অনুভব করলুম সেই অমূল্য বস্তুটিকে — 'সামাজিক আসঞ্জন' ছাড়া যার আর কোনো যুতসই নাম আমার মাথায় আসছে না। এটা হল সর্বসাধারণের ভবিষ্যৎ লক্ষ্যগুলি সম্বন্ধে সেই বোধ, কাজের প্রতিটি স্তরে পরস্পরের জন্যে সেই সচেতনা, যৌথ সমাজের প্রতিটি সদস্য সম্পর্কেই সেই এক সচেতনা, নিয়ত-জাগরূক একটিমাত্র সুউচ্চ সাধারণ লক্ষ্যের সেই চেতনা — যা নাকি কখনও নিছক পণ্ডিতিয়ানায় কিংবা বাচালতায় প্রকাশ পায় না। এই 'সামাজিক আসঞ্জন' বস্তুটি এমন জিনিস নয় যা কোনো সম্মেলন বা বৈঠকে মিলিত হবার আগে তাড়াহুড়ো করে দোকানের কাউন্টার থেকে পাঁচ কোপেকে কিনে নেয়া চলে, পাশের লোকটির সঙ্গে অমায়িক হাসি-বিনিময় ও আলাপের একটা কায়দামাত্র নয় এ; এ হল গিয়ে সত্যিকার ঐক্য, চলাফেরার ও কাজের, দায়িত্বের ও পারস্পরিক সাহায্যের সমন্বয়সাধন, এ হল গিয়ে ঐতিহ্যের অন্তর্নিহিত ঐক্য।

'চেকা'র লোকজনের বিশেষ তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যবস্তু হওয়ায় গোড়া থেকেই দ্জের্জিন্স্কি-পন্থীরা অনেক বেশি সুবিধাজনক পরিবেশে জীবনযাত্রা চালিয়ে যেতে পারল। তাদের জন্যে কর্তৃপক্ষ যা কিছু করে দিচ্ছিলেন তাকে ভালোমনে মেনে নেয়াই ছিল তাদের কাজ। আমাকেও আর আগের মতো পাথরের দেয়ালে মাথা খুঁড়ে মরতে হচ্ছিল না, কর্তৃপক্ষের মাথায় এই সামান্য কথাটা ঢোকানোর জন্যে ব্যর্থ চেষ্টায় দিনের-পর-দিন কাটাতে হচ্ছিল না যে

পকেট-রুমাল আর অন্যান্য টুকিটাকি জিনিসও মানুষের পক্ষে ভারি উপযোগী আর দরকারি বস্তু।

সত্যিই আমি যারপরনাই খুশি হয়েছিলুম। এই খুশির কারণকে সূত্রবদ্ধ করলুম এইভাবে: খাঁটি বল্‌শেভিকদের সঙ্গে এতদিনে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়ার ফলে আমি অবশেষে দৃঢ়-নিশ্চিত হয়েছি যে আমার শিক্ষাদানের প্রণালীটি খাঁটি বল্‌শেভিক পদ্ধতি এবং যে-ধরনের মানুষকে এতদিন আদর্শ বলে মনে-মনে ভেবে এসেছি তা মোটেই আমার নিজের মনগড়া আবিষ্কার নয়, দিবাস্বপ্নও নয়, তা খাঁটি জীবন্ত একটা সত্য, আর এটা-যে সত্য তা আমার পক্ষে পুরোপুরি বোঝা সম্ভব হচ্ছে এই কারণে যে এমন মানুষ গড়ার জন্যে আমার কাজে অংশীদার হয়েছেন এমনই সব মানুষ। আর পদে-পদে উন্মত্ত হস্তক্ষেপ যা নাকি ছিল এতদিন আমার কাজের অবশ্যম্ভাবী অঙ্গ কমিউনের কাজে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ায় অবশেষে মনে হতে লাগল যে কাজটা কঠিন হতে পারে তবে এ মানুষের মানসিক সামর্থ্যের অসাধ্য কিছু নয়।

বাইরে থেকে লোকে যা ভাবছিল দেখা গেল কমিউনার্ডদের জীবন মোটেই সেরকম সুখৈশ্বর্যে-ভরা আর দুশ্চিন্তামুক্ত নয়। 'চেকা'র লোকজন তাঁদের মাস-মাইনের শতকরা একটা অংশ কমিউনার্ডদের ভরণপোষণের জন্যে চাঁদা হিসেবে দিতেন, কিন্তু তাতে না-আমাদের না-তাঁদের কারোই যে বিশেষ কিছু সুবিধে হোত তা নয়।

তিনটে মাস যেতে-না-যেতেই সত্যিকার অভাবের পীড়ন অনুভব করতে শুরু করল কমিউন। ফলে আমরা কর্মীদের মাইনে বাকি ফেলতে শুরু করলুম, এমন কি রক্ষণাধীন ছেলেপিলেদের খাওয়ার খরচ যোগাতেও অসুবিধে বোধ করতে লাগলুম। কমিউনের ওয়র্কশপগুলো থেকে বাইরের কাজ করে আয় হচ্ছিল সামান্যই, কেননা ওয়র্কশপগুলো আসলে বৃত্তিশিক্ষার কেন্দ্র ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। অবশ্য এটা ঠিক যে কমিউন চালু হওয়ার প্রথম দিনগুলোতেই একসময়ে ছেলেরা আর আমি মিলে জুতোতৈরির কারখানার যন্ত্রপাতিগুলো বাড়িটার একটা অন্ধকারে আবডালে টেনে নিয়ে গিয়ে বালিশ চাপা দিয়ে নিঃশব্দে তাদের সদ্‌গতি করে ফেলেছিলুম আর 'চেকা'র লোকেরা এই খুনের ব্যাপারটাকে দেখেও না-দেখার ভাব করে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু অন্যান্য ওয়র্কশপ থেকেও-যে মোটামুটি একটা বাঁধা আয় নিশ্চিত করা যাবে এমন কিছুই আমরা মাথা খাটিয়ে বের করতে পারলুম না।

একদিন আমাদের বড়কর্তা আমায় ডেকে পাঠালেন। তারপর কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকিয়ে আর ইতস্তত করে টেবিলের ওপর একখানা চেক ধরে দিয়ে বললেন:

'ব্যস, এই-ই সব।'

ব্যাপারটা বুঝলুম। বললুম:

'কত দিলেন আমায়?'

'দশ হাজার। তবে এই-ই শেষ। আসছে বছরের জন্যে অগ্রিম হিসেবে টাকাটা দেয়া গেল। তবে আর কিছুই কিন্তু দিতে পারব না — বুঝলেন? আপনি ওই — উঁ — লোকটিকে বরং কাজে লাগান... লোকটি ভারি কাজের...'

আর এর কয়েকদিন পরেই দেখলুম এক ব্যক্তি, যাঁকে ঠিক শিক্ষাবিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোক বলে মনে হয় না, তিনি কমিউন-বাড়িটার সর্বত্র দৌড়োদৌড়ি করে বেড়াচ্ছেন। জানলুম, তাঁর নাম সলোমন বরিসভিচ কোগান। যাকে যুবক বলে সলোমন বরিসভিচ ঠিক তা ছিলেন না। তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ষাট। তাছাড়া তাঁর হৃদ্‌যন্ত্র ছিল দুর্বল, নিশ্বাসের কষ্ট ছিল, 'স্নায়বিক বিকার'ও ছিল আর ছিল বুকের মাংসপেশীর খিঁচুনির রোগ। সর্বোপরি তিনি ছিলেন একটু বেশি মোটা। কিন্তু কাজের ব্যাপারে লোকটির মধ্যে যেন দৈত্যের শক্তি নিহিত ছিল আর এই দৈত্যকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা তাঁর নিজেরই সাধ্য ছিল না। সলোমন বরিসভিচ সঙ্গে করে টাকার পুঁজি বা মালমশলা-জিনিসপত্র কিংবা উদ্ভাবনী প্রতিভা কিছুই আনেন নি, কেবল তাঁর জীর্ণ পুরনো দেহের কাঠামোখানা ভরে টগবগে-ফুটন্ত গুণাবলীর এমন সঞ্চয় নিয়ে এসেছিলেন আগের আমলে যা তিনি কোনোদিন কাজে লাগান নি। আর তা হল — কর্মতৎপরতা, আশা পোষণের অপরিসীম ক্ষমতা, নাছোড়বান্দা ভাব, মানুষ চেনার ক্ষমতা আর এই সবকিছুর সঙ্গে মেশাল-দেয়া এক-চিমটে ক্ষমার্হ বিবেকবর্জিত বেপরোয়া ভাবের মশলা। আর এ-সবের পাশাপাশি একটু অদ্ভুত অথচ মনোরমভাবে বসত-করা একটা স্পর্শকাতর হৃদয় আর আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা। খুব সম্ভবত এই সব ক'টি বস্তুকে গাড়ির চাকার পাখি বা অরের মতো পাশাপাশি ধরে রেখেছিল চাকার যে-বেড়টি তা হল সলোমন বরিসভিচের আত্মসম্মানবোধ। কেননা প্রায়ই তাঁকে এই কথাগুলো বলতে শোনা যেত যে —

'তমরা এখনও কোগানরে চিনো নাই, বোঝলে! কোগানরে ঠিক-ঠিক চিনলি তবেই কতি পার যে হাঁ —!'

ঠিক কথাই বলতেন তিনি। হ্যাঁ, কোগানকে আমরা ক্রমে-ক্রমে চিনলুম আর তার পরই বলতে সক্ষম হলুম যে এ এক অসামান্য মানুষ! তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতায় আমাদের বড়ই প্রয়োজন ছিল। অবশ্য এ-ও সত্যি যে তাঁর এই অভিজ্ঞতা থেকে-থেকে এমন রূপ নিয়ে প্রকাশ পেত যে কাণ্ডকারখানা দেখেশুনে আমাদের গায়ের রক্ত হিম হয়ে যেত, নিজেদের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারতুম না তখন।

একদিন শহর থেকে বড় একবোঝা কাঠের গুঁড়ি নিয়ে এসে হাজির হলেন সলোমন বরিসভিচ।

শুধোলুম, 'এসব কী জন্যে?'

'কী জন্যি মানে? গুদামঘর বানাতি লাগব্যে না? দালান বানানের ইন্‌স্টিটিউটের জন্যি আসবাবপত্তর বানানের বায়না নিয়ি এয়্যেচি। তা, সেগুলান তো রাখা লাগব্যে কোনো জায়গায়, নাকি?'

'কিন্তু সেগুলো জমা করে রাখার দরকার কী? ফার্নিচার তৈরির সঙ্গেসঙ্গেই আমরা সেগুলো তো গৃহনির্মাণ ইন্‌স্টিটিউটে পাঠিয়ে দিতে পারি।'

'হি-হি-হি! সত্যই ভাবতিছেন নাকি যে অমনধারা এট্টা ইন্‌স্টিটিউট আছে? কিছু নাই, কিছু নাই, ওয়া সেরেফ মনগড়া! ওয়া যদি সত্যসত্যই ইন্‌স্টিটিউট হোত্য, তাইলি কি আমি ওয়ার ধারেকাছে ঘেঁষি?'

'সত্যিই অমন কোনো ইন্‌স্টিটিউট নেই?'

'ইন্‌স্টিটিউট আবার কিসির? ওয়ারা যা খুশি নিজিদেরকে বলুক-না কেনে! মোদ্দা কথা হল্য, ওয়াদের পয়সা আছে। আর পয়সা আছে বলিই ওয়ারা আসবাবপত্তর হ্যানো-ত্যানো বানাতি চায়। অথচ আসবাবপত্তরের মাথায় এট্টা চাল থাকা দরকার। নিজিই তো জানেন তা, নাকি? কিন্তু ওয়ারা মাথার উপর একখান ছাদ বানাতি পারে নাই, ক্যানে কি — এখনও পর্যন্ত ভিটার দেয়াল তোলা হয় নাই। এই আর কি!'

'কিন্তু আপনি যাই বলুন, আমরা গুদামঘর বানাচ্ছি না!'

'আরে, আমিও তো ওয়াদেরে তাই কলাম। দ্জের্‌জিন্‌স্কি কমিউনরে ওয়ারা এট্টা বাজে হট্টশালা বলি মনে করে... কিন্তু এডা এট্টা আদর্শ প্রেতিষ্ঠান।

তাইলি এমন প্রোতিষ্ঠানডা কি যত্তোসব রদ্দি গুদামঘর বানায়্যে সময় নষ্ট করব্যে? আমাদের সময় অত শস্তা নাকি?'

'তা, ওরা কি বলল?'

'কী আর কবে, শুধা কয়: 'ঠিক আছে, বানাত্যে শুরু করয়্যে দ্যাও!' তা, যখন দ্যাখলাম বানানোর জন্যি ওয়ারা এমনধারা পাগল হয়ি উঠ্যেছে তখন আমি কলাম: 'সবকিছু বানাতি বিশ হাজার লাগব্যে।' তা, আপনে যদি এখন গুদামঘর বানাতি না রাজি থাকেন তাইলি আপনের যা ইচ্ছা তাই বানান! সত্যই তো, আমাদের যখন জিনিসপত্তর জোড়াতাড়া দিবার কারখানাঘর দরকার, তখন আমরা মরতি গুদামঘর বানাতি যাই কিসির দুঃখে?..'

এর দু'সপ্তাহ পরে সলোমন বরিসভিচ একদিন অ্যাসেম্বলি-শপ বানাতে শুরু করে দিল। মাটিতে খুঁটি পোঁতা হল, তারপর দেখলুম ছুতোরমিস্ত্রিরা চেরাই কাঠ দিয়ে দেয়াল তুলতে শুরু করেছে।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'সলোমন বরিসভিচ, অ্যাসেম্বলি-শপ বানাচ্ছেন-যে, তা টাকা পেলেন কোত্থেকে?'

'আপনেরে কই নাই কনে থ্যেকে? ওয়ারা-যে আমাদের আমানতে বিশ হাজার রুব্‌ল গচ্ছিত করয়্যে দেছে!'

'কারা দিল আবার?'

'ক্যানে, আপনেরে তো কয়েলাম? ইন্‌স্টিটিউট দেছে, আবার কেডা!..'

'কোন কাজে?'

'কোন কাজি আবার! ওয়ারা চায় গুদামঘর বানান হোক!.. তা, তা-ই সই! ওয়াদের গুদামঘর বানাতি আমার আপত্তি কিসির?'

'কিন্তু, সলোমন বরিসভিচ, আপনি তো গুদামঘর বানাচ্ছেন না, অ্যাসেম্বলি-শপ বানাচ্ছেন!..'

এবার সলোমন বরিসভিচের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। বললেন:

'বটে, বটে! তা, এ-কথাডা কেডা কয়্যেল যে আমাদের গুদামঘরের দরকার নাই? আপনেই কয়্যেলেন, তাই না?'

'টাকাটা আমাদের ফেরত দেয়া দরকার, বুঝলেন!'

শুনে সলোমন বরিসভিচ মস্ত বিজ্ঞের ভঙ্গিতে ভুরু কোঁচকালেন। বললেন:

'রাখেন, রাখেন, অত কাঁচাবুদ্ধি হলি চলে! নগদা পয়সা ফিরত দিতি

কাউরে কোনোদিন শ্নুনোছেন? আপনে না-হয় কড়া ধাতের লোক, এমন কাজ আপনে প্রাণে ধরি করতি পারেন, কিন্তু আমি মশয় অসুস্থ মানুষ, নিজির মনটারে নিয়ি এমন ছিনিমিনি খেলা আমার শরীলে পোষাব্যে না... বলে কী, নগদা পয়সা ফিরত দিতি লাগবে! বটে!'

'কিন্তু ওরা এই জোচ্চুরিটা-যে ধরে ফেলবে!'

'আন্তন সেমিওর্নভিচ, আপনে তো মশয় বুদ্ধিমান লোক, নাকি? তা কন দেখি, ওয়ারা ধরি ফ্যালব্যেডা কী? ধরি ফ্যালবার আছেডা কী? ধরেন, যদি আসচে কালই এস্যে পড়ে ওয়ারা! তা এসি কী দ্যাখব্যে? দ্যাখব্যে লোকে ঘর বানাত্যেছে! তা, ওয়াদের কানে-কানে কবেডা কেডা যে এখেনে জিনিসপত্তর জোড়াতাড়া দেয়ার কারখানাঘর বানান চলত্যেছে?'

'কিন্তু যখন কলঘরের কাজ শ্নুরু হয়ে যাবে?'

'তাতে কী! কাজ করতি আমারে বাধা দিতি পারে কেডা? দালান বানানের ইন্স্টিটিউটের সাধ্যি কী যে আমারে কাজ করতি বাধা দেয়? তাছাড়া কেডা আমারে কয়ে দিবে যে আমি গুদামঘরে কাজ করব্য না খোলা মাঠে কাজ করব্য? এ-ব্যাপারে কোনো আইন আছে নাকি? কোনো আইন নাই।'

সলোমন বরিসভিচের যুক্তির কোনো মাত্রা বা মাথামুণ্ডু কিছুই ছিল না। এই ধরনের যুক্তির হাতুড়ির প্রচণ্ড ঘায়ে সকল বাধাবিপত্তি চূর্ণ করে দিতেন তিনি। বাধা দিতে গিয়ে খানিক দূর পর্যন্ত এগিয়ে আমাদেরও থেমে যেতে হোত, কারণ বাধাদানের সকল চেষ্টাই তিনি অংকুরে বিনাশ করে দিতেন।

বসন্তকালে আমাদের ঘোড়াদুটো মাঠে রাত কাটাতে শ্নুরু করতে-না-করতেই ভিত্কা গোর্কভ্স্কি একদিন এসে আমায় শুধোল:

'সলোমন বরিসভিচ আস্তাবলে ওটা কী বানাতি লেগেছেন?'

'বানাতে লেগেছেন, মানে?'

'হ্যাঁ, বানানো শ্নুরু করেই তো দেছেন। একটা যেন বয়লার না কী বসায়েছেন, আর তার চিমনি বানাতি লেগেছেন।'

'আমার কাছে ওঁকে ডাক তো দেখি!'

সলোমন বরিসভিচ এলেন। সর্বদাই যেমন তেমনি তেলকালিমাখা অবস্থায়, ঘামতে-ঘামতে, হাঁপাতে-হাঁপাতে।

'আস্তাবলে ওটা কী বানাচ্ছেন আপনি?'

'ওইডা? আরে, আপনে তো জানেনই। ঢালাইয়ের কলঘর বানাত্যেছি!'

'ঢালাইয়ের কলঘর? কিন্তু আমরা-যে ঠিক করেছিলুম এজমালি গোসলখানার পেছনে ঢালাইয়ের কলঘর বানাব?'

'ক্যানে, গোসলখানার পিছনে ক্যানে, যখন আস্ত একখান দালান পাঁড় রয়্যেছে?'

'কী বলছেন, সলোমন বরিসভিচ?'

'বোঝলাম, ওয়া তো আমার নাম। কিন্তু হল্যাডা কী?'

'ঘোড়াগুলোর কী হবে?' গোর্কভস্কি শুধোল।

'ঘোড়াগুলান বাইরি খোলা বাতাসে দিব্যি থাকতি পারে। তমরা বুঝি মনে কর যে খালি তমাদেরই তাজা বাতাস দরকার, আর ঘোড়াগুলান গু-মুতির গন্ধ শুঁকি বাঁচত্যে পারে, কেমন? বাঃ, চমৎকার সব ঘোড়াপালার লোক আমার!'

স্বীকার করতেই হয় এমন একখানা যুক্তির গুঁতোয় আমরা একেবারে কুপোকাত হয়ে গেলুম। কিন্তু ভিত্‌কা তবু হার মানবার পাত্র নয়। সে শুধোল:

'কিন্তু শীত এলি পর, তখন?'

এবার সলোমন বরিসভিচ একঘায়ে ওকে খানখান করে দিলেন। বললেন:

'তুমি মস্ত বুঝদার এয়্যেচ কিনা, একবারে বুঝ্যে বসি আছ যে শীত আসব্যেই!'

এহেন জবাবে হতবুদ্ধি ভিত্‌কা শুধু বলতে পারল, 'সলোমন বরিসভিচ!'

সলোমন বরিসভিচ এবার সামান্য একটু পিছু হটলেন। বললেন:

'তা শীত যদি আসেই তাতে হয়্যেছেডা কী? অক্টোবর মাসি কি আস্তাবলের দালান তোলা যায় না? তাতে ক্ষেতিডা কী হয় শুনি? নাকি, এখুনি হাজার দুই রুব্‌ল খরচা করার জন্যি পাগলা কুত্তায় কামড়াচ্ছে তোমারে?'

কী আর করা! করুণ দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে হার স্বীকার করে নিলুম। আমাদের অবস্থা দেখে নিছক করুণাবশতই সলোমন বরিসভিচ এবার নিজের কথাটা ব্যাখ্যা করতে বসলেন। ডান হাত দিয়ে বাঁ-হাতের আঙুল একটা-একটা করে মটকে হিসেব দিতে লাগলেন তিনি:

'মে, জুন, জুলাই, ওরে কী কয় ঘ্যানো — ও হ্যাঁ, আগস্ট, সেপ্টেম্বর...'

এই পর্যন্ত এসে উনি একমুহূর্ত একটু ইতস্তত করলেন। তারপর দ্বিগুণ উৎসাহে ফের শুরু করে দিলেন:

'অক্টোবর... ভাবেন একবার — ছয়-ছয়ডা মাস! বাপ রে, সোজা কথা! ছয় মাসে দুই হাজার রুব্ল আরও দুই হাজার রুব্ল বাচ্চা পাড়ব্যে-নে। আর আপনেরা চান কিনা ছয় মাস কাল যাবৎ আস্তাবলডা খালি পড়্যে থাকুক! কিন্তু পুঁজি না-খাটায়্যে আমরা কি তারে এমনে ফেল্যে-ছড়ায়্যে রাখতি পারি, না রাখা সম্ভব!'

পুঁজি না-খাটিয়ে তাকে নিতান্ত নিরীহভাবে জমিয়ে রাখাতেও ছিল সলোমন বরিসভিচের প্রবল আপত্তি।

তিনি বলতেন, 'আমি তো ভালোমতন ঘুমাতি পারি না। আচ্ছা কন দেখি, চারদিকি এত কাজ করার থাকলি মানুষে নিশ্চিন্দি হয়্যে ঘুমায় কী কর্যে? প্রেত্যিডা মিনিট হল্য গিয়ি এট্টা-এট্টা টাকার কারবারির সামিল। মানুষেরে রোজ এত ঘণ্টা করি ঘুমাত্যে হবে এ-যে কেডা বিধেন দিল তাই ভাবি!'

আর সত্যিই আমরা তাজ্জব বনে গিয়েছিলুম। এই তো অল্প কিছুদিন আগেও আমরা ছিলুম হতদরিদ্র, আর এখন দেখি সলোমন বরিসভিচ চেরাই-করা কাঠ, লোহালক্কড় আর লেদ-মেশিনগুলোয় আকণ্ঠ ডুবে আছেন। আমাদের কাজের দিনগুলো সত্যিই বোঝাই হয়ে ছিল লেনদেন-সম্পর্কিত চিঠি, চেক, আগাম দাদন, চালান, দশ হাজার, বিশ হাজার — ইত্যাকার কথাবার্তায়। দলপতি-পরিষদের সভায় ওই সময়ে ট্রাউজার্স বানানো বাবদ তিন শো রুব্লের মতো সামান্য ক'টা টাকা ধার্য করার ব্যাপারটা নিয়ে ছেলেরা যখন বক্তৃতা দিত, সলোমন বরিসভিচ তখন ঘুমঘুম চোখে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে তাদের কথা শুনতেন। তারপর হঠাৎ একসময় বলে উঠতেন:

'এয়া নিয়ি আবার অত আগড়ম-বাগড়ম কিসির? ছেল্যাদের পরনের ট্রাউজার্স দরকার, ব্যাস ফুইর্যে গেল! আর তার জন্যি মাত্তর তিন শত রুব্ল ক্যানে? অত কমে কাজ চলব্যে না — তার জন্যি দরকার হাজার রুব্ল...'

'কিন্তু টাকাটা আসবে কোথা থেকে বলেন দেখি?' ছেলেরা সমস্বরে শুধোত।

'তমাদের তো হাত-পা আর মুণ্ডগুলান আছে, নাকি? তা, নিজিদেরকে শুধাও দেখি মুণ্ডগুলান খামোকা আছে কী করতি? শুধা টুপির বাহার

দিবার জন্যি? মোট্টেও না! এখন থ্যেকে রোজ কারখানাঘরগ্‌লোয় আরও পনারো মিনিট করো্য বেশি সময় দ্যাও দিকি, দ্যাখো তমাদেরকে হাতে-হাতে হাজার র্‌ব্‌ল কি তার থ্যেকেও বেশি ট্যাকা আমি তুলি দিতে পারি কিনা, যেমন-যেমন কাজ করবে তেমন-তেমন আয় হয় কিনা তমাদের।'

দেখলে হঠাৎ গ্‌দামঘর বলে সন্দেহ হয় এমন নড়বড়ে ওয়র্কশপগ্‌লো সলোমন বরিসভিচ ভরে তুলেছিলেন যত রাজ্যের প্‌রনো শস্তা লেদ-মেশিন আর দড়িদড়া আর জাদ্‌মন্ত্রে বেঁধে-রাখা হাজারো রকমের যন্ত্রপাতির জঞ্জালে। কমিউনার্ডরা কিন্তু সানন্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে এইসব জঞ্জাল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করত। আর এর ফলে তৈরি হতে লাগল অসংখ্য ধরনের জিনিস — যথা, ক্লাবের ব্যবহার্য আসবাবপত্র, খাটের নানা অংশ, তেলের ডিবে, শর্ট্‌স, স্পোর্টস শার্ট, ডেস্‌কো, চেয়ার, আগ্‌ন-নেবানোর যন্ত্রের অংশ, ইত্যাদি। আর সবই তৈরি হতে লাগল দ্‌টো-চারটে করে নয়, একেবারে গাদা-গাদা, কেননা সলোমন বরিসভিচের এইসব কারখানায় শ্রমবিভাগ একেবারে চ্‌ড়ান্ত পর্যায়ে পেঁছেছিল। তিনি বলতেন:

'এই ছেল্যা, তুই তো ছ্‌তারমিস্তিরি হতি যাচ্ছিস না, তাই না? আমি জানি, তুই ছ্‌তারমিস্তিরি হবি না, তুই হবি গে ডাক্তার। তাইলে গোটা একখান চেয়ার তর বানাবার দরকারডা কী? তুই বরং চেয়ারের পায়া বানা। দ্‌ইখান পায়া বানানোর জন্যি আমি যদি তরে এক-কোপেক করো্য দিই, তাইলে সারা দিনি তুই পঞ্চাশ কোপেক রোজগার করতি পারবি। তা, তর তো ইস্তিরিও নাই, কাচ্চাবাচ্চাও নাই, তর আর ভাবনা কী...'

দলপতি-পরিষদের সভায় কমিউনার্ডরা সলোমন বরিসভিচের এইসব কাণ্ডকারখানা নিয়ে হাসাহাসি করত আর ছেলেদের দিয়ে এইসব বাজে ছ্‌টকো কাজ করাতেন বলে তাঁর বির্‌দ্ধে অন্‌যোগও তুলত। কিন্তু হলে কী হবে, এইসব নিয়েই আমরা সেদিন শ্রমশিল্পগত ও আর্থিক পরিকল্পনা ফেঁদে বসেছিল্‌ম আর সেটা ছিল আমাদের কাছে অপরিসীম গ্‌র্‌ত্বের ব্যাপার।

কাজের জন্যে কমিউনার্ডদের পয়সা দেয়ার পদ্ধতি এতই হালকা চালে চাল্‌ করা হল যেন খেয়ালই করা হল না যে শিক্ষাবিজ্ঞান বলে একটা বস্তু আছে এবং শয়তান ও তার নানা কারসাজিরও কোনো অস্তিত্ব আছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা যখন বেতন দেয়ার শিক্ষাবিজ্ঞান-সংক্রান্ত জটিলতার দিকটি সলোমন

বরিসভিচের নজরে আনার প্রয়াস পেতেন তখন তিনি জবাব দিতেন:

'আমার তো মনে হয় কত ধানে কত চাল ছেল্যাপিলারে তা শিখানোই আমাদের কাজ। তা, ছেল্যাপিলা যদি বিনে-পয়সার কাজ কর্য়ে গতর খরচ করে তাইলে তার মাথায় জ্ঞানবুদ্ধিডা গজাব্যে কেমনে তা তো বুঝি না!'

'কিন্তু, সলোমন বরিসভিচ, আপনি কি মনে করেন যে ধ্যানধারণার চর্চাটা কিছুই না?'

'লোকে যখন গতরে খাট্যে বেতন পায় তখন এত ধ্যানধারণা তার মাথায় কিলবিল করতি থাকে যে সে ভাব্যে পায় না অত চিন্তাভাবনা নিয়ি করব্যেডা কী। কিন্তু যখন জেবের ভিত্রি পয়সা থাকে না তখন তার মাথায় খালি এট্টা ভাবনাই ঘোরে — তা হল্য, কার কাছ থ্যেকে পয়সা ধার করা যায়। এই হল্য গে ঘটনা।'

আমাদের শ্রম-যৌথে সলোমন বরিসভিচ ছিলেন অত্যন্ত কার্যকর খামির বা গাঁজবিশেষ। জানতুম, তাঁর যুক্তিতর্ক আমাদের পক্ষে পরকীয় আর কিম্ভূত, তবু হাসতে-হাসতে অথচ প্রচণ্ড জোরে আমাদের একগাদা অন্ধ সংস্কারে তিনি এমন মারাত্মক ঘা দিলেন যে হয়তো নিছক তাঁকে বাধা দিতে গিয়েই আমাদের মধ্যে শিল্প-কারখানায় কাজের ভিন্নতর পদ্ধতি চালু করার একটা চাহিদা জেগে উঠল।

দ্জের্জিন্স্কি কমিউন এত সরল-সহজ উপায়ে এবং প্রায় বিশেষ কোনো চেষ্টা ছাড়াই এমন পুরোপুরি স্বনির্ভর হয়ে উঠল যে এটা কত বড়-যে একটা জয় তা আমরা নিজেরাই তেমনভাবে টের পেলুম না। সলোমন বরিসভিচ মিথ্যেমিথ্যিই কথাটা বলেন নি যে —

'কী বলতিছেন? এক শত পঞ্চাশ জনা কমিউনার্ড তাদের প্যাটের ভাত উপার্জন করতি পারে না? পারে বৈকি, নিচ্চয় পারে! তাদের তো আর শ্যাম্পেন খাওয়ার দরকার করে না, না কী কন? নাকি তাদের ঘরে মাগ আছে, যাদের জন্যি তাদেরকে ভালো-ভালো পোশাক আর অলঙ্কার যোগাতি লাগব্যে?'

ব্যাপক যৌথ প্রয়াসে কমিউনার্ডরা একের-পর-এক তাদের ত্রৈমাসিক শ্রমশিল্পগত ও আর্থিক পরিকল্পনা পূরণ করে চলল। আর 'চেকা'র লোকজনেরা এ-কাজে আমাদের সঙ্গে থাকতেন প্রতিটি দিন। কমিউনার্ডদের

সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও শরিক হতেন প্রতিটি তুচ্ছ খুঁটিনাটির, প্রতিটি সামান্যতম ভুলত্রুটির, সলোমন বরিসভিচের ব্যাবসাদারি মনোভাবের প্রতিক্রিয়ার, উৎপন্ন জিনিসপত্রের নিচু মান আর তৈরি-করতে-গিয়ে নষ্ট-হয়ে-যাওয়া জিনিসপত্রের সংখ্যাধিক্যের জন্যে ক্ষোভের। কমিউনার্ডদের কারখানায় কাজের অভিজ্ঞতা দিনের-পর-দিন এতদূর পাকাপোক্ত আর সূক্ষ্ম হয়ে উঠতে লাগল যে তারা সলোমন বরিসভিচের কাজকর্মের ধরনধারণকেও সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখতে শিখল। সলোমন বরিসভিচ তো চটেমটে একদিন বলেই বসলেন:

'ব্যাপারখান কী? ওয়ারা নাকি সবই শিখ্যে ফেল্যেছে এখন! খার্কভ ইঞ্জিন-তোয়েরের কারখানায় কোন কায়দায় কাজ হয় তা-ই দেখি আমারে শিক্ষে দিতি চায় ওয়ারা! তা, শুধোই — খার্কভ ইঞ্জিন কারখানার জানেডা কী ওয়ারা?'

সর্বস্বীকৃত, সকলের মনোমতো একটা স্লোগান আমাদের চোখের সামনে হাতছানি দিয়ে দুলতে লাগল যেন:

'সত্যিকার একটা ফ্যাক্টরি চাই-ই চাই আমাদের!'

ফ্যাক্টরি তৈরির ব্যাপারটা ক্রমশ ঘনঘন আমাদের মধ্যে আলোচিত হতে লাগল। ব্যাঙ্কের চলতি আমানতে যতই একেক হাজার রুব্‌ল যোগ হতে লাগল ততই আমাদের নিজস্ব ফ্যাক্টরি গড়ার নির্বিশেষ আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল আর সে-আকাঙ্ক্ষা খুঁটিনাটি বিষয়ের আলোচনায় ক্রমশ বাস্তব রূপও নিতে লাগল। তবে যা বলছি এ-সবই হচ্ছে কিছুকাল পরের ঘটনা।

তার আগে যা ঘটছিল তা হচ্ছে দ্জের্জিন্স্কি-পন্থীদের সঙ্গে গোর্কিপন্থীদের ঘনঘন দেখাশোনা। ছুটির দিনগুলোয় দুটি সংস্থাই বাহিনীতে-বাহিনীতে ভাগ হয়ে পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ করত, ফুটবল, ভলিবল, গরদ্কি* ইত্যাদি খেলত, একসঙ্গে স্নান করত, বরফের ওপর স্কেটিং করত, বেড়াতে যেত আর নয়তো যেত থিয়েটরে।

কলোনি আর কমিউন প্রায়ই নানা ব্যাপারে সংস্থা হিসেবেও একত্র যোগ দিত। যেমন, তারা একত্র মিলত কম্‌সমোল ও পাইওনিয়র সংগঠনগুলির

* গরদ্কি — ইউরোপীয় স্কিট্‌ল্‌স-জাতীয় একরকম খেলা। তবে এ-খেলায় বলের বদলে ছোট-ছোট কাঠের পিন ব্যবহার করা হয়। — অনুঃ

নানা অভিযান অনুষ্ঠানে, তাছাড়া দ্রষ্টব্য জায়গা দেখতে, উৎসব উদ্‌যাপনে ও নানা ধরনের সফরের জন্যেও একসঙ্গে মিলত। ওই দিনগুলো এখনও আমার কাছে ভারি প্রিয়, ওগুলো ছিল আমার সত্যিকার জয়গৌরবের দিন। আর সঙ্গে সঙ্গে একথাও আমি ভালোই জানতুম যে ওই দিনগুলো ছিল আমার শেষ গৌরবের দিন।

ওই দিনগুলোতে কলোনি এবং কমিউন উভয়ের পক্ষ থেকেই সবকিছু সম্পর্কে সাধারণ নির্দেশ জারি করা হোত -- এমন কি সেই বিশেষ সময়ে কী পোশাক পরে যেতে হবে আর কোথায় পরস্পর মিলতে হবে তারও পর্যন্ত নির্দেশ থাকত। গোর্কিপন্থী আর কমিউনার্ড উভয়েরই উর্দি ছিল একরকম — ঘোড়সওয়ারের ব্রিচেস পরনে, পায়ে উ'চু মোজা, শার্টের চওড়া শাদা কলার আর মাথায় আঁটো গোল টুপি। এরকম দেখাসাক্ষাতের কোনো ব্যাপার থাকলে তার আগের রাত্তিরটা আমি কলোনিতে কাটাতুম আর কমিউনকে ছেড়ে রাখতুম কির্‌গিজভের তত্ত্বাবধানে। হাঁটাপথে শহরে পে'ছিবার জন্যে ঘণ্টা তিনেক সময় হাতে রেখে কুরিয়াজ ছাড়তুম আমরা, তারপর যথাসময়ে শহরে গিয়ে পে'ছিতুম খলোদ্‌নায়া পাহাড়ের উৎরাই ভেঙে। সর্বদাই আমাদের উভয়পক্ষের মেলবার জায়গা হিসেবে শহরের তের্ভিলিওভ স্কোয়ারের অ্যাস্‌ফল্‌টে-মোড়া চওড়া চত্বরটা নির্দিষ্ট হোত। চত্বরের ঠিক সামনেই ছিল সারা-ইউক্রেন কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির দপ্তর।

গোর্কি কলোনির ছেলেমেয়েরা যখন শহরের রাস্তা ভেঙে চলত তখন বরাবরই ভারি চমৎকার দেখাত তাদের। পাশাপাশি ছ'জন করে সার বে'ধে প্রায় গোটা রাস্তাটাই দখল করে হাঁটতুম আমরা, এমন কি ট্রামলাইনও দখল করে নিতুম কখনও-কখনও। আর তখন গোটা দশেক ট্রাম দাঁড়িয়ে যেত আমাদের পেছনে, ড্রাইভাররা চে'চামেচি করত আর ঢংঢং শব্দে ঘণ্টা বাজিয়ে চলত অনবরত। কিন্তু আমাদের সারিগুলোর বাঁ-দিকে হাঁটত যে-ছেলেমেয়েরা তারা তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে ভারি সচেতন ছিল, আর চলার বেগ সামান্য একটু কমিয়ে দিয়ে তারা কুচকাওয়াজ করে চলত গম্ভীরভাবে আর থেকে-থেকে চোরা-চাউনিতে পাশের ফুটপাথের দিকে তাকাত। তবে ট্রামগাড়ি, ড্রাইভার আর তাদের ঘণ্টা বাজানোর দিকে দৃক্‌পাতমাত্র করত না তারা। আমাদের সারিগুলোর সবশেষে পেছন-পেছন তিনকোনা একটা পতাকা তুলে ধরে

আসত পিয়েত্রো ক্রাভ্‌চেঙ্কো। রাস্তার লোকজন বিশেষরকম ঔৎসুক্য নিয়ে স্নেহভরে তার দিকে তাকিয়ে থাকত আর বাচ্চা ছেলেরা মহা-উৎসাহে এমনভাবে চারিদিক থেকে ছেঁকে ধরত তাকে যে পিয়েত্রো বেচারা লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিত। আর তার পতাকাখানা পেছনের ট্রামের ড্রাইভারের একেবারে নাকের ডগায় দুলতে থাকত তখন, আর পিয়েত্রোকে মনে হোত যেন কানে-তালা-ধরানো ট্রামের ঘণ্টির জমাট আওয়াজের আবহাওয়ায় ভাসছে।

অবশেষে রোজা লুক্সেমবুর্গ স্কোয়ারে পেঁছে তবেই আমাদের সারিগুলো ট্রামলাইন ত্যাগ করত। আর তখন ট্রামগুলো একে-একে আমাদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেত আর জানলায়-জানলায় যাত্রীরা ছেলেদের দিকে তাকিয়ে হাসত আর বাহবা দেয়ার ভঙ্গিতে আঙুল নাড়াত। ছেলেরা কিন্তু এতে মোটেই বেসামাল হোত না কিংবা পা ফেলার তালে গোলমালও করত না, কেবল মুখ টিপে-টিপে বাচ্চাসুলভ দুষ্টু হাসি হাসত। আর তারা হাসবে না-ই বা কেন? শহুরে লোকেদের সঙ্গে একটু ঠাট্টা-মসকরা করা, একটু নির্দোষ মজা করায় দোষটা কী? তাছাড়া এইসব লোকজন তো ছিল আমাদেরই আপন জন, চমৎকার সব মানুষ — কেননা আগেকার যতসব অভিজাত আর দরবারি লোকজন আমাদের রাস্তাঘাটে তখন আর হাঁটত না, মহিলাদের বাহুলগ্ন করে রঙচঙে পোশাকে-সাজা ফৌজী অফিসাররাও পথ চলত না তখন, দোকানদাররাও আমাদের দিকে রাগী চোখের ঝিলিক হানত না। তাই শহরে চলাফেরা করতুম আমরা এমনভাবে যেন আমরাই শহরের কর্তা, 'অনাথাশ্রম'-এর ছেলেপিলে নই — আমরা কলোনি-বাসিন্দা, গোর্কিপন্থী। আর আমাদের লাল পতাকা এমনি-এমনি আমাদের সারির সামনে পত্‌পত করে হাওয়ায় ওড়ে না, আমাদের বিউগ্‌লগুলো অযথাই 'বুদিয়োনি কুচকাওয়াজ'-এর বাজনা বাজায় না।

তৌভিলিওভ স্কোয়ারে পেঁছে খাড়াই বেয়ে চত্বরটায় ওঠা শুরু করতে-না-করতেই দ্জের্‌জিন্‌স্কি-পন্থীদের পতাকার আগাটা নজরে পড়ত। আর তারপরই দেখা যেত শাদা কলারের লম্বা-লম্বা লাইন, ভাবগম্ভীর পরিচিত মুখগুলো, কুচকাওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে হাতের দোলানি আর শোনা যেত বাজনার বজ্রগর্জন। দেখা যেত গোটা কির্‌গিজভ-বাহিনীকে। আর দ্জের্‌জিন্‌স্কি-পন্থীরা আমাদের অভ্যর্থনা জানাত পতাকার নিচে স্যালুটের বিশেষ ভঙ্গিতে।

তারপর একটি মুহূর্ত কাটত, আর পরমুহূর্তেই আমাদের ব্যান্ড কুচকাওয়াজের বাজনা থামিয়ে গর্জন করে উঠত প্রতি-নমস্কারে।

অতঃপর আমাদের দুটি সংস্থা পরস্পর মুখোমুখি হয়ে কড়াকড়ি নৈঃশব্দ্য বজায় রেখে অল্প একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকত, আর সেই সময়টায় কির্‌গিজভ তার রিপোর্ট পেশ করত। আর তারপরই লাইন ভেঙে ছেলেরা যে-যার বন্ধুদের কাছে ছুটে যেত, করমর্দন করত আর হাসিঠাট্টায় মুখর হয়ে উঠত। এ-সময়টায় আমার কেন যেন ফাউস্টের কথা মনে পড়ত। আমাকে এ-সময়ে দেখলে ধান্দাবাজ সেই টিউটনটির কিন্তু ঈর্ষারই উদ্রেক হোত! ডাক্তারটির ভাগ্য খারাপ ছিল, তিনি নিজের জন্যে একটা খারাপ যুগ বেছে নিয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে যা খাপ খায় না বেছে নিয়েছিলেন তেমন একটা সমাজ-কাঠামো!

এইরকম এক দেখাসাক্ষাতের পরের দিনটা যদি ছুটির দিন হোত তাহলে তো কথাই নেই, প্রায়ই দেখা যেত যে মিত্‌কা জেভেলি আমার কাছে এসে যে-কোনো ছুতোনাতায় সদলবলে গোর্কি কলোনিতে যাওয়ার প্রস্তাব দিচ্ছে। হয়তো এসে বলছে:

'আমরা গোর্কিপন্থীদের কাছে যাই, কী বলেন! আজ সন্ধ্যায় ওদের ওখেনে 'যুদ্ধজাহাজ পতিওম্‌কিন' ছবিখান দেখানো হচ্ছে। আর ওখেনে খাবারদাবারও আছে যথেষ্ট...'

আর এমন সব দিনে পদভোর্‌কি গাঁখানাকে আমাদের দুই দলের সম্মিলিত ব্যান্ডের বাজনার আওয়াজে ঘুম ভাঙিয়ে তুলে কলোনিতে পৌঁছতুম আমরা। তারপর গভীর রাত পর্যন্ত হট্টগোল সমানে চলতে থাকত খাবারঘরে, এজমালি শোবার ঘরগুলোয় আর ক্লাবঘরে — বড়রা বলে চলত কলোনির গোড়ার দিনগুলোর নানারকম ভাগ্যবিড়ম্বনার কাহিনী আর ছোটরা গোগ্রাসে গিলত তা-ই ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে।

এপ্রিলের শুরু থেকে আমাদের কথাবার্তার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়াল কলোনিতে গোর্কির আসার ব্যাপারটা। আলেক্সেই মাক্সিমভিচ চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, বিশেষ করে জুলাই মাসে তিনি খার্‌কভ আসবেন কলোনিতে তিনটে দিন কাটিয়ে যাবার জন্যে। আলেক্সেই মাক্সিমভিচের সঙ্গে আমাদের চিঠি-লেখালিখি বহুদিন আগে থেকেই নিয়মিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যদিও কলোনি-বাসিন্দারা তার আগে কোনোদিন তাঁকে চোখে দেখে নি তবু

নিজেদের ও দলবলের ওপর তাঁর ব্যক্তিত্ব-যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা তারা অনুভব করছিল, আর অনুপস্থিত মায়ের কথা ভেবে বা তাঁর ছবি দেখে বাচ্চারা যেমন মন-কেমন-করায় বুঁদ হয়ে ওঠে তেমনই বুঁদ হয়ে উঠেছিল তারাও। একমাত্র যে-ব্যক্তি ছেলেবেলা থেকে পারিবারিক জীবনে বঞ্চিত হয়ে থেকেছে, কোথা থেকে এতটুকু স্নেহমমতা পাবার ভরসা না-রেখে গোটা জীবন কাটাতে হয়েছে যাকে, সে-ই শুধু বুঝতে পারে সময়ে-সময়ে জগৎটাকে কতখানি নিরুত্তাপ আর সুদূর ঠেকতে পারে, আর একমাত্র এমন লোকই একজন মহৎ মানুষের, সমৃদ্ধ, উদার, হৃদয়তাপে-ভরা একজন মানুষের স্নেহযত্নের যথার্থ মূল্য উপলব্ধি করতে সমর্থ।

গোর্কিপন্থীরা জানত না কেমন করে সূক্ষ্ম সুকুমার আবেগ প্রকাশ করতে হয়, কেননা সুকুমার কোমল ভাবকে তারা বড্ড বেশি মূল্যবান জ্ঞান করত। আমি নিজে ওদের সঙ্গে আট-আটটা বছর কাটিয়েছিলুম, রক্ষণাধীন ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেকেই আমার অত্যন্ত অনুরক্ত হয়ে উঠেছিল, তবু ওই সময়ের মধ্যে ওদের একজনও আমার প্রতি এমন ভাব দেখায় নি যাকে প্রচলিত অর্থে সুকুমার বা কোমল বলা চলে। আমার সম্পর্কে ওদের মনোভাব আমি মাপতে পারতুম একমাত্র আমারই পরিচিত কিছু-কিছু ভঙ্গি বা লক্ষণ দিয়ে — যেমন, চকিত চাউনির গভীরতা, গালদুটোয় হঠাৎ-ধরা রঙ্, দূর থেকে আমার দিকে নজর রাখা, কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ অল্প-একটু গলা ধরে ওঠা কিংবা আচমকা অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়ে গেলে খুশিতে লাফ দিয়ে ওঠা। আর আচরণের এইসব লক্ষণ জানা থাকার ফলেই আমার পক্ষে লক্ষ্য করা সম্ভব হোত — গোর্কির কথা বলতে গিয়ে ছেলেদের কণ্ঠস্বরে কখন অনির্বচনীয় কোমলতার ছোঁয়াচ লাগছে, তিনি আসছেন এই সংক্ষিপ্ত খবরটুকু কেমন করে ওদের মন অব্যক্ত আনন্দে ভরে তুলছে।

কলোনিতে গোর্কি আসছেন -- এটা ছিল আমাদের কাছে একটা বড়রকমের পুরস্কার। তবে আমরা-যে এমন পুরস্কার পাবার পক্ষে পুরোপুরি যোগ্য একথা কিন্তু আমাদের মনে হয় নি, সত্যিই মনে হয় নি। আর এই উচ্চ পুরস্কার পেতে চলেছিলুম আমরা এমন একটা সময়ে যখন গোটা সোভিয়েত ইউনিয়ন এই মহৎ লেখককে সংবর্ধনা জানানোর জন্যে পতাকা তুলে ধরেছিল, যখন আমাদের ছোট্ট সংস্থাটি পরিব্যাপ্ত গণ-আবেগের ঢেউয়ের নিচে সহজেই চাপা পড়ে যেতে পারত।

কিন্তু দেখা গেল তা চাপা পড়ল না। আর এটা আমাদের মনকে দোলা দিয়ে গেল, নিজেদের চোখে আমাদের জীবনের দাম বাড়িয়ে দিল বহুগুণে।

গোর্কির চিঠি পাওয়ার একেবারে পরদিন থেকেই আমরা তাঁর সংবর্ধনার প্রস্তুতিতে নেমে পড়লুম। নিজে আসার আগেই গোর্কি আমাদের অগ্রিম মহামূল্যবান অর্থসাহায্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, আর কুরিয়াজের পুরনো দিনের যে-সব দগ্‌দগে ঘায়ের শেষ ক্ষতটি তখনও পর্যন্ত রয়ে গিয়েছিল তা নিরাময় করে তুলতে সে-উপহার সাহায্য করল আমাদের।

আর এমনই ভাগ্য যে ঠিক ওই সময়টাতেই আমার ডাক পড়ল কৃতকর্মের কৈফিয়ত দিতে। নানান ধরনের শিক্ষাবিজ্ঞানী পণ্ডিতের কাছে সবিস্তারে বর্ণনা দিতে আমার শিক্ষাবিজ্ঞানগত আদর্শের ভিত্তি কী, কোন-কোন নীতিতে আমি বিশ্বাসী। কাজের এই কৈফিয়ত নেয়ার পক্ষে যথেষ্ট কারণ আসলে তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

ক্ষমা বা প্রশ্রয় পাওয়ার আশা ছিল না যদিও, তবু আমি হালকা মন নিয়েই এর জন্যে তৈরি হলুম।

অবশেষে সেই উঁচু, প্রশস্ত হলঘরখানায় সম্মুখীন হলুম এমন একটা সভার যাকে অবতার আর ধর্মপ্রচারকদের রীতিমতো একটা সম্মেলন বলে ঠেকতে পারত। সত্যিই সেটা ছিল রীতিমতো উঁচু পর্যায়ের মান্যগণ্যদের একটা সভা। সেখানে মতামত প্রকাশ করা হচ্ছিল সৌজন্যসহকারে, বিনয়সূচক লম্বা-লম্বা বাক্যে মুড়ে, মস্তিষ্কের স্নায়ুকুণ্ডলী, প্রাচীন মোটা-মোটা বই আর বহুব্যবহারে-জীর্ণ আরামকেদারার সোঁগন্ধে ভরে। তবে ওইসব অবতার আর ধর্মপ্রচারকের শাদা লম্বা দাড়ি, পূতপবিত্র নাম কিংবা মহৎ কোনো আবিষ্কারের গৌরব ছিল না, এই যা তফাত। জানি না ওদের কী অধিকার ছিল মহামহিম ভাব দেখানোর আর হাতে পবিত্র গোটানো পুঁথি ধরে থাকার! আসলে ওরা তো ছিল যতসব সন্দেহজনক খদ্দের, যারা সোভিয়েত জীবনের সুফল বিতরণের সময় ঘরে দোর দিয়ে বসে ছিল।

অধ্যাপক চাইকিনের চেয়ে বেশি সক্রিয় লোক সেদিন আর কেউ ছিল না। ইনি হলেন সে-ই চাইকিন — এরও কয়েক বছর আগে যাঁকে দেখে চেখভের বিশেষ একটি গল্পের কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল।

প্রশংসার কানাকড়ি ভাগও আমাকে দিতে নারাজ হয়ে চাইকিন তাঁর বক্তৃতায় ইতি টানলেন নিচের কথাগুলো বলে:

'কমরেড মাকারেঙ্কোর ইচ্ছে শিক্ষাদানের গোটা ব্যাপারকে কর্তব্যবোধের ভিত্তিতে দাঁড় করানো। এটা ঠিকই যে উনি এই কর্তব্যবোধের সঙ্গে 'প্রলেতারিয়ান' শব্দটাও যোগ করে দিয়েছেন। কিন্তু কমরেডস, এ-সত্ত্বেও ওঁর মতাদর্শের অন্তঃসারটুকু আমাদের কাছে গোপন থাকছে না। কমরেড মাকারেঙ্কোকে আমরা পরামর্শ দিতে চাই যে কর্তব্যবোধের ঐতিহাসিক উৎস সম্বন্ধে একটু গভীরভাবে পড়াশুনো করলে উনি ভালো করবেন। আসলে এই ধারণাটা বুর্জোয়া সমাজ-সম্পর্কেরই ভিত্তিস্বরূপ, এ-ধারণার প্রকৃতি গভীরভাবে ব্যাবসাদারি ভাবধারায় নিহিত। সোভিয়েত শিক্ষাবিজ্ঞানের লক্ষ্য হল সৃষ্টিশীল ক্ষমতা, প্রবণতা আর উদ্যোগের বাধামুক্ত প্রকাশকে অব্যাহত করে তোলা, কর্তব্যবোধের বুর্জোয়া ধারণার চর্চা করা কোনোমতেই নয়।

'দু-দুটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত ডিরেক্টরের মুখ থেকে মর্যাদাবোধের চর্চা করার আবেদন শুনে গভীর ক্ষোভে আর বিস্ময়ে আমরা হতবাক হয়ে গেছি। এই আবেদনের প্রতিবাদ না-করে পারছি না আমরা। বিজ্ঞানের ধ্যানধারণার সঙ্গে সোভিয়েতের যে-জনমত যুক্ত তা-ও এমন একটা সেকেলে ধারণায় ফিরে যেতে কিছুতেই রাজি নয়, যা নাকি চোখে আঙুল দিয়ে মনে করিয়ে দেয় ফৌজী অফিসারদের বিশেষ সুযোগসুবিধে, উর্দি আর তকমার কথা।

'শ্রমশিল্প সম্বন্ধে বক্তার উক্তিগুলো নিয়ে এখানে আমাদের আলোচনার অবকাশ নেই। হতে পারে — বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে এটা একটা প্রয়োজনীয় উদ্দীপকই, কিন্তু শিক্ষাবিজ্ঞান কখনই শ্রমশিল্পকে শিক্ষাগত প্রভাবের উৎসগুলোর একটা বলে গণ্য করতে পারে না, 'শ্রমশিল্পগত ও আর্থিক পরিকল্পনাই সবচেয়ে বড় শিক্ষক' বক্তার এই উক্তিকে অনুমোদন দেয়া তো দূরস্থান। এ-সমস্ত তত্ত্ব শ্রম-সম্পর্কিত শিক্ষার ব্যাপারে ধ্যানধারণার অমার্জিত বিকৃতি ছাড়া কিছু নয়।'

চাইকিন ছাড়াও সভায় আরও অনেকে বক্তৃতা দিল। সমালোচনার মনোভাব নিয়ে চুপ করে রইল অনেকে। বক্তৃতা শুনতে-শুনতে অবশেষে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল আর মুহূর্তের হঠকারিতায় আমি অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়ে বসলুম। বলে ফেললুম:

'কে জানে, হয়তো আপনারাই ঠিক কথা বলছেন। আমাদের পক্ষে পরস্পরকে বোঝা কোনোদিনই সম্ভব হবে না। আমি আপনাদের কথাবার্তা

একেবারেই বুঝতে পারি না! যেমন, ধরা যাক, আপনারা মনে করেন মানবিক উদ্যোগ হল এক-ধরনের প্রেরণার ব্যাপার, ঈশ্বর জানেন কোথা থেকে, হয়তো-বা বিশুদ্ধ শূন্যতা কিংবা নিষ্ক্রিয়তা থেকে টুপ্ করে পাকা ফলের মতো যা হাতে এসে পড়ে। কিন্তু আমি আপনাদের এই নিয়ে তৃতীয়বার মনে করিয়ে দিচ্ছি যে উদ্যোগ দেখা দেয় সেখানেই যেখানে একটা বিশেষ কাজ করবার থাকে, কাজটা সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব থাকে, বৃথা সময় নষ্ট হলে পর কৈফিয়ত দেবার তাগিদ থাকে আর থাকে গোটা যৌথ সমাজের চাপ। কিন্তু আপনারা আমার কথা একেবারেই ধরতে পারছেন না, তাই বারবার খালি কাজ-থেকে-বিচ্ছিন্ন, বন্ধ্যা একধরনের উদ্যোগের কথা বলে চলেছেন। দেখা যাচ্ছে, আপনাদের মতে তাহলে নিজের নাইকুণ্ডলীর দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে আপনা থেকেই উদ্যোগ বস্তুটা এসে হাজির হবে...’

ওঃ, শুনে কী-যে খেপে উঠল ওরা, আমাকে লক্ষ্য করে কী ভীষণ-যে চেঁচাতে লাগল, কী বলি! মুখে ফেনা তুলে অবতারের দল তারস্বরে নিজেদের মহিমা কত-যে প্রচার করতে লাগল! সে এক দৃশ্য! দেখলুম ল্যাজের আগুনে লঙ্কাকাণ্ড শুরু হয়ে গেছে আর ফেরার সব পথই বন্ধ আমার কাছে। সবকিছুই নষ্টভ্রষ্ট হয়ে গেছে বলে নতুন করে আমার হারাবারও আর কিছু নেই। তাই মরণকামড় দিলুম একেবারে:

‘শিক্ষাদান কিংবা উদ্যোগ নিয়ে বিচার-বিবেচনার যোগ্য নন আপনারা, ওসব ব্যাপারের অ-আ-ক-খ’ও আপনাদের জানা নেই!’

‘কিন্তু স্বয়ং লেনিন উদ্যোগ সম্বন্ধে কী বলেছেন আপনার কি তা জানা আছে?’

‘জানা আছে বৈকি।’

‘না। জানা নেই!’

পকেট থেকে নোটবইখানা টেনে বের করে থেমে-থেমে স্পষ্ট উচ্চারণে এবার আমি নিচের কথাগুলো পড়ে শুনিয়ে দিলুম:

‘রুশ কমিউনিস্ট পার্টির একাদশ কংগ্রেসে, ১৯২২ সালের ২৭ মার্চ তারিখে লেনিন বলেছিলেন, ‘উদ্যোগ বলতে সুশৃঙ্খলভাবে পিছুহটা এবং কঠোর শৃঙ্খলা বজায় রাখা বোঝায়’।’

অবতাররা একটু যেন থমকে গেল, তবে তা একমুহূর্তের জন্যে। তারপরই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল:

'পিছুহটার সঙ্গে এ-ব্যাপারের সম্পর্ক কী?'

বললুম, 'শৃঙ্খলারক্ষা আর উদ্যোগের মধ্যেকার সম্পর্কের দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি-আকর্ষণ করতে চেয়েছি। তাছাড়া, আমি নিজে সুশৃঙ্খলভাবে পিছু হটতে চাই...'

অবতাররা চোখ-পিটপিট করে উঠল, তারপর পরস্পরের দিকে ফিরে ফুসফাস-গুজগাজ আর কাগজ ওলটানোর খড়মড় আওয়াজ করতে লাগল। অতঃপর সেই উ'চু পর্যায়ের মান্যগণ্যদের সভা সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব পাশ করলে:

'শিক্ষাদান-সংক্রান্ত প্রস্তাবিত পদ্ধতিটি একটি অ-সোভিয়েত পদ্ধতি।'

সভায় আমার অনেক বন্ধুস্থানীয়ও উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাঁরা চুপ করে রইলেন। 'চেকা'র একদল সদস্যও উপস্থিত ছিলেন সভায়। তাঁরা মনোযোগ দিয়ে তর্কাতর্কি শুনলেন, লেখার প্যাডে আলোচনার নোটও নিলেন, তারপর সভার রায় শোনার জন্যে অপেক্ষা না-করে চলে গেলেন।

অনেক রাত করে সেদিন কলোনিতে ফিরলুম আমরা। আমার সঙ্গে ছিলেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা, আর ছিল কম্‌সমোল ব্যুরোর কয়েকজন সদস্য। বাড়ি ফেরার পথে সারাটা রাস্তা জোর্‌কা ভোল্‌কভ বকতে-বকতে এল:

'ওরা এসব কথা বলতি পারল কী করে! কী, ভাবে কী ওরা — মর্যেদাবোধ বলে কিছু নাই? আমাদের কলোনির মর্যেদা বলি কোনো বস্তু নাই? ওদের মতে এসব কোনো বস্তুর অস্তিত্বই নাই!'

লাপত বলল, 'ওদের কথায় আপনে কান দিবেন না, আন্তন সেমিওনভিচ! গুচ্ছের বাজে লোক যতসব, খালি ঘ্যানঘ্যান করতিই জানে...'

'কই, আমি তো কান দিই নি,' ছেলেদের সান্ত্বনা দিয়ে বললুম।

কিন্তু আমার ভাগ্য ততক্ষণে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল।

একটুও বিচলিত হওয়ার ভাব না-দেখিয়ে, একমুহূর্তের জন্যেও যৌথের উ'চু-তারে-বাধা জীবনযাত্রায় ঢিল না-দিয়ে সংস্থাটাকে আমি গুটোতে শুরু করে দিলুম। আমার বন্ধুদের সংস্থা থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরিয়ে দেয়া অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। এটা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল দুটো কারণে। প্রথমত, নতুন একটা ব্যবস্থার অধীনে অনভ্যস্ত জীবনযাপনের ঝামেলার হাত থেকে ওই ছেলেপিলেদের রেহাই দিতে, আর দ্বিতীয়ত কলোনির মধ্যে যাতে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কোনো কেন্দ্র না-থেকে যায় সেটা দেখার জন্যেও বটে।

পরদিনই ইউরিয়েভের কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করলুম। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ চিন্তায় ডুবে থেকে অবশেষে একটিও কথা না-বলে তিনি ডান হাতখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু আমি যখন ঘর ছেড়ে চলে আসছি তখন যেন নিজেকে গুছিয়ে নিলেন বলে মনে হল। বললেন:

'একমিনিট দাঁড়ান!.. কিন্তু খেয়াল আছে তো যে গোর্কি আসছেন?'

'তা তো বটেই! আপনি কি ভেবেছিলেন গোর্কিকে আমি নিজে ছাড়া আর কাউকে অভ্যর্থনা জানাতে দেব?'

'এই তো চাই!..'

এরপর অফিসঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করলেন উনি। বিড়বিড় করে খালি বলতে লাগলেন:

'ধুত্তেরি!.. চুলোয় যাক সব!..'

'কী হল?'

'না, এই বলছি! ধুত্তেরি, আমিও শালা এখেনে আর থাকছি না!'

তাঁকে এই শুভ মনোবাসনা নিয়ে ভাবতে দিয়ে আমি বিদায় নিলুম। করিডরে পেছন থেকে এসে ফের তিনি ধরলেন আমাকে। বললেন:

'দোস্ত, আন্তন সেমিওনভিচ, ব্যাপারটা আপনার খুব মনে লেগেছে! তাই না?'

শুনে হাসলুম। বললুম, 'এই সেরেছে! হল কী আপনার? নাঃ, আপনাদের — বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে আর পারা যায় না!.. ঠিক আছে, ঠিক আছে, গোর্কি যেদিন চলে যাবেন আমিও কলোনি ছাড়ব সেইদিন। কেমন, এতে চলবে তো? পরিচালনার ভার আমি জুর্‌বিনের হাতে দিয়ে যাব। তারপর আপনাদের যেমন খুশি তেমনভাবে চালাবেন সবকিছু...'

'কিন্তু...'

পদত্যাগের কথাটা কলোনিতে কাউকে জানালুম না। ইউরিয়েভও কথা দিলেন এ-সম্পর্কে আগে কাউকে কিছু জানাবেন না তিনি।

এরপর ছুটোছুটি শুরু করে দিলুম নানা ফ্যাক্টরিতে আর আমাদের পৃষ্ঠপোষকদের আর 'চেকা'র লোকজনের কাছে। কলোনি-বাসিন্দাদের মধ্যে বড় ছেলেমেয়েদের কলোনি ছেড়ে যাবার কথা নিয়ে অনেকদিন আগে থেকেই আলোচনা চলছিল, কাজেই এখন উঠে-পড়ে সে-কাজে হাত লাগানোয় কলোনিতে

কেউই তেমন আশ্চর্য হল না। আমাদের নানা বন্ধুর কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ায় গোর্কিপন্থীদের জন্যে খারকভের বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে কাজ আর থাকার জন্যে শহরে ঘর যোগাড় করায় আমায় তেমন কিছুই অসুবিধেয় পড়তে হল না। একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্না আর গুলিয়ায়েভা বিদায়ী ছেলেমেয়েদের জন্যে অল্পস্বল্প পোশাক-আশাক বানিয়ে দিলেন। এসব কাজে ইতিমধ্যে তাঁরা অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। গোর্কি আসতে তখনও পুরো দু'মাস বাকি ছিল, তাই হাতে সময়ও ছিল যথেষ্ট।

আমাদের বড় ছেলেমেয়েরা একের-পর-এক বৃহত্তর জগতের পথে বেরিয়ে পড়ল। যাবার সময় তারা চোখের জল ফেলল বটে, তবে বিচ্ছেদের বেদনায় অভিভূত হল না— কারণ আমরা জানতুম যে আবার আমাদের দেখা হবে। তাদের প্রত্যেককে বিদায় দিলুম উঁচু-করে-তোলা গোর্কি পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে সম্মানসূচক কুচকাওয়াজ করে আর ব্যান্ড বাজিয়ে। এইভাবে একে-একে আমাদের ছেড়ে চলে গেল তারানেত্স, ভোলখভ, গুত্, লেশি, গালাতেঙ্কো, ফেদরেঙ্কো, কারিতো, ভোল্কভরা দুই ভাই, লাপত, কুদ্লাতি, স্থুপিত্সিন, সরোকা আর আরও অনেকে।

এছাড়া আরও কয়েকজনকে কভালের পরামর্শমতো কলোনিতে রেখে দিলুম মাসমাইনের ভিত্তিতে। কলোনি যাতে নেতৃহীন হয়ে না-পড়ে তার জন্যেই এমন ব্যবস্থা করা হল। আরও কয়েকজন, যারা 'রাব্ফাক'-এ ভর্তির জন্যে তৈরি হচ্ছিল, পরের শরৎকাল পর্যন্ত তাদের আমি বদলি করে দিলুম দ্জের্জিন্স্কি কমিউনে। ঠিক হল শিক্ষক-শিক্ষিকারা আরও কিছুকাল কলোনিতে থেকে যাবেন, কলোনিতে আচমকা যাতে একটা ত্রাস ছড়িয়ে না-পড়ে তা-ই দেখার জন্যে। একমাত্র কভাল কিছুতেই থাকল না, শেষটুকু দেখার জন্যে অপেক্ষা না-করে আগেই গাঁয়ে ফিরে গেল সে।

ওই সময়টায় না-চাইতে যে-সমস্ত পুরস্কার আমার ওপর বর্ষিত হচ্ছিল তাদের মধ্যে একটা ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত। এটা হল আমার এই আবিষ্কার যে চার শো মানুষের জীবন্ত একটা যৌথ সমাজ বড় সহজে মরে না। যারা আমাদের ছেড়ে গিয়েছিল সেই বড় ছেলেদের জায়গা দেখতে-দেখতে পূরণ করে দিল নতুন সব সদস্য — পূর্বসূরীদের মতো একই রকম প্রাণবন্ত, রঙ্গরসে-ভরা, আশায় ভরপুর সব ছেলে। কলোনি-বাসিন্দাদের নানা পদে ফাঁকগুলো ভরে উঠল সব, যুদ্ধের সময় সৈন্যদের সারিতে ফাঁকগুলো ভরে

ওঠে যেভাবে ঠিক সেইভাবেই। যৌথ সংস্থাটি শুধু-যে মরতে চাইল না তা-ই নয়, মরার বিন্দুমাত্র বাসনাও ছিল না তার। পরিপূর্ণ জীবন যাপন করতে লাগল যৌথ, যেন মসৃণ রেলপথের ওপর দিয়ে দ্রুত গড়িয়ে চলল, আর্লেক্সেই মাক্সিমভিচকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে তৈরি হতে লাগল সাড়ম্বরে, ভালোবাসা নিয়ে।

এই সময়ে দিনগুলো কাটছিল আমাদের চমৎকারভাবে। ভারি সুখের দিন ছিল সেগুলো। সপ্তাহের কাজের দিনগুলো যেন-বা ফুলের মতোই ফুটে উঠত শ্রমে আর হাসিখুশিতে, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণার অনুভূতি নিয়ে, হৃদয়তাপে আর বন্ধুত্বে-ভরা আলাপে আর গল্পগুজবে। আমাদের দায়দায়িত্বগুলোও মাথার ওপর ঝুলে থাকত রামধনুর ছটা মেলে, আর আমাদের স্বপ্ন আকাশ চিরে ছুটে যেত সার্চলাইটের আলোর মতো।

আর আগেও যেমন করতুম তেমনই সানন্দে, গোপন কথা পরস্পরকে বলার মতো করে নিজেরা-নিজেরাই প্রস্তুত হতে লাগলুম আমাদের আসন্ন উৎসবের দিন, কলোনি-জীবনে আমাদের সবচেয়ে বড় উৎসবের দিনটির জন্যে।

অবশেষে দেখতে-দেখতে সেই বিশেষ দিনটি এসে গেল।

সেদিন খুব ভোরবেলা থেকেই আমাদের কলোনি ঘিরে যেন একটা মচ্ছবের মেলা বসে গেল — কত রকম লোক আর কত কী-যে আসতে লাগল তার ঠিকঠিকানা নেই — শহরের লোকজন, মোটরগাড়ি, স্থানীয় যতসব কর্তৃপক্ষ, সাংবাদিকদের রীতিমতো একটা ব্যাটালিয়ন, ফোটোগ্রাফার আর ফিল্মের লোকজন। এদিকে আমাদের বাড়িগুলো সাজানো হয়েছিল নিশান আর মালা দিয়ে, খেলার কোর্টগুলো ফুল দিয়ে, বেশ কিছুটা ফাঁক দিয়ে-দিয়ে লাইন করে ছেলেদের দাঁড় করানো হয়েছিল, আগাম খবর আনার জন্যে আখ্তির্কার বড়রাস্তায় ঘোড়সওয়ারদের পাঠানো হয়েছিল আর আমাদের উঠোনে অভ্যর্থনার কুচকাওয়াজের জন্যে রাখা হয়েছিল গার্ড-অব-অনারের দলকে।

দীর্ঘদেহী গোর্কি এসে গাড়ি থেকে নামলেন, চারিদিকে তাকালেন একবার, নিজের সুপুষ্ট শ্রমিকশোভন গোঁফে কাঁপা-কাঁপা আঙুল বুলোলেন বারেক, তারপর হাসলেন। বোঝা গেল উনি বিচলিত হয়ে উঠেছেন। ঋষিতুল্য মুখ আর বন্ধুর কোমল চোখদুটি যাঁর সেই মানুষটির মনের তারে ঘা লেগেছে।

'কেমন আছ?.. এরা সব তোমার ছেলেপিলে?.. আচ্ছা?.. চল, যাওয়া যাক!..'

পতাকা-অভিবাদন, ছেলেদের একসঙ্গে স্যালুটের ভঙ্গিতে হাত তোলার শিসধ্বনি, তাদের জ্বলজ্বলে চোখ, তাদের সঁপে-দেয়া মন — সবকিছুই আমাদের প্রিয় অতিথির পায়ের কাছে বুক পেতে কার্পেটের মতো ছড়িয়ে রইল।

সারবাঁধা ছেলেদের সামনে দিয়ে এগিয়ে চললেন গোর্কি...

১৫

উপসংহার

তারপর সাত বছর কেটে গেছে। আগের এ-সবই ইতিহাস এখন।

সফর শেষ হলে পর গোর্কিকে নিয়ে ট্রেনখানা যেদিন চলে গেল সেই দিনকার একেবারে তুচ্ছ খুঁটিনাটিটি পর্যন্ত আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। আমাদের ভাবনা আর আবেগ তখন ট্রেনখানার পিছু-পিছু ধাওয়া করে চলেছে, ছেলেদের চোখগুলো প্রিয়বিদায়ের হৃদয়তাপে ঝলমল করছে তখনও, এমন সময় ছোট্ট একটা অস্ত্রোপচারের কাল ঘনিয়ে এল আমার কাছে। গোর্কিপন্থী আর দ্জের্জিন্স্কি-পন্থীরা সারা প্ল্যাটফর্ম জুড়ে সারবেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, দু'দলের ব্যান্ডপার্টির বিউগ্লগুলো আর দুটো পতাকাদণ্ডের মাথা ঝলমল করছে। উল্টোদিককার প্ল্যাটফর্ম থেকে রিজোভ যাবার সুবার্বন ট্রেনখানা ছাড়ব-ছাড়ব করছে। এমন সময়ে জুর্বিন এল আমার কাছে। বলল:

'গোর্কিপন্থীদের কি ট্রেনে উঠতে বলব?'

'বল।'

আমার পাশ দিয়েই ছুটে কলোনি-বাসিন্দারা ট্রেনে গিয়ে উঠল, ব্যান্ডের পেতলের বাজনাগুলো পাশ দিয়েই হাতে করে নিয়ে গেল তারা, আর নিয়ে গেল রেশমি সুতোয় এমব্রয়ডারি-করা আমাদের পুরনো পতাকাখানা। এর মিনিটখানেকের মধ্যে ট্রেনখানার প্রতিটি কামরার জানলায় উৎসবের দিনের গুচ্ছ-গুচ্ছ ফুলের মতো ছেলেমেয়েদের ঝলমলে মুখগুলো দেখা গেল। চোখ কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে তারা হেঁকে বললে:

'আসুন সেমিওনভিচ, এদিকে, এদিকে, আমাদের কামরায় আসেন!'

'কী, আমাদের সাথে আসতেছেন না? কমিউনার্ডদের সাথে যাতিছেন?'

'তাইলে আসচে কাল আসতেছেন তো?'

ওইসব দিনকালেও আমার মনটা বেশ শক্ত ছিল, বাচ্চাগুলোর দিকে তাকিয়ে দিব্যি হাসতে পারছিলুম। তারপর জুর্‌বিন আমার কাছে এলে ওর হাতে একখানা নির্দেশনামা ধরিয়ে দিলুম। তাতে লেখা ছিল আমি 'ছুটি'তে যাচ্ছি বলে কলোনি-পরিচালনার ভার ওরই হাতে ন্যস্ত করা হল।

নির্দেশনামাখানার দিকে কেমন শূন্যচোখে তাকিয়ে রইল জুর্‌বিন। বলল:

'এর মানে কী — এই-ই শেষ?'

বললুম, 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু... কী ব্যাপার..?' কী-একটা যেন বলতে যাচ্ছিল জুর্‌বিন কিন্তু ঠিক সেই সময় ট্রেনের গার্ড সজোরে হুইস্‌ল বাজিয়ে দেয়ায় কথাটা বলতে না-পেরে অসহায়তার একটা ভঙ্গি করে ট্রেনের জানলাগুলোর দিক থেকে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল ও।

সুবার্‌বন ট্রেন ছেড়ে দিল। উৎসবের দিনের গুচ্ছ-গুচ্ছ ফুলের মতো ছেলেপিলেদের মুখগুলো আমার সামনে দিয়ে ভেসে-ভেসে সরে যেতে লাগল। রসিকতা করে টুপিগুলো দু'আঙুলে তুলে ধরে ওদের অনেকে চেঁচিয়ে বলল 'বিদায়'! ট্রেনটার শেষ কামরার শেষের জানলাটার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল কোরত্‌কভ। নিঃশব্দে হাসিমুখে সে স্যালুট করল আমাকে।

প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে স্টেশন-চত্বরে গেলুম। দ্‌জের্‌জিন্‌স্কি-পন্থীরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আমার অপেক্ষায় ছিল। আমি মার্চ শুরু করার হুকুম দিলুম, তারপর শহর পেরিয়ে সবাই মিলে চলে গেলুম কমিউনে।

এরপর আর কোনোদিন আমি কুরিয়াজে যাই নি।

* * *

ওইদিনটার পর সাত-সাতটা সোভিয়েত বছর কেটে গেছে, আর এই সময়টা অন্য যে-কোনো (যেমন ধরা যাক, জার-আমলের) সাতটা বছরের চেয়ে ঢের বেশি দীর্ঘ সময়। এই সময়ের মধ্যে আমাদের দেশ প্রথম পঞ্চ-বর্ষ পরিকল্পনার গৌরবময় পথ অতিক্রম করে দ্বিতীয় পরিকল্পনার কালপর্বও প্রায় শেষ করে এনেছে, এই সময়ের মধ্যে গোটা দুনিয়া ইউরোপের পূর্বাঞ্চলের

সমভূমিকে যতটা মর্যাদা দিতে শিখেছে এতটা মর্যাদা রমানভ-বংশের তিন শো বছরের রাজত্বকালেও তারা দেয় নি। এই সময়ের মধ্যে আমাদের জনসাধারণ নতুন বলে বলীয়ান হয়ে উঠেছে, আমাদের নিজস্ব বুদ্ধিজীবীরাও গড়ে উঠেছেন।

আমার গোর্কিপন্থীরাও ইতিমধ্যে বড় হয়ে উঠে সারা সোভিয়েত ইউনিয়নে ছড়িয়ে পড়েছে। অতএব এখন আমার পক্ষে এমন কি কল্পনাতেও তাদের একত্র করে দেখা কঠিন হয়ে পড়েছে। যেমন, এখন আমাদের এঞ্জিনিয়র জাদোরভের পাত্তা পাওয়া অসম্ভব, তুর্কমেনিস্তানে কী-একটা বিশাল নির্মাণকর্মে সে আছে গলা পর্যন্ত ডুবে। দূরপ্রাচ্যের বিশেষ সামরিক বাহিনীর মেডিক্যাল অফিসার ভেরশ্নেভ কিংবা ইয়ারস্লাভ্লের ডাক্তার বুরুনকেও এখন আর ডেকে পাওয়া যাবে না। এমন কি নিসিনভ আর জোরেন — সেই পুঁচকে দুটো বাচ্চা — তারাও কিনা ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে চলে গেছে আমার কাছ থেকে দূরে। না-না, আমার শিক্ষাদানগত সহানুভূতির ফলে গজানো কোমল মানস-অঙ্কুরের ডানায় ভর দিয়ে নয়, তাদের এই ডানা হল সোভিয়েত এয়ারপ্লেনের ইস্পাতের ডানা। শেলাপুতিনও যখন প্রতিজ্ঞা করেছিল যে ভবিষ্যতে পাইলট হবে, তখনও সে-ও ভুল বলে নি। আর আমাদের শুরকা জেভেলি তার বড়ভাইয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চায় নি, দাদার মতো সুমেরুসাগরের নাবিক না-হয়ে সে-ও হয়েছে প্লেনের পাইলট।

কলোনিতে এক-চক্কর ঘুরে এসেছেন এমন কিছু-কিছু কমরেড কখনও-সখনও আমায় শুধিয়েছেন:

'লোকে বলে, রাস্তার অনাথ ছেলেপিলের মধ্যে নাকি বেশ কিছু প্রতিভাবান ছেলেপিলেও আছে, যাকে বলে সৃষ্টিশীল প্রবণতাসম্পন্ন ছেলেপিলে... তা, বলুন তো, আপনার ছেলেদের মধ্যে থেকে কেউ লেখক বা শিল্পী হয়েছে কী?'

বলা বাহুল্য, আমাদের মধ্যে অবশ্যই লেখকও ছিল শিল্পীও ছিল, লেখক-শিল্পী ছাড়া কোনো যৌথ জীবন টিকতে পারে না — তারা না-থাকলে আমাদের পক্ষে দেয়ালপত্রিকা বের করা সম্ভব হোত না। তবে আমাকে সখেদে স্বীকার করতেই হচ্ছে যে গোর্কিপন্থীদের মধ্যে থেকে পরবর্তী জীবনে কেউ লেখক বা শিল্পী হিসেবে বেরিয়ে আসে নি। কিন্তু এর কারণ এই নয় যে তাদের মধ্যে অনেকের যথেষ্ট সহজাত শক্তি ছিল না। এর কারণ সম্পূর্ণ

অন্যত্র নিহিত। আসলে এর কারণ, জীবন ও তার দৈনন্দিনের বাস্তব সমস্যাদি ওই হবু লেখক-শিল্পীদের গ্রাস করে নিয়েছিল।

কারাবানভও কোনোদিন কৃষিবিৎ হল না। কৃষিবিদ্যার 'রাব্‌ফাক' থেকে সে স্নাতক হয়ে বেরোল বটে, তবু আরও পড়াশুনোর জন্যে ইন্‌স্টিটিউটে ঢুকল না। দৃঢ়ভাবেই সে আমাকে বলেছিল:

'অন্য লোকে ফসল ফলানো নিয়ে মাথা ঘামাক গে! আমি কিন্তু কচি বাচ্চাগুলোকে ছেড়ে থাকতে পারব না! এখনও কত-যে মিষ্টি বাচ্চা পথে-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে — ওহ্, কত-যে, কী বলি! আন্তন সেমিওনভিচ, আপনি যদি এ-কাজ হাতে নিতে পেরে থাকেন তাহলে আমার মনে হয় আমিও তা নিতে পারব।'

আর সত্যিসত্যিই সেমিওন কারাবানভ সামাজিক শিক্ষাদানের শহীদগিরি বেছে নিল। আজও পর্যন্ত এ-পথ সে ত্যাগ করে নি, যদিও সেমিওনের কপালে ছিল এমন একটা মর্মান্তিক কষ্ট যা হয়তো খুব কম শহীদকেই বরণ করতে হয়েছে। সে পরে তার সেই চের্নিগভের মেয়েটিকেই বিয়ে করেছিল, তাদের একটি ফুটফুটে সুন্দর ছেলেও হয়েছিল — মায়ের মতো কালো চোখ আর বাপের মতো প্রচণ্ড প্রাণশক্তির অধিকার নিয়ে। আর সেই বাচ্চাটির যখন তিন বছর বয়স হয়েছিল তখন একদিন সেমিওনের রক্ষণাধীন ছেলেদেরই একজন বাচ্চাটিকে নির্মমভাবে কচুকাটা করে। রক্ষণাধীন ওই ছেলেটাকে সেমিওনের 'বাগ-মানানো শক্ত এমন ছেলেপিলেদের' অনাথ-সদনে পাঠানো হয়েছিল। ছেলেটা ছিল অস্বাভাবিক, শোনা যায় অমন কাজ সে নাকি আগেও একাধিকবার করেছিল। এমন কি এই ঘটনার পরও সেমিওনের অটল সংকল্পে চিড় ধরে নি, আমাদের ফ্রন্ট ত্যাগ করে নি সে। কোনো ওজর-আপত্তি তোলা, কাউকে অভিশাপ দেয়া — কিছুই করে নি সেমিওন, শুধু ছোট্ট একখানা চিঠি লিখেছিল আমাকে আর সে-চিঠিতে যত-না শোক প্রকাশ পেয়েছিল তার চেয়ে বেশি প্রকাশ পেয়েছিল বিস্ময়।

আমাদের মাত্‌ভেই বেলুখিনও উচ্চশিক্ষা নেয় নি। একদিন তার কাছ থেকে এইমর্মে একখানা চিঠি পেলুম আমি:

'এটা কিন্তু আমি ইচ্ছে করেই করেছি, আন্তন সেমিওনভিচ। আর আপনাকে-যে আগে আমি একটি কথাও জানাই নি তার জন্যে মাপ

চাইছি। কিন্তু বলুন তো, কেমনধারা এঞ্জিনিয়র বনতাম আমি যখন মনে-মনে আমি ফৌজের লোক ছাড়া কিছু নই? আমি তাই ঘোড়সওয়ার সৈনিকের একটা প্রশিক্ষণ স্কুলে ভর্তি হয়েছি। অবশ্য আপনি হয়তো বলবেন, 'রাব্‌ফাক' ছেড়ে আমি শুয়োরের অধম কাজ করেছি। জানি, আমি অন্যায় করেছি। তবু দয়া করে আমার এই চিঠির একটা জবাব দেবেন, কারণ -- ব্যাপার কী জানেন, কাজটা করে ফেলে আমার ভারি খারাপ লাগছে!'

বেলুখিনের মতো লোক যতক্ষণ আছে, যতক্ষণ কোনো কিছু করে ফেলে তাদের 'খারাপ লাগে', ততক্ষণ ভবিষ্যতে আস্থা হারাবার কিছু নেই। আশাকরি সোভিয়েত অশ্বারোহী বাহিনীর স্কোয়াড্রনে বেলুখিনের মতো কমান্ডারদের অধিষ্ঠিত হতে দেখে যেতে পারব। এই বিশ্বাসটা আমার আরও বেশি দৃঢ় হয়েছে মাত্‌ভেইকে চাক্ষুষ দেখে — প্রশিক্ষণশেষে পোশাকে সামরিক অফিসারের নতুন ব্যাজ লাগিয়ে যেদিন সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল সেইদিনকার লম্বা-চওড়া জোয়ান, পরিণত মানুষ, 'তৈরি ছেলে' মাত্‌ভেইকে দেখে।

মাত্‌ভেইয়ের মতো অন্যরাও এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে, আর প্রত্যেকবারই এককালের বাচ্চা ছেলে বা মেয়েকে সাবালক, পরিণতবয়স্ক হিসেবে চোখের সামনে দেখে মনে-মনে কেমন যেন চমকে গেছি। অবাক হয়ে দেখেছি — আমাদের সেই অসাদ্‌চি এখন প্রযুক্তিবিৎ, মিশা অভ্‌চারেঙ্কো মোটরচালক, অলেগ ওগ্নিয়েভ কাস্পিয়ান সাগরের ওদিকে কোথাও সেচবিভাগের কর্মী, মারুসিয়া লেভ্‌চেঙ্কো শিক্ষিকা, সরোকা ট্রাম-ড্রাইভার, ভোলখভ ইলেক্‌ট্রিশিয়ান, করিতো তালাসারাই মিস্ত্রি, ফেদরেঙ্কো যন্ত্রপাতি ও ট্রাক্টর-স্টেশনের ফোর্‌ম্যান, আলিওশ্‌কা ভোল্‌কভ, দেনিস কুদ্‌লাতি ও জোর্‌কা ভোল্‌কভ তিন পার্টিকর্মী। মার্ক শেইন্‌হাউসও এসেছিল আমার কাছে — এখনও সেইরকম সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ, তবে এখন তার সঙ্গে সত্যিকার বলশেভিক চারিত্র্যে বলীয়ানও বটে। এছাড়া এসেছিল আরও আরও অনেকে।

আবার এই সাত বছরে অনেকে আমার চোখের আড়ালে হারিয়েও গেছে। আন্তন কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে আছে ঘোড়াদের জগতে আর সে-যে আছে এমন কোনোরকম সাড়াশব্দ দিচ্ছে না। প্রাণশক্তিতে ভরপুর ঝড়পাখির

উন্দাম হৃদয়টাকে নিয়ে কোথায়-যে হারিয়ে গেল লাপত, কোথায়-যে গেল ওস্তাদ জুতো-বানানেওয়ালা গুত্, মস্ত নির্মাণকর্মী তারানেত্স। তবে এজন্যে আমার কোনো দুঃখ নেই, আমায় ভুলে আছে বলে এই ছেলেদের আমি দোষও দিই না। আমাদের জীবন নানা কর্মে এমন পূর্ণ যে আশা করা যায় না ছেলেপিলেদের প্রত্যেকে তাদের বাপমায়ের বা শিক্ষক-শিক্ষিকার মানসিক দুঃখবিলাসকে মনে করে রাখবে। মোটকথা, তাদের সবাইকে ফিরে পাওয়া বা ফিরিয়ে আনা 'কার্যকরতা'র বিচারেও অবাস্তব। আমার এই বইয়ে যাদের নাম করা সম্ভব হয় নি অথচ অন্যদের মতোই যারা ছিল একই রকম প্রাণবন্ত, প্রাণের প্রিয়, আপন জন এমন কত-যে ছেলেমেয়ে শুধুমাত্র গোর্কি কলোনিতেই বাল্য আর কৈশোর কাটিয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। গোর্কি যৌথ সংস্থা গুটিয়ে ফেলার পর সাত বছর কেটে গেছে, তবু তা সত্ত্বেও সর্বত্র এই ধরনের বাচ্চাদের দল ভারি করে চলেছে নতুন-নতুন বাচ্চা এসে আর বছরগুলো পূর্ণ করে তুলেছে তাদের সংগ্রাম, তাদের জয়-পরাজয়, তাদের সেই চির-পরিচিত চোখের ঝিলিক আর হাসির সূক্ষ্ম রঙফেরা দিয়ে।

দ্জের্জিন্স্কি কমিউনটি কিন্তু এখনও যাপন করে চলেছে রঙেরসে পূর্ণ জীবন আর তা নিয়ে অন্তত হাজার দশেক 'মহাকাব্য' লেখা চলে।

সোভিয়েত দেশের যৌথ সংস্থাগুলি নিয়ে আরও বহু বই লেখা হবে, কারণ এটি হল প্রথমত ও প্রধানত যৌথ সংস্থারই দেশ। আর, সন্দেহ নেই, এই সমস্ত বই 'যৌথ জীবন' সম্পর্কে আজগবি ব্যাখ্যায়-ভরা আমার ওলিম্পাসবাসী বন্ধুদের বইয়ের চেয়ে শতগুণে বেশি জ্ঞানগর্ভ হবে। কেননা এই শেষোক্তরা 'যৌথ জীবন'-এর সংজ্ঞা নিরূপণ করছেন এইভাবে:

'যৌথ হল পরস্পরের ওপর ক্রিয়াশীল ব্যক্তিবিশেষদের এমন একটি গোষ্ঠী যা যৌথভাবে অমুক বা তমুক উত্তেজকের প্রভাবে সাড়া দেয়।'

মাত্র পঞ্চাশজন গোর্কিপন্থী ছেলেমেয়ে তুষার-ঝরা এক শীতের দিনে এসে হাজির হয়েছিল দ্জের্জিন্স্কি কমিউনের সুন্দর সাজানো ঘরগুলোয়, তারা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল আবিষ্কার, ঐতিহ্য আর নব উদ্ভাবনার সমৃদ্ধ ঐশ্বর্য, যৌথ প্রয়োগকৌশলের — প্রভুর দাসত্ব থেকে মুক্ত মানুষের স্ফুটনোন্মুখ প্রয়োগকৌশলের — এক বহুবিচিত্র সম্ভার। আর এই উর্বর জমিতে 'চেকা'র লোকজনের সযত্ন তত্ত্বাবধানে সুরক্ষিত থেকে, প্রতিদিন তাঁদের

কর্মশক্তি, সংস্কৃতি ও স্বাভাবিক নৈপুণ্যের জলহাওয়ায় বলীয়ান হয়ে কমিউন ক্রমশ বেড়ে উঠল চোখ-ধাঁধানো সৌন্দর্যের দীপ্তিতে-ভরা একটি যৌথ হিসেবে, সত্যিকার শ্রমসমৃদ্ধি ও উঁচুদরের সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসেবে, 'মানব-সন্তানের সংস্কারসাধন'-এর মতো অবাস্তব কোনো সমস্যার তেমন কিছু লক্ষণ না-প্রকাশ করেই।

দ্জের্জিন্স্কি কমিউনের এই সাত বছরের জীবন সংগ্রাম ও প্রবল মানসিক চাপের সাতটা বছরও বটে।

সলোমন বরিসভিচের প্লাইউডের কারখানার কথা ইতিমধ্যে ভুলে বসে আছে সবাই, কারখানাঘরের কাঠগুলোকে চিরেচুরে চুল্লীর জ্বালানি কাঠ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে গেছে কবেই। স্বয়ং সলোমন বরিসভিচও আর নেই, তাঁর জায়গা দখল করে নিয়েছে এমন জনা-বিশেক এঞ্জিনিয়র যাদের মধ্যে অনেকের নামই সোভিয়েত ইউনিয়নের সবচেয়ে সম্মানিত নামের তালিকায় স্থান পাওয়ার যোগ্য।

১৯৩১ সালের মধ্যেই কমিউনার্ডরা তাদের প্রথম ফ্যাক্টরি — বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের একটা বড় কারখানা — তৈরি করে ফেলেছে। নানা প্রতিকৃতি আর ফুল দিয়ে সাজানো, আলো-হাওয়ায় ভরা, উঁচু ছাদওয়ালা হলঘরে সেই থেকে শোভা পাচ্ছে হরেকরকমের অদ্ভুতকর্মা সব লেদ-মেশিন। এখন আর শুধু শর্ট্স কিংবা শোবার খাটের নানা অংশ কমিউনার্ডদের হাত থেকে বেরোয় না, এখন তারা তৈরি করছে শতেক পার্ট্স — জোড়-লাগানো, 'উচ্চতর গণিতের গন্ধমাখানো' বড়-বড় আর সুন্দর-সুন্দর যন্ত্রপাতি।

উচ্চতর গণিতের মীমাংসা নিয়ে কমিউনের সমাজ এখন ঠিক ততখানিই উত্তেজিত আর বিচলিত হয়, বহুকাল আগে আমরা যেমন বিচলিত হয়ে উঠতুম বীট-ফসল, সিমেন্থাল গোরু, 'ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ' নামের শুয়োর আর ঘোড়া 'মলাদিয়েত্স'কে নিয়ে।

যেদিন সেই বিখ্যাত 'দ্জের্জিন্স্কি ড্রিল-মেশিন'টি অ্যাসেম্বলি-শপ থেকে তৈরি হয়ে বেরিয়ে এল আর তাকে কার্যকরতা পরীক্ষার টেবিলে রাখা হল, রীতিমতো বড়-হয়ে-ওঠা ভাস্কা আলেক্সেয়েভ সেদিন যখন বৈদ্যুত কারেন্ট চালু করে দিল তখন এঞ্জিনিয়র, কমিউনার্ড ও শ্রমিকদের গুটিবিশেক মাথা ঝুঁকে পড়ল যন্ত্রটার ওপর সেটা কীরকম আওয়াজ দিচ্ছে তা-ই শোনবার জন্যে।

হঠাৎ চিফ এঞ্জিনিয়র গর্বুনোভ বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, 'আরে, স্পার্ক দিচ্ছে-যে!..'

'ধুত্তোরি ছাই, স্পার্ক দিচ্ছে!' বলে উঠল ভাস্কাও।

বিরক্তি লুকোতে হাসতে লাগল ওরা। তারপর ড্রিল-মেশিনটাকে ফের বয়ে নিয়ে গেল অ্যাসেম্বলি-শপে, টুকরো-টুকরো করে খুলে ফেলে ফের আগাগোড়া পরীক্ষা করে দেখল সেটাকে আর গোটা তিনটে দিন ধরে উচ্চতর গণিতের সব ক'টা নিয়ম প্রয়োগ করে দেখল যন্ত্রটার ওপর, ব্লু-প্রিন্টগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া আর তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করল তিনটে দিন। আর ওই তিন দিন ধরে কম্পাসের দাঁড়াগুলো হেঁটেচলে বেড়াল ব্লু-প্রিন্টগুলোর ওপর, সূক্ষ্ম কাজের উপযুক্ত 'কেল্লেনবের্গের' শান-যন্ত্রগুলো ড্রিলের নানা অংশের এক-ইঞ্চির এক-শতাংশ বাড়তি জোড়ের মুখগুলো চেঁছে সমান করল, ছেলেদের নিপুণ অনুভবনশীল আঙুলগুলো যন্ত্রটার সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি অংশগুলো ফের একবার জোড়া লাগাল আর তাদের সংবেদনশীল মন পরের বারের পরীক্ষার জন্যে আশায় উদ্বেগে অধীর হয়ে রইল।

তিনদিন পর 'দ্জের্জিন্স্কি ড্রিল'টাকে আবার পরীক্ষার টেবিলে এনে ফেলা হল। ফের একবার গুটিবিশেক মাথা ঝুঁকে পড়ল যন্ত্রটার ওপর আর আবার একবার চিফ এঞ্জিনিয়র গর্বুনোভ সখেদে বলে উঠল:

'এখনও স্পার্ক দিচ্ছে...'

'স্পার্ক দিচ্ছে, শালার যন্তর!' ওর কথার প্রতিধ্বনি তুলল ভাস্কা আলেক্সেয়েভ।

কথাটা মনে পড়ায় গর্বুনোভ ফের বলল, 'আমেরিকান যন্তরটায় কিন্তু স্পার্ক দিচ্ছিল না।' ওর গলায় একটু ঈর্ষার সুর ফুটল।

ভাস্কারও মনে পড়ে গেল, 'সত্যি, সেটায় স্পার্ক দিচ্ছিল না তো!'

'না তো, সেটায় স্পার্ক দিচ্ছিল না,' ওদের মতে সায় দিল আরেকজন এঞ্জিনিয়র।

'ঠিক-ঠিক, সেটায় স্পার্ক দিচ্ছিল না!' ছেলেরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল এবার। কার ওপর-যে রাগ দেখাবে তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না ওরা — নিজেদের ওপর, না লেদগুলোর ওপর, না গোলমেলে চার নম্বরী মার্কামারা ইস্পাতের ওপর, না বৈদ্যুত মোটরের আর্মেচার নিয়ে কাজ করেছে যে-মেয়েরা তাদের ওপর, নাকি খোদ এঞ্জিনিয়র গর্বুনোভের ওপর।

হঠাৎ দেখা গেল ছেলেদের ভিড়ের মধ্যে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে ডিঙি মেরে উ'চু হয়ে উঠে সকলকে তার সোনালি চুলের চুড়ো আর কালো তিলের ছিটে-দেয়া মুখখানা দেখাচ্ছে তিম্‌কা অদারিউক। তারপর লজ্জায় লাল হয়ে উঠে আর চোখদুটো নামিয়ে নিয়ে সে বলছে শোনা গেল:

'আমেরিকান ড্রিলটায়ও এমনই স্পার্ক দিতেছিল।'

'কী করি জানলি তুই?'

'বাঃ, আমি দেখি নাই বুঝি! পষ্ট মনে আছে, চলতি শুরু করেই ওটায় স্পার্ক দিতি লাগল। তা, স্পার্ক তো দিবেই, আমাদের ভেন্টিলেটর আছে না?'

কিন্তু তিম্‌কার কথায় কারো বিশ্বাস হল না। ড্রিল-মেশিনটাকে আবার অ্যাসেম্বলি-শপে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল, আবার একগাদা মাথা, লেদ-মেশিন আর বদমেজাজ যন্ত্রটা নিয়ে উঠে-পড়ে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে গোটা যৌথ সংস্থার মেজাজ চড়তে লাগল লক্ষণীয়রকম, এজমালি শোবার ঘর, ক্লাবঘর আর ক্লাসরুমগুলোয় ছড়িয়ে পড়তে লাগল দুশ্চিন্তা।

ওদিকে অদারিউককে ঘিরে ওর সমর্থকের একটা দলও গড়ে উঠল। তারা বলতে লাগল:

'এই প্রেথম ড্রিল-মেশিন বানায়েছে তো তাই আমাদের ছোঁড়ারা একটুকুন ঘাবড়ায়েছে। কিন্তু যাই বল্‌ 'আমেরিকান' মেশিনটায় আরও জোর স্পার্ক মারাতাছিল।'

'না, মোটেই না!'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়!'

'বলতেছি, মোটেই না!'

অবশেষে আর মনোবল বজায় রাখতে পারলুম না আমরা। মস্কোয় লোক পাঠাতে হল, আমাদের চেয়ে এ-কাজে আরও অভিজ্ঞ আর আরও নিপুণ লোকজনের কাছে মাথা নিচু করতে হল আমাদের। বলতে হল:

'আমাদের একটা 'ব্ল্যাক অ্যান্ড ডেকার' ছাপমারা ড্রিল-মেশিন পাঠান!'

ওরা একটা মেশিন পাঠিয়েও দিল।

'আমেরিকান' মেশিনটাকে কমিউনে এনে কার্যকরতা পরীক্ষার টেবিলে ফেলা গেল। এবার বিশটা মাথাই শুধু ঝুঁকে পড়ল না টেবিলের ওপর, তিন শো কমিউনার্ডের উদ্বেগ ঝুঁকে রইল গোটা অ্যাসেম্বলি-শপের ওপর।

রীতিমতো ফ্যাকাশে মেরে গিয়ে ভাস্‌কা বৈদ্যুত কারেন্ট চালু করে দিল আর এঞ্জিনিয়াররা নিশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করে রইল। আর চলন্ত মেশিনের গুনগুন আওয়াজ ছাপিয়ে হঠাৎ শোনা গেল অদারিউকের জোর গলা:

'কেমন, আমি বলেছিলাম কিনা...'

আর গোটা কমিউন থেকে একটা স্বস্তির নিশ্বাস উঠে মিলিয়ে গেল আকাশে। উদ্বেগে-ভরা চাউনির জায়গায় এবার দেখা দিল বিজয়ীর হাসি।

'হ্যাঁ, তিম্‌কাই ঠিক বলেছিল!'

উত্তেজনায়-ভরা ওই দিনটির কথা আজ কতদিন হল ভুলে বসে আছি আমরা, কারণ বহুদিন আগে থেকেই আমরা-যে প্রতিদিন পঞ্চাশটা করে অমন মেশিন তৈরি করে চলেছি আর সেই মেশিনগুলো স্পার্ক দিতে ভুলে গেছে সে-ও আজ কতদিন হয়ে গেল। এটা ঠিক যে তিম্‌কা ওইদিন সত্যি কথাই বলেছিল, কিন্তু তাছাড়া আরও একটা সত্য অপরীক্ষিত রয়ে গিয়েছিল সেদিন। আর তা হল উচ্চতর গণিতগন্ধী সত্য আর চিফ এঞ্জিনিয়র গর্দোনোভের দৃঢ়সংকল্প:

'উঁহু, মেশিনটার স্পার্ক দেয়া চলবে না!'

এ-সবই আজ ভুলে যাওয়া গেছে, কারণ ইতিমধ্যে আরও নতুন-নতুন দায়দায়িত্ব, নতুন-নতুন সমস্যা ভিড় করে এসেছে আমাদের জীবনে।

১৯৩২ সালে একটা কথা চাউর হয়ে গেল কমিউনে:

'আমরা লাইকা ক্যামেরা তৈরি করতে যাচ্ছি।'

কথাটা প্রথম তুলেছিলেন 'চেকা'র একজন লোক। এঞ্জিনিয়র নন, লেন্‌স্‌নির্মাতা মেকানিক বা ক্যামেরা তৈরির বিশেষজ্ঞ কারিগরও নন তিনি। তিনি ছিলেন স্রেফ একজন বিপ্লবী ও শ্রমিক। সঙ্গে সঙ্গে 'চেকা'র অন্যান্য লোকজন, বিপ্লবী আর বল্‌শেভিকরা বলেছিলেন:

'কমিউনার্ডরা লাইকা ক্যামেরা বানাক-না কেন!'

সেবার কিন্তু কমিউনার্ডরা কথাটাকে রীতিমতো অনুত্তেজিত শান্তভাবেই গ্রহণ করল। বলল:

'লাইকা ক্যামেরা? তা, ঠিক আছে, লাইকা ক্যামেরাই বানাব আমরা!'

কিন্তু শয়ে-শয়ে এমন অন্য অনেক এঞ্জিনিয়র, লেন্‌স্‌নির্মাতা মেকানিক, ক্যামেরা তৈরির কারিগর ছিলেন যাঁরা কথাটা শুনেই লাফিয়ে উঠলেন:

'লাইকা বানাবে তোমরা? পাগল হলে নাকি? হা-হা-হা!..'

অতঃপর শুরু হয়ে গেল নতুন একচোট লড়াই। ওই সময়ে আমাদের দেশে যে-সমস্ত অসংখ্য ও অত্যন্ত জটিল সোভিয়েত উদ্ভাবনার কাজ চলছিল এটা ছিল তাদের মধ্যে একটি। এই লড়াইয়ে নিহিত ছিল বহুবিচিত্র আবেগ, ভাবনাচিন্তা, কখনও কল্পনার পাখায় কখনও সোভিয়েত এয়ারপ্লেনে চেপে ইতস্তত উড়াল, আর ল্যাবরেটরির গভীর নৈঃশব্দ্যে ডুবে থেকে ব্লু-প্রিন্ট ঘাঁটা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো আর আরও নানারকম আনুষ্ঠানিক আচার উদ্‌যাপন করা। এই লড়াইয়ের সঙ্গে জড়িত ছিল সুরকিধুলো মেখে আক্রমণের পর আক্রমণ ফের আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া, কমিউনার্ডদের দলবলের পক্ষ থেকে মরিয়া হয়ে, বদ্ধপরিকর হয়ে ওয়ার্কশপগুলোয় আঘাতের-পর-আঘাত হানা। আর যতবার ব্যর্থ হচ্ছিল ততবারই কাজটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করছিল কমিউনার্ডরা। অথচ ওদের চারিদিকে সন্দেহ আর অবিশ্বাসের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা হচ্ছিল বারে-বারে, চশমার কাচের পেছনে অবিশ্বাসী চোখগুলো কুঁচকে উঠছিল ক্রমাগত, ক্রমাগতই শোনা যাচ্ছিল:

'লাইকা বানাবে? ছেলেরা? একেবারে চুলচেরা নিখুঁত সূক্ষ্ম লেন্‌স্? বলে কী! হা-হা-হা!'

কিন্তু পাঁচ শো ছেলেমেয়ে এ-সবের তোয়াক্কা না-রেখেই তখন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মাইক্রন-পরিমাণ মাপজোকের জগতে, সূক্ষ্ম কাজের উপযোগী লেদ-মেশিনগুলোর সূক্ষ্ম-জটিল জালে এবং সহনশীলতা, গোল-অপেরণ ও অপ্‌টিক্যাল বক্ররেখার ক্ষণভঙ্গুর জগতে। আর কাজে আকণ্ঠ ডুবে-থাকা এই ছেলেমেয়েরা কখনও-সখনও হাসিমুখে যখন ফিরে তাকাত 'চেকা'র লোকজনের দিকে তখন তাঁরা আশ্বাস দিতেন, বলতেন:

'ঠিক আছে, চালিয়ে যাও বাচ্চারা! ঘাবড়ানোর কিছু নেই!'

ফুলের বাগান, অ্যাস্‌ফল্‌টের রাস্তা আর ফোয়ারায় ঘেরা চমৎকার ঝকঝকে 'ফেদ'* কারখানা একদিন মাথা জাগিয়ে উঠল কমিউনের এলাকায়। আর তারপর মাত্র এই কয়েকদিন আগে কমিউনার্ডরা প্রজাতন্ত্রের জনকমিশারের টেবিলে এনে হাজির করেছে তাদের নিজহাতে তৈরি দশ হাজারতম 'ফেদ' ক্যামেরাটি — নিখুঁত, সুদর্শন একটি ছবিতোলার যন্ত্র।

* 'ফেদ' — দ্জের্‌জিন্‌স্কি কমিউনের অপটিক্যাল যন্ত্র নির্মাণের কারখানা। অনুঃ

এইরকম অনেক কিছু ঘটেছে, আবার অনেক কিছুই ভুলে যাওয়া গেছে। এককালের আদিম ধরনের বড়াই-বাহাদুরি, চোরের জগতের সাঙ্কেতিক ভাষা এবং কুশ্রী অতীতের আরও বহু জেরের অস্তিত্ব ভুলে যাওয়া গেছে কবেই। এখন প্রতিবছর বসন্তকালে কমিউনার্ডদের নিজস্ব 'রাব্‌ফাক' ডজনে-ডজনে ছাত্রছাত্রী পাঠিয়ে চলেছে উচ্চ শিক্ষায়তনগুলিতে আর এইসব ছাত্রছাত্রী ওই সমস্ত ইন্‌স্টিটিউট থেকে এঞ্জিনিয়র, ডাক্তার, ইতিহাসবিৎ, ভূতত্ত্ববিৎ, পাইলট, জাহাজনির্মাতা, রেডিও-অপারেটর, শিক্ষাবিজ্ঞানী, সঙ্গীতজ্ঞ, অভিনেতা-অভিনেত্রী ও গায়কগায়িকা হয়ে স্নাতক হিসেবে বেরিয়ে এল বলে। প্রতিবছর গ্রীষ্মে এইসব সদ্য-গড়ে-ওঠা নতুন জগতের বুদ্ধিজীবী তাদের শ্রমিক ভাইদের সঙ্গে মিলতে আসে — হাত মেলাতে আসে যতসব টার্নার, 'ক্যাপ্‌স্টান' লেদের অপারেটর, ধাতু-কাটাইওয়ালা আর ছাঁচকারদের সঙ্গে। আর তখন একটা রাজকীয় কুচকাওয়াজের অনুষ্ঠান হয়। গ্রীষ্মকালীন কুচকাওয়াজ কমিউনে একটা ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কমিউনার্ডরা ইতিমধ্যে কত হাজার কিলোমিটর-যে পায়ে হেঁটে পাড়ি দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই — আগের মতোই একেক সারিতে ছ'জন করে, সারির সামনে পতাকা তুলে ধরে, ব্যান্ড বাজিয়ে। ওরা কুচকাওয়াজ করে গেছে ভোল্‌গার আশপাশের জেলার মধ্যে দিয়ে, ক্রিমিয়ায়, ককেশাসে, এমন কি মস্কো আর ওদেসা শহরেও কুচকাওয়াজ দেখিয়েছে ওরা, কুচকাওয়াজ করেছে আজভ সাগরের উপকূলগুলোতেও।

আর থেকে-থেকে কখনও-সখনও কমিউনে — কখনও গ্রীষ্মকালীন পুনর্মিলন-সম্মিলনীর সময়ে, কখনও-বা জীবন যখন 'স্পার্ক দিচ্ছে' তখন, আবার কখনও-বা কমিউনার্ডদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার রুটিন যখন শান্তিতে পালিত হয়ে চলেছে তখনও — বুলেটের আকারের মাথা আর স্বচ্ছ দুটি চোখ নিয়ে কোনো একটি ছেলে হয়তো গিয়ে দাঁড়ায় সদর দরজার মুখে, তারপর বিউগ্‌লখানা আকাশমুখো তুলে ধরে দলপতি-পরিষদের সভা ডাকার সংক্ষিপ্ত-সংকেত বাজিয়ে দেয়। আর অতীতে যেমন হোত ঠিক সেইভাবে দলপতিরা তখন দাঁড়িয়ে যায় ঘরের দেয়াল-বরাবর, কৌতূহলী দর্শকরা ভিড় জমিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দরজাগুলোয় আর বাচ্চা ছেলেরা বসে মেঝের ওপর। আর চিরকাল যেমন হয়ে এসেছে তেমনই তীক্ষ্ম গম্ভীর গলায় দলপতি-পরিষদের সভাপতি তখন সেইদিনকাল দোষী ছেলেটিকে হেঁকে বলে:

'যা, ঘরের মধ্যিখানে গিয়ি দাঁড়া!.. অ্যাটেন্শন! এইবার আদ্যোপান্ত সবকথা খুলি বল দেখি আমাদেরে!'

আর ঠিক আগের মতোই থেকে-থেকে নানান ঘটনা ঘটে, হরেক লোকের হরেকরকম মেজাজের ফলে খিটিমিটিও বাধে, আর তখন গোটা যৌথ সংস্থা উত্ত্যক্ত মৌচাকের মতো ভনভনিয়ে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিপদের জায়গাটায়। আর শিক্ষাবিজ্ঞান ও তার প্রয়োগ আগের মতোই কঠিন আর জটিল ব্যাপার থেকে যায়।

অথচ ব্যাপার-স্যাপার কত-না সহজ হয়ে উঠেছে এখন! গোর্কি কলোনিতে কলঙ্ক আর অক্ষমতায়-ভরা আমার সেই প্রথম দিনগুলো আজ সুদূর অতীতের ব্যাপার হয়ে গেছে, সেগুলোকে এখন স্টিরিওস্কোপের সরু লেন্সের মধ্যে-দিয়ে-দেখা ছোট্ট ছবির মতো ঠেকে। সত্যি, ব্যাপার-স্যাপার অনেক সহজ হয়ে উঠেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অনেকগুলো জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাবিজ্ঞানগত কাজের দৃঢ়বদ্ধ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে এখন, এবং এখনও পর্যন্ত হতভাগ্য, মনোবল-ভাঙা শৈশবের লালনক্ষেত্র হয়ে রয়েছে যে-শেষ ঘাঁটিগুলো তাদের ওপর চরম আঘাত হেনে চলেছে কমিউনিস্ট পার্টি।

আর খুব অল্পদিনের মধ্যেই সম্ভবত লোকে আর 'শিক্ষা-সংক্রান্ত মহাকাব্য' লেখার কথা চিন্তা করবে না, তারা লিখবে কাজে লাগার মতো সহজ-সরল বই আর তার নাম দেবে: 'কমিউনিস্টশোভন শিক্ষাদানের পদ্ধতি'।

খার্কভ, ১৯২৫-১৯৩৫